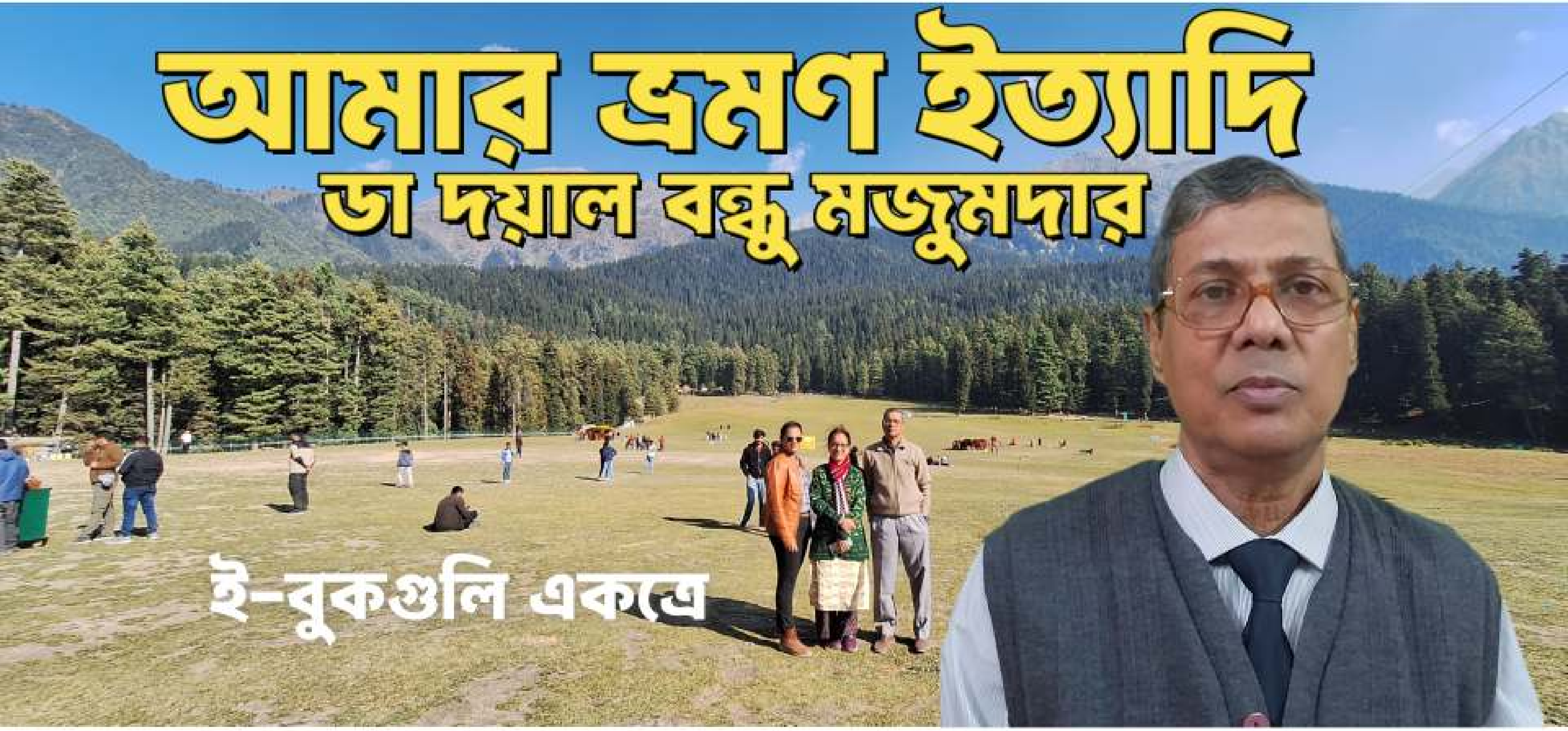
আমার ভ্রমণ ইত্যাদি
ডা দয়াল বন্ধু মজুমদার
ই-বুকগুলি একত্রে

আন্দামান ভ্রমণ – ২০১৮
ডা দয়াল বন্ধু মজুমদার

আন্দামান ভ্রমন ( 1)

আন্দামান ভ্রমন সেরে বাড়ী ফিরেছি গতকাল বিকেলে ( 22.2.2018)। ওখানে থাকতে থাকতেই গৌতম দাশগুপ্তবাবু বলেছেন, পরের বইটা শুধু ভ্রমন কাহিনী নিয়েই লিখতে। শুনেই আমার ছেলে বলেছে, আন্দামান নিয়ে লেখা দায়সারা ভাবে লেখা চলবে না। ফেরার সাথে সাথে রুবি দিদিমনি আর রাজীববাবু আন্দামান ভ্রমণ নিয়ে লিখতে শুরু করতে বলেছেন। একটা সমস্যায় পড়াগেল। কি লিখব সেটা কোন সমস্যা নয়; সমস্যা হল কতটা লিখব। এই ছয় রাত্রের ভ্রমণ কাহিনী নিয়েই একটা প্রমান সাইজের বই হয়েযায়। বাস্তবে আমার মেজদারই বই আছে আন্দামান ভ্রমণ নিয়ে।

এর মধ্যেই দুএকজন এই ভ্রমণ নিয়ে যে সব তথ্য জানতে চেয়েছেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সেই তথ্যগুলিই আগে লিখি। অবশ্য গুগুলদাদা সবই জানেন। ওনার জানাতেও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ তথ্য মহাসাগর থেকে নিজের দরকারি তথ্যগুলি খুঁজে বেরকরার থেকে আন্দামানের সমুদ্রের তলা থেকে  প্রবাল সাম্রাজ্যের ছবি তুলে আনা সহজ। ভ্রমণের পরে সেসব জায়গা কেমন লাগল, এ খবর বলাটাও বেশ সহজ নয়। আমার যা দারুন ভালোলাগে, আপনার সেটা বিরক্তিকর লাগতেই পার। ঐ আমার আগে লেখা," ধনিয়াপাতা থিওরী " আর কি! আমার ঠিক যে জন্য যে জায়গাটা ভালোলাগল, আর একজনের ঠিক ঐ জন্যই জায়গাটা খারাপ লাগতেই পারে। এই যেমন ধরুন, হ্যাভেলক দ্বীপের রাধানগর সমুদ্র তট। লোকে বলে এশিয়ার সবথেকে সুন্দর সী বিচ। আমার তেমন ভালোলাগেনি। আমার তো ঐ হ্যাভেলক দ্বীপের এলিফ্যান্ট বিচ সবথেকে সুন্দর মনে হয়েছে। মাত্র চরদিন আগেই আমার বন্ধু সুজিত হ্যাভেলক দ্বীপে গেলেও ঐ এলিফ্যান্ট বিচে যায়ই নি।

যে কোন বেড়ানোর জায়গা সম্বন্ধেই বলা যায়, " যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব?" এর উত্তরেও সেই ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপারই এসে যায়। যদিও আমার এ লেখা যে বা যাঁরা পড়ছেন, ধরেই নেওয়াযায় যে তাঁরা ভ্রমন পছন্দ করেন। তবে কিনা সাধ আর সাধ্যের মধ্যে ফাঁকটা সব সময় তো পূরণ করা সম্ভব হয় না। আমিও তো এই আন্দামান ভ্রমণের আগে আর্থিক ব্যাপারটি কয়েকজনের কাছে বোঝার চেষ্টা করেছি। এটিই কিন্তু বেশীরভাগ লোকের কাছে সবথেকে জরুরী তথ্য। আমার ক্ষমতা মত, আমি যে পয়সায় ছয় রাত্রের একটা ভ্রমণ সেরে এলাম, সেটাই জানাই।

আন্দামান ভ্রমণের প্রথম পদক্ষেপটি হল, এরোপ্লেনের টিকিট কাটা। এখন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান ছাড়াও বেশ কয়েকটি বেসরকারী কোম্পানির বিমান কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার যাতায়াত করে। আমি প্রায় চার মাস আগে চার জনের যাতাযাতের টিকিট কাটি, স্পাইসজেট কোম্পানির। বিয়াল্লিশ হাজারের একটু বেশী লেগেছিল।

বিমানের টিকিট যতো আগে কাটাযায় ততোই সস্তা হয়, এতো সবারই জানা। তবুও চারমাস আগে টিকিট কাটা সব সময় সম্ভবও নয়। চারজন সদস্য চার মাস পর সুস্থ থাকার নিশ্চয়তা চাই। রেলের মত বিমানের টিকিট ক্যানসেল করাযায় না।

এর পরের ব্যাপারটি হল, কত দিনের জন্য বেড়াতে যাচ্ছি। এক রাত বেশী মানেই চারজনের এক রাতের জন্য দুটি হোটেলের রুম ভাড়া বেশী খরচ। আমার মত একেবারে ভেতো বাঙালীর তিন তিন ছয় হাজার টাকা খরচ বাড়ে। আমার এবারের ছয় রাত্রের আন্দামান ভ্রমণের জন্য ট্যুর কোম্পানি ষাট হাজার টাকা নিয়েছে। এতে ছিল হোটেল ভাড়া, গাড়ী ভাড়া, জাহাজ ভাড়া আর কয়েকটা শো ইত্যাদির টিকিট। আমরা খাওয়ার খরচ আর জলে নেমে সমূদ্রতল দেখার সব খরচ নিজেদের পছন্দ মত করেছি। এটাই দস্তুর। এই দিকটাতে আমাদের চারজনের তিরিশ হাজার টাকা মত খরচ হয়েছে।

এখন কথাটা হচ্ছে, কতদিন লাগবে আন্দামান ভ্রমণের জন্য? আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পাঁচশ বাহাত্তরটি দ্বীপ আছে। সাধারন লোকজন থাকে তিরিশটি দ্বীপে। ঠিকঠাক সবটা দেখতে হলে দেড়মাস মত লেগে যায়। আমি ছয় রাত ছিলাম। কেউ সাত বা আট রাত থাকে। এজন্যই, ঐ দ্বীপে যাওয়া হল না; কিংবা ওটাতে এক রাত না থেকে দু রাত থাকা উচিত, এসব চিন্তা অমূলক। সাধারণত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণের জন্য লোকে যায় না। ওখানে থাকার জায়গা প্রায় নেই।

আন্দামান ভ্রমণের জন্য একশ একটা সংস্থা আছে। এখন ইন্টারনেট দেখে চার ছটি কোম্পানির দরদাম দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। দামের ফারাকটা মূলত হয় হোটেলের রুমের মানের জন্য। আমি আন্দামান গ্রেট হলিডেস কোম্পানির সাথে ঘুরে এলাম। একশোতে নিরানব্বই নম্বর দিলাম ওদের।

আন্দামান ভ্রমণ (৩)

লক্ষ্মণপুর বিচে নেমে দেখি একেবারে পাথুরে প্রান্তর৷ এবড়ো খেবড়ো পাথর ছড়ানো৷ পাথরগুলি উঁচু নিচু হয়ে এমন একটা অবস্থা যে দু একজন বয়স্কা মহিলা আর এগোলেন না৷ সমূদ্রের জল বেশ দূরে চলেগেছে৷ পাথরগুলি কিন্তু ভেজা ভেজা৷ পাড়ের দিকটা বেশ উঁচু ; ঘন গাছপালা, ঝোপ ঝাড়ে ঢাকা। অনেক কেয়া গাছে আনারসের মত ফল ধরে আছে৷ গাইড ছেলেটি জানাল, আদিবাসী লোকজন ঐ ফল সেদ্ধ করে খায়৷ পরে আমার বন্ধু ডা বৈরাগীর কাছেও শুনেছি, জনজাতী লোকেদের ঐ কেয়া ফল সেদ্ধ করে তার থেকে আটার মত জিনিষ বেরকরে খাদ্য তৈরীর ব্যাপারটি৷ ডা বৈরাগী এক সময় ঐ রকম জনজাতীর লোকেদের চিকিৎসক হিসেবে চাকরী করেছে ; সেই সময় ঐ কেয়া ফলের আটার তৈরী খাদ্য খেয়েও দেখেছে৷ পরে যখন পোর্টব্লেয়ারের নৃতত্ত্ব মিউজিয়াম দেখলাম, ওখানে দেখলাম, মডেলের মাধ্যমে ঐ রকম খাদ্য তৈরীর প্রক্রিয়া৷

এখানে একটা জরুরী তথ্য জানিয়ে রাখি। সাধারণভাবে আমরা জানি, আন্দামানের আদিম উপজাতি মানে জারোয়া। ঐ দ্বীপপুঞ্জে ছয়টি আদিম উপজাতির মানুষের বসবাস আছে। আমার বন্ধু যে সোমপেন উপজাতির চিকিৎসক ছিলেন, তাদের নাম আমি আগে শুনিনি। নৃতত্ত্ব মিউজিয়ামে সকল উপজাতির মানুষের ছবি ইত্যাদি দেখলাম। আমাদের মত তথাকথিক সভ্য মানুষের বর্বরতা থেকে ওনাদের রক্ষা করার জন্য খুব কড়াকড়ি আছে। ওনাদের কোন ছবি তোলাও দন্ডনীয়। এমনকি একমাত্র নৃতত্ত্ব মিউজিয়ামেই ক্যামেরা নিয়ে ঢোকা নিষিদ্ধ।

অনেকেই বলেছে, আন্দামান ভ্রমণ সেরে এলেন, জারোয়া দেখলেন না! এ যেন সুন্দরবনে বাঘ দেখতে যাওয়া। চিন্তাটা কতোটা অশ্লীল একটু ভেবে দেখবেন। ঐ ছয় উপজাতির মধ্যে নিকোবরীরা পড়াশুনা করে অনেক এগিয়েছেন। কয়েকজন নিকোবরী ডাক্তার ও হয়েছেন।

আমরা আবার ন্যাচারাল ব্রীজের দিকে এগোই চলুন। একেবারে পাড়ের গাছেদের কাছে একটি প্রায় চারফুট লম্বা সামূদ্রীক সাপ মরে পড়ে আছে দেখলাম। আমি ছবিও তুললাম। ওটি সি ক্রেট সাপ। ভয়ংকর বিষধর ; কামড়ালে আর উপায় নেই। ভারতে এসব সামূদ্রীক সাপের কোন আন্টিভেনম নেই। এসব কথা আমাদের ওয়েবপেজ, স্নেকবাইট লাইফসেভারস -এ পাবেন। ঐ ছবিটিও ঐ পেজে দিয়েছি।

হাঁটতে হাঁটতে একটা বাঁক ঘুরতেই বাঁদিকে দেখতে পেলাম ন্যাচারাল ব্রীজ। ছবিতো আগের পর্বেই দিয়েছি। বাঁ দিকের উঁচু পাড়ের সাথে সমূদ্রতটে উঠে আসা পাথরের স্তম্ভকে যেন একটা সেতু দিয়ে জোড়া। ঐ পাথরের উপর গাছ গাছালিও জন্মেছে।

আমরা সুন্দর ভাটার সময় পৌছেছি, ব্রীজের কাছে চলেযেতে কোন অসুবিধা হল না। গোটা সমূদ্রতট যেন পাথর বাঁধানো। মাঝে মাঝে একটা ঢেউ এসে পা ভিজিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্যান্ট গুটিয়ে, চটি বা কিটো পরেই গেছলাম। আন্দামান ভ্রমণ মানে প্রধানত সমূদ্রতটে ঘোরা। এজন্য কিটো বা বর্ষার জুতো পরে যাওয়াই ভালো। জলে না নামলেও সমূদ্রতটে প্রচুর বালি। আর এই নীল দ্বীপের ন্যাচারাল ব্রীজের কাছে গিয়ে নানান রকম সামূদ্রীক প্রাণী দেখতে হলে জলে ভেজা প্রবাল পাথরের উপরে হাঁটতে হবে। আন্দামানের দ্বীপগুলির প্রায় সবই এই প্রবাল পাথরে তৈরী। বস্তুত এই ন্যাচারাল ব্রীজও হাজার হাজার বছর আগে সমূদ্রের তলায় প্রবাল হয়েই তৈরী হয়েছে। পাথরের ব্রীজের উপর পাছপালা দেখলেই বোঝাযায় পাথরের ভেতর শেকড় চালানোর মত ফাঁক আছে। ঐ গাছে একটি সামূদ্রিক পাখি বাসা করে বসে ছিল, বলেছি সে কথা।

গোটা চত্তরে ছড়ানো প্রবাল পাথরের মাঝে মাঝে যে খানা খন্দ আছে তাতে টলটলে পরিস্কার সমূদ্রের জল আটকে থাকে। আর থাকে নানাধরণের প্রাণী। গাইড ছেলেটি আমাদের কাছে বিস্কুট আছে কিনা জানতে চাইল। বিচের কুকুরদের দেওয়ার জন্য যে বিস্কুট কেনা হয়েছিল, তার কয়েকটা ছিল। দশ ফুট বাই দশ ফুট মত একটা জায়গায় দু আড়াই ফুট গভীর জল আটকে ছিল৷ গাইড ছেলেটি বলল, ওইখানে বিস্কুটের গুঁড়ো ফেলুন, দেখবেন মাছেদের লড়াই লাগবে৷ আমার স্ত্রী বিস্কুটের গুঁড়ো ফেলতেই কয়েকশ মাছের হুটোপুটি লাগল৷ সবথেকে বড়গুলি তিন চার ইন্চি সাইজের তেলাপিয়া মাছের মত৷ আরও অনেক ছোট ছোট মাছ এসেগেল বিস্কুটের গুঁড়ো খেতে৷ এই মাত্র মিনিট দুয়েকের একটা ঘটনা আমার মনে, হিন্দু দর্শনের একটা গভীর জিনিষ ঢুকিয়ে দিল৷ মাত্র বারো ঘন্টা পর জোয়ার এসে ঐ ছোট্ট জলের খন্দটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে৷ ওখন ঐ ছোট্ট মাছগুলিও মহাসিন্ধুর ডাক পাবে৷ আমাদের এই সত্তর আশি বছরের জীবনের ওপাড়ে যে মহাসিন্ধু পড়ে আছে, আমরা কি তার অস্তিত্ব ভুলে ঐ মাছগুলির মত সামান্য বিস্কুটের গুঁড়োর জন্য মেতে আছি?

এই দেখুন, কদিন ছুটি নিয়ে একটু হালকা মেজাজে ছুটি কাটাতে গিয়ে, এসব গুরুগম্ভীর কথা কেন বাপু? ক্ষ্যামা দাও৷ ভ্রমনের এই এক পার্শপ্রতিক্রীয়া৷ তুশার ধবল হিমালয় বা সুনীল সাগরের তীর আপনাকে মাঝে মাঝেই দার্শনিক করে তুলবে৷ নিজেদের ক্ষুদ্রতাকে বুঝতে পারি, এই সব বিশাল বিপুলের কাছে গেলেই৷ এই নীল দ্বীপের অভিজ্ঞতা লিখতে গিয়েই, আমার এক বয়জ্যেষ্ঠা এরকম অনুভবের কথা বলেছেন; সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে৷

প্রবাল পাথরের ছোট ছোট গর্তের ভেতর সমূদ্র জোঁক দেখাল, গাইড ছেলেটি। না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওরা ডাঙার জোঁকের মত মানুষকে আক্রমণ করে না। পাথরের গর্তেই আটকে থাকে। ঐ রকম গর্তের ভেতরেই দেখাল, সি অর্চিন নামের কালো কাঁটায় ঘেরা একরকম প্রাণী। গাইড সাবধান করল, হাতে পায়ে ঐ কাঁটা ফুটলে পেকে উঠবে। পরে পোর্টব্লেয়ারের মেরিন মিউজিয়ামে ওদের পূর্ণ অবয়বটা দেখলাম।

একটা জীবিত সমুদ্র শশা হাতে নিয়ে দেখাল গাইড। সেমি সাবমেরিন থেকে দেখে ওদের শশা আকৃতির পাথর মনে হয়েছিল। দীঘার সমূদ্রতটে আমরা ষ্টার ফিস বা তারা মাছ দেখেছি। এখানেও দেখলাম। কিন্তু একেবারে অন্য রকম। দু রকম তারামাছ একেবারে হাতে নিয়ে দেখিয়ে আবার জলে ছেড়ে দিল।

অনেক পাথরের গর্তেই অক্টোপাশ ঢুকে আছে মনে হল। গর্ত থেকে শুধুই দুটি শুঁড় একটু বেরকরে নাড়ছে। অন্য একজন গাইড একটি রঙীন কাঁকড়া ধরেফেলল, সবাই দেখার জন্য জড়ো হলাম। ছবিও তুললাম। জলের ভেতর অর্কিডের ফুলের মত আটকে আছে, পাথরের গায়ে। গাইড আমার ছেলেকে ছুয়ে দেখতে বলল।ছোয়ার সাথে সাথেই, লজ্জাবতীর মত গুটিয়ে একেবারে প্রায় ভ্যানিস হয়ে যাচ্ছে। আমরা ভিডিও তুললাম।

আরও একরকম সুক্ষ্ম লজ্জাবতীর মত এলগি, পাথরের গায়ে ছুয়ে দেখলাম। একদিকে দেখলাম দুটি ছেলে হাঁটু জলে নেমে একটা বড় পাথরকে ঠেলে নাড়ানোর চেষ্টা করছে। তাই দেখে আমাদের গাইড ছেলেটিও হাত লাগাল। একটু দুরের থেকে দেখলাম, একটা কি জিনিস হাতে নিয়ে ওদের একজন সকলকে দেখাচ্ছে। আমরাও এগিয়ে গেলাম। এবার কিন্তু আমাদের চমকের পালা। সাথে সাথে নিজের অজ্ঞতাকে আবারও আবিস্কার করলাম। যে শুঁড়গুলিকে অক্টোপাশের শুঁড় ভাবছিলাম, ওগুলো আসলে পাঁচ শুঁড়ওয়ালা একটা তারা মাছ। ছবি তো উঠলই। জলে ছেড়ে ভিডিও তোলাও হল।

এসব প্রাণী দেখা ইত্যাদি করতেই এক ঘন্টা পেরিয়ে গেল। এরপর যেতে হবে, এই নীল দ্বীপের বিখ্যাত সান সেট পয়েন্ট। ফেরার রাস্তা ধরলাম। একটা কুড়ি বাইশ বছরের গাইড ছেলের কাছে অনেক সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধে শিক্ষা পেলাম। কিন্তু তার থেকেও যে বড় শিক্ষাটা ওরা দুজন আমাদের দিল, আমাদের মত তথাকথিক শিক্ষিত মানুষদের সে শিক্ষার জন্য, " বেত্র ব্যবহারই " জরুরী। আমাদের গাইড ছেলেটি আমাদের সাথে ফিরে আসছিল ; পেছন থেকে ওকে ডাকল আর একটি গাইড। একটা প্লাস্টিক জলের বোতল কেউ সমূদ্রতটে ফেলে গেছল, ওটা তুলে,দুমড়ে মুচড়ে পিছনের ছেলেটি ছুড়ে দিল এর দিকে। ওটা নিয়ে ছেলেটি ফিরে এল, নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলার জন্য। আন্দামানের যে কটা দ্বীপ ঘুরেছি, সব জায়গায়ই দেখেছি, ওরা প্রকৃতি আর পরিবেশ রক্ষায় খুবই আন্তরিক। আমরা শহুরে লোকেরা নির্লজ্জের মত যত্র তত্র প্লাষ্টিক ফেলে আসছি। জব্বলপুরের মার্বেল রকের নর্মদায় বোটিং করার সময়ও দেখেছি, টলটলে পরিস্কার জলে প্লাষ্টিকের বোতল ছুড়ে ফেলল নৌকা থেকে।

আন্দামান ভ্রমণ প্রথম পর্ব আমার টাইম লাইনে পাবেন, ২৫ শে ফেব্রুয়ারি। আর দ্বিতীয় পর্ব ৩রা মার্চ। (ক্রমশ )

আন্দামান ভ্রমণ ( ৪)

নীল দ্বীপের এই ন্যাচারাল ব্রীজ এর অবস্থান, লক্ষ্মণপুর এক নম্বর সমুদ্রতটে। লক্ষ্মণপুর দুই নম্বর সমুদ্রতটে সূর্যাস্ত দেখার জন্য সবাই জড়ো হয়। আমরাও চললাম।

এখানে নীল দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানটি একটু জেনে নেওয়াযাক। আন্দামানের প্রধাণ দ্বীপ যেখানে পোর্টব্লেয়ার শহর, সেখান থেকে জাহাজে করে দু ঘন্টা উত্তর পুর্বে হ্যাভেলক দ্বীপ। হ্যাভেলকের রাধানগর সমূদ্রতট পৃথিবী বিখ্যাত। এছাড়াও দশ মাইল লম্বা হ্যাভেলকে আরও গোটা ছয়েক বিচ আছে। হ্যাভেলকের থেকে এক ঘন্টা জাহাজে দক্ষিণদিকে গেলে এই নীল দ্বীপ। এটি লম্বা চওড়ায় মাত্র দু কিলোমিটার করে।

নীল দ্বীপেও রামপুর, ভরতপুর আর লক্ষ্মণপুরের দুটি, মোট চারটি বিচ আছে। আমরা সকালে সাড়ে দশটা নাগাত পৌছেছি। হোটেলে ব্যাগপত্র রেখেই চলে গেছলাম ভরতপুর বিচে। গাড়ীতে পৌছনোর সময় ড্রাইভার ছেলেটিই বলেছিল, এখন জোয়ার চলছে; জলের ভেতরের যা কিছু করবার এখন করে নিন। এখানে দেখলাম, সমূদ্রের তট থেকে পাড়ের ওপরের অনেকটা পর্যন্তই বালি ছড়ানো। গাছের ছায়ায় ছায়ায় অনেক গুমটি দোকান। ডাব, কোল্ড ড্রিংক্স থেকে শুরু করে মাছ ভাতের দোকান সবই আছে।

বালির উপর বড় বড় পলিথিন পেতে লোকের বসার ব্যবস্থা করেছে নৌকাওলারাই। আমরা একটা গ্লাশ বটম নৌকায় ওঠার জন্য পাঁচশ টাকা করে চারটি টিকিট কাটলাম। আমাদের সাথে আর একজন ভদ্রমহিলাও চললেন। ওনার স্বামী নৌকায় চাপবেন না। আমাদেরই বললেন, ওনার স্ত্রীকে একটু দেখতে। পরে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভদ্রলোকের নৌকায় না ওঠার কারন কি? বাচ্চা নিয়ে পাড়ে বসে থাকা? না, কোন বাচ্চা ওদের সাথে ছিল না। ভদ্রলোকের জলে ভয়, তাই ঐরকম ছোট নৌকায় ওঠেন নি। আমরা সবাই ভেসে থাকার লাইফ জ্যাকেট পরে নিয়ে উঠে পড়লাম নৌকায়। জল ছিটে হাতের ক্যামেরা বা মোবাইল ভেজাবে কি না জানতে চাওয়ায়, মাঝি, না বলল। আগের দিনই এলিফ্যান্ট বিচ থেকে ফেরার সময়, জল ছিটে ভিজিয়ে দিয়েছিল। ভরতপুরেও হাওয়া আর ঢেউ দুইই ছিল। জল একটু আধটু ছিটলেও,একেবারে স্নান করার মত ছিল না।

এই গ্লাশ বটম নৌকায় দুপাশে পাঁচ ছজন করে বসার জায়গা থাকে। পায়ের কাছটা স্বচ্ছ কাঁচের তৈরী। ঐ কাঁচের ভেতর দিয়ে সমূদ্রের তলার প্রবাল সাম্রাজ্যের শোভা দেখা যায়। প্রবালের ফাঁকে ফাঁকে খেলে বেড়ানো নানান রকম রঙীন মাছ দেখতে দেখতে আধ ঘন্টা কখন যেন পেরিয়ে যায়। নৌকা চলে পিছনে লাগানো ইয়ামাহা ইঞ্জিনে। মাঝি পিছনে বসেই নৌকার গতি আর গন্তব্য নিয়ন্ত্রণ করে। ওরা জানে কোথায় গেলে ভাল প্রবাল বা মাছ দেখা যাবে। যেখানে ভাল মাছ দেখা যায়, সেখানে নৌকার গতি মন্থর করে আমাদের দেখার সুযোগ করে দিচ্ছিল মাঝি।

ভরতপুর বিচের কাছেও জোয়ারের সময় সমূদ্রের জলের রং খুব সুন্দর আর ঝকঝকে স্বচ্ছ। পাড়ের থেকে একশ দেড়শো গজ দূর পর্যন্ত সবুজাভ নীল; তারপর দূরের সমূদ্র ঘন নীল। পরে বুঝেছিলাম, যেখানে জলের নিচে কয়েক ফুটের গভীরেই প্রবাল থাকে, সেখানে সমূদ্র ঐ রকম সবুজাভ নীল দেখায়। গ্লাশ বটম নৌকায় বসে নিচের দিকে তাকিয়ে প্রবাল পাথরের দুরত্ব নৌকা থেকে মাত্র কয়েক ফুটই মনে হচ্ছিল। পাড় থেকে তিনশো গজ মত দূরে একটা দুধ সাদা মাস্তুল লাগানো নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ছোট্ট গ্লাশ বটম একেবারে ওর কাছে পৌছে গেল। মাঝি বলল, ওটা অস্ট্রেলিয়ান নৌকা, প্রতি বছরই আসে। ঐ নৌকার একজন নাকি আমাদের মাঝিকে কখনও বলেছে, ওরা ঘর বাড়ী বিক্রী করে এরকম একটা নৌকা নিয়ে গোটা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। একজন নাকি ছ মাস ছাড়া একবার ডাঙায় নামে। পরে এরকম গোটা দুই নৌকা পোর্টব্লেয়ারের কাছেও দেখেছি।

অস্ট্রেলিয়ান সাহেবের মত নৌকা নিয়ে গোটা পৃথিবীর সব সাগর মহাসাগর ঘোরার সম্ভাবনা আমার বা আপনাদের কারোরই বোধহয় নেই। আমি আগেও পড়েছি, এবার আন্দামানে যাওয়ার আগেও শুনলাম, জাহাজে চড়লে প্রায় সবারই সি সিকনেস হয়। জাহাজের দুলুনিতে গা গোলায়। অনেকেরই বমি হয়। অদ্ভুতভাবে এই আন্দামান ভ্রমণের সময় আমরা বার তিনেক জাহাজে আর একদিন বড় লঞ্চে করে সমূদ্রে কয়েক ঘন্টা ঘুরলাম; আমাদের চারজনের কারোরই ওসব সমস্যা হয়নি। সম্ভবত আমাদের সৌভাগ্য,ঐ সময় সমূদ্র তেমন উত্তাল হয়নি।

অদ্ভুত কান্ড হল এই ভরতপুরে গ্লাশ বটম নৌকায় চড়ে। মিনিট কুড়ি ঘোরার পর,শেষ দশ মিনিট আমার বেশ গা গোলাচ্ছিল। হতে পারে আমার ঘাড়ে স্পন্ডাইলোসিস থাকায় অনেকক্ষন ঝুঁকে দেখার জন্য ওরকম হয়েছিল। পরে আমার মেয়েরও ওরকম হয়েছে শুনলাম। এই গ্লাশ বটম নৌকায় চড়ে সমূদ্রের তলাটা দেখার পর মনে হয়েছে, অত খরচ করে সেমি সাবমেরিনে না চড়লেও বিশেষ ক্ষতি হত না। এখানে পাঁচশ টাকা দিয়ে যা দেখা গেল, সেমি সাবমেরিনে সাড়ে আঠারশো টাকায় ঐরকমই দেখেছি। অবশ্যই ওটাতে এয়ার কন্ডিসন্ড কেবিনে বসে দেখা হয়।

আমাদের নৌকার সহযাত্রী মহিলার স্বামীর মত লোকেদের জন্য সেমি সাবমেরিন আদর্শ। ওখানে আর একটা সুবিধা পাওয়া যায়; একজন মহিলা মাইক নিয়ে কোথায় কি দেখা যাচ্ছে, ধারা বিবরনী দিয়ে যাচ্ছিলেন।

এখানেই আবার একটু অর্থনৈতিক ব্যাপারটা মনে করিয়ে দিই। জংলীঘাট জেটি থেকে রস আর নর্থবে দ্বীপ দুটিতে যাওয়ার জন্য লঞ্চ ধরতে গেলাম সকালে আটটা নাগাত। গিয়ে দেখি গাড়ী আর মানুষের ভীড়। অনেকে হাতে একটা করে রঙীন বিল বই নিয়ে কিসের যেন টিকিট বিক্রী করছে। আমাদের টিকিট কেটে রেখেছে ট্যুর কোম্পানির লোক; তাই তার জন্য অপেক্ষা করলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ছেলেটি এসে গেল। ও আমার ছেলেকে মার্ক মেরিনা লঞ্চের চারটি টিকিট দিয়ে বলল, অন্য কিছু ওয়াটার আক্টিভিটি করলে তার বুকিং এখানেই করতে হবে। ঐ বিল বইওয়ালা একজনের সাথে কথা বলতে বলল। এই একটা জায়গায় দেখলাম, নানান ভাবে বুঝিয়ে টিকিট বিক্রীর চেষ্টা চলছে। ও-ই বুঝিয়ে সেমি সাবমেরিনের চারটি টিকিট আমাদের বিক্রি করল।

কিন্তু স্কুবা ডাইভিং করার জন্য আমার ছেলে মেয়ে হ্যাভেলকে সময় নির্ধারণ করে রেখেছিল, তাই এদের অনেক বোঝানোতেও রাজী হল না। বস্তুত একটু কম বয়সিদের কাছে এই স্কুবা ডাইভিং একটা দারুন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এজন্যে ওরা ভালো রকম খোঁজখবর নিয়েই, হ্যাভেলকের গোবিন্দনগরের স্কুবা ডাইভিং সেন্টার ঠিক করেই নিয়েছিল। আন্দামানে আমরাই তো গোটা ছয়েক জায়গায় স্কুবা হচ্ছে দেখলাম। একই ভাবে নর্থ বে ছাড়াও এলিফ্যান্ট বিচে সি ওয়াক হয়। কিন্তু জংলীঘাটের ছেলেগুলো বোঝানোর চেষ্টা করছিল, গোটা ভারতে একমাত্র নর্থ বে তেই হয়। আমরা যেহেতু কেউ সি ওয়াক করিনি, তাই বলতে পারছি না, স্কুবা ভাল না এটা।

দেখুন, কথায় কথায় আপনাদের নীল দ্বীপের ভরতপুর বিচের থেকে পোর্টব্লেয়ারের জংলীঘাট জেটি, সেখান থেকে কোথায় কোথায় যেন ঘুরিয়ে আনলাম। ভরতপুরে গ্লাশ বটম নৌকায় ঘোরাহলে, তীরে এসে একটা গুমটিতে চা খেলাম। বালির ওপর পাতা পলিথিনে না বসে ঐ চায়ের দোকানের সামান্য মাচায় বসে সমূদ্র দেখছিলাম। এক ভদ্রলোক দেখলাম জলে নেমে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছেন। অনেক দূর, অন্তত একশ গজ চলে গেলেও জল ওনার হাঁটুর ওপরে হচ্ছে না। পরদিন সকালে দেখেছি, ভাটায় জল নেমে আরও দূরে চলেগেছে। জেগে আছে পাথুরে প্রান্তর।

আমাদের গাড়ী , আমাদের ন্যাচারাল ব্রীজ দেখা হলে, লক্ষণপুর বিচ থেকে সানসেট পয়েন্টে নিয়ে চলল। গ্রামের গাছপালা, নারকেল বাগান, সুপারী বাগানের ভেতরের সরু বাঁধানো রাস্তা দিয়ে মিনিট দশেকেই একটা জায়গায় পৌছে দিল। খুব লম্বা লম্বা একটু কম ডালপালার অনেক গাছেদের তলায় তলায় ট্যুরিষ্টদের গাড়ীগুলি এসে সকলকে নামাতে থাকল। ড্রাইভার বলেদিল, বিচ ধরে বাঁদিকে এগোতে। বিচে গিয়ে দেখলাম, সমূদ্র অনেক দূরে সরেগেছে ভাটায়। কালচে মরা প্রবালের পাথরে ঢাকা প্রান্তরের ওপারে নীল জল, অন্তত দুশো গজ দূরে। বাঁদিকে পাড়ে কেয়া গাছের ফল, আনারসের মত দেখতে। ডান দিকে পাথরের ফাঁকে মাছের খোঁজে ঘোরা দু একটা পাখি, এসব দেখতে দেখতে প্রায় হাফ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে এগোলাম। সানসেট পয়েন্টে পৌছে দেখলাম, বালুচরের ঢাল শেষ হওয়ার পর সেই পাথরের প্রান্তর। সূর্য তখনও বেশ উপরে। একটু পিছিয়ে এসে, ছায়া দেখে, একটা চায়ের গুমটিতে চা বলে, ওদের মাচায় বসলাম।

আন্দামান ভ্রমন ( ৫)

এই যে সমুদ্রতটের চায়ের দোকানে আধ ঘন্টা বসে থাকা; এর থেকেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। দোকানে চা তৈরী করছেন এক মহিলা। তার স্বামী লোকটি ঘুরে ঘুরে লোকজনকে ডাকছে। চা ছাড়াও কলার মোচার পাকড়ো পাওয়া যায়, খেয়ে দেখতে বলছে, এই সব আরকি। ওরাও বাংলায় কথা বলছে। আমাদের পরে আরও অনেকে চা পাকোড়া খেল। সবাই বাঙালী। " রম্যাণি বীক্ষ্য " বইয়ের লেখক, শ্রদ্ধেয় সুবোধ কুমার চক্রবর্তীর একটি অভ্যেস ছিল, তখনকার রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীদের সাথে আলাপ জমাতেন; তথ্য সংগ্রহের জন্য।

আজকাল অবশ্য ট্রেনে সেভাবে আলাপ জমাতে গেলে, লোকে পকেটমার ভাবতে পারে। এই চা বিক্রেতা লোকটি নিজেই বক বক করছিল। আমারও আধ ঘন্টা মত সময় কাটানোর দরকার ছিল। ওর কথায় যা জানলাম, ওর আদি বাড়ী শান্তিপুরের কাছে কোন গ্রামে। মামার কাছে চলে এসেছিল কোন জীবিকার সন্ধানে। অনেক আগে যারা এসেছিল, তারা জমিজমা পেয়েছে, এদের ওসব নেই। চাষ আবাদ করে কিনা জানতে চাওয়ায় জানাল, আগে সব্জির চাষ হত, এখন রাসায়নিক সার না আসায় চাষ বন্ধ। ওর দোকানে দুধ বিক্রী হচ্ছে ; তাই বললাম, গোবর সারে সব্জির চাষ হয় না? ওর কথায় বুঝলাম ওসব জৈব সার বা জৈব চাষ ওদের অভিধানে নেই। পরে পোর্টব্লেয়ারের রাস্তার পাশে রঙীন ব্যানার দেখেছি, " নীল দ্বীপের টাটকা সব্জি ". নীল দ্বীপে আনিডো অর্থাৎ আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দুগ্ধ সমবায়ের অফিস দেখেছি। আমার বন্ধু ডা বৈরাগীর স্ত্রী বলছিলেন, নীল দ্বীপে এক সময় দুধ সস্তা ছিল, ডা বৈরাগী ওদিক থেকে পোর্টব্লেয়ার ফেরার সময় দুধ নিয়ে আসতেন।

আমি নীল দ্বীপে কোথাও চাষ দেখিনি। হ্যাভেলকে তবু একটাই জমিতে বাঁধাকপি দেখেছি। শুনেছি ওসব দ্বীপে লোকজনকে বসবাসে উৎসাহী করতে, এক সময় বিনা পয়সায় বিঘার পর বিঘা জমি দেওয়া হয়েছে। এখন ট্যুরিজম এর ব্যবসা করে লোকের হাতে প্রচুর টাকা হয়েছে, ওরা আর চাষ আবাদের কথা ভাবে না। চায়ের দোকানের লোকটিই বলছিল, ঐ সময় বরবটির দাম তিনশো গ্রাম পঞ্চাশ টাকা। এক কাপ চায়ের দাম কুড়ি টাকা হলে, বরবটির ঐ দামই হওয়া উচিত।

আস্তে আস্তে লোক সমাগম বাড়ছিল। একটি বাঙালী পরিবার, সকলেই বেশ শিক্ষিতই মনে হল, চা আর পাকড়োও খেলেন।সকলেরই বয়েস ষাটের উপরই হবে। আমরা সকলেই কাগজের কাপে চা খেয়ে নির্দিষ্ট বালতিতে কাপ ফেলেছি। এক ভদ্রমহিলা বিচের বালির ওপরেই কাপটা ফেললেন। ওনার স্বামীই সম্ভবত, ওনাকে বারবার বলা সত্ত্বেও কাপটা তুলে বালতিতে ফেললেন না। শেষে ভদ্রলোক নিজেই কাপটা তুললেন। ওখানে বসেই লক্ষ্য করছিলাম, এক আধটা কাপ বালতির বাইরে পড়লে, দোকানের লোকটিই তুলে বালতিতে ফেলছিল। ওদের ওখানে আইনের কোন কড়াকড়ি আছে কিনা জানিনা। কিন্তু সমুদ্রতটে ওরকম কোন প্লাষ্টিক বা কাগজ কোথাও পড়ে থাকতে দেখিনি। সূর্যাস্ত দেখার জন্য শ দুই লোক তো হাজির হয়েছিলাম। মোড় ঘুরে বাঁ দিকেও দেখলাম বেশ কয়েকটা ওরকম চায়ের গুমটি আছে। আমাদের স্বভাব মত যথেচ্ছ চায়ের কাপ আর প্লাষ্টিক ছড়ালে, এক মাসেই ঐ সানসেট পয়েন্ট নরক কুন্ড হত নিশ্চয়ই।

এবার সূর্যাস্ত দেখার সময় হল। আমি আধ ঘন্টা আগেই ছেলেকে বলেছিলাম, পশ্চিম দিকে যেখানে সূর্য ডুববে, সেখানে একটা দ্বীপের মত দেখা যাচ্ছে, সূর্য একেবারে সমুদ্রের জলে না ডুবলে দেখে মজা নেই। গোধূলির মায়াবী আলোয় আমাদের পিছনের মানুষজন গাছপালা সব কিছুই সুন্দর লাগছিল। কিন্তু সমুদ্রের জলে গোধূলির অস্তরাগে যে আলতা গোলা রং দেখার আশা করেছিলাম, সেটা হল না। তবুও অনেক ছবি উঠল। অনেকেই প্রবাল পাথরে সাবধানে পা ফেলে ফেলে যতোটা এগোনো যায় এগিয়ে গেল। এখানে একটা পুরনো কথা একটু ঝালিয়ে নিই। মহাত্মা গান্ধী তাঁর, " মাই ফার্ষ্ট ভিজিট টু লন্ডন" রচনায় লিখেছেন, প্রথমবার লন্ডন শহর দেখে উনি খুবই হতাশ হয়েছিলেন। আসলে বৃটিশ রাজের মূল কেন্দ্র সম্বন্ধে ওনার প্রত্যাশা অনেক বেশী ছিল।

এই প্রত্যাশা পূরণ না হয়ে হতাশ হওয়ার ব্যাপারটি আমাদের জীবনে যেমন আকছার ঘটছে, তেমনি এই প্রত্যাশার মাত্রা নিজের আয়ত্তে রাখাটাও কঠিন। এই ভ্রমনের ক্ষেত্রেই যেমন। কেউ একটা কোন জায়গা ঘুরে এসে এমন উচ্ছসিত প্রশংসা করল যে আপনি পরের ছুটিতেই ছুটলেন। গিয়ে হয়তো দেখলেন, একেবারে মামুলী একটা জায়গা। বেশীরভাগ লোকই সুন্দরবন ঘুরে এসে বলে,ধ্যুৎ,বাঘই দেখলাম না। সুন্দরবন যেন আলিপুর চিড়িয়াখানা! নৌকা করে বাবুরা এসেছেন, বাঘ এসে পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে, কটা ছবি তুলতে চান তুলে নিন, আমার একটু তাড়া আছে, একটা হরিণ ধরতে যাচ্ছি।

আমি এজন্যই কোন ভ্রমণস্থানেরই উচ্ছসিত প্রশংসা করতে চাইনা। আমার কথা শুনে কেউ পরে গিয়ে হতাশ হলে, আমার রুচি নিয়ে খারাপ ধারনা করতে পারে। সূর্যাস্ত হওয়ার পর একে একে সবাই ফিরে চললাম গাড়ীগুলির দিকে। সানসেট পয়েন্টের কাছে অনেক কটা ছোট আলোর স্তম্ভ আছে পাড়

ঘেঁসে ; হয়তো কোন কোন গেষ্ট একটু অন্ধকার পর্যন্তই থেকে যায়। আমরা সারাদিন ঘুরে সন্ধ্যার পর বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই সোজা হোটেলেই ফিরে এলাম। ড্রাইভার পরদিন সকালে জাহাজ ধরানোর সময়ে আসবে জানিয়ে বিদায় নিল। ওর কাছে একটা তথ্য জানা হয়নি বলে পরে আমার আফশোষ হয়েছে।

যে কোন জায়গায় বেড়াতে গেলে ভোরে উঠে সূর্যোদয় দেখতে চাই। সমূদ্রে সূর্যোদয় তো খুবই সুন্দর। কিন্তু বেশীরভাগ লোকই ভোরে উঠতে পারে না,তাই সূর্যাস্ত নিয়েই মেতে থাকে। আমাদের হোটেলটি নীল দ্বীপের প্রায় মাঝখানে, গঞ্জের মত জায়গাটায়। আসেপাশেই একটা বাজার, পোষ্ট অফিস, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পুলিশ ফাঁড়ি, দুগ্ধ সমবায়ের কেন্দ্র সবই। রাস্তার পাশে পাশে অসংখ্য নীম গাছ।

আমি ভোরে উঠে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। মিনিট পাঁচ সাতেই পৌছে গেলাম ভরতপুর বিচে। কাল দুপুরের সেই জমজমাট এলাকা যেন নিঝুম পুরী। একটাও লোক নেই। সমূদ্র চলেগেছে বহু দূরে। বিস্তীর্ণ পাথুরে প্রান্তর দেখলে কে বলবে যে ওখানেই কুড়ি ঘন্টা আগে আমরা গ্লাশ বটম নৌকায় চড়ে সমূদ্রের ঢেউয়ে দুলেছি। তা হোক, সমূদ্র তো ভাটায় দূরে সরে যাবেই। আমি হতাশ হলাম, ডান দিকে গাছপালার পেছন থেকে সূর্য ওঠার আভাস পেয়ে। ঐটুকু দ্বীপের পুর্ব দিকের কোন সমূদ্রতটে হেঁটে যেতেই পারতাম। সম্ভবত ওদিকেই সীতাপুর বিচ। এবার আর দেখা হল না। দূরে, বাম দিকে, জেটির দিকে দু একজনকে হাঁটতে দেখে ওদিকেই এগিয়ে গেলাম।

জেটির ওপর একটু কসরত করেই উঠলাম। বাঁদিকে দেখলাম মাছ শুকানোর জায়গা। সাধারনত ওসব জায়গায় মাছের উৎকট দুর্গন্ধ থাকে; এখানে ওসব নেই। সম্ভবত এখনও চালু হয়নি। সকাল সাড়ে ছটার আগেই কিছুলোক জাহাজের টিকিট কাটার জন্য লাইন দিয়েছে দেখলাম, এক দুজন সাহেবও লাইনে ছিল। একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে ফিরে এলাম হোটেলে।

সকাল আটটায় হোটেল থেকে চেক আউট করে নিচে খাওয়ার জায়গায় নেমে এলাম। এদেরও ব্রেকফাষ্ট কম্লিমেন্টারী। কিন্তু পোর্টব্লেয়ার বা হ্যাভেলকের মত ঢালাও ব্যবস্থা নয়; বেশ সংক্ষিপ্ত। লুচি আর ঘুঘনি। যারা লুচি খাবেনা,তাদের জন্য মুড়ি আর ঘুঘনি। গাড়ী যথা সময়ে এসে আমাদের জাহাজঘাটায় পৌছে দিল। অনেক লোক গেটের বাইরে লাইন দিয়েছে দেখে খোঁজ নিলাম। জানলাম ওটা আগের জাহাজের জন্য, আমাদেরটা নয়। গেটের বাইরে কেয়াপাতায় ছাওয়া বসার ঘরে বসে অপেক্ষা করলাম মিনিট চল্লিশ। একটা মোটা কুকুর বাঁশের বেঞ্চিতে নিশ্চিতভাবে ঘুমাচ্ছে; অর্থাৎ বসার জন্যে বেশী লোক ওই কুঁড়ে ঘরে ঢোকেনা।

ওখানে বসে বসেই দেখেছি, দু জোড়া সাহেব মেম বসে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল। এক জোড়া পোল্যাণ্ডের নাগরীক জানলাম। অন্যরা কোন দেশের জানতে পারিনি। গেটে টিকিট দেখিয়ে লোকজন ঢুকছে দেখে আমরাও জেটিতে ঢুকলাম। এই প্রথম সরকারী জাহাজে উঠলাম। আমাদের টিকিট সাধারণ শ্রেনীর ছিল, তাই নিচে নামতে হল। আগে গ্রীন ওসেন জাহাজে চাপার অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, লোকে বেশী সময় নিচে বসে থাকে না। প্রায় সবাই সমূদ্র দেখার জন্য ওপরে উঠে আসে। এই সরকারী বাম্বুকা জাহাজে তো নিচের সব সিট ভরলই না। একটু পরে উপরে উঠে দেখি, অনেক যাত্রী খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে সমূদ্র দেখছে আর ছবি তুলছে। রোদের বেশ তেজ ছিল। তাই সবাই একটু ছায়া খুঁজছিল। সমূদ্রের চোখ ধাঁধানো নীল রঙের কয়েকটা ছবি তুলে আমিও নিচে নেমে সিটে বসলাম।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, এক সাহেব তার বড় পিঠের ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়েছে খোলা ছাদেই। মাথাটাই যা একটু ছায়া পেয়েছে, গোটা শরীর রোদে। সাথের মেমটিও একটু ছায়া দেখে বসে বসে একটা বই পড়ছে। ছাদে বড় বড় ব্যাগপত্র স্তুপাকারে রাখা। আমার ছেলে বলেছিল, সরকারী জাহাজে অনেক সময় বসার জায়গা না পেয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। এখানে তো নিচের অনেক সিট খালিই দেখলাম। সাহেবরা কি তাহলে সিটে না বসে সস্তায় টিকিট কেটেছে? সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, সাহেবরা কেবিনে না গিয়ে, নিচের সস্তার টিকিটেই চেপেছিল।

এবারের মত নীল দ্বীপের ভ্রমণ শেষ করে পোর্টব্লেয়ার ফিরছি। জাহাজে এক ঘন্টা লাগবে। জাহাজে বসে বসে ভাবছিলাম, আমার এক শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা দিদির অভিজ্ঞতার কথা। ওনার বইতে, নীল দ্বীপে থাকার সময় ওনার যে দার্শনিক অনুভুতি হয়েছিল, লিখেছিলেন। ওনার ঐ ছোট্ট দ্বীপে থাকার সময়, এই বিশাল বিপুলের মধ্যে এক অতি ক্ষুদ্র আর তুচ্ছ মনে হয়েছে নিজেকে। এই নীল দ্বীপের জায়গাটায় গোটা দেশের মানচিত্রে একটা বিন্দুও হয়তো নেই।

বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগরের বিশাল বিপুল জলরাশির ভেতর ঐ দু কিলোমিটার লম্বা একটা ছোট্ট দ্বীপ তো সত্যিই ক্ষুদ্র। শান্ত মনে মেদিনীপুরের কোন গ্রামের আকাশে নির্জন রাত্রে তাকিয়ে দেখুন; মহাবিশ্বের অনন্ত নক্ষত্র পুঞ্জের মাঝে আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর অবস্থান চিন্তা করলে মাথা ঝিমঝিম করবে। দিদি তো আবার হাড়ে মজ্জায় রবীন্দ্র অনুরাগিণী। ওনার নিশ্চয়ই কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা মনে এসেছিল। " অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে" ; তাই ওনার প্রাণও বিস্ময়ে জেগে উঠেছিল। কিংবা নীল দ্বীপের কোন বিচ রেসর্টের আঙিনায় বসে দিদি গেয়ে উঠেছিলেন, " বিপুল তরঙ্গ রে"!

আমার বৈশ্য বুদ্ধিতে মনে হচ্ছে, দিদি নিশ্চয়ই কোন বিচ রিসোর্টের অতিথি হয়েছিলেন। রাত্রে জোয়ারের সময় হয়তো দমকা হাওয়ায় ওনার মনে এসেছিল," আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরান সখা বন্ধু হে আমার।" আমরা যেহেতু দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে,দোতলা এ সি হোটেলে রাত্রে থেকেছি, দিদির মত ঐ অতীন্দ্রিয় অনুভুতি থেকে বঞ্চিতই হয়েছি। নিজেকে যদি " দূরদ্বীপবাসিনী" ভাবতে ভালোবাসেন, তাহলে একটু বেশী খরচ করে ওরকম কোন বিচ রেসর্টেই থাকবেন নীল দ্বীপে গিয়ে।

আন্দামান ভ্রমণ (৬) - চিড়িয়াটাপু আর মুন্ডা পাহাড়

নীল দ্বীপের থেকে পোর্টব্লেয়ার ফিরলাম দুপুরে৷ বিকেলে চললাম চিড়িয়াটাপু আর মুন্ডা পাহাড় দেখতে৷ এই জায়গাটা আন্দামানের একেবারে দক্ষিনে, পোর্টব্লেয়ার শহর থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে৷

দুচার কিলোমিটার যাওয়ার পরই শহর শেষ হয়ে গ্রাম শুরু হল৷ কোথাও বেশ ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গাড়ী চলল; কোথাও বাম দিকে নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে সমূদ্র দেখা যাচ্ছিল৷ এভাবেই একটা সময় পৌছে গেলাম চিড়িয়াটাপু৷ অনেক লম্বা লম্বা গাছের ছায়ায় বেশ কয়েকটা ট্যুরিষ্ট গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম৷ একটা চেকপোষ্ট মত জায়গায় পুলিশের কাছে গাড়ীর নম্বর আর সবার নাম লিখে ভেতরে ঢুকলাম৷ কয়েকজনকে একসাথে করে গেটের পুলিশ কয়েকটা কথা বলেদিল৷

ওখানকার সমূদ্রের জলে কুমির আছে, তাই জলের কাছে যেতে বারন করল৷ নামতেই যদি হয়, জাল দিয়ে ঘেরা জলেই যেন নামা হয়৷ ভেতরে একটু এগিয়েই দেখলাম, জলের একটা জায়গা নাইলনের জাল দিয়ে ঘেরা৷ বিকেলের ভাটা চলছিল, তাই জল একটু দুরে দুরেই ছিল৷ বাম দিকে পাড়ের দিকে ঘন জঙ্গলের মত৷ একটু একটু করে পাড়ের জঙ্গল পাহাড়ের উপর উঠে গেছে৷ কেয়াগাছের ঝোপের ছায়ায় কয়েকটা বসার বেঞ্চির মতও করার আছে৷ আমরা হাঁটতে হাঁটতে বাঁদিকের জঙ্গলের ভেতর একটা পায়ে চলার রাস্তার দেখা পেলাম৷ যদিও চিড়িয়াটাপু নাম হয়েছে, অনেক পাখি দেখা যেত বলে, আমরা এক দুটির বেশী পাখি দেখিনি৷

হাঁটতে হাঁটতে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরে ওপরে উঠতে শুরু করলাম৷ আরও দু চারজন চলেছে একই পথে৷ রাস্তাটাতে অনেক গাছের শেকড় আড়াআড়ি গিয়ে বেশ শিঁড়ির ধাপের মত দেখতে হয়েছে৷ এক এক জায়গায় জঙ্গল বেশ ঘন৷ মাঝে মাঝেই এক একটা মহীরুহ এত উঁচু যে মাথা দেখাযায় না৷ কোন বন্যপ্রাণির কোন চিহ্নও দেখলাম না৷ এক জায়গায় পৌছে দেখলাম উল্টো দিকে, অনেক নিচে সমূদ্রের ঢেউ এসে গাছের প্রায় গোড়ায় পড়ছে৷ ওখানেই বসার জন্যে একটা বেঞ্চির মত পেলাম৷

গোটা আন্দামান ভ্রমণের এই একটি জায়গায় দেখলাম কিছু প্লাষ্টিকের জলের বোতল আর দু একটা কাগজ বা থার্মোকলের থালা জঙ্গলে ছড়ানো পড়ে আছে৷ রাস্তাটা ডান দিকে আরও এগিয়ে গেছে৷ এক দুজন ওদিকে এগিয়ে গেলেও আমরা আর এগোলাম না৷ ওখানেই কিছু সময় বসলাম৷ কয়েকটা ছবি তোলা হল৷ সমূদ্রের দিকে অনেকটা নেমে দেখে এলাম। জল ছুঁয়ে দেখার মত জায়গায় পৌছন গেল না৷

এর আগে বিশাখাপত্তনম গিয়ে দেখেছি, পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নীল সমুদ্র দেখা যায়৷ ওখানে কৈলাশ পাহাড় আর সমুদ্রের মাঝে রাস্তা আর কিছুটা সমুদ্র তটও আছে৷ আন্দামানের এই মুন্ডা পাহাড় একেবারে যেন সমুদ্রের জল থেকেই উঠেছে৷ বিশাখাপত্তনমের কৈলাশ পাহাড়ে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা পার্কের মত করে, রোপওয়ে ইত্যাদি দিয়ে কৃত্রিম মনোরঞ্জক করা হয়েছে৷ মুন্ডা পাহাড় একেবারে প্রাচীন অবস্থায়ই আছে৷ পায়ে চলার ঐ রাস্তাটুকু ছাড়া আর কোথাও কোন গাছ, লতাপাতাও কাটা হয়নি৷ ফেরার পথে দেখলাম, একটা ছোট্ট ফলকে লেখা আছে মুন্ডা পাহাড় ট্রেকিং, ১. ৮ কিমি৷ আমরা যেখান থেকে ফিরে এলাম,তার থেকে আর তিন চারশ মিটার জঙ্গলের পথে হেঁটে একটা ভিউ পয়েন্টে গেলে হয়তো সমুদ্র একটু ভালো দেখা যেত৷

আমরা নামার সময় দেখলাম, জঙ্গলে ঢোকার মুখে যে লোকটি ঘোরাঘুরি করছিল, সে দু একজনকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। সম্ভবত বিকেল চারটের পর আর কাউকে মুন্ডা পাহাড়ে উঠতে দেয় না। গেটের বাইরে,গাছের ছায়ায় অনেক বসার জায়গা তৈরী করা আছে, পার্কের মত। ড্রাইভার বলেছিল, সাড়ে চারটেয় ওখান থেকে রওনা দেবে। কিছু সময় বসে ড্রাইভারকে ডেকে নিলাম। চিড়িয়াটাপু থেকে সানসেট পয়েন্টে যেতে পাঁচ সাত মিনিট লাগল। ওখানে পৌছে কিন্তু বেশ বুঝলাম, এখানেও হতাশ হতে হবে।

নীল দ্বীপের সানসেট পয়েন্টে,পশ্চিমদিকের দ্বীপটি অনেক দূরে হালকা দেখা যাচ্ছিল। সূর্য প্রায় সমুদ্রের জলেই ডুবেছিল। কিন্তু চিড়িয়াটাপুর পশ্চিম দিকের দ্বীপগুলি অনেক কাছেই দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এখানেও যথেষ্ট যাত্রী সমাগম হল। এখানেও ভাটার জন্য সমুদ্র তটের অনেকটা পর্যন্তই পাথর ছড়ানো।

জোয়ার এলে জল ওসব পাথর ডুবে যায়, সেটা বোঝা যাচ্ছিল। পাড়ের অনেকটাই ভালোকরে পাথরে সিমেন্টে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। আন্দামানে আর কোথাও এরকমভাবে পাড় বাঁধানো দেখিনি ( কোভরিং কোভ বিচ ছাড়া) । ডানদিকে একটু টিলা মত। তার ওপরেও বসার জন্য চালামত তৈরী। বেশ বোঝাযায়, জায়গাটাকে ট্যুরিষ্ট স্পট হিসেবে তৈরীর জন্য কর্তৃপক্ষ বেশ সচেষ্ট।

এরকম সাধারন কিছু জায়গাকে, ভিউ পয়েন্ট বা সাইট সিয়িং স্পট করে দেখানো হয়, মিরিকে পেলিংয়ে, আরাকু ভ্যালিতে। ওসব জায়গার গাড়ীওলারা পাঁচটা পয়েন্ট,সাতটা পয়েন্ট এরকম হিসেবে ভাড়া নেয়। চিড়িয়াটাপুর এই সান সেট পয়েন্টও ওরকম একটা মনে হল। সুর্য ডোবার মুখে কয়েক ডজন গাড়ীতে শ খানেক গেষ্ট এসে গেল। আমরা বাঁধানো পাড় ধরে আরও এগিয়ে গেলাম।

অনেকেই তটের পাথরের ওপরে গিয়ে উঠল; হয়তো ভালো ছবি উঠবে বলে। ছবি আমরাও তুললাম। সুর্য ডুবলে ফেরার পথ ধরলাম। কয়েকশো মিটার গাড়ী চলবার পর ড্রাইভার একটা জায়গার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। জানাল ওখান থেকে আন্দামানের কিলোমিটার মাপ শুরু হয়। মানে ওটা আন্দামানের জিরো পয়েন্ট। ওখান থেকে পোর্টব্লেয়ার ছাব্বিশ কিলোমিটার। একটু জন বসতি শুরু হতে ড্রাইভারকে বললাম, একটা মিঠাইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়াতে। পোর্টব্লেয়ারের শহরতলীর একটা ছোট্ট বাজার মত জায়গায় একটা মিষ্টির দোকানের সামনে গাড়ী দাঁড়াল। দোকানের মহিলা দক্ষিন ভারতীয় মনে হল। আন্দামানে মিষ্টির দোকান খুব একটা চোখে পড়েনি। নীল দ্বীপের রসগোল্লার খুব সুখ্যাতি শুনেছি। ফেরার সময় জাহাজঘাটার কাছে ভ্যান রিক্সায় একটা বড় প্লাষ্টিকের জারে রসগোল্লা বিক্রী হতে দেখেছি। ওরকম রসগোল্লার জার মাথায় নিয়ে একজন ঘুরছিল এলিফ্যান্ট দ্বীপেও। কোন জায়গায়ই আমাদের আর খেয়ে দেখা হয়নি।

আমরা পোর্টব্লেয়ারের শহরতলীর দোকানে যে সব লাড্ডু বা বরফি জাতীয় শুকনো মিষ্টি দেখলাম, ওরকম সাধারনত উত্তর ভারতের শহরে দেখাযায়। ঐদিন সন্ধ্যায় আমাদের আমার এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ীতে যাওয়ার কথা ছিল, তাই সোজা হোটেলে ফিরে এলাম।

আমার সহপাঠী এই ডাক্তার বন্ধু পোর্টব্লেয়ারের পুরনো বাসিন্দা। নিজে গাড়ী চালিয়ে এসে আমাদের সকলকে ওর বাড়ী নিয়ে গেল। তিরিশ বত্রিশ বছর পর সহপাঠী বন্ধুর সাথে দেখা হল; খুবই আনন্দ হল।ওর বাড়ীতে ঘন্টা তিনেক ছিলাম। নিজেদের পারিবারিক আর ব্যক্তিগত নানান গল্পের বাইরেও অনেক তথ্য জানাগেল, আন্দামানের আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেরও। আমার বন্ধু বেশ কয়েক বছর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে চাকরী সূত্রে থেকেছে। এমন অনেক তথ্য জানাগেল যা, গুগুলদাদাও বলবেন কিনা জানিনা। পরেরদিন আন্দামানের বিখ্যাত নৃতত্ব মিউজিয়ামে ঘুরে ওখানকার আদি বাসিন্দা জনজাতীগুলির সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলাম। কিন্তু আমার বন্ধু নিকোবরের সোমপেন উপজাতির চিকিৎসক ছিলেন। তাই ওদের সাথে মিশে ওদের জীবনযাত্রা খুব কাছে থেকে দেখেছে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, এই সোমপেন উপজাতির মানুষের কথা ঐদিন সন্ধ্যায় প্রথম জানলাম। পরের দিন মিউজিয়ামে আরও পাঁচটি উপজাতির কথা জানলাম। একমাত্র এই সোমপেন উপজাতির মানুষের গায়ের রং আমাদের মত। ওদের দেখতে অনেকটা থাইল্যান্ড বা আমাদের মণিপুরের বাসিন্দাদের মত। আমার বন্ধু ২৫-৩০ বছর আগে যখন ওদের চিকিৎসা করত, ওদের ভাষা কেউ জানত না। আমাদের ভাষাও ওরা বুঝত না; সবই চলত ইশারায়। ওদের কুঁড়ে ঘরের ছবি আর মডেল মিউজিয়ামে দেখেছি। বন্ধুর কাছে সোমপেন উপজাতির জীবনযাত্রার একটা অদ্ভুত জিনিষ শুনলাম। বড় কলা পাতায় ভাত ঢেলে, অনেকে এক পাতেই খেত। আরও বিশেষ ব্যাপার ছিল, দু হাত দিয়েই ভাত খাওয়া। এখন ওদের ভাষার ব্যাপারটা কি অবস্থায় আছে জানতে পারিনি।

আমাদের অনেকেরই ধারনা ছিল বিগত সুনামিতে আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সব জায়গায়ই ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ধারনাটা ভুল। ক্ষতি শুধু নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেই হয়েছিল। আন্দামানের প্রায় কোন ক্ষতিই হয়নি। একটা কারন সম্ভবত, আন্দামানের দ্বীপগুলির উচ্চতা। পোর্টব্লেয়ার শহরতো ছোট খাট পাহাড়ী শহরের মত। প্রথমদিনই এয়ারপোর্টের থেকে হোটেলে যাওয়ার সময় দেখেছি, রাস্তাগুলি পাহাড়ী রাস্তার মত চড়াই উৎরাই।সেলুলার জেলের লাইট এন্ড সাউন্ড থেকে জানলাম, সমুদ্র থেকে ষাট ফুট উপরে ঐ জেলখানা তৈরী হয়েছিল। হ্যাভেলক বা নীল দ্বীপেও সুনামিতে বিশেষ ক্ষতি হয়নি। ( চলবে )

আগের পর্বগুলির লিংক নিচে।

https://www.facebook.com/dayalbandhu.majumdar/posts/1857395800946747

"আন্দামান ভ্রমন ( পর্ব ৮) সেলুলার জেল "

জীবনে তো কতোকিছুর জন্যই আফশোস থেকে যায়। আমার একটি ব্যাপারে আফশোস, আজ ২৯ শে এপ্রিল, সকালে রেডিওটা চালিয়েই আবার মনে পড়ল। আজ প্রনম্য স্বাধীনতা সংগ্রামী, প্রয়াত বিমল দাশগুপ্ত মহাশয়ের পবিত্র জন্মদিন। মেদিনীপুর শহরে বছর সাতেক থাকার সময়, কলেজ মোড়ে এই প্রণম্য বিপ্লবীর বাড়ীর সামনে দিয়ে বহুবার যাতায়াত করেছি। প্রথম দিকেই এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, ঐ জায়াগায় থাকেন ঐ মহান বিপ্লবী। একবার প্রণাম করতে যাবো, বলেও ছিলাম ঐ বন্ধুকে। এখন পিছন দিকে তাকালে ভাবি, কি বিচিত্র সব কাজে আর অকাজে প্রায় সাতটা বছর কাটিয়েছি মেদিনীপুর শহরে। একদিন সন্ধ্যায় যাওয়ার সময় হলনা, সাত বছরে? তারপর উত্তরবঙ্গের চাকরীর জায়গার ব্যস্ততা। ঠিকমত বললে ব্যাতিব্যস্ততা, মেদিনীপুর শহরের সাথে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। বছর ছয় সাত পর আবার মেদিনীপুরে যাতায়াত শুরু করেছিলাম। ঐসময় একদিন বাসে আসতে গিয়ে দেখলাম, শ্বশানে ঢোকার রাস্তার মুখে একটা আবক্ষ মূর্তি। সামনে থেকে ঐ মহান বিপ্লবীকে দেখিনি কোনদিন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঐ মূর্তির কাছে বাসটা একটু দাঁড়ানোয়, মূর্তির নিচে নাম দেখলাম, বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত !মনে একটা গোপন অপরাধ বোধ যেন উঁকি দিয়ে গেল। মনে মনেই মহান বিপ্লবীকে একটা প্রনাম করলাম।

সেই মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা অপরাধ বোধটা আবার একবার বিবেকের দরজায় নাড়া দিয়ে গেল কদিন আগে। আন্দামানে সেলুলার জেল দেখে এলাম, দু'মাস পেরিয়েছে। ওখানে প্রত্যেক ভারতীয়ের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র দর্শনের অভিজ্ঞতা হল। এর মধ্যে আন্দামানের ভ্রমণকাহিনী লেখা শুরুও করেছি। গোটা ছয় পর্ব লেখাও হয়েগেল। সকালে রেডিওটা চালিয়েই শুনলাম এক বিপ্লবীর শুভ জন্মদিন। মেদিনীপুরের অত্যাচারকারী বৃটিশ মেজিস্ট্রেট পেডিকে হত্যা ইত্যাদি নিয়ে বলতে শুনেই আমার সেই গোপন ক্ষতে আঘাত খেলাম।মেদিনীপুর আমার জন্মস্থান হওয়ার সুবাদে, তিনজন অত্যাচারকারী বৃটিশ মেজিস্ট্রেট, পেডি – ডগলাস – বার্জ, এদের হত্যাকাণ্ড একটু আধটু জানাই আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের

মহান ইতিহাসে মেদিনীপুরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু আমার মত মেদিনীপুরের ইতিহাসগর্বী তথাকথিত শিক্ষিত লোকজনের যে সেই গর্ববোধের বিন্দুমাত্র অধিকার আজ আর নেই, সে তো নিজের অবস্থান থেকেই পরিস্কার।

রেডিওটা বেজেই চলেছে। আমার সেই অতিপুরাতন অপরাধবোধ আমাকে পিছিয়ে নিয়েগেল তিরিশটা বছর। এরপর যখন জানলাম, মেদিনীপুরের এই মহান বিপ্লবীকে বেশ কয়েক বছর আন্দামানের সেলুলার জেলে থাকতে হয়েছিল, নিজের অপরাধবোধটা চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছল। সেলুলার জেলের চত্তরটা এবার আন্দামানে ভ্রমণের সময় দুবার ঘুরে এলাম। সবাই তাই করে। আমরা প্রথমদিন সন্ধ্যায়ই জেলের ভেতরের লাইট এন্ড সাউন্ড দেখলাম। জেলের ইতিহাস ভূগোল সবকিছুই একটু একটু করে বলে যাওয়া হয় ঐ প্রায় ৪৫ মিনিটে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানের পূণ্যভূমিতে বসে, সেই ইতিহাস শোনা,অবশ্যই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

নীল দ্বীপের কথা লেখার সময়, আমার এক শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা দিদির কথা লিখেছি। ওনার অভিজ্ঞতার কথা মাথায় ছিল। তাই বাঙালী বিপ্লবীদের কথা কতোটা বলাহয় সেটার দিকে সজাগ ছিলাম। আমার ঐ দিদি যতোটা হতাশ হয়েছিলেন, আমি ততোটা হতাশ হইনি। প্রনম্য বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর কথা বলা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু অন্য এক দুজনকে নিয়ে একটু যেন বেশীই মাতামাতি আছে ঐ অনুষ্ঠানে। আবার শেষের দিন, জেলখানার ভেতরের খুঁটিনাটি দেখার প্রায় শেষ পর্বে গিয়ে,

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামের দীর্ঘ তালিকা দেখলাম। ঐ তালিকার সামনে দাঁড়ালে নিজেদের ক্ষুদ্রতাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করাযায়। কত অসংখ্য বিপ্লবী, কী অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করেছেন, দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য! এত দীর্ঘ তালিকা, সব নাম পড়ে শেষকরাই মুস্কিল।

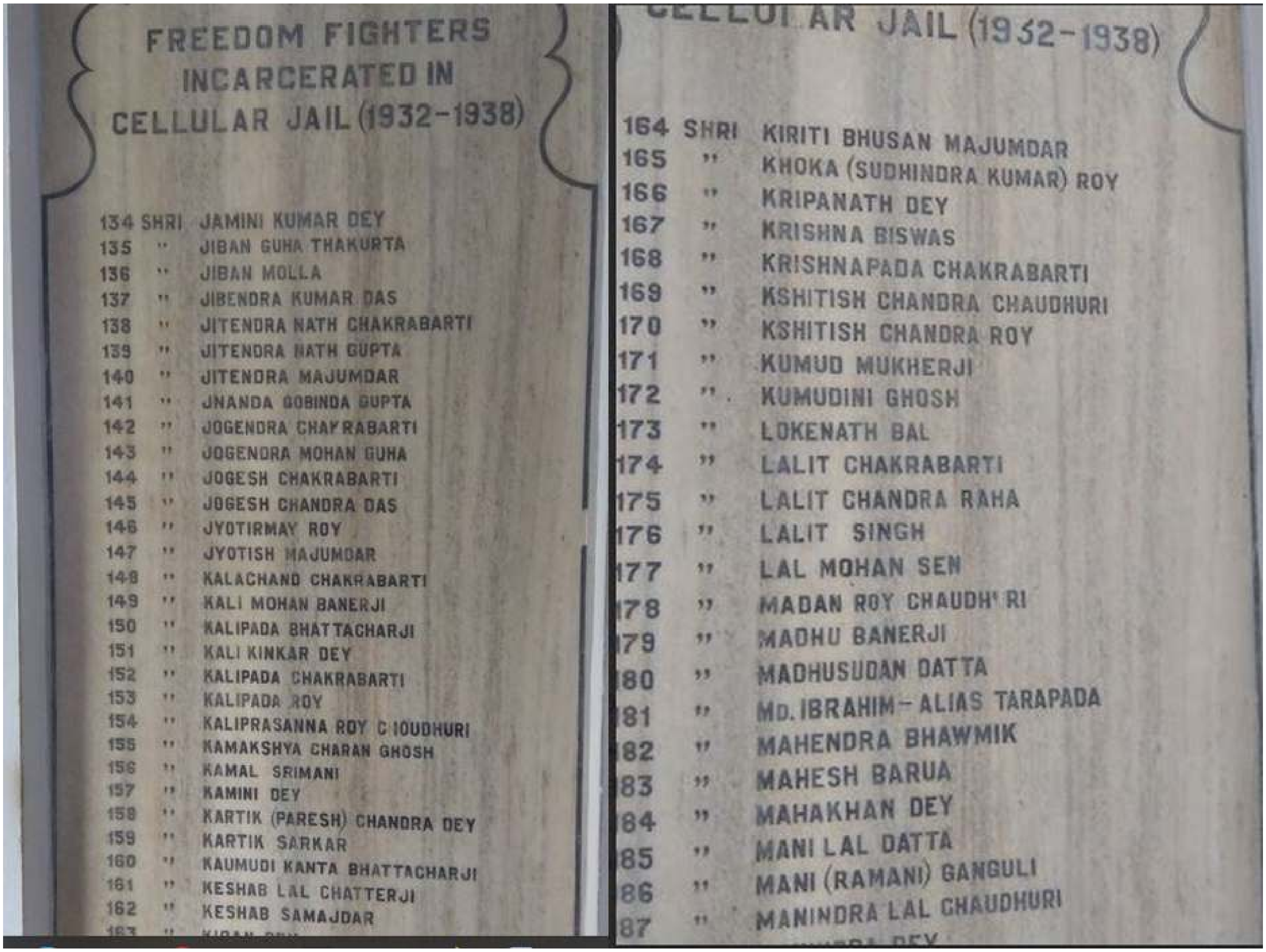


ঐ দিনটা ছিল আমাদেও আন্দামানে ভ্রমণের শেষদিন। সকালে আটটা নাগাত বেরিয়ে প্রথমে চাথামের কাঠ চেরাই কারখানা, তারপর দুটি মিউজিয়ামে ঘুরে প্রায় এগারোটা নাগাদ সেলুলার জেলে পৌছেছিলাম। মূল ফটকের ডানদিকে পঞ্চাশফুট মত দূরে ছোট একটি গেটের ভেতর টিকিট ঘর। আমাদেও চারটি টিকিট কাটার জন্য ওরা কার্ডে পেমেন্টের জন্য জোর দিল।অ ামাদেও কোন আপত্তিও ছিলনা। গাইডের দুশো টাকা, পওে গাইডকেই দিতে হল।

প্রথম দিন সন্ধ্যায় যে মূল ফটক দিয়ে ঢুকেছিলাম লাইন দিয়ে, সেই ফটক দিয়েই এক দুজন করে ধিরে সুস্হে ঢুকলাম। ভেতরেই একজন গাইড দাঁড়িয়ে ছিলেন, ওনার কাছে যেতেই বললেন,

দাঁড়ান,আর দু-চারজন আসুক। ওনার কাছে আমাদেও দেখেই আর দুজন যারা ভেতরেই অপেক্ষ া করছিল, এগিয়ে এল। ততো সময়ে গাইড আমাদের, সামনেই বাঁদিকের নিরন্তর জ্বলন্ত অমর জ্যোতি দেখে নিতে বলেছেন।

মূল ফটক থেকে সোজা যে রাস্তা ভেতওে চলে যাচ্ছে তার বাঁদিকে একটা বাগানের মতজায়গায় তৈরী হয়েছে মহান শহিদের স্মরনে, অনির্বাণ শিখা।গাইডের কাছেই জেনেছি, ভারত সরকারের পেট্রলিয়াম দপ্তরের তৈরী এই অনির্বাণ শিখা, তরল প্রাকৃতিক গ্যাসে নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত। আমরা দু–একটা ছবি তুলতে না তুলতেই গাইড আমাদেও ডেকে নিলেন।

রাস্তার ডান দিকে সেই বিখ্যাত অশত্থ গাছ। লাইট এন্ড সাউন্ড অনুষ্ঠানে যে গাছ একজন প্রধান চরিত্র। তবে, সম্ভবত বর্তমান গাছটি আদি অশত্থটি নয়। সেটি আগেই কোন ঝড়ে ভঙ্গে পড়েছে। ডান দিকে অশত্থ গাছ ছাড়িয়ে,

হাজার খানেক ধাতব চেয়ার পাতা হয়েছে, লাইট এন্ড সাউন্ড অনুষ্ঠান বসে দেখার জন্য। ঐ চেয়ারগুলি ছাড়িয়ে, আরও ডানদিকে চললাম, গাইডের সাথে সাথে।প্রথমেই ঢুকলাম ফাঁসি ঘরে। লাইট এন্ড সাউন্ড অনুষ্ঠানে যে কথাটা পরিস্কার কওে বলা হয়নি, গাইড সেটা জানালেন। বিপ্লবী কাজের জন্য যাঁদেও ফাঁসি হত, তাঁদেরতো এই জেলে আনা হত না। দ্বীপান্তও সাজা প্রাপ্ত কেউ এখানে মারাত্মক কোন অপরাধ করলে, তাঁকেই এখানে ফাঁসি দেওয়া হত।

জীবনে প্রথম কোন ফাঁসির মঞ্চ, দড়ি, পাটাতনের হ্যান্ডেল, এমনকি নিচে যেখানে শহিদেও দেহ ঝুলে থাকত, সেখানে ঢুকেও দেখলাম। নিজে ডাক্তার বলেই কিনা জানিনা, প্রণম্য শহিদদেও উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসা ছাড়া আর কোন অনুভুতি হয়নি।

ওখান থেকে বেরিয়ে জেল প্রাঙ্গণের ঘানি টানার ঘর দেখতে গেলাম। সেই সময়কার ঘানি,

নারকেল ছোবড়ার থেকে দড়ি বানানোর জায়গা, পায়ে হাতে বেড়ি লাগিয়ে অত্যাচার,

এসবেরই মডেল তৈরী করে রাখা হয়েছে ঐ ছাউনির ভেতর। আমাদেও গাইড সবই বুঝিয়ে বলছিলেন। বৃটিশসাহেবরা অত্যাচারকারী ছিল, এ খবর আমরা সবাই জানি। কিন্তুআমাদেও প্রাতঃস্মরণীয় স্বাধীনতাসংগ্রামীদেও ওপর কতোটা পাশবিক অত্যাচারতারা কওে গিয়েছে, ওখানে না গেলে কোনদিন কল্পনাও করতে পারতাম না।ঐ ছাউনির বাইরে, ছাউনি আর ফাঁসি ঘরের মাঝে, একটা সিমেন্টের বেদী মত দেখিয়ে গাইড জানালেন, ওটা ফাঁসিদেওয়ার আগে শহিদ বিপ্লবীদেও স্নান করানো, আর ধর্মগ্রন্থ পড়ে শোনানোর জায়গা।ওখান থেকে চললাম দোতলায় বিপ্লবীদেও আটকে রাখার সেলগুলি দেখতে। আমরা অনেকেই সেলুলার জেলের একটা মডেলের ছবি অনেক জায়গায় দেখেছি। একটি সাত বাহুর একটি তারার মত। মাঝের একটা গোলমত সিঁড়িঘরের সাতদিকে সাতটি তিনতলা বাড়ী। বর্তমাতে তিনটি বাড়ী বা উয়িং আছে। বাকি চারটি বহুবছর আগেই ভূমিকম্পে নষ্ট হয়। ওগুলির জায়গায় তৈরী হয়েছে দ্বীপপুঞ্জের প্রধাণ হাসপাতাল, জি বি পন্থ হাসপাতাল। তিনতলায় উঠলে পাখীর চোখে গোটা হাসপাতালটিই দেখা যায়।

এই যে তিনতলা এক একটি বাড়ীর মত এক একটি উয়িং; প্রতিটির এক এক তলায় গোটা তিরিশ করে সেল বা কক্ষ সবই একই রকম। সামনে একটা টানা বারান্দা। বারান্দার দিকে দরজায় মোটা লোহার গ্রীলের কপাট। এই গ্রীলগেট বন্ধ করার জন্য দরজার পাশে, মোটা দেওয়ালের ভেতর কৌশল করে কব্জা লাগানোর বন্দোবস্ত। দেওয়ালের ভেতর এমনভাবেই কব্জাকে ঢোকানো যে, হাতে চাবি

পেলেও, সেলের ভেতর থেকে চাবি পর্যন্ত হাত যাওয়ার বিন্দু মাত্র সম্ভাবনা নেই। সেলের পিছনদিকের দেওয়ালে,অনেক উঁচুতে ছোট্ট একটি ঘুলঘুলি; তাইদিয়ে আকাশ দেখাতো দূরের কথা, আলোও ঠিকমত ঢোকে না। প্রতিটি উয়িং এমনভাবেই তৈরী যে, কোন সেল থেকে অন্য সেলে বন্দি বিপ্লবীর মুখ দেখার কোন সম্ভাবনাই নেই। বড়জোর চিৎকার করে কথা বললে,পাশের দু তিনটি সেলের বন্দি শুনতে পাবেন।

আমরা গাইডের পিছন পিছন একটি বারান্দা ধরে, একটি একটি সেল দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলাম। দু একটি সেল আর কব্জার ছবিও তোলা হল। তিন তলার একেবারে শেষ সেলটি একটু বিশেষ ভাবে রাখা আছে। এইখানে, অত্যন্ত গভীর মনোবেদনার সাথে লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে, আজ আমার যে কথাটা চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, সেটি বলতে পারছি না। কারন, কথাটি," পোলিটিক্যালি ইন্‌কারেক্ট"!

ঐদিন অবশ্য ঐ পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমার এসব কথা মাথায় আসেনি। আমার সেই অধ্যাপিকা দিদির ক্ষোভ যে অমূলক নয়, বাঙালীমাত্রই উপলব্ধি করবেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস একটু আধটু যারা পড়েছে, সেলুলার জেলের লাইট এন্ড সাউন্ড অনুষ্ঠানে গেলে, কিংবা জেলটি ঘুরে দেখলে, ইতিহাসের বিকৃত রূপ তাদের চোখে পড়বেই। আমরা গাইডের সাথে ঘুরতে ঘুরতে মাঝের গোলাকার অংশের ওপর তলায় পৌছলাম। ওখানে কয়েক মিনিট আমাদের সাথে থেকে, ওর পরে কোনদিকে যাওয়া যাবে জানিয়ে গাইড বিদায় নিলেন। ওখানে দেওয়ালে, লম্বা লম্বা মার্বেল পাথরের ফলকে, ঐ জেলে যে সকল মহান বিপ্লবীকে একসময় আটকে রাখা হয়েছিল, তাঁদের নাম ক্ষোদিত আছে। এত দীর্ঘ তালিকা যে আমরা সবকটা নাম পড়ে শেষ করতে পারলাম না। পরে শুনেছি ঐ তালিকায় ছয়শো মত বিপ্লবীর নাম আছে। তার মধ্যে পাঁচশর বেশী নাম বাঙালীর। আমার শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা দিদির ক্ষোভ এই নিয়েই। অবশ্য আমি একটু আশাবাদী মানুষ। যে কোন দুর্যোগ, যে কোন ব্যর্থতার থেকে ভালো জিনিসটি খুঁজে বেরকরার চেষ্টায় থাকি। আজ প্রদেশ হিসেবে বাংলার এত পিছিয়ে পড়ার কারন কি? আমাদের আত্মঘাতী কাঁকড়ার স্বভাবই এর জন্য দায়ী। যেখানে অন্য প্রদেশের মানুষ নিজেদের সামান্য গৌরবের কিছু পেলেই তাকে প্রচারের কৌশলে বিশাল করে তোলেন, আমরা আমাদের যে কোন সম্পদকে কি করে ধ্বংশের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তার প্রতিযোগীতায় নেমেছি। যে নেতাজীর নাম উচ্চারণ করলে আপামর ভারতীয়ের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে, একটা কলকাতার গলির মস্তান তাঁর বাড়ীটা পর্যন্ত চেনেনা! ২০১৮ সালে , কলকাতায়

একজন কৃমিকীট , " সুভাষদাকেই ডেকে দিন" বলার মত আস্পর্ধা দেখাল! আমরা তাকে ল্যাম্পপোষ্টে বেঁধে ঝাঁটার বাড়ী মারতে শিখিনি এখনও, এটাই সবথেকে বড় ব্যার্থতা আমাদের। আজ আমাদের এতই দুর্দশা যে, রাজ্যের বাইরে নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতেও কুন্ঠা বোধ হয় । আন্দামানের ঐ পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীদের গৌরবগাঁথা শুনলে নিজেদের নীচতাকে সুন্দরভাবে উপলব্ধি করা যায়।

আমরা মহান বিপ্লবীদের অনেক কটা তালিকা থেকে কয়েকটার ছবিও তুললাম। আমার একটি মাত্র পরিচিত নাম চোখে পড়ল, চট্টগ্রামের প্রাতঃ স্মরণীয় মাষ্টারদার সহযোদ্ধা , প্রনম্য লোকনাথ বল।

এই মাত্র সেদিন, ২৯ শে এপ্রিল, সকালে রেডিও শুনে জানলাম, প্রণম্য বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত মহাশয়ও ঐ পবিত্র কারগারে কয়েক বছর থেকে এসেছেন। একথা শুনেই আমার স্ত্রী জানাল, সেলুলার জেলের ঐ মার্বেল ফলকগুলির কোনটিতে, সে ঐ মহান বিপ্লবীর নামটি দেখেছে।আমার অপরাধবোধের কলসটি এবার কানায় কানায় পূর্ণ হল। এরপর থেকে," মেদিনীপুরে আমার জন্মভিটা", একথাটা বলার আগে, নিজের অজ্ঞতা আর তুচ্ছ কারনে ঐ মহান বিপ্লবীর চরণ স্পর্শ করার সুযোগ হারানোর আপশোস, আজীবন আমাকে তাড়াকরে বেড়াবে।

আন্দামানের বৃহত্তম কাঠকল

আন্দামান ভ্রমণের ভ্রমনসূচি ইত্যাদি নিয়ে প্রথম পর্বেই অনেকটা লিখেছি। আন্দামানে প্রধানত সুন্দর সুন্দর সমুদ্রতট আর সবুজের সমারোহ দেখতে যায় সবাই। আমার ছেলে মেয়েও ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করে, গোটাছয়েক ট্যুর কোম্পানির নানান কিসিমের প্যাকেজ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে একটা ছয় রাত সাত দিনের ভ্রমনসূচি তৈরী করেছিল। মূলত মাসচারেক আগে এরোপ্লেনের টিকিট কাটলে একটু দাম কমপড়ে,এই পর্যবেক্ষণ করেই, ঐ রকম প্রায় একশ আঠারো দিন আগে টিকিট কাটা হয়েছিল। এরপর অনেকটা ঐ ভ্রমনসংস্থার দেওয়া খরচের হিসেবেই, ওদের দেওয়া একটা ভ্রমনসূচি চুড়ান্ত করা হল। আন্দামানে সমুদ্রতট ছাড়া ঐতিহাসিক সেলুলার জেল সব ভ্রমনসূচিতেই থাকে। এছাড়া "জারোয়া দর্শনের" মত চুড়ান্ত অমানবিক আর প্রায় অশ্লীল একটা যাত্রাপথ প্রায় সকলেই রাখে। এ ব্যাপারে আগেই বোধহয় একটু উল্লেখ করেছি। যাই হোক, সময়ের অভাব বা যেকোন কারনেই হোক, আমাদের ভ্রমনসূচিতে ঐ আপত্তিকর ব্যাপারটি ছিল না; তাই আঙুর ফল টকই হোক আর মিষ্টিই হোক, আমার মনে কোন আফশোষ নেই। কিন্তু পোর্টব্লেয়ার শহরের ভেতর সেলুলার জেল ছাড়াও যে আর একটা ঐতিহাসিক দর্শণীয় জায়গা আছে, আমরা রওনা হওয়ার আগেরদিনই জেনেছি। সেনবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাই, উনি না বললে, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা না দেখেই হয়তো চলে আসতাম।

রওনা দেওয়ার আগের সন্ধ্যায় সেনবাবুকে একটা চাবি দিতে গেছলাম। উনি কয়েকবছর আন্দামানে চাকরী করেছেন, বছর চারেক আগে এদিকে ফিরে এসেছেন। আন্দামানের এটা ওটা গল্প করতে করতে বললেন, চাথামের কাঠ চেরাই কারখানাটা দেখে আসবেন, এশিয়ার বৃহত্তম কাঠকল। ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম,আমাদের ভ্রমনসূচিতে আছে কি না। ও জানাল, ওটার কথা ওরা ভাবেনি। তবে শেষদিন তো শহরের মিউজিয়ামগুলি দেখার কথা, ঐদিন দেখে নেওয়া যাবে।

সাধারণত আন্দামান ভ্রমণের সফরসুচিতে একটা দিন পোর্টব্লেয়ার শহর দেখার জন্য রাখা থাকে। সকলেই সেলুলার জেলের লাইট এন্ড সাউন্ড দেখে একদিন সন্ধ্যায়। আমরাও প্রথমদিন সন্ধ্যায়ই ওটা দেখেছি। আমাদের প্লেন দেরীকরে যাওয়ায় প্রথমদিনই জেলের ভেতরটা ঘুরে দেখা হয়নি। প্রথমদিনই এটা দেখা উচিত ছিল, পরে বুঝেছি। জেলের ভেতর যে ছোট্ট মিউজিয়াম আছে, সেটা দেখেনিলে,বিশেষ করে রস দ্বীপের ইতিহাস আগে জেনে ওখানে বেড়াতে গেলেই ভালো।

আমদের যেহেতু একেবারে শেষদিন শহর ঘোরার পরিকল্পনা ছিল, প্রথমদিন জেলখানা না দেখায় কোন আপত্তি হয়নি। শেষের আগেরদিনই যখন চিড়িয়াটাপু থেকে ফিরছিলাম, গাড়ীর ড্রাইভারের সাথে কথা বলেনিয়েছিলাম, শেষদিন জেল ছাড়াও আরও তিনটি জায়গা দেখে নেব। এগুলি ওদের নির্দিষ্ট সফরসুচিতে ছিল না, তাই প্রতিটি পয়েন্টের জন্য পাঁচশ টাকা করে অতিরিক্ত দেড় হাজার টাকা লাগবে।

সকাল আটটায় হোটেল থেকে চেক আউট করে বেরিয়েপড়লাম। ব্যাগপত্র সব গাড়ীতে নিয়ে ঘুরতে বিশেষ কোন অসুবিধাও হল না। হোটেল থেকে শহরের আরেক প্রান্তে চাথাম কাঠকলে যেতে আধ ঘন্টার মত লাগল। ঐদিন শহরের ভেতরদিয়ে ম্যারাথন দৌড় চলছিল। কিন্তু তারজন্য কোথাও আমাদের গাড়ীকে এক মিনিটও দাঁড়াতে হয়নি। একটা ব্রীজের ওপরদিয়ে গাড়ী গিয়ে একেবারে কাঠকলের দরজায় আমাদের নামাল। ঐযে বললাম, ব্রীজের ওপরদিয়ে গাড়ী গেল; এটা পরে বুঝেছি, ভেতরের মিউজিয়ামে একটা মানচিত্র দেখে। চাথাম আসলে একটা আলাদা দ্বীপ। গেটের বাইরের টিকিটঘর থেকে মাথাপিছু কুড়িটাকা করে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম।

টিকিট ঘরেই জানতে চাইলে,ওরা বলল, ভেতরে ঢুকে বাঁদিকে দেখুন, ওরা বসে আছে, পঞ্চাশ টাকা নেবে। বাঁদিকে একটা খোলা বসার ঘর মত দেখাগেল ; জন তিনেক প্যান্ট শার্ট পরা লোক বসেছিল, একই রকম পোশাক। দেখে গাইডের মতই লাগল। ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় খুব মগ্ন ছিল। কোনরকমে বলল, এগিয়ে যান, গাইড ওদিকেই পাবেন। অগত্যা পঞ্চাশ ষাট গজ এগিয়েই গেলাম।

ডান দিকে প্রচুর চেরাই করা কাঠ থরে থরে সাজানো দেখলাম। যে পিচ বাঁচানো রাস্তাটা ধরে এগোচ্ছিলাম, তার একপাশ ধরে টয় ট্রেনের লাইন পাতা দেখলাম। বাঁদিকে একটা দোকানে কাঠের নানান পুতুল, মাছ, পাখি ইত্যাদি সাজানো আছে, কাঁচের ভেতরদিয়ে দেখাযাচ্ছে। তারপরই একটি মিউজিয়াম। দরজা ঠেলে একটি বড় এয়ারকন্ডিসন্ড হলের ভেতর ঢুকলাম। একজন মহিলা কর্মচারি বসেছিলেন। ওনাকে গাইডের কথা জানতে চাওয়ায়,উনিও গেটের কাছের ঘরটিতে খোঁজ নিতে বললেন। ভেতরে প্রচুর কাঠের প্রদর্শন সামগ্রি ছাড়াও,নানান মডেল আর মানচিত্র ইত্যাদি সব নিজেরাই দেখলাম। সব কিছুর জন্যই ইংরেজী আর হিন্দীতে বোর্ড দেওয়া আছে,বুঝতে কোন অসুবিধাও হল না। অনেক ছবিও তোলা হল।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আমি আর ছেলে আবার গেটের কাছে গাইডদের কাছে গেলাম। এবার একজন আমাদের সাথে চলল। মিউজিয়াম দেখা হয়েগেছে বলায়, ঐ বাড়ীর পাশদিয়ে একটা গলির মত রাস্তাদিয়ে চলতে শুরু করল। চলতে চলতেই এই কাঠচেরাই কারখানার ইতিহাস বলতে থাকল। ঐ গলির মুখে একটু বিবর্ণ একটা সাইনবোর্ড দেখলাম;

তাতে দিকচিহ্ন দেওয়া আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমের জায়গা। আমাদের দলের সাথে দেখা হল দুজন গেষ্টের,ওরা স্বামী স্ত্রী , গাইড ছাড়াই ঘুরছিল। আমাদের গাইডকে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখার আছে। গাইড পাশের মিউজিয়ামের দরজা দেখাল আঙ্গুল তুলে, আর ঐ সাইনবোর্ড দেখিয়ে বলল, এরকমের বোর্ড আছে, দেখে দেখে এগিয়ে যান। আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, কোন ভ্রমণস্থানেই গাইড ছাড়া ঘোরা উচিত নয়। আশি ভাগ জিনিসই অজানা থেকে যায়।

ঐ গলিরাস্তা ধরে পঞ্চাশ ষাট গজ এগিয়ে গেলাম। একটু উঁচু পুকুর পাড় মত জায়গায় কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠলাম। বাম দিকে একটা বড় সেগুন গাছ দেখিয়ে গাইড জানাল, ওটা টিক গাছ। সেগুনকে টিক বলে সে তো জানি। কিন্তু আন্দামানে প্যাডক ( Padauk) নামে যে এক মহার্ঘ গাছ আছে,তার খবর ঐ প্রথম শুনলাম। গাইড জানাল, এই প্যাডকের জন্যই সাহেবরা এরকম একটা প্রত্যন্ত দ্বীপপুঞ্জের ভেতর এমন একটা কাঠ চেরাই কারখানা তৈরী করেছিল। গাইডের মতে, প্যাডকের কাঠের দাম টিক বা মেহগিনী কাঠের অন্তত চার পাঁচগুন বেশী। আমি কাঠ বিশেষজ্ঞ নই, সেগুন একটা দামী কাঠ,এটুকুই আমার জানার দৌড়। ছবিতে যে প্যাডকের গাছ দেখলাম, আন্দামানে ভ্রমণের সময় ঐ গাছ দেখলেও, পরে আর চিনব না।

ঐযে একটা পুকুর পাড়ের মত জায়গা বললাম, ওটার ভেতরে তাকিয়ে দেখি একটা শুকনো ডোবা। নিচে সামান্য কটা শুকনো পাতা পড়ে আছে, আসপাশের গাছ থেকে। একটা পরিত্যক্ত ঝোলানো সেতু মত টাঙানো আছে, আগে হয়তো এপাড় থেকে ওপাড়ে যাওয়া যেত। ডোবাটা কুড়ি ফুট মত গভীর আর পঞ্চাশ ফুট মত ব্যাসের হবে। গাইড জানাল এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা বোম পড়েছিল, তাতেই এমন গর্ত হয়েছে। বোমার রাসায়নিক এতই ভয়ংকর ছিল যে, আজ পঁচাত্তর বছর পরেও ডোবার মাটিতে ঘাস জন্মায় না। ঐ বিশ্বযুদ্ধের কিছু কিছু বোমারু বিমানের বোম ফেলার ভি ডি ও দু একটা দেখেছি, ইন্টারনেট এর কল্যানে। কিন্তু বোম পড়ে কতোটা ধ্বংশ করতে পারে, আগে কোনদিন দেখিনি।

ওখান থেকে ফেরার সময় গাইড বলেছিল, এরকমের তিনটি বোম পড়েছিল সে সময়, এই চাথাম কাঠ কলের ওপর। তাতে কারখানার অর্ধেকের বেশী ধ্বংশ হয়ে যায়। পরে আবার অনেকটাই নতুন করে তৈরী হয়েছে।

মিউজিয়াম পেরিয়ে বাঁদিকে এগোলাম। একটু এগিয়েই বাঁদিকে একটা ছোট্ট টিলা মত চোখে পড়ল। টিলার মাঝ বরাবর উঠে, গাইড একটা বাঁধানো সুড়ঙ্গ পথ দেখাল। এখন বাইরেটা একটু দর্শণীয় করে, চকচকে স্টিলের বেড়া মত দেওয়া হয়েছে। গাইড জানাল ওটা জাপানী সেনার একটা বাঙ্কার ছিল। ভেতরে গিয়ে দেখে আসতে বলল। আমরা সবাই বাঙ্কারে ঢুকে প্রায় কুড়ি পঁচিশ ফুট চলে গেলাম; তারপর রাস্তা বন্ধ। ফেরার পর মূল কারখানার দিকে এগোলাম। ভারতের বহু ভ্রমনস্থানেই তো ঘুরলাম। পুরনো দূর্গ আর বিশ্বযুদ্ধের পরিত্যক্ত রানওয়ে দেখলেও, এমন বাঙ্কারে ঢুকে দেখার সুযোগ কোথাও হয়নি।

হাটতে হাটতেই গাইড আমাদের অনেক তথ্য জানাচ্ছিল। বাঙ্কার থেকে নেমে বাঁদিকে কয়েক পা হেঁটেই ডানদিকে মূল কারখানার দিকে চললাম। একটা প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু আসবেসটসের ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে, ডানদিক বাঁদিকে সব দাখলাম। ঐ প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু মোটা কাঠের থাম দেখিয়ে গাইড জানাল, ওগুলি প্রথম থেকেই আছে, প্যাডক কাঠের। আজকাল ওরকম উঁচু থাম, ষ্টিলের বা কংক্রীটেরই হয়। কয়েকধাপ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার মূল কারখানা।

সব জায়গায় বোর্ডে লিখে দিকচিহ্ন দেওয়া আছে, কোনদিকে যাওয়া যাবে আর কোনদিকে নয়। শক্তপোক্ত কাঠের মেঝে। দোতলায় ওঠার আগে থেকেই একটানা যান্ত্রিক করাত চলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। দোতলায় উঠে, প্রথমে বাম দিকে কয়েক পা এগোলেই, কারখানার পিছনের সমূদ্রের খাঁড়ি দেখাগেল। গাইড দেখাল, খাঁড়ির জলে বিশাল বিশাল গাছের গুঁড়ি ভাসছে। ওটাকেই বোধহয় সিজনিং বলে। গাইডের মতে, গাছের গায়ে যে ছোট ছোট পোকা মাকড় থাকে, সমূদ্রের জলে কয়েকদিন ডুবলে সেগুলি মরে যায়, মাছেও কিছু পোকাকে খেয়ে ফেলে।

জলে সিজনিং করা বিশালকায় সব কাঠের গুঁড়ি ক্রেনে করে তুলে, আস্তে আস্তে করাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বামদিকের বড় করাতের কাছে যাওয়ার সুযোগও নেই, কাছে গিয়ে দেখার সাহসও ছিল না। গোটা চত্তরে একটা কাঠের গুঁড়োর গন্ধ ম ম করছে। একটু গুঁড়ো উড়ছেও। আমরা পাঁচজন যে দাঁড়িয়ে দেখছি বা আমার ছেলে যে মোবাইল ক্যামেরায় ভি ডি ও তুলছে, তাতে যে কয়েকজন নিরবে কাজ করে চলেছেন, তাঁদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই দেখলাম। দোতলায় এতবড় কারখানায় সবমিলিয়ে জনা চারেক লোক কাজ করছেন। প্রায় সব কাজই মেশিনে হচ্ছে। বাঁদিকের প্রথম করাত থেকে কাঠ চেরাই হয়ে একটা কোমর সমান উঁচু কাঠের পাটাতনের ওপরদিয়ে যেন ভেসে ভেসে ডানদিকে চলে যাচ্ছে। সবই লাগাতার ঘুরতে থাকা কতগুলি পুলির ওপরদিয়ে।

ডানদিকে কিছুটা যাওয়ার পর আবার দিক পরিবর্তন করে আর একটা রাস্তা ধরছে। এসব সময় কুড়ি পঁচিশ ফুট লম্বা ঐ তক্তা একটু আধটু তেরছা হয়েগেলে, হাতে দেড় দু ফুটের মত লম্বা লোহার হুক নিয়ে টেনে সোজা করে দিচ্ছেন, একজন বা কখনও দুজন শ্রমিক। ওদিকে কিছুটা গিয়ে আবার নতুন দিক ধরছে ঐ চলমান তক্তা। ওদিকে যে চকচকে ঘুর্ণমান করাতে ঐ তক্তা আবার একটু চেরাই হচ্ছে, সেটা দেখাই যাচ্ছে। ঐ তক্তা শেষে ঐভাবে পাটাতন বেয়ে, প্রায় ভাসতে ভাসতেই দূরে চলে যাচ্ছে। দূরে কোথায়......... সে তো দেখতে পাচ্ছি না।

গাইড বলছিল, " লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসের সব কাঠের আসবাব এই আন্দামান থেকে নেওয়া প্যাডক কাঠের তৈরী।" দোতলায় একটা বড় পুরনো মেসিন দেখিয়ে গাইড বলেছিল, ওটা পুরনো স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে চালানো করাত কল। নতুন বৈদ্যুতিক মেসিন এসে ওকে মিউজিয়ামের প্রত্নসামগ্রী বানিয়েছে। কারখানা থেকে বেরনোর রাস্তাটা ঐ চকচকে ঘুর্ণমান করাতের পাশদিয়েই। নিচে নেমে গাইড আমাদের কাছে তার মাত্র পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে বিদায় নিল। ভারতবর্ষে আর কোথাও এত কম টাকায় গাইড আছে কিনা আমি জানিনা। এই এক ঘন্টা মত সময়ে ও আমাদের যা কিছু দেখাল বা জানাল, পঞ্চাশ টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও তার জন্য যথেষ্ট নয়। আমরাই তো তার পাঁচ দশ মিনিট পরই কারখানার দোকান থেকে দুটি প্যাডক কাঠের ডলফিন কিনলাম।

আমি জানি, ঐ ছ ইন্চি মাপের ডলফিন দুটি আটশো টাকা দিয়ে কিনলাম বটে, আট মাস পরই ওরা বাড়ীতে জমতে থাকা নানান স্মৃতিচিহ্ন আর উপহারের ভীড়ে, হয়তো বছরে একবার নেড়ে দেখার মত মনোযোগও পাবে না। কিন্তু এই একটা কাঠকল, এমন হাজার হাজার কাঠকল হয়তো এদেশে ছড়িয়ে আছে, এর বুকে একটা ইতিহাসকেই আগলে নিয়ে পোর্টব্লেয়ারের এক প্রান্তে আজও জীবন্ত ইতিহাস হয়ে বেঁচে আছে। কজন জানে এর কথা?

আর ঐ মহার্ঘতম প্যাডকের তক্তাগুলি? ওদের চোখের সামনে, কারখানার পাটাতনের ওপরদিয়ে ভেসে যাচ্ছে, মনেহল কেন আমার? বাইরে এসে দেখলাম, অত্যাধুনিক চলমান ক্রেনে করে চেরাই কাঠ পরিবহনের ব্যবস্থা। ঐ যে টয় ট্রেনের লাইন মত পাতা দেখেছি, তার ওপরদিয়ে কাঠের বোঝা নিয়ে বেরিয়ে আসছে ছোট ছোট ট্রলি। ঐ সব কাঠই তো জাহাজে চেপে ভেসে যাবে দূর দূর বন্দরে।

একদিন এই প্রত্যন্ত দ্বীপপুঞ্জের, আরও দূর্গম কোন দ্বীপের মহার্ঘ প্যাডক গাছ, এই চাথামের কাঠ চেরাই কলে তক্তায় পরিনত হয়েছে। তারপর জাহাজে ভেসে ভেসে, মহাসাগর, মহাদেশ পেরিরে পৌছেগেছে ভারতভাগ্যবিধাতার সুরম্য অট্টালিকার শোভা বর্ধন করার জন্য। আজও কি এ দেশের মহার্ঘ জিনিসগুলি ভেসে যাচ্ছে না, রাজার দেশে? যাচ্ছে, যায়, প্রতিনিয়তই চলে যাচ্ছে আমার দেশের কোহিনুর মণীর মত মহার্ঘতম বুদ্ধিমান মানুষগুলি। ক্যালিফোর্নিয়া শহরে বসবাসকারী, আই আই টির উজ্জ্বলতম প্রাক্তনিটি মেদিনীপুরের কোন এঁদো গ্রাম থেকে একদিন ভেসে গিয়েছেন, আমরা কি কেউ তার খবর রাখি?

আন্দামান ভ্রমণ ( ৯ )- রস আর নর্থবে দ্বীপ

আন্দামানের সেলুলার জেলের ভেতর একটি ছোট প্রদর্শনশালা বা মিউজিয়াম আছে। গাইড আমাদের কাছথেকে বিদায় নেওয়ার সময় বলেদিয়েছিলেন, ছাদে গিয়ে ছবি তুলতে পারেন, আর নিচের প্রাঙ্গণের মিউজিয়ামে ঘুরে যাবেন।

এখন যে তিনটি উয়িং অবশিষ্ট আছে, তার একেবারে পিছনেরটির ছাদেই ওঠাযায়। আমরা যখন ঐ ছাদে উঠি, তখন সূর্য একেবারে মধ্য গগনে। রোদের ভেতর চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি হেঁটে, ছাদের একেবারে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম।

ছাদের উপর থেকে দূরে রস আর নর্থবে দ্বীপ দুটি দেখা যাচ্ছে। রস তো এতোই কাছে, মনেহয় লোকজনকে হাঁটতেও দেখা যাচ্ছে। আমরা আন্দামানে পৌছনোর পরদিনই ঐ দুই দ্বীপে ঘুরে এসেছি। রসদ্বীপে বেশকিছু পোড়োবাড়ী মত দেখেছি। ওগুলির সম্বন্ধে কিছুই জানা হয়নি।

সেলুলার জেলের ছাদ থেকে নিচে নেমে এলাম। আমাদের এবারের আন্দামান ভ্রমণের শেষ দর্শনীয় জিনিস, সেলুলার জেলের চত্তরের ছোট মিউজিয়ামটিতে ঢুকলাম। একটি বড় হলঘরে যত্নকরে রাখা অনেক ছবি। আমরা গত ছ দিনে যেসব দ্বীপে ঘুরেছি, সেরকম কিছু জায়গার ছবি যেমন আছে, আমাদের দেখা হয়নি তেমন জায়গার ছবিও আছে।

যে রসদ্বীপে আমরা কদিন আগে ঘুরে এলাম, তার ইতিহাসকেই ছবিতে দেখলাম। এই একটি জায়গায় এসেই মনেহল, প্রথম দিনই জেলের ভেতরের এই মিউজিয়ামটিতে ঢুকলে ভালো হত। আমরা এবার যে ভ্রমণসংস্থার ব্যবস্থাপনায় এসেছিলাম, তাদের সূচী অর্থাৎ ইটিরেনারী অনুযায়ী, প্রথমদিনই বিকেলে আমাদের সেলুলার জেল দেখার কথা ছিল। কিন্তু কলকাতা থেকে প্লেন ছাড়ার আগের মূহুর্তে একজন যাত্রি অসুস্থ হওয়ায়, এক ঘন্টা দেরী হল রওনা দিতে আর পৌছতে। তাই প্রথমদিন আর জেল দেখতে যাওয়া হয়নি। প্রথমদিন আমরা কোভরিং কোভ বীচ আর জেলের লাইট এন্ড সাউন্ড অনুষ্ঠান দেখতে পেরেছিলাম। বিকেলে গাড়ীতে কোভরিং কোভ বীচের দিকে যাওয়ার সময় একটা জায়গা থেকে রসদ্বীপ দেখিয়ে ড্রাইভার বলেছিল, আগামীকাল আপনারা ওখানে যাবেন। পরে রাজীব গান্ধী ওয়াটার স্পোর্টস কম্প্লেক্সের ভেতর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, একটা ডিঙি নৌকা নিয়েই রসে চলে যাওয়া যাবে।

পরদিন সকালে ভ্রমণ সংস্থার গাড়ী এসে আমাদের হোটেল থেকে জংলীঘাট জেটিতে নিয়েগেল। আমাদের হোটেল থেকেই, পিছনদিকে জংলীঘাট জেটি দেখাযায়, পরে দেখেছি। জংলীঘাটে গিয়ে দেখি গাড়ী আর ট্যুরিস্টের মেলা বসেছে যেন। আমাদের জন্য ঠিক করাই ছিল, মার্ক মেরিনা লঞ্চ। ভ্রমণ সংস্থার লোক এসে আমাদের লঞ্চের টিকিট দিয়ে গেল। আগেও বলেছি, এই একটি জায়গায় দেখলাম, বেশকিছু লোক নানান রকমের জলক্রীড়ার টিকিট বিক্রীর জন্য, লোকজনকে প্রায় বিরক্ত করছে। এমনকি সাথে টাকা কম থাকলে, পরে হোটেল থেকেও নিতে পারে, এমন প্রস্তাব সকলকেই দিচ্ছে। আমরা চারজনের জন্য বেশ দাম দিয়েই, সেমি সাবমেরিনের টিকিট কিনলাম। মুখে মুখেই ডেকে, আমাদের মার্ক মেরিনা লঞ্চের জন্য জেটিতে লাইন করে দাঁড়াতে বলল। প্রায় একশো জন মত যাত্রি উঠলাম। লঞ্চের আকার আমাদের, হাওড়া বাবুঘাট ফেরীতে চলা লঞ্চের মত। তবে বসার আসন বেশ গদি দেওয়া। আর বৃষ্টি বাদলার থেকে বাঁচার জন্য সুন্দর কাঁচে ঘেরা। সবাই উঠে যেতেই, একজন কর্মচারি সকলকে, লাইফ জ্যাকেট বেঁধে নিতে বলল।

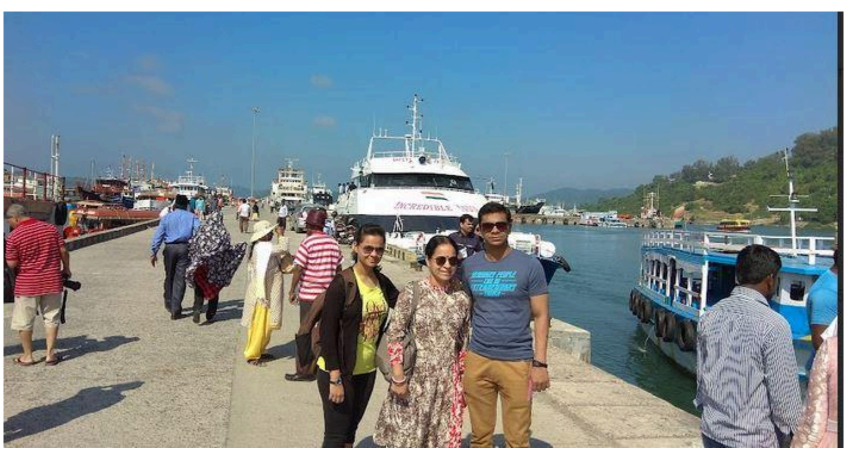

জংলি ঘাট

এই প্রথম লাইফ জ্যাকেট বেঁধে কোন জলযানে বসা। বেশ একটা উত্তেজক ব্যাপার। তার ওপর আন্দামান ভ্রমণ মানেই বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরে বেড়ানো। বেশ জাহাজে লঞ্চে ঘুরে বেড়ানো হবে, এমন একটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই

ছিলাম। যাত্রিদের বেশীরভাগই বাংলায় কথা বলছে দেখলাম। লঞ্চ মিনিট দশেক চলার পরই দেখি, এক দাদু উঠে দাঁড়িয়ে একটি ছোট্ট ডিজিট্যাল ক্যামেরায় ছবি তুলছেন। ছবি আমরাও প্রায় সকলেই তুলছি, ক্যামেরা, নয়তো মোবাইলে। আসলে, বিশেষ করে বাঁদিকের দৃশ্য এতোই নয়নাভীরাম যে, ছবি না তুলে থাকা যায় না। আচ্ছা, দাদু কি একটু দুলে দুলে নাচছেন না কি? প্রথমে মনে হয়েছে, দাদুর বেশ ছোটখাটো চেহারা; তার উপর ঐ উজ্জ্বল লাইফ জ্যাকেট বেঁধে বেশ পুতুল পুতুল লাগছে। তাই লঞ্চের দুলকি চালে মনে হচ্ছিল, নাচছেন। একটু পরেই দেখি, জ্যাকেট বাঁধা দিদিমাটি উঠে দাঁড়িয়ে, দেশ দুলে দুলে নাচছেন।

মিনিট পঞ্চাশ চলার পর, লঞ্চ পৌছল রস দ্বীপের ঘাটে। হ্যা, ঘাটই; বেশ সুন্দর করে বাঁধানো ঘাটের পরই, টিকিট ঘর। দ্বীপে ঢোকার জন্য মাথাপিছু তিরিশ টাকার টিকিট। আমরা টিকিট কেটে দ্বীপে ঢুকলাম। লঞ্চের কর্মচারি নামার সময় বলেদিল, এক ঘন্টা পরেই ফিরে আসতে হবে।

রস দ্বীপে

দ্বীপে ঢোকার পরই অনেকটা খোলা মাঠ মত। বাঁধানো রাস্তা ডানদিক বাঁদিকে চলে গেছে। রাস্তার পাশে পাশে লম্বা লম্বা নারকেল গাছ। আমরা বাঁদিকে এগিয়ে গেলাম। আবার একটু বাঁদিকে এগিয়ে, সমূদ্রের বাঁধানো পাড় পেলাম। পাথরের ওপর এসে পড়ছে সমূদ্রের ঢেউ। এত টলটলে পরিস্কার জলও যে হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করাই মুস্কিল। সমূদ্র পিছনে রেখে দু একটা ছবি তোলা হল। তারপর পাড় ধরে এগিয়ে গেলাম দ্বীপের উত্তর পশ্চিম কোনের দিকে। ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরের নর্থ বে দ্বীপকে নীল সমূদ্রের জলে ভেসে থাকা একটা সবুজ অরন্য মনে হল।

ঐ কোনের দিকে একটা ছোট্ট হেলিপ্যাড আছে। এমনিতে কোন প্রাচীর বা গেট নেই; কিন্তু একটা ছোট্ট বোর্ডে লেখা আছে " এন্ট্রি রেস্টিকটেড"! দু একজন গেষ্ট দেখলাম, ঐ হেলিপ্যাডের ওপর দিয়েই, অলস ভঙ্গিমায় হেঁটে যাচ্ছে। বারন করারও কেউ নেই। আমরা ওদিকে না গিয়ে, ডানদিকে,দ্বীপের ভেতরদিকে এগিয়ে গেলাম। ওখানে ফাঁকা মাঠের ভেতর অনেক ধাতব চেয়ার পাতা আছে দেখলাম। ওখানে সন্ধ্যায় লাইট এন্ড সাউন্ড অনুষ্ঠান হয়, বোঝাগেল। আবার উত্তর দিকে এগোলে কয়েকটা পোড়ো বাড়ীর ধ্বংশাবশেষ দেখাগেল। একসময়

বাড়ী ছিল, এখন ভাঙা দেওয়ালে ইঁটের থেকেও গাছের শেকড়ই বেশী চোখে পড়ে। অবস্থা দেখলে তো মনেহয়, কয়েকশ বছর আগে ওখানে মানুষ থাকত। কিন্তু আন্দামানের ইতিহাস কি এত পুরনো? জানি না; লাইট এন্ড সাউন্ড অনুষ্ঠান দেখলে হয়তো জানা যেত।

কিন্তু ঐ পোড়ো বাড়ীগুলি পেরিয়ে গেলে, একটা প্রায় ব্যবহার যোগ্য সুইমিং পুল দেখলে একটু অবাকই হতে হয়। সমুদ্রের বাঁধানো পাড়ের তলাদিয়ে ঐ পুলের জলের সাথে যুক্ত পাইপ লাইন আছে দেখাযাচ্ছে। এবার আমরা হাঁটতে হাঁটতে পুব দিকে এগোলাম। একটা ঐরকম পোড়ো বাড়ীর ভেতর একটা ভাঙাচোরা বয়লার দেখলাম। ওখানে বোর্ডে লেখা থেকে জানলাম , ওটা পানীয় জল তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হত।

রাস্তাটা ক্রমশ উপরে উঠছে। যতোই ওঠাযায়, দুপাশের গাছপালা ততোই ঘন হতে হতে একেবারে জঙ্গলের মত হয়েছে। অনেক নারকেল গাছ। এছাড়া তাল গাছের মত ছোট বড় মাঝারি নানান ধরনের গাছের ছায়ায় কয়েকটা ময়ুর দেখা গেল। ঐ ছায়ায় ঢাকা গাছের তলায় একজন দেহাতি মতন মানুষ বস্তা ভরে নারকেল সংগ্রহ করছে দেখলাম।

বাঁধানো রাস্তা ক্রমশ পাহাড়ের উপরে উঠছে। এক জায়গায় গিয়ে দেখি, তিন রাস্তার মোড়। কোনদিকে গেলে কি দেখার আছে কিছুই জানিনা। বাঁদিকের ছায়া ঢাকা রাস্তা ধরে দুচারজন নেমে আসছে দেখে, ওদিকেই এগোলাম। পঞ্চাশ ষাট গজ এগিয়ে ডানদিকে কয়েকটা বড় বাড়ী দেখলাম। ভেঙে না পড়লেও, মানুষজন থাকেনা,দেখলেই বোঝাযায়। কোন গাইড না থাকায় কিসের বাড়ী,কে থাকত, কিছুই বুঝলাম না। বাড়ীগুলীর গঠনশৈলী পুরনো ইউরোপীয় ধাঁচের।

পরে সেলুলার জেলের ভেতর মিউজিয়ামে ছবি দেখে জেনেছি যে, এক সময় ঐগুলিই ছিল, বলাযায় দ্বীপপুঞ্জের রাজ বাড়ী। ঐসব পোড়োবাড়ীই ছিল, দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর।

আমরা ডানদিকে, গাছের শেকড়ে ঢাকা পুরনো দেওয়ালগুলিকে রেখে, এগিয়ে চললাম। বাঁদিকে গভীর খাদ; কিন্তু ঘন গাছপালায় ঢাকা থাকায়, পাহাড়ী খাদের মত লাগে না। মাঝে মাঝে গাছের ফাঁক দিয়ে অনেক নিচে ঘন নীল সমূদ্রের জল দেখা যাচ্ছে, সবুজের ভেতরদিয়ে এমন ঘন নীল আর কোথাও দেখিনি। ঐ রাস্তার শেষে, একটা ছোট্ট মাঠ মত জায়গা। ওখানে একটু নিচু লোহার বেড়া দিয়ে একটা বিশাল নোঙর-এর আকৃতির ভাস্কর্য রাখা আছে। হয়তো নৌ সেনার কোন কীর্তির স্মারক হবে। একটু ডানদিকে তাকালে, গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে অকুল সাগর দেখা যায়। ওদিকে কোন দ্বীপের কোন আভাসও চোখে পড়েনা। এক দুটি ছবি তুলে ফেরার রাস্তা ধরলাম। আবার সেই তিন রাস্তার মোড়ে এসে, সোজাই চলতে থাকলাম। ওখানে একটা ছোট্ট সমতল জায়গায় একটা বড়, শিংওয়ালা হরিণ ঘুরছিল। ওকে একটি গেষ্ট মেয়ে বিস্কুট খেতে দিল। তাই দেখে ওখানে কর্মরত ঝাড়ুদার একটু ধমক দিল। বিস্কুট না দিয়ে পাতা ছিঁড়ে দিতে বলল।

ওদিকে একটা পুকুর আছে, এরকম একটা দিক নির্দেশ দেখতে পেলাম। গাছপালার ছায়ার ভেতরদিয়ে হেঁটে কিছুটা এগিয়ে, ডানদিকের নামার রাস্তা ধরলাম। ডানপাশে একটা ডোবা মত দেখাগেল। বাঁধানো রাস্তার পাশে

দু একটা বসার মত জায়গা আছে। বয়স্করা সম্ভবত উপরে না উঠে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। একটি বড় শিংওয়ালা হরিণ এসে এক বয়স্ক মহিলার হাত থেকে বিস্কুট খেল। আরও নিচে নেমে,প্রায় ঘাটের কাছে, কয়েকটা খরগোসও ঘুরছে দেখলাম। কয়েকজন গেষ্ট ওদের কিছু খেতে দিলে,কাছে এসে খেয়ে গেল। আমাদের ফেরার জন্য যে সময় বলেদিয়েছিল, মিনিট দশেক বাকি আছে দেখে, আমরা ডাব কিনে খেলাম। দাম কলকাতার মতোই। ঘাট থেকে মার্কমেরীনা লঞ্চের কর্মচারি ডাকদিলে,সবাই লঞ্চে উঠেগেলাম।

আবার সেই লাইফ জ্যাকেট বেঁধে বসে গেলাম। আধ ঘন্টা মত চলে,আমরা নর্থবে দ্বীপের ঘাটে পৌছলাম। ওখানে একটা ভাসমান জেটিতে নেমে, ভাসানো রাস্তা দিয়ে পাড়ে এলাম। এখানে পাড়েও বড় বড় পাথর ছড়ানো। বয়স্করা এসব জায়গায় নেমে পাড়ে উঠতে বেশ সমস্যায় পড়বেন।

নর্থ বে

পাড়ে বেশ কিছু অস্থায়ী দোকানপাট। ওর ভেতরই যাদের ওয়াটার আক্টিভিটির টিকিট আছে, তাদের জন্য চালার ভেতর লোকজন, সরঞ্জাম নিয়ে বসে আছে।

পাড়ের থেকে অল্প দূরেই, নানা রকম জলক্রীড়ার ব্যবস্থা। স্নরকেলিং, স্কুবা ডাইভিং, সি ওয়াকিং সবই চলছে। দ্বীপে কোন কিছুই দেখার নেই। এই নর্থ বে দ্বীপের উত্তর পুর্ব কোনায় একটা লাইট হাউস আছে। পোর্টব্লেয়ার থেকে দেখাযায়, সবুজের মাঝে লাল সাদা একটা গোল থামের মত। কুড়ি টাকার নোটের পেছনে এই এই ছবি দিয়ে একে বিখ্যাত করা হয়েছে। রসদ্বীপ থেকেও একে দেখেছি। কিন্তু নর্থবে দ্বীপের ঘাটের অবস্থান ঠিক এর উল্টো দিকে ; তাই এখান থেকে ঐ লাইট হাউস দেখা যায়না।

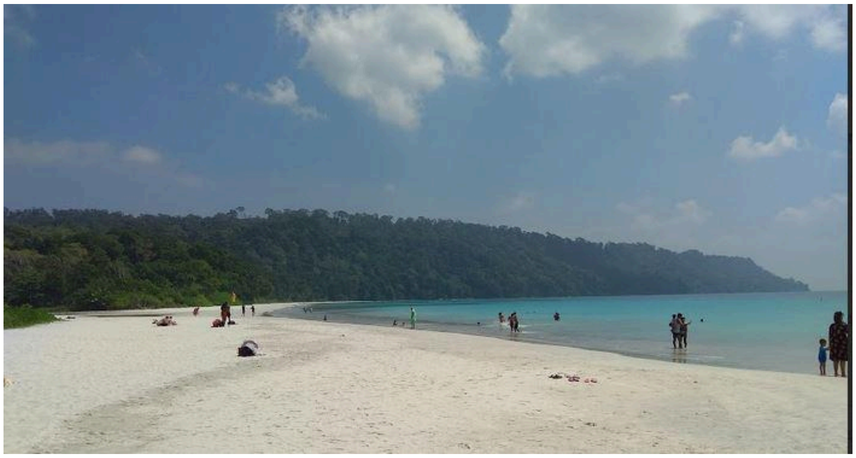
রাধানগর বিচ

# দয়াল বন্ধুর ভ্রমণ কথা- ২০২৪

## শৈব তীর্থ ( ইন্দোরের দিকে ) ও প্রয়াগ কুম্ভ

### আসাম-শিলং-২০২৩, নৈনীতালের দিকে

## রাঁচী , কাশ্মীর, বারানসী-২০১৯

শৈব তীর্থে ভ্রমণ ১

২০২৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর শুরু হল আমাদের শৈব তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ। এবার যাত্রা হাওড়া স্টেশন থেকে। যাবো উজ্জয়িনী (মহাকালেশ্বর), ইন্দোর,ওঙ্কারেশ্বর, আর ফেরার পথে কিছু সময়ের জন্য প্রয়াগ। এসব টিকিট সেই চার মাস আগে যখন ট্রেনের অগ্রিম টিকিট কাটতে পারতাম সেই সময় কাটা। তারপর তো দু'মাস আগে টিকিট কাটার নিয়ম হয়ে গেল। হাওড়া থেকে উজ্জয়িনী, শিপ্রা এক্সপ্রেসে। সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় ছেড়ে পরদিন রাত দশটার আগে পৌঁছয়। আমি নতুন জায়গায় বেশী রাত্রে গিয়ে পৌঁছনো এড়িয়ে চলতে চাই; কিন্তু এই রাস্তায় এ ছাড়া গাড়ী নেই।

শিপ্রা এক্সপ্রেস

ট্রেন এক দুই ঘন্টা দেরী করে পৌঁছবে, এটাই দস্তুর। তাই টিকিট কেটেই দেখে নিলাম, উজ্জয়িনী স্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে কি না। আছে দেখেই , সন্ধ্যা আটটা থেকে পরদিন সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত বুক করলাম, একটি নন এসি রুম। মাত্র ৩৩৩ টাকা। এত সস্তা হওয়ায় একটু খুঁতখুঁত করছিল মন; পৌঁছে দেখলাম, ঠিকই আছে। আর ট্রেন গোটা রাস্তা ঠিকঠাকই চলল। মাঝে কিছু সময় মিনিট কুড়ি লেটে চললেও, উজ্জয়িনী স্টেশনে পৌঁছে গেল, আট মিনিট আগেই। আমরা এবার দুই Senior Citizen রওয়ানা দিলাম। বিকেল চারটা নাগাদ রওনা দিয়ে, দমদম মেট্রো ধরলাম, চারটে পনের মিনিট নাগাদ। ধর্মতলায় মেট্রো পাল্টে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেলাম, পাঁচটা দশে। ধর্মতলায় মেট্রোতে ওঠার আগেই দেখলাম বেশ ভিড়। দুটি ষ্টেশন হলেও বেশ চাপাচাপি ভিড় হয়ে গেল। হাওড়ায় শিপ্রা এক্সপ্রেস আট নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমরা উঠে ব্যাগপত্র রাখার জায়গা পেয়ে গেলেও, দশ মিনিট পর যারা উঠল তাদের বড় বড় ট্রলি ইত্যাদি রাখা নিয়ে বেশ সমস্যা হল। লোকজন কতো বড় বড় বোঝা নিয়ে ট্রেনে ওঠে,দেখলে আমরা অবাক হয়ে যাই। পরে জেনেছি, এক মহিলা মেদিনীপুরের বাড়ী থেকে ভূপালের কোয়ার্টারে যাচ্ছেন; ট্রলিব্যাগ ভরে চাষের বেগুন, বাঁধাকপি, ফুলকপি সব নিয়ে

চলেছেন। সাথে একটি বছর চারেকের বাচ্চা, তার শীতের পোশাক ইত্যাদি তো আছেই। বাচ্চার বাবা বেচারার শাস্তিটা ভেবে দেখুন। ওরা মিলিটারির চাকরীর জন্য বাইরে বাইরেই থাকে। আরও প্রায় একই রকম আর একটি পরিবারও আমাদের সহযাত্রী। ওদের বাচ্চাটা আরও ছোট। কিন্তু সমস্যা হল, আমরা দুই সিনিয়র সিটিজেন নীচের দুটি বার্থ নিয়ে বসে গেছি। ওরা মিডিল আর আপার। বাচ্চা নিয়ে উপরে শোয়া বেশ সমস্যা। ছোট বাচ্চার মা এই প্রথম বাচ্চা নিয়ে ট্রেনে চলেছে। যে কাজটা ওর স্বামীর একটা নিরীহ অনুরোধে হয়ে গেল; সেইটা নিয়ে আমার স্ত্রীর মেজাজ বিগড়ে দিয়েছিল। আজই সকালে শ্রীশ্রী মা সারদার একটি অমর পরামর্শের আলোচনা শুনছিলাম। দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদার জেলেদের মাছ ধরতে বারণ করে দিলেন। জেলেরা মাছ ধরার কাজ না করলে সপরিবারে মারা যাবে। ওরা এসে শ্রীশ্রী মাকে বিপদের কথা জানাল। মা বললেন, জমিদারের সাথে ঝগড়াঝাঁটি না করে, ভালো করে বুঝিয়ে বল, উনি ঠিকই বুঝবেন। জেলেরা জমিদারের কাছে সবিনয়ে অনুরোধ করায় তিনি আবার মাছ ধরার অনুমতি দিলেন। যে কাজ অনুরোধে হয়ে যায়, সেটাই তর্কাতর্কি করলে জটিল হয়ে যায়। এই কম বয়সের বাচ্চার মা ভেবেছিল, বাচ্চা নিয়ে উঠেছে, তাই তার অধিকার, নিচের বার্থে যাবে। রেলের নিয়মে তো সেরকম কিছু কথা নেই। টিকিট কেনার সময়ই কে কোন বার্থে যাবে জানিয়ে দিয়েছে। এবার আমি সহানুভূতি দেখিয়ে নিচের বার্থ ছেড়ে দিলাম, সেটা অন্য কথা। সবাই তো ছাড়ে না। না ছাড়লে কারো কিছু বলার নেই। আমার সাংঘাতিক অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে রাতের ট্রেনে, মেঝেতে চাদর পেতে শুইয়ে কলকাতা এনেছিলাম, মালদা থেকে। সম্পূর্ন রেলের ভুলে হয়েছিল গণ্ডগোলটা। কোন যাত্রী একটা বার্থ ছাড়েনি। এমনকি টিটি, দুটি বার্থ টাকা নিয়ে অন্য লোককে দিয়ে দিয়েছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম সে সব বাজে অভিজ্ঞতা। এরকম কেউ কেউ খুঁচিয়ে মনে করায়। যাই হোক, আমাকে একবার বলাতেই, বাচ্চার জন্য নিচের বার্থ ছেড়ে দিলাম। এটা কোন মহানুভবতা নয়। প্রভুর কৃপায় আমি এখনও যথেষ্ট শারীরিক ভাবে সুস্থ আছি। নিজেই অক্ষম হলে তো, অন্যের করুণার উপর নির্ভর করতে হবে। এই বাচ্চা দুটিকেই আমি আগের লেখায়, বাল গোপাল বলে উল্লেখ করেছি। [ নিতাইদা-৪ লেখা থেকে ঃ - প্রায় চব্বিশ ঘন্টা হল হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে রওনা দিয়েছি। সাথে দুটি বাল গোপাল চলেছে। এরা কেউ সফর সঙ্গী হলে, ট্রেনের দীর্ঘ ভ্রমণ আনন্দময় হয়ে যায়। সেও এক রকম, বাল গোপাল এর কৃপা। এদের একজনের “বালভাসিতম অমৃতম্” শুনতে শুনতে চলেছি। ওর সাথে পাশের একটি কিশোরী কন্যা বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে। সেই দিদির কোলে বসে, এই শিশুটি হঠাৎ বলল, আমি হাত দিয়ে বাঁশী বাজাতে পারি। ওর ঐ কথাগুলি এতই অস্পষ্ট যে, মেয়েটি বা তার মা বুঝতে পারছিল না। দুই তিন বার কি করতে পারিস, জিজ্ঞেস করায় ও বলল, “ কিন্নোর মটো বাচি বাজাই।” ঐ বাঁশী আর কিন্নো মিলিয়েই বুঝলাম , এ সেই পরম করুণাময় শ্রী কৃষ্ণের বাঁশীর কথা বলছে। সে বাঁশী তো কোন সুদূর অতীত থেকেই বেজে চলেছে; শুনতে পায় কজন? যে শুনতে পায়, সে তো কৃপা ধন্য।]

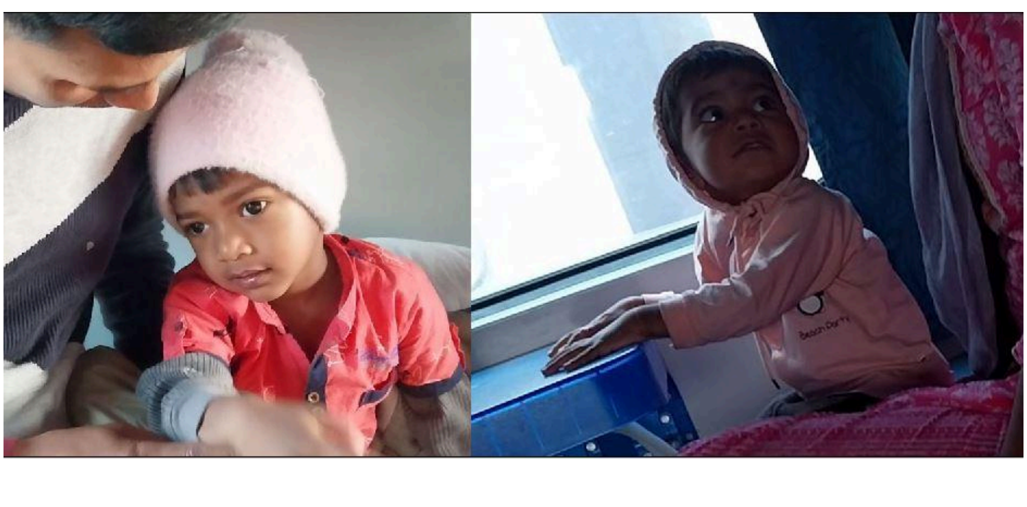

ওরা দুজনও নতুন রেল যাত্রার অভিঘাত বুঝতে বুঝতে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকালে উঠে ওরা দু'জন আশপাশের লোকজন সকলকে সারাদিন মাতিয়ে রাখে। একেবারে ছোট্টটা কথাই বলতে শেখেনি। সেও আমাকে তার দাদু মনে করে আমাকে একেবারে আপন করে নিল। একসময় তো ওদের দুজনের সাথে আমাকেও বেলুন নিয়ে খেলতে হল। একটা বেলুন চুপসে না যাওয়া পর্যন্ত আমার ছুটি হল না। "কিন্নোর বাচি" বাজানোর গল্প তো বলেছি। সেই কিন্নো ভক্ত আমাদের থেকে ঘন্টাখানেক আগে নেমে গেল। ছোট্টটা তার আগেই মায়ের সাথে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা উজ্জয়িনী স্টেশনে পৌঁছে, এক নম্বর প্লাটফর্মে Retiring room পেয়ে গেলাম। দোতলায় উঠে, মাসিকে কাগজ দেখাতে, বলল , নিচে গিয়ে Enquarry তে নাম লিখিয়ে আসুন। আমি নীচে নেমে গেলাম। ঐ ছোট্ট খুপড়ি ঘরে আগেই জন তিনেক যাত্রী ঢুকে ছিল। একজন রেলের কর্মচারি ওদের সাথে কথা বলছেন , শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছিল না। একজন বেরোনোর পর আমি মুখ বাড়াতেই সেই কর্মচারি বললেন, আপনার আছে? আমি আমার ছাপিয়ে নিয়ে যাওয়া বুকিং এর কাগজটি ওনার হাতে দিতেই, উনি সেটা আগের দুইজনকে দেখিয়ে বললেন, এই রকম একটি কাগজ বা মোবাইলে পাঠানো বার্তা দেখাতে হবে। আমার আধার কার্ড মিলিয়ে খাতায় লিখে নিলেন। আমার নাম ঠিকানা খাতায় লিখে সই করে দিতে বললেন। প্রথমে থাকা কম বয়সের মেয়েটি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেল বোঝাতে যে, ওর কাছে ঐ রকম কোন বার্তা আসেনি। ওর মোবাইলে আসা একটি কোন বুকিং নম্বর দিয়ে কিছু করা যায় কি না সেই চেষ্টা চলছে দেখে আমি বেরিয়ে এলাম। স্টেশনের বাইরে অনেক অটো রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে, উপর থেকেই দেখেছি। কয়েক পা এগিয়ে ওদের একজনের সাথে কথা বলে নিলাম। জানলাম, ভস্মারতি দেখতে হলে রাত দুটোয় বেরোতে হয়। সেই মহাদর্শনীয় কর্মকাণ্ড দেখতে হলে, মাস দুই তিন আগে থেকেই অনলাইনে টিকিট কাটতে হয়। সেরকম কোন পূণ্য লাভের আশায় আমরা আসিনি। তাই ভোরে উঠে মন্দিরের দিকে যাবো ঠিক করে শুয়ে পড়লাম। কদিন আগে এদিকে থাকা এক ভদ্রলোকের কাছে জানতে পেরেছিলাম, ইন্দোরের দিকে দারুণ ঠাণ্ডা পড়ে। উজ্জয়িনীতে সেরকম ঠাণ্ডা পেলাম না। জানালা দরজা বন্ধ Retiring room এ একটা পাতলা কম্বলেই বেশ ভালো ভাবে রাত কেটে গেল।

আমাদের অভ্যেস মত ভোর চারটে নাগাদ ঘুম থেকে উঠে বেরনোর জন্য তৈরী হয়ে গেলাম। স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা টোটো ধরে ছুটলাম মহাকাল দর্শনের জন্য। টোটো একটা চৌরাস্তায় নামিয়ে হাঁটতে বলল। এবার শুরু হল পূজার ডালা বিক্রির দোকান। এটা আমরা জানি; সব বড় মন্দিরের সামনে এরকম,ডালা বিক্রির দোকান অন্তত আধা কিমি আগে থেকেই শুরু হয়। ভক্তদের পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে থাকলে বোঝা যায়, জুতো জমা রাখার জায়গা সামনে আছে। আমরা সাতাশ নম্বর দোকানে জুতো খুলে, ডালা কিনে নিলাম I এবার চললাম পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে। একটা ফাঁকা মাঠ মত জায়গার সামনে বিরাট বড় টিভিতে ভেতরের ভষ্ম আরতি দেখাচ্ছে। অনেকে বসে দাঁড়িয়ে দেখছে। আমরা না থেমে এগিয়ে গেলাম। যারা বসে টিভিতে দেখছেন, তাঁদের জন্য বেশ কিছু চকচকে স্টিলের বসার জায়গা করা হয়েছে। ওরা সম্ভবত ভোর তিনটে থেকেই বসে দেখছেন।

আমরা একটি আধুনিক হলের ভিতরে ঢুকে, স্টেনলেস স্টিলের বেড়ার মধ্যে ঢুকে গেলাম। হলে আমাদের সামনে অন্তত হাজার তিনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে আরও হাজার পাঁচ সাত লোকের দাঁড়ানোর মত জায়গা খালি ছিল। আধ ঘন্টার মধ্যে প্রায় গোটা হল ভরে গেল। আমরা আরও মিনিট চল্লিশ দাঁড়িয়ে, টিভিতে আরতি দেখলাম।

আরতি শেষ হল ছটার পর। তারপর সব পরিষ্কার করে, শিব লিঙ্গের উপর থেকে রুপার মুকুট সরিয়ে রাখল। একটি রুপার কলসিতে জল ভরে শিব লিঙ্গের উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সেই কলসীর তলার ছিদ্র দিয়ে জল পড়তে থাকল। একটা মোটা পিতল বা তামার পাইপ কলসির উপর জুড়ে দেওয়া হল। সাড়ে ছয়টা নাগাদ হলের লোকেদের জন্য ভেতরে যাওয়ার গেট খুলে দিল। এবার নিশ্চয়ই দর্শন হবে।১৯.১২.২৪.

শৈব তীর্থে ভ্রমণ 2

সাধারনত আমি এরকম লম্বা লাইন দিয়ে, ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে কোন মন্দিরে পূজা দিতে, বা দর্শন করতে সময় দিই না। পূণ্য লাভের আশায় কোন তীর্থেও যাই না। এত বড় দেশের নানান প্রান্তে শত শত মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বারা, গীর্জা আছে। কটিই বা আমরা যেতে পারি? কিন্তু যে কটি জায়গায় আমি পৌঁছতে পেরেছি, সেখানে " পূজা চড়ানো" , প্রার্থনা, বা পর্দা চাপানো, কোন কিছুই আমি করিনি। আবার আমার স্ত্রী যেখানে যা পূজা ইত্যাদি দিয়েছে, আমি বাধা দিয়ে নাও করিনি। এই তো গত বছর, কামাক্ষা মন্দিরে পূজা দেওয়ার লাইনে ঘন্টা দুই দাঁড়িয়ে, আমি বেরিয়ে এসেছিলাম। আমার স্ত্রী, দলের বাকীদের সাথে মন্দিরে ঢুকে পূজা দিয়ে, হোটেলে ফিরল বিকেল পাঁচটা নাগাদ। আর আমি একা একাই ঘুরলাম, কামাক্ষা পাহাড়ের অন্য কিছু মন্দির দেখলাম, ভান্ডারায় খিচুড়ি ভোগ খেলাম, লঞ্চে চেপে উমানন্দ দেখে হোটেলে ফিরলাম, চারটার আগেই। একটা জায়গায় বেড়াতে গিয়ে, মাত্র একটি মন্দিরে ঢুকে পূজা দিয়ে একটি গোটা দিন খরচ করতে রাজী নই। আমাদের দলের বাকী প্রায় তিরিশ জন জানলোই না, কামাক্ষা পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ব্রহ্মপুত্র নদ কেমন দেখতে।

উমানন্দ যাওয়ার ঘাটে

চলুন এবার আমরা সবাই মহাকাল দর্শনের জন্য পা চালিয়ে ভেতরে যাই। নীচের হল থেকে দেড় দুই তলা উপরে উঠে, কিছুটা নিচে নেমে, সুন্দর করে বেড়া দিয়ে দিয়ে লাইন ঠিক করে রাখা। সেই পথে ভেতরে চললাম। আমাদের আগে একজনকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়াও দেখলাম। লোকে দূর্গম হিমালয়ের রাস্তায়, মানুষের পিঠে চেপেও তীর্থ করতে চলেছে, এরকমও তো দেখেছি। পূণ্য লাভের কি প্রবল বাসনা মানুষের! এদিকে আমার মত অর্বাচীন,ভ্রমণ করতে যাওয়া হুজুগে লোকও আছে। যদি এরকম উটকো লোকগুলোকে কোন ভাবে বাছাই করে বাইরেই আটকে রাখার ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে আসল ভক্ত লোকগুলি একটু আরামে পূজা দিয়ে স্বস্তি পেতো। এই বাছাই করা ব্যপারটা মনে হল , এখন " তপোভূমি নর্মদা" তীরে বসে আছি বলেই। সেই ১৯৫২ সাল নাগাদ শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী মশাই এই নর্মদার পাড়ে পাড়ে পরিক্রমা করছিলেন। এই ওমকারেশ্বর মন্দিরের চাথালে দেখা পেয়েছিলেন, মহাত্মা প্রলয় দাস মহারাজের।( ১৯.১২.২০২৪, আজ আমি সেই ওমকারেশ্বর মন্দিরে ঢুকে ভিড় বাড়িয়ে এলাম), কোথায় কি চাথাল ! সব বেড়া দিয়ে লাইন করার ব্যবস্থা। হাজার হাজার মানুষের হট্টগোলে, কোন কোনায় বসে ছিলেন মহাত্মা প্রলয় দাসজী বোঝার কোন প্রশ্নই নেই। এই মহাত্মা

জানতেন, আর কয়েক মাইল পশ্চিমে এগিয়ে গেলেই , শৈলেন্দ্র নারায়ণকে কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হবে। তাই তিনি "বাচ্চা পরিক্রমাকারিকে" মহর্ষি দণ্ডীকৃত শিবের সহস্র নাম মুখস্ত করে তারপর এগোতে বলেছিলেন। ওটা বলতে না পারার জন্য, শত শত শখের পরিক্রমাকারীকে ফেরৎ করে দেওয়া হত। এখন তো সব মন্দিরেই " ভি আই পি দর্শনের" ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মহাকাল দর্শনের জন্যও সেরকম, বেশী টাকা দিয়ে কম লাইনের বন্দোবস্ত আছে। আমি জানতাম, কিন্তু খোঁজ করে দেখিনি। পরে সেই সব " টিকিট কেনার, কম্পিউটারাইজড কাউন্টার" দেখেছি, বেরনোর রাস্তায়। সে যাই হোক, ভিড়ের পিছু পিছু এগিয়ে আমরাও দর্শন করে নিলাম। হল থেকে এগিয়ে , দর্শন পর্যন্ত প্রায় আধ ঘন্টা মত লাগল। আঠারোই ডিসেম্বর ভোর রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল উজ্জয়িনীতে; তাই সবমিলে ঘন্টা দেড় দুই মহাকাল মন্দির চত্বরে থাকলেও কোন কষ্ট হয়নি। গরমের সময় কিন্তু বেশ কষ্টকর হবে ব্যাপারটা। হলে, ভেতরের লাইনের জায়গায়, অনেক ফ্যানের ব্যবস্থা আছে। আমাদের জন্য ফ্যান চালাতে হয়নি। কিন্তু উনিশ তারিকেই , ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের লাইনে ফ্যান চলছে; তবুও অনেকে ঘেমে গেছে দেখলাম। এই মহাকাল মন্দির নিয়ে সরকারের খুব ভালো পরিকল্পনা আছে। এখনও অনেক সম্প্রসারণের কাজ চলেছে। মূল মন্দির থেকে বেরিয়ে অনেকটা ফাঁকা চত্বর আছে। তার আসে পাশে অন্তত গোটা দশেক ছোট মন্দির আছে। অনেকে সেই সব মন্দিরেও পূজা দিচ্ছেন। এবার একটু ভেতরের কথা বলি। দশ হাজার লোককে দেড় দুই ঘন্টায় , একটি শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়ে, পদপিষ্ঠ না হয়ে বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা। অর্থাৎ, আপনি প্রায় একশ ফুট দূর থেকে এক ঝলক দেখতে পাবেন। আগেই হলে দাঁড়িয়ে, লাইভ টেলিকাস্ট দেখে জেনে গিয়েছিলাম, তাই বুঝলাম, ঐ তো রূপোর কলসীর নীচে ফুট দুই লম্বা, মহাকাল শিবলিঙ্গ।

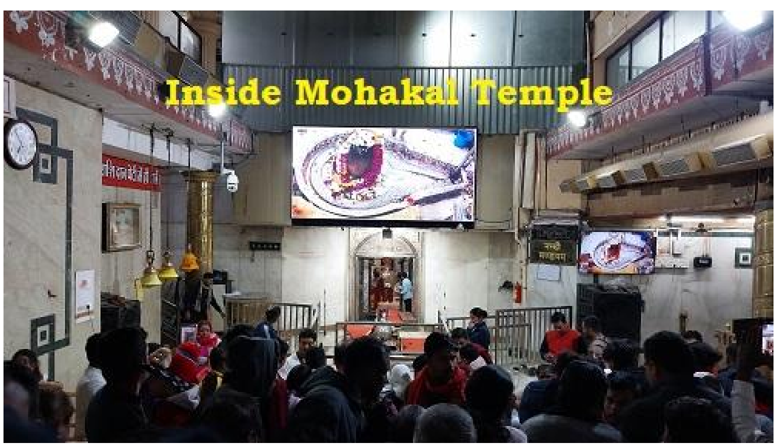


পেঁচানো লাইনে এগোতে গিয়ে এক জায়গায় দেখেছি, দেড় দুশো লোকের বসার মত ধাতব আসন আছে। সেটা আরো দশ ফুট উপরে। তাহলে , রাত তিনটে থেকে একশ দশ ফুট দূর থেকে কিছু মানুষ , সরাসরি ভষ্মারতি দেখেছেন। আর আমার মত হাজার হাজার মানুষ, টিভিতে লাইভ টেলিকাস্ট দেখে, একটু কম পূণ্য পেয়েছি। টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখার মত, এখানেও আমার মনে হয়েছে, টিভিতে অনেক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। প্রায় এক কিমি হেঁটে, মন্দিরের আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে, আমাদের জুতো রাখা সেই সাতাশ নম্বর দোকানে পৌঁছতে, বার চারেক লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে হল। খালি পায়ে পাথুরে রাস্তায় হেঁটে ঘুরে এসেছি, আমার মত কড়া পরা পা না হলে কিন্তু কষ্ট আছে। অবশেষে মন্দির চত্বরের বাইরে , রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দোকানের একটিতে

ঢুকে প্রাতরাশ সারলাম। যেখানে ভোরে টোটো থেকে নেমেছিলাম সেখান থেকেই আবার স্টেশনে ফেরার টোটো ধরলাম। ভাড়া এবারও মাথা পিছু কুড়ি টাকা। উজ্জয়িনী স্টেশনের Retiring room এ ফিরে,গরম জলে স্নান করে আবার বেরোলাম, উজ্জয়িনী শহর দেখতে। ষ্টেশন এর বাইরে রাস্তায় এসে, একটু দরদাম করে পাঁচশ টাকা দিয়ে একটা অটো ভাড়া করলাম। একটু বয়স্ক অটো চালক। ধীরে সুস্থে অটো চালান। সকালের দিকে রাস্তা ফাঁকা ফাঁকা ছিল। প্রথমেই যেন একটু পাড়ার ভেতরের রাস্তা দিয়ে চললাম। বর্ধমান বা কৃষ্ণনগর জেলা শহরের মতই বাড়ী ঘর আর রাস্তা ঘাট। প্রথমে গেলাম, পাশাপাশি কালী আর গনেশ মন্দিরে। যে কোন মন্দিরের সামনে যেমন পূজার ডালার দোকান লাইন দিয়ে থাকে, এখানেও তেমন। আমরা মন্দিরের মূল গেটের বাইরে জুতো খুলে, মন্দির চত্বরে ঢুকলাম। এই জুতো খুলে ঢোকার সময়ই মনে পড়ল, আমার "শাকালু নিতাই দাদার" গল্পে একটা মজার কথা বলতে ভুলে গেছলাম। দাদার প্রায় বছর পঞ্চাশ আগের একটা টোটকা আমি এখনও ভুলিনি। মন্দিরে, কীর্ত্তন এর আসরে বা ঐ রকম কোন জায়গায় সবাই জুতো খুলে ঢোকে। কিছু লোক জুতো চুরি করতে যায়। একটা হয়তো খুব পুরোনো চটি পায়ে দিয়ে গেল। বেরনোর সময়, কোন ভালো জুতো পছন্দ হলে, সেটাই পায়ে দিয়ে বাড়ী চলে যায়। এক্ষেত্রে নিজের জুতো জোড়া পাশাপাশি সাজিয়ে না রেখে একটু দুরে দুরে রাখলে, সাধারনত চোরের চোখে পড়ে না। নিজে তো জানি কোনটা কোথায় রেখেছি; তাই নিজের জুতো খুঁজে বের করতে অসুবিধা হয় না। এই মন্দিরের চত্বরেই প্রথম দেখলাম , দুই দিকে দুটি সিমেন্টের বা পাথরের দীপ জ্বালানোর প্রায় কুড়ি পঁচিশ ফুট উঁচু দীপদানি। এগুলির ঠিক কি নাম আমি জানি না। এক একটিতে শ'খানেক প্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা। ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত কালো পোড়া তেলে একেবারে জবজব করছে। এরকম জিনিস পরে অনেক মন্দিরেই দেখেছি। কাল ভৈরব মন্দিরের চত্বরেরটি সবথেকে উঁচু।

একটি ছেলে ওটার গায়ের থেকে পোড়া তেল ঘসে ওঠাচ্ছে। একটি কর্মচারি ছেলে লাইন ঠিক করা ইত্যাদি করছিল। ওকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ঐ প্রদীপ দেওয়ার হাতের মত বেরিয়ে থাকা পাথরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে উপর উঠে তেল ভরা আর প্রদীপ জ্বালানোর কাজ করা হয়। বিখ্যাত মহাকাল মন্দির চত্বরে এরকম বাতিদান দেখিনি। কালিকা মন্দির আর গনেশ মন্দিরে ঢুকে কয়েকটা ছবি তোলা হল। গনেশ মন্দির চত্বরে গোটা পাঁচ ছয় তাগড়াই গোরু পোষা আছে। একজন টাটকা ঘাসের আটি বিক্রী করছে। লোকে প্রায় লাইন দিয়ে, সুন্দর করে কুচিয়ে রাখা ঘাস, এক বাটি করে কিনে গরুদের খাওয়াচ্ছে। কেনার জন্য QR কোড রাখা আছে। নগদ টাকা না দিয়ে, অনলাইনেই কেনা যায় (? পূণ্য)!

গনেশ মন্দির চত্বরে

কালী মন্দিরের গেটের বাইরে যে সব পূজার ডালা বিক্রির দোকান আছে, সেখানে ফুল, নারকেল, নকুল দানা, মুড়ি, কিসমিসের সাথে লম্বা লম্বা পাতি লেবুর মালা বিক্রী করছে। ওদের কাছে জানা গেল, ওগুলি ১০৮ মুন্ডের মালার প্রতীক; কালী পূজার সামগ্রী। যে দেশে শত শত লিটার দুধ নদীর জলে ঢালা হয়, সেখানে শত শত পাতি লেবু মালা গেঁথে নষ্ট করবে, সে আর বিচিত্র কি!

লেবুর মুন্ডমালা

এবার চললাম, আর এক বিখ্যাত মন্দির, কাল ভৈরব। মিনিট পনের অটো চলেই পৌঁছে গেলাম। সেই একই বন্দোবস্ত। বিরাট মাঠের ভেতর অটো পার্কিং করে ড্রাইভার বললেন, জুতো অটোতে রেখেই মন্দিরের দিকে এগিয়ে যান। অটো থেকে নামার সাথে সাথেই পূজার ডালার দোকানের ছেলে এসে, ডালা কিনে ঢুকতে সাধাসাধি শুরু করলো। আমরা এখানে আর ডালা নিলাম না। অটোর ড্রাইভার নামার সময় বলেছিলেন, এতো ফাঁকা মাঠ দেখছি, দু ঘন্টা পর এখানে মেলার মত ভিড় হয়ে যাবে। প্রথমে কিছুটা পাথুরে রাস্তায়, তারপর লাল কার্পেট বিছানো, বেড়ার মধ্যে দিয়ে আঁকাবাকা রাস্তা ধরে হনহনিয়ে এগিয়ে চললাম। মন্দিরের মূল গেটের কাছে পর্যন্ত বেশ ফাঁকা ফাঁকা রাস্তায় যেতে পারলাম। শেষ পঞ্চাশ ফুট সিঁড়ি ইত্যাদিতে লাইনের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঐ

রাস্তাটুকু পেরিয়ে মন্দিরের দরজায় পৌঁছতে মিনিট পনের লাগল। আমি এক সেকেন্ডে দেখে নিয়েছি, পিতলের একটি মুখমন্ডল, বাঘের মতো বললে কিছুটা কাছাকাছি হয়। আমার স্ত্রী কিছুই দেখতে পারেনি।

কাল ভৈরব মন্দির

লাইনের বাইরে বেরিয়ে ছোট্ট চত্বরে কয়েক মিনিট থেকে মন্দিরের পিছন দিকে বেরনোর রাস্তা ধরে সেই অটো রাখার মাঠে ফিরে এলাম। পরে একটি দলের কাছে শুনলাম, কাল ভৈরব মন্দিরে ঘন্টা তিনেক লাইন দিয়ে পূজা দিয়েছে। এর পরের মন্দির , শিপ্রা নদী পেরিয়ে মঙ্গলনাথ মন্দির। ব্রীজের উপর থেকে শিপ্রা নদী দেখলাম; জল আদৌ বয়ে যাচ্ছে বলে মনে হল না। নদীর অন্য পার থেকেই দেখেছি, মন্দিরের চুড়া অসম্পূর্ণ। মন্দিরে ঢোকার সময় এখানে আবার পান্ডা পুরুতের ছড়াছড়ি। সবাই রঙ্গিন ধুতি পাঞ্জাবি পরে , তিলক কেটে ,পূজা করানোর খদ্দের পেতে ব্যস্ত। মন্দিরের দোতলায় উঠে বোঝা গেল ওদের পেশাতেও স্টেশনের বাইরে যাত্রী ধরতে ব্যস্ত অটো চালকদের মত চাপ আছে। দোতলার বিশাল চাথাল জুড়ে কয়েকশ পণ্ডিত ( পুরুত) আসন পেতে, পূজা করানোর দোকান নিয়ে বসে গেছে। অর্ধেকের বেশি পুরুত খদ্দের পেয়ে গিয়েছে; চলছে জোর পূজা পাঠ। খুব চকচকে একটি করে পিতল বা তামার ঘট , দেখার মত।

তিনতলায় পূজা দেওয়ার চেষ্টা, বেড়ার মধ্যে ঢুকে লাইন। শ'দুই তিন লোক লাইনে দাঁড়িয়ে গুতাগুতি করছে দেখে আমরা নীচে নেমে এলাম। আমার স্ত্রী একটি জায়গায় দানপেটি দেখে, একটা দশ টাকার কয়েন ফেলে দিল। ঐ রাস্তায় সামান্য কিছু এগিয়েই সন্দীপনি আশ্রম। এটি শ্রীকৃষ্ণ আর বলরামের গুরুর বাড়ী। ছোট্ট গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। বেশ ছায়া সুনিবিড় আশ্রম। ভেতরে গোটা দুই তিন ছোট্ট মন্দিরও আছে। এছাড়াও

শ্রীকৃষ্ণের পাঠশালা বলে একটি ছোট্ট মিউজিয়ামও আছে; সেখানে বেদ , রামায়ণ, পুরান ইত্যাদি হিন্দি বা সংস্কৃত বই বিক্রী করছে।

আশ্রমের উল্টো ফুটের একটি তাঁবু টাঙ্গানো দোকানে বসে আমরা চা খেলাম। অটো এবার আবার শহরের ব্যস্ত রাস্তায় ঢুকে চলল আমাদের শেষ দর্শনীয় স্থান, রাম ঘাট। শহরের মধ্যেই খাটাল আছে। রাস্তায় রাস্তায় প্রচুর গরু ঘুরে বেড়াচ্ছে। বারাণসীর রাস্তায় অনেক ষাঁড় ঘোরার বদনাম শুনেছি; সেখানেও এত গোরু ঘুরতে দেখিনি। রামঘাটে নেমে দেখলাম , গোরুর সংখ্যা আরও বেশি। ওখানেও গরুকে খাওয়ানোর জন্য ঘাসের আটি বিক্রী হচ্ছে। আমরাও একটি বিরাট চেহারার গরুকে ঘাস খাওয়ালাম। রাম ঘাটে সন্ধ্যায় আরতী হয়। শিপ্রার দুই পার বাঁধানো, যতদূর চোখ যায়। জলে বেশ কিছু মেশিনে চালানো নৌকা চলছে। অনেক লোক ঘাটে স্নান করছে। জলের কাছে গিয়ে, অসম্ভব নোংরা জল দেখে , জলে হাত দিতেও ইচ্ছা হল না। জলের রং দেখে মনে হচ্ছিল, দুই পারে প্রচুর খাটাল আছে। খাটালের গোবর গোলা জল নদীতে এসে মিশে জলের রং সেই রকম করেছে।

রাম ঘাট

বাঁধানো পারের রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতে থাকলাম। ঘাটের উপর পর পর অনেক পাণ্ডার অফিস, বোর্ড ব্যানার দেখতে দেখতে চললাম। অনেক পান্ডা, বাঁধানো ঘাটে বসে লোকজনকে পূজা পাঠ করাচ্ছে।

তিন চার জায়গায় লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে আমরা একটি বড় রাস্তায় উঠে এলাম। ওখান থেকে মহাকাল মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক টোটো, ডাকাডাকি করছিল। আমরা ঐ রাস্তা ধরে আরও প্রায় আটশ মিটার হেঁটে, বাম দিকে করিডোরে ঢোকার গেটে পেলাম।

এখনও টিকিট কাটতে হচ্ছে না; ভবিষ্যতে টিকিট কাটতে হবে , মনে হল। লাল পাথরে বাঁধানো খুব সুন্দর করিডোর দিয়ে হেঁটে মহাকাল মন্দিরের দিকে এগোলাম। পাশে লাগানো বড় বড় ফুলের গাছ, বেশ যত্ন করে রাখা। অনেক পৌরাণিক কাহিনীর মূর্তি বানিয়ে করিডোরের পাশে পাশে সাজানো। সমুদ্র মন্থন, রাবণের কৈলাশ পর্বত বয়ে নিয়ে চলা, মহাদেবের মূর্তি ঘিরে সপ্তর্ষি এই সব। রাত্রে আলোর নিচে দেখলে এই করিডোর আরও সুন্দর দেখাবে নিশ্চয়ই।

সপ্তর্ষী

একটা জায়গায় এসে আমরা করিডোর ছেড়ে বাজারের মতো বসে যাওয়া ডালার দোকানের দিকে চললাম। সকালে যেখানে প্রাতরাশ করেছিলাম, সেই রকম আর একটা দোকানে ঢুকে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। তারপর সেই চৌরাস্তার মোড় থেকে টোটো ধরে স্টেশনে ফিরে এলাম। কালিদাসের সেই উজ্জয়িনী কেমন ছিল জানিনা। এখন একটা অতি সাধারণ জেলা শহরের থেকে আলাদা কিছু নয়। রাম ঘাটের উল্টো দিকের পারে বিরাট বড় বড় করে লেখা, " ত্রিভুবন বন্দিতা শিপ্রা!" সেই শিপ্রার জল এত নোংরা যে আমি লিখে বোঝাতে পারলাম না। সন্ধ্যের ট্রেন ধরে ইন্দোর চললাম; ১৮ ই ডিসেম্বর ২০২৪ সালে। ২১.১২. ২৪.

শৈব তীর্থে ভ্রমণ ৩

উজ্জয়িনী থেকে  ইন্দোর মাত্র ঘন্টা দেড়েক। তাই অনেকদিন পর স্লিপার ক্লাসের দুটি ব্যার্থ রিজার্ভ করেছিলাম। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ছিল ট্রেনের সময়। মিনিট দশেক দেরী করে এল। ট্রেনে উঠেই দেখলাম, প্রায় সবাই উজ্জয়িনীতে নেমে গেছে। মাত্র কয়েকজন যাত্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। আমাদের যে দুটি সিটে বসার কথা, তার একটিতে একজন বছর তিরিশের ছেলে বসে আছে। দুই পা জুতো সহ সিটের উপর তুলে বসেছে। আজকাল আর এসব দেখলেও না দেখার ভান করি। একে ভদ্র ভাবেই বললাম, জুতো খুলে পা তুলে বসতে। ছেলেটি সাথে সাথেই পা নামিয়ে বসল। এক মিনিট পর উঠে গিয়ে ওর বন্ধুকে বোধহয় বলেছে, কোথা থেকে একটা উজবুক বুড়ো এসেছে, জুতো খুলে পা তুলতে বলছে। ওর বন্ধুটা " দর্শনীয়" লোকটিকে দেখতে এল। আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় থাকি? আমি মুহুর্তের মধ্যে বুঝলাম ওর কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে; বললাম, উজ্জাইন। ও আর কিছু না বলে চলে গেল। আমার স্ত্রী বেশ ভয় পেয়ে গেল। আমাকে আস্তে সাবধান করল। আমি সেরকম ভয় না পেলেও, ওরা আরও পিছনে লাগলে কি করতে পারি ভাবতে থাকলাম। আমার মনে পড়ল, বছর দশ বারো আগে, আমি জেলার শহর থেকে স্লিপার ক্লাশে ফিরছি জেনে, আমার এক বন্ধুপত্নী আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। এখন বুঝতে পারছি, তিনি আমাকে শুধু " ভিখারী" থেকে গেছি ভাবেননি; হয়তো আরও নীচ কোন শ্রেণীর লোক ভেবে নিয়েছিলেন। প্রত্যেক মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই অন্যকে বিচার করে। উনিও হয়তো, তারও আগে, স্লিপার ক্লাশে চাপার এই সব অসভ্যতা দেখে নিয়েছিলেন। ইন্দোর স্টেশনে নেমে একটু বিভ্রান্ত হলাম। এক পুলিশকে পেয়ে জানতে চাইলাম, Retiring room কোন দিকে? সে বলল, ওটা এক নম্বর প্লাটফর্মে, বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে। সে আবার কি খবর? রেলের ফ্লাই ওভারে উঠে সবার পিছন পিছন চললাম। এক অটো রিক্সা চালক উপরে উঠে এসেছে, যাত্রী ধরতে। এক নম্বরে যাব শুনে বলল, অটো নিয়ে যেতে হবে, একশ টাকা ভাড়া। একই স্টেশনের ছয় থেকে এক নম্বর প্লাটফর্মে যেতে একশ টাকা ভাড়া? কেমন সন্দেহ হল। নিচে নেমে গেলাম। বেশ কয়েকজন অটো চালক এসে ডাকাডাকি করছিল। একজন ষাট টাকায় রাজী হলে তার অটোতে উঠলাম। আমাদের তেমন বড় বোঝা থাকে না। দুটি ছোট ট্রলি ব্যাগ। অটো, মিনিট তিন চার চলেই এক নম্বরের বাইরে পৌঁছে দিল। পরে আমরা ২১ তারিক সকালে হাঁটতে বেড়িয়ে দেখেছি, এক নম্বর থেকে ছয় নম্বরে যাওয়ার সুন্দর করিডোর আছে। মসৃন টাইলস বাঁধানো রাস্তা, সাত -আটশ মিটার মত হবে। আমাদের যে ছেলেটি অটো করে এক নম্বর প্লাটফর্মে পৌঁছে দিয়েছিল, তাকেই জিজ্ঞেস করলাম, সরাফা বাজার নিয়ে যাবে কি না। সে বলল যাবে, একশ টাকা ভাড়া। আমরা ওকে আধ ঘন্টা পর আসতে বললাম। ও যেহেতু ঐ জায়গার নয়, তাই বাইরে থাকবে বলল। ফোন নম্বর দিয়ে চলে গেল। আমরা ঠিক সাড়ে আটটায় নীচে নেমে ওকে ফোন করলাম। বার দুই তিন ফোনাফুনি চলল। সম্ভবত ও এর মধ্যে অন্য যাত্রী নিয়ে অন্য দিকে চলে গেছে। আমরা যে মিনিট কুড়ি দাঁড়িয়ে থাকলাম সেই সময়, অন্তত গোটা পাঁচেক অটো আর একটি টোটো ( ওদিকে সবাই বলে , ই-রিক্সা) আমাদের সামনে থেমে, জানতে চাইল, কোথায় যাব? আমরা সকলকেই, গাড়ী আসছে বলে , চলে যেতে বললাম। ই-রিক্সা নিয়ে এসেছিলেন একজন শাড়ী পরিহিতা মহিলা, সাথে বোধহয় তাঁর কন্যা। ওরা আশি টাকায় নিয়ে যাবে, বলেছিল। ঠিক সেই সময় আমাদের সেই ছেলেটি অটো নিয়ে এসে গেল। স্টেশন থেকে সরাফা

বাজার মিনিট দশ বারো লাগল। একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে, বাম দিকে দেখাল। একটি দোকানে উজ্জ্বল আলো দেখিয়ে বলল, ঐ জায়গা থেকে ডান দিকে চলে যান। সেই ডান দিকে ঘুরেই দেখতে পেলাম, সরু গলির দুই পাশে সারি সারি দোকানের আলো। এই সরাফা বাজারের খবর জেনেছি , অনিন্দ্য বাবুর ইউ টিউব ভিডিও দেখে। তাই গোটা গলিটাই যেন আমার চেনা। এই সরাফা বাজার ইন্দোরের একটি দর্শনীয় স্থান। আসল দোকানগুলি সব সোনার গয়নার। রাত সাড়ে আটটার পর , ঐ সোনার দোকান সব বন্ধ হলে, রাস্তার দুই পাশে লাইন দিয়ে দোকান বসে যায়; সবই যাকে বলে, ফাষ্ট ফুড এর। আমরা গোটা গলিটা হেঁটে ঘুরে দেখলাম, বেশ কিছু পানের দোকান , কুলপি আইস ক্রিম, মিষ্টির দোকানও বেশ কিছু আছে। এছাড়া এখন কিছু চাবির রিং ইত্যাদি মেমেন্টোর দোকানও বসেছে। আমরা মূলত দেখার জন্যই ওখানে গেছলাম। তবুও কিছুতো খেতেই হয়। আমরা কিছু খাদ্য কিছু কিছু খেয়ে দেখলাম; সাধারনত যেগুলি কলকাতায় দেখা যায় না। প্রথমেই খেলাম, ডাবের স্পেশাল লস্যি, বা ঘোল বলা যায়। ডাবের জল আর শাঁস মিক্সিতে বেশ করে ঘুলিয়ে নেওয়া হয়। একটা সাদা লস্যি মত তৈরী হয়। ডাবের জল আর শাঁস দুই এর স্বাদ পাওয়া যায়।

ডাবের লস্যি

 কুলপি বলল, পঞ্চাশ টাকা থেকে ছয়শ টাকা দামেরও আছে। কুলপি কিন্তু আধুনিক ডিপ ফ্রিজে রাখা। আসল আকর্ষণ কিন্তু বিক্রেতা। দুজন একই রকম চেহারা, একই পোশাক, আর কয়েক কেজি সোনালী গয়না পরে কুলপি বিক্রী করছে। ওদের সাথে ছবি তোলার জন্যই লোকে কুলপি কিনছে। আমরাও কিনলাম, ছবি তোলা হল। সেই ছবি দেখে দীনবন্ধুবাবু মন্তব্য করেছেন, “আপনি তো সোনার খনিতে পৌঁছে গেছেন!” আজকাল প্রতিদিনই কিছু লোক ঐ বাজারে ছবি তুলে বা ভিডিও করে ইউ টিউব-এ দেয়; তাতে এদের বেশ প্রচারও হয়ে যায়। অনেক কটা দোকানে ব্যানার ফেস্টুন দেখলাম, লিখেছে,” ইউ টিউব খ্যাত!” ঠিকই, আমিও তো ঐ ইউ টিউব দেখেই এই বাজারের খবর জেনেছি। একটি বেশ ছড়ানো মিষ্টির দোকানে, আতার পায়েস দেখে, এক বাটি কিনে, দুজনে খেলাম। এই “ আতার পায়েসের” কথা বেশ কিছু বছর আগে, টেনিদার গল্পে পড়েছি। সেটা ছিল, দেওঘরের বিখ্যাত “ আতার পায়েস!” এরা অবশ্য পায়েস বলেছিল না; হিন্দিতে অন্য কোনো নাম বলেছিল ( সিতাফল রাবড়ী)।

আতার পায়েস

সোজা গলিটা দেড়শ মিটার মত হবে; এক মাথায় গিয়ে দেখি, বাঁ দিকে আর একটা তস্য গলিতেও ঐ রকমের দোকান চলে গেছে অনেক দূর। আমরা ঐ গলিতে বেশিদূর আর এগোলাম না। রাত সাড়ে দশটা বাজলে, ফেরার রাস্তা ধরলাম। আবার একটা অটো রিক্সা নিয়ে স্টেশনে ফিরে এলাম। ঐ বাজার প্রায় রাত চারটে পর্যন্ত চলে। খাদ্য রসিকদের জন্য বেশ মজার জায়গা। আর একটি আরও সুন্দর বাজারে গেছলাম, দু'দিন পর। ইন্দোরের বিখ্যাত , " ছাপান্ন বাজার!" আর একটা নতুন খাওয়ার খেয়েছিলাম, পেয়ারার সরবত। তেমন কিছু সুখাদ্য নয়। এবার আমাদের পাঁচ রাত বাইরে থাকার কথা; তার মধ্যে চার রাত রেলের Retiring room . ইন্দোরের প্রথম রাত পাঁচ নম্বর ঘরে, খারাপ নয়। পরদিন সকালে আটটায় বেরিয়ে আমরা যাব, ওঙ্কারেশ্বর।

ওঙ্কারেশ্বর নিয়ে লেখাটা বেশ বড় হবে, তাই ওটা নিয়ে পরে লিখছি।

আমরা 20 ডিসেম্বর বিকেলেই ফিরে , সন্ধ্যায় ছাপান্ন বাজার বা "৫৬ দুকান" ঘুরে নেব, সেরকম ভেবেছিলাম। কিন্তু ওঙ্কারেশ্বর থেকে সোজা না ফিরে, মহেশ্বর আর মান্ডু হয়ে ফেরার জন্য, সন্ধ্যা আটটা বেজে গেল। এতোটা গাড়ীতে ঘুরে, দুটি ফোর্ট দেখে আর ইন্দরে রাত্রে বেরোতে চাইলাম না। আমি স্টেশনের বাইরে একটি অটোর সাথে কথা বলে নিয়েছিলাম, সকালে  ঘন্টা তিনেক ঘোরাবে, পাঁচশ টাকা নেবে। ওর ফোন নম্বর দিয়েছিল। বছর পঁচিশ এর ছেলে, রাহুল। ভদ্র ছেলে, আমাদের ভালো ভাবেই ঘুরিয়েছে। কিন্তু সকালে ওর মা ফোন ধরে ঘুম থেকে ডেকে উঠিয়েছে, তাই আসতে প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেল। প্রথমেই গেলাম ছাপান্ন বাজার। সকালে রাস্তা ফাঁকা ছিল, তাই দশ মিনিট মত লাগল। এই ছাপান্ন বাজারও একটি খাওয়ার দোকানের বাজার। খাদ্য রসিকদের জন্য স্বর্গরাজ্যের সমান। এখানে ছাপান্নটি দোকান আছে। অত্যন্ত সাজানো গোছানো, আধুনিক বাজার। একশ মিটার কি একটু বেশী লম্বা হবে। চওড়া আমাদের সেন্টাল এভিনিউ এর মত। কিন্তু ভেতরে কোন যানবাহন চলাচল করতে পারে না। মাঝ খানে বিরাট সাজানো, পার্কের বেঞ্চে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা। প্রায় সব দোকানেই ভেতরেও বসার কিছু চেয়ার টেবিল আছে। আমরা একটি দোকানের ভেতরে বসেই পোহার সাথে জিলিপি খেলাম। ঐ সকাল পৌনে নয়টার আগে মাত্র গোটা সাত- আট দোকান খুলেছিল। বেশিরভাগ খদ্দেরই মনে হল, ট্যুরিস্ট। প্রায় সবাই, বাইরে দাঁড়িয়ে বা বেঞ্চে বসে খাচ্ছে। ডাস্ট বিন, না কি ঝকঝকে বসার জায়গা, তাই বুঝতে আমার সময় লাগল। আমরা কিছু ছবি তুলে ফিরে এলাম। সন্ধ্যার পর ঐ ছাপ্পান্ন বাজার যে একটা মেলার মত অবস্থায় থাকে, বেশ বোঝা যায়।

রাহুল আমাদের নিয়ে চলল, লালবাগ প্যালেস। একটা ছোট খাট ময়দানের ভেতর দিয়ে রাস্তা। মাঠে ছেলেরা খেলছে। রাস্তা ধরে দলে দলে মানুষ প্রাতঃভ্রমণ করতে চলেছে। অনেকেই জোরে জোরে হাততালি দিয়ে "জয় মহাকাল" বলে বলে হাঁটছে। কিন্তু প্যালেসের দরজা তখনও খোলেনি, বোধহয় দশটার পর খোলে। আমাদের মত আরও কিছু ট্যুরিস্ট গেট বন্ধ দেখে ফিরে চলল। গেটের উল্টো দিকে গোটা তিনেক বিশাল তেঁতুল গাছের ডালে ডালে ঝুলছে, শত শত বাদুড়; ছবি তুলে অটোতে উঠলাম।

এরপর অন্নপূর্ণা মন্দির। বেশ চকচকে সাদা মার্বেল পাথরের মন্দির। দুই চার জন করে দর্শনার্থী ঘুরে যাচ্ছে; আমরাও দর্শন করে নিলাম। ঐ মন্দির চত্বরে আরও গোটা তিনেক মন্দির দেখে, এক জায়গায় মশলা চা বিক্রী করছে দেখে দাঁড়ালাম। ছোট কাগজের কাপে চা খেয়ে দেখতে দিল। চায়ের কিছু নেই, আদা, গোলমরিচ গুঁড়ো ইত্যাদির পাঁচন। ঠাণ্ডা লেগে গলা খুশ খুশ করলে ভালো লাগবে; তাই আমিও একটা প্যাকেট কিনে নিলাম। শহরের মধ্যেই, একটু শুরু রাস্তার উপর কাঁচ মন্দির। আমরা নেমে ঢুকতে গেলে, গেটে দাঁড়িয়ে এক বয়স্ক মানুষ

বললেন, সাড়ে দশটায় খুলবে। এখন শুধু জৈন ধর্মের লোকেরা পূজা দিতে ঢুকতে পারে। ওখান থেকে সামনেই রাজোয়ারা প্যালেস। বাইরে থেকে গেট দেখে বোঝার উপায় নেই। এটাও মহারানী “দেবী অহল্যাবাই” এর একটি বাড়ী। পুরোনো কাঠের থামগুলি সমীহ জাগায়।

দোতলার মিউজিয়াম দেখার জন্য পনের টাকার টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। আমরা দোতলায় ওঠার পর কর্মচারীরা আলো জ্বালিয়ে দিল। ওদিকে আসলে কোলকাতার থেকে প্রায় চল্লিশ- পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর সূর্য ওঠে; তাই সবই মনে হয় দেরী করে খুলছে। আমরা এগারোটার মধ্যে সব ঘুরে নিয়েছি। বাকী রইল শুধু “ রিজিওনাল পার্ক।” আমাদের সুচিতে না থাকলেও, সময় আছে বলেই চললাম দেখতে। এটি শহরের ভেতর একটি সাজানো গোছানো বিরাট পার্ক। অনেক বড় বড় গাছ আছে। ভেতরের রাস্তা ঝকঝকে টাইলস বাঁধানো। ফুল গাছ প্রায় নেই। প্রায় আধা কিমি ভেতর ঢুকলে একটি বিশাল ঝিল আছে। বোটিং হয়, আমাদের খোঁজ নেওয়ার সময় ছিল না। ঝিলে বেশ কিছু বড় বড় হাঁস ভাসতে দেখে ছবি তোলা হল। ওগুলি পোষা হাঁস কি না বুঝলাম না। পঁচিশ টাকার টিকিট কেটে ঢোকার মত পার্ক নয়।

রাহুল আমাদের স্টেশনের কাছে একটি ভালো খাওয়ার রেস্টুরেন্টে নামিয়ে রেখে চলে গেল। আমাদের খাওয়া হলে, রাতের জন্য চারটি তাওয়া রুটি বেঁধে নিলাম। ফোন করতেই রাহুল এসে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিল। ভালো ছেলে ( মোবাইল নং- ৮৬২৯৯০০৬২৫)। আমার কাছে বেশী টাকা ক্যাশ ছিল না, UPI তে ওর পাঁচশ টাকা দিয়ে দিলাম। ওদিকে UPI খুব চলে; তিরিশ টাকা, চল্লিশ টাকাতো অনেকবার দিয়েছি। আমাদের ট্রেনের নাম Indore Prayagraj Express হলেও, ওটা ছেড়ে আসে, একুশ কিমি আগের , ডাঃ আম্বেদকর নগর ষ্টেশন থেকে। পৌনে বারোটার ট্রেন, মিনিট দশেক দেরী করে এল। পরদিন ভোরে মিনিট দশেক আগেই প্রয়াগরাজ স্টেশনে পৌঁছে গেল। আবার আর এক তীর্থে পৌঁছে গেলাম। চার মাস আগে টিকিট কাটার সময় জানতামই না যে, আমরা পৌঁছনোর দিন দশেক আগেই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওখানে মহাকুম্ভ মেলার উদ্বোধন করবেন। কপালে পূণ্য থাকলে না নিয়ে যাবো কোথায়? বলব সে সব গল্প। তার আগে অন্য তিন জায়গার কথা বলে নিতে হবে।

২৩.১২.২৪.

আজ সকাল সকাল বাড়ী ফিরে এলাম। বাকী কথা এদিকে বসেই লিখতে হবে। আজ শুরু করলাম, মাদুরাই এর দিকের হোটেল এর খোঁজ খবর।

শৈব তীর্থে 4

ইন্দোরের একটি সংস্থার গাড়ি আমাদের ওঙ্কারেশ্বর নিয়ে যাবে, এক রাত ওখানে থেকে পরদিন বিকেলে ফিরে আসার কথা। রাত্রেই ড্রাইভার এর নম্বরে ফোন করে বলে দিলাম, সকাল আটটায় বেরিয়ে যাব। কিন্তু স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্মে Retiring room এ থাকছি, ব্যপারটা বোঝাতে সময় লাগল। ওরা হোটেল বোঝে, Retiring room ব্যপারটা ঠিক বোঝে না। যাই হোক, ড্রাইভার সকালে আটটার পাঁচ মিনিট আগেই ফোন করে জানাল, এসে গেছে। আমাদের এই গাড়ী নিয়ে বেরোনো, এই যাত্রায় এটিই প্রথম। যে কোন ভ্রমণে সবথেকে বেশি খরচ হয় গাড়ীর পিছনে। এবার তো আমরা হোটেলও মাত্র এক রাতের জন্য নিয়েছি। এবারের গাড়ীর এই সংস্থার মালিকের সাথে আমার দেখা হয়নি। সবই Whats App আর ফোনে কথা বলে ঠিক করা।( Indore Car, Javed : 6262026262) এই গাড়ীর যাত্রায় আমরা বার তিন চার নতুন করে প্রোগ্রাম ঠিক করেছি। আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা রত্ন, শ্রী সুব্রত কুমার বুড়াই কদিন আগেই জেনেছেন যে আমি ইন্দোর যাচ্ছি। ওনার প্রিয় ছাত্র, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ এখন ইন্দোরের IIT তে অধ্যাপক। বুড়াই বাবুর খুবই ইচ্ছা, আমরা যেন তাঁর প্রিয় নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে গিয়ে থাকি। আমাদের ঠাসা প্রোগ্রামে সেটা সম্ভব নয়, অনেক কষ্টে বোঝাতে পেরেছি। কিন্তু যেমন শিক্ষক, তেমনি তাঁর ছাত্র। আমি উজ্জয়িনী পৌঁছনো থেকেই ডক্টর পাত্র আমার খোঁজ খবর নিতে শুরু করেছেন। ওনার কেনা নতুন বাড়ী আমাদের রাস্তা থেকে একটু ভেতরে হলেও, Indore IIT আমাদের যাত্রা পথের পাশেই। তাই অন্তত IIT তে ঢুকে ওনার ওখানে Breakfast করে যেতে বললেন। আমরা গাড়ীতে উঠে ড্রাইভারকে সেই মত জানালাম। ড্রাইভার শুধু বলল, বেশী দেরী করবেন না, রাস্তা খারাপ, সময় লাগবে। রাস্তার অনেক জায়গায় নতুন ফ্লাইওভার তৈরী হচ্ছে, তাই খুব স্বচ্ছন্দে যাওয়া যাচ্ছিল না। তবুও আমরাই আগে IIT এর গেটে পৌঁছে গেলাম । ডক্টর পাত্র ওনার এক ছাত্রকে ফোনে বলে দিলেন, আমাদের সাথে দেখা করে, ক্যান্টিনে নিয়ে যেতে। গেটের গার্ডেকে আমার ফোনেই ডক্টর পাত্র বলে দিলেন।

With Dr Patra at IIT Indore

সুন্দর সাজানো বিরাট ক্যাম্পাস এর ভেতরে ঢুকে, গাড়ী একেবারে সেন্ট্রাল ক্যান্টিন এর সামনে দাঁড়াল। ছাত্রটি এসে আমাদের ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে, খেয়ে নিতে বলল। আমি আগে গোটা দুই IIT এর ক্যান্টিন, অতিথি ভবন ইত্যাদিতে খেয়েছি। এদের বিশাল তিন তলা জুড়ে ক্যান্টিন। এক এক তলায় হাজার খানেক লোকের বসার ব্যবস্থা। আমরা খাওয়ার পর ওদের গবেষণাগারের দিকে এগিয়ে গেলাম। এই ছাত্রটি এখন ডক্টর পাত্রর কাছে, PHD করছে; মুম্বাই এর ছেলে। আমার ছেলে মেয়ের থেকেও অনেক ছোট। আমার আবার মুম্বই এর লোকেদের উপর একটা দুর্বলতা আছে। আমার ভীষণ বিপদের সময় মুম্বই এর লোকেদের কাছে যা সাহায্য পেয়েছি, সারা জীবন ওদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। এদের গবেষণার বিষয় Astro Physics! ডক্টর পাত্র এই বিষয়ের এক বিশাল পণ্ডিত। কিন্তু মানুষটি একেবারেই মাটির মানুষ। ওনার টেবিলে, স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত রাজযোগ বইটি দেখলাম। উনি পড়ছেন। ওনার গবেষণাগারে মিনিট পনের কুড়ি থাকলাম। যে কোন অতি বিখ্যাত মন্দিরের গর্ভ গৃহে থাকার থেকে অনেক বেশী গর্বের ব্যাপার আমার কাছে। ওনারা যে সকল বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন, আমাদের মত বারো ক্লাশ পর্যন্ত ফিজিক্স পড়া লোকের কাছে সেটা ‘ টিভিতে প্রশান্ত মহাসাগরের ছবি দেখার মত!’ যে সকল দু'দিনের বৈরাগী এখন ভাতকে বলে অন্ন, তারা আবার ঐ রাজযোগ পড়া নিয়ে কোন “ আনন্দবাজারী” মন্তব্য করেন কে জানে! ডক্টর পাত্রই বললেন, এদিকে এসেছেন যখন, মহেশ্বরও পারলে ঘুরে যান। আমরা ওনার বাড়ীতে ফেরার পথে ঢুকতে পারি, এরকম বলে , ওঙ্কারেশ্বর -এর দিকে রওনা দিলাম। মহাকাশ, মহাবিশ্ব নিয়ে যেটুকু আভাস ডক্টর পাত্র আমাদের দিয়েছেন, তাই নিয়ে চিন্তা করার সামর্থ আমার নেই। ও নিয়ে আমাকে কিছু লিখতে বলবেন না। আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের ছবি দেখেছি, মহা সমূদ্র নিয়ে কিছু লিখতে পারব না।

এবার দিন সাতেকের যাত্রায় আমি একবারই অসুস্থ হয়ে পড়েছি, মাত্র আধ ঘন্টার জন্য। অনেকদিন পরে গাড়ীতে মোশন সিকনেস হল। হঠাৎ গা গুলিয়ে বমি পেল। ড্রাইভার গাড়ী থামাতে থামাতে কোন রকমে জানালার কাঁচ নামিয়ে বমি করলাম। নেমে চোখে মুখে জল দিয়ে আবার চললাম। মিনিট পনের কুড়ির মধ্যে পৌঁছে গেলাম, ওমকারেশ্বর। বড় রাস্তা থেকে নদীর দিকে যাওয়ার রাস্তায় গাড়ী ঢুকতে দিচ্ছে না। হোটেলে ফোন করার পর, হোটেলের ম্যানেজার এসে ট্রাফিক পুলিশকে বোঝাল যে, ওর হোটেলে গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা আছে; তারপর গাড়ী ঢুকল সেই সরু রাস্তায়। সত্যিই বেশ সরু রাস্তা; বড় অটো দুটি যাতায়াত করতে পারে। তাতেই জট পাকিয়ে ফেলেছে। অটো চলার রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে ঢুকলাম। এটা যে মন্দিরের দিকে যাওয়ার রাস্তা সেটা দুই পাশের দোকানপাট দেখলেই বেশ বোঝা যায়। ঐ রাস্তা ধরেই " ঝুলা পুল" আর সোজা অমলেশ্বর মন্দির যেতে হবে। আমাদের হোটেল, " গুরুকৃপা ইন" , ঝুলা পুলে ওঠার ঠিক আগেই, ডান দিকে, একটু নদীর দিকে নেমে। গাড়ী আমাদের নামিয়ে, আরও নীচে নেমে গেল, হোটেলের পার্কিংয়ে। আমাদের হোটেলটি বেশ ভালো জায়গায়। পিছনের জানালা দিয়ে নর্মদা নদী দেখা যায়। একটু বাম দিকে তাকালে ঝুলা পুল, আর তার ওদিকে ওঙ্কারেশ্বর মন্দির দেখা যায়।

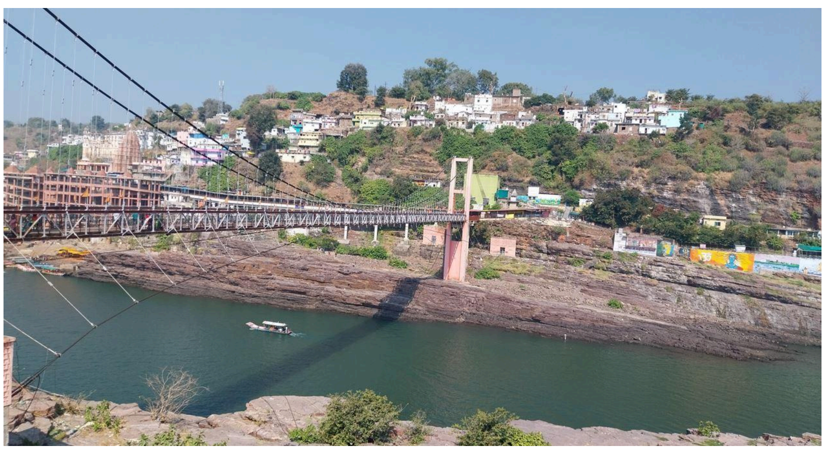

সন্ধ্যার পর পুল, মন্দির, ওপারের গোটা দ্বীপ আলোয় আলোয় সাজানো।

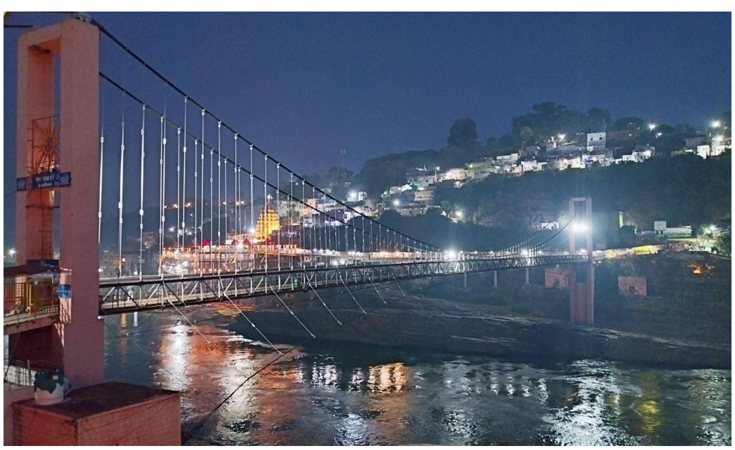

একটিই সমস্যা; সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার আগে পর্যন্ত নদীতে মেশিন লাগানো নৌকা চলতেই থাকে; সারাদিন ঘরঘর শব্দ। আমরা হোটেলে ব্যাগ পত্র রেখে, এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঝুলা পুল পেরিয়ে মন্দিরের দিকে চলার সময়, অসংখ্য মহিলারা পূজার ডালা কিনে নিয়ে যেতে সাধাসাধি করতে থাকল। আর আছে, ফটো তুলে, সাথে সাথেই প্রিন্ট করে দেওয়ার চার -পাঁচ জন লোক। আমরা ফেরার রাস্তা ধরা, কপালে টিপ দেওয়া দু-একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, মন্দিরে ভিড় কেমন? কেউ কেউ বলল, মন্দির এখন বন্ধ, তিনটায় খুলবে। বেড়ার মধ্যে ঢুকে দেখলাম, লাইন ফাঁকা। ওদিকের ডালার দোকানের লোকেরা বলল, একটা দশের পর আবার খুলবে। আমরা একটা ডালা কিনে, জুতো জমা রেখে, বেড়ার মধ্যে ঢুকে গেলাম। বেশ কিছুটা এগিয়ে দেখি এর মধ্যে লাইন পড়ে গেছে। মনে ভাবলাম, একটা তো বাজেই, না হয় এক ঘন্টা লাইন দিলাম। বিখ্যাত মন্দিরের লাইন ঠিক কি বস্তু, এখানেই ঠিক বুঝলাম। ১৯ শ ডিসেম্বর, আমি তো শুধুই একটা গরম জামা গায়ে বেড়িয়েছি। লাইনে অনেক ফ্যান চলছে; তবুও কয়েকজন গরমে অস্থির হয়ে বসেই পড়ল। গুতাগুটি করে লাইন এগিয়ে চলল অতি ধীর গতিতে। শেষ একশ মিটার যেতে দুই ঘন্টা লাগল। অনেক আগেই দেখেছি, পাশের বেড়াটি ভিআইপি লাইন।

Lt line is VIP, Rt one general

ততক্ষণে আমাদেরও পিছনে কয়েকশ লোক দাঁড়িয়ে আছে; পিছন ফিরে বেরোতেই হয়তো এক ঘন্টা লাগবে। তার মধ্যেও দুই একজন মহিলা লাইন ভেঙ্গে, গুতিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছে, ঝগড়া লেগে যাচ্ছে। শেষ কুড়ি ফুট বাকি থাকতে দেখলাম, অন্য দিক থেকে আরও দুটি লাইন এক জায়গায় এনে মিলিয়ে দিয়েছে। অতি সংকীর্ণ জায়গায় এক বিশ্রী গুতাগুতি কান্ড। শেষ দশ ফুট আগে,বাম দিকের থেকে ভিআইপি লাইনও এই হট্টগোলে মিশেছে। এখানেও শিব লিঙ্গের সামনে এক দেড় সেকেন্ড দাঁড়ানোর ব্যবস্থা। দাঁড়িয়ে গেলে পায়ের তলায় পড়ার সম্ভাবনা। এখানে শিব লিঙ্গের দু'ফুট দূরে কাঁচ দিয়ে ঘেরা; তার বাইরে দিয়ে দর্শন করে নিতে হবে। এই শিব লিঙ্গের উচ্চতা সাত আট ইঞ্চি হবে সম্ভবত। আমাদের হোটেলে ফিরতে প্রায় সাড়ে তিনটা বাজল। পূজার প্রসাদ হোটেলে রেখে, খেতে বেরোলাম। মন্দিরে ঘন্টা আড়াই লড়াই করে একটি উপকার হয়েছে; আমার সেই গা গোলানো ভাব কেটে গিয়ে বেশ খিদে পেয়ে গেল। হোটেলে ফিরে এক ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার বের হলাম। সেই অটোর জটলায় পৌঁছে খোঁজ খবর নিলাম, আদি শঙ্কর এর মূর্তি দেখতে কত টাকা ভাড়া, কত সময় লাগবে, এসব।

বুঝলাম, সকালে যাওয়াই ভালো। নৌকার মাঝিও লোক ধরতে দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম ভাড়া; মাথা পিছু তিনশ টাকা। নিচে ঘাটের কাছে যেতেই অন্য নৌকার মাঝিরা প্রায় টানাটানি করে, একটি পাঁচ ছয় জনের দলের সাথে আমাদের দু' জনকেও তুলে নিল। আমাদের ভাড়া মাথা পিছু একশ' টাকা। আগে যারা উঠেছে তাদের কত করে নিয়েছে ,আমরা জানি না। শুধু আমাকে আস্তে করে বলল, তোমরা কত ভাড়া দিচ্ছ ওদের বোলো না। বেড়ানোর জায়গায় এসব চলতেই থাকে। যার কাছে যা পারে নিয়ে নেয়। সূর্য ডোবার মুখে নৌকা ছাড়ল। তখনও অন্তত গোটা পনের নৌকা, ঘড়ঘড় শব্দ করে শব্দ দূষণ করে চলেছে। সব মিলে মিনিট পনের কুড়ি নৌকা বিহার। দুই পাড়ে আলো জ্বলে উঠলো। জলে আলোর ছায়া। এর মধ্যে চলল আমাদেরও মোবাইলে ভিডিও তোলা। দলের লোকগুলি নামল ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের ঘাটে। আমাদের কথা মত নামাল উল্টো দিকের, অমলেশ্বর মন্দিরের ঘাটে। এখানে নদী দেড় দু'শ ফুট মাত্র চওড়া। আমরা যেখানে ঘাটে নামতে চাইলাম, সেখানে তখন জোর বাদ্যি বাজনা বাজিয়ে আরতি চলছে। প্রতিদিনই হয় কি না, জানিনা। ওদিকে সবই শিব ঠাকুর আর নর্মদা মায়ের পূজা। এরা দেখলাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম গানও করল। এখানে নদী থেকে উপরের মন্দির প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হল। এদিকেও ঘাটের থেকে মন্দির পর্যন্ত প্রচুর ডালার দোকান। এই অমলেশ্বর বা মামলেশ্বর মন্দির চত্বরে দুটি প্রায় একই রকম মন্দির; পুরনো পাথরের তৈরি।

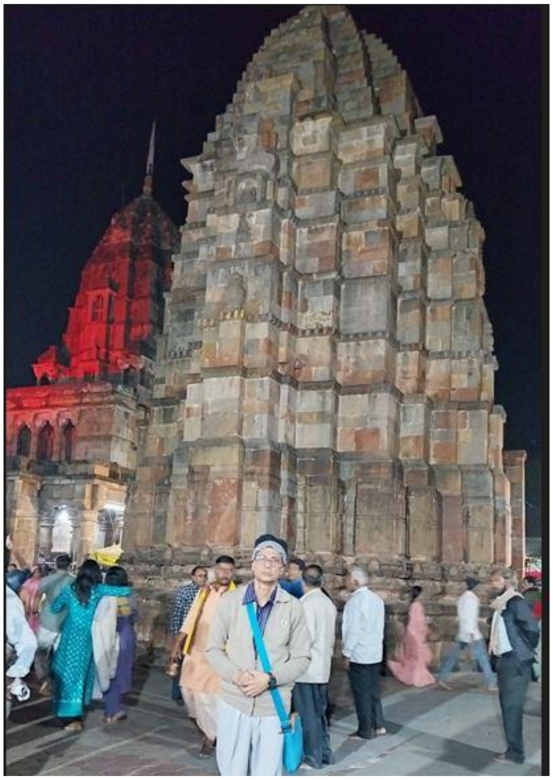

সামনে পিছনে অনেকটা খোলা, পাথর বাঁধানো চত্বর আছে। মন্দিরে ঢোকার আগে, পঞ্চাশ ফুট মত, স্টেনলেস স্টিলের বেড়া দিয়ে লাইন করার ব্যবস্থা। সন্ধ্যায় ঐ পঞ্চাশ ফুটের বাইরে পর্যন্ত লাইন। আমরা ঢোকার চেষ্টা করলাম না। আর একটু উপরে উঠে ফেরার রাস্তা ধরলাম। রাস্তার দুই ধারে সাজানো হরেক রকমের দোকান তখন সবই খোলা। আমরা সোজা সেই দুপুরের খাবারের দোকানে গিয়ে, রাতের জন্য রুটি কিনে নিলাম। এদিকে সব জায়গায়ই তন্দুরী রুটি বেশী চলে। তাওয়া রুটি না বললে, ওরা আমাদের মত সাধারণ রুটি বোঝে না। রাত্রে আটটা সাড়ে আটটার পর আর নৌকার ঘরঘর শব্দ শুনিনি। ভোরে আমরা উঠেছি সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। কিন্তু সূর্য উঠল পৌনে সাতটা নাগাদ। আমরা ছয়টার দিকে যখন সেই বাজারের মধ্যে দিয়ে অমলেশ্বর মন্দিরের দিকে হেঁটে চলেছি, তখন রাস্তা বেশ অন্ধকার। আমরা ঝুলা পুল ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে ডান দিকে ঘুরে দেখলাম, একটা ব্রীজের উপর ওঠার রাস্তা। ঐ ব্রীজটা নদী পের হয় না। এদিকেই একটা করিডোর মত করেছে। ওটার উপর থেকে উল্টো পারের মন্দির, ধর্মশালা, ঘরবাড়ির আলোকিত দৃশ্য তো দেখাই যায়, তারও উপরে দেখা যায়, ষাট ফুট উঁচু আদি শঙ্করাচার্যের মূর্তি। আমরা ঐ করিডোর ধরে এগিয়ে, অমলেশ্বর মন্দিরের সামনের রাস্তায় পৌঁছে গেলাম। সেই অন্ধকার থেকেই কিছু কিছু ডালার দোকান বসে গেছে। মন্দির চত্বরে পৌঁছতেই এক পূজারী পান্ডা আমাদের ধরে ফেলল। আমরাই ওর প্রথম শিকার। ভালো শিকারী। একশ একান্ন টাকা দক্ষিণা নিয়ে পূজা করিয়ে দিতে রাজী হল। বেশ ফাঁকা ফাঁকা মন্দিরে ঢুকে পূজা দিয়ে বেরিয়ে, বাইরের একটি ছোট্ট শিব লিঙ্গের সামনে দুজনকে বসিয়ে, একটু মন্ত্র পাঠ করিয়ে, হরে দরে পাঁচশ দশ টাকা নিয়ে নিল। আসলে আগের দুপুরের তিন ঘন্টার গুতাগুতি মনে ছিল বলেই, এই সুস্থ স্বাভাবিক পূজা দিয়ে ঐ টাকাটা দিতে ইচ্ছাই হল। এই মিনিট দশেকেই কিন্তু মন্দিরে ঢোকার লম্বা লাইন শুরু হয়েছে। ঐ পাণ্ডার কাছেই জেনে নিয়ে, পুরাতন ব্রীজের

দিকে চললাম। রাস্তায় একটি বড় বিষ্ণু মন্দির দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের আগে মাত্র দুজন যাত্রী। আমার স্ত্রী মন্দিরে উঠে গেলে আমি নিচের চত্বরে ঘুরে দুই একটা ছবি তোলার চেষ্টা করলাম। সেই সময় এক ভদ্রলোক এসে তুলসী মঞ্চের মত বাঁধানো জায়গায় ফুল জল দিচ্ছিলেন। বছর পঞ্চান্ন বয়সের প্যান্ট শার্ট পরা ভদ্রলোক। ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন দিক দিয়ে ব্রীজে যেতে পারব; আর ঐ শঙ্করাচার্য মূর্তির কাছে যাওয়ার রাস্তা কোন দিকে? একেই বলে যোগাযোগ। ভদ্রলোক বললেন, শুধু ঐ মূর্তি দেখে ফিরতে এক ঘন্টাতো লাগবেই, আর কোনোদিন এদিকে আসা হবে কি না, এবারই গোটা দ্বীপ একটা পরিক্রমা করে নাও। ঘন্টা দুই আড়াই লাগবে। শীতের সকালে হাঁটতে কষ্টও হবে না। বলে দিলেন, ব্রীজ পেরিয়ে একটু নামলেই সাত আট ফুট চওড়া পাথর বাঁধানো রাস্তা পেয়ে যাবেন। গাইড লাগবে কি না বলায় একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, এখানে সবাই " লুটনে কে লিয়ে" বসে আছে। কিচ্ছু লাগবে না, চলে যাও। ওনার কথা মত এগিয়ে সুন্দর পরিক্রমা হল।

এই পরিক্রমার কথা আমি কোন ইউটিউব ভিডিওতে দেখিনি। স্বাভাবিক ভাবেই, সেই সকালে দুপারের মন্দিরে হাজার পাঁচেক লোকের ভিড় থাকলেও, আমরা বোধহয় জন কুড়ি লোককে পরিক্রমা করতে দেখেছি। সেই পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে একটি চায়ের দোকান দেখে বসে চা খেলাম। সেই দোকানের পিছনে তিন দিক আর উপরে ত্রিপল ঘেরা একটি জায়গায় , জন দশ বারো বয়স্ক মানুষ, স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে, পূজা পাঠ করতে বসে গেছেন। দোকানদার বলেছিল, ওরা নর্মদা পরিক্রমায় বেড়িয়েছেন। এরকম দিন দুই তিন থেকে আবার এগিয়ে যাবেন। ওনাদের পূজা পাঠের ছবি তুলে আমরা এগিয়ে চললাম।

পরে এরকম চটি আরও কয়েকটি দেখেছি। সেখানে বেশ বড় একটি করে স্টিলের ট্রাঙ্ক রাখা আছে। দশ বারো জন পরিক্রমাকারীর বোচকা পুটুলি ঐ ট্রাঙ্ক এ অনায়াসে ঢুকে যাবে। পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে সেই রাস্তা। প্রায় পুরো সময় নিচে বাঁদিকে নর্মদা নদী দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও একশ মিটার রাস্তার পাশে কোন বাড়ী ঘর নেই। মাঝে মাঝে এক একটা ছোট ছোট কুঠিয়া বা আশ্রম। একটি রামকৃষ্ণ কুঠিও দেখলাম।

দ্বীপের দক্ষিণ দিকে পরিক্রমা করে , পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গমের উপরে পৌঁছে গেলাম। ওখান থেকে নীচে একটি রাস্তা নেমে গেছে, সঙ্গম পর্যন্ত। আমরা সেই রাস্তা দিয়ে হেটে প্রায় দুশো মিটার গিয়ে, সঙ্গমে পৌঁছলাম।

দ্বীপের উত্তর দিক দিয়ে নর্মদা নদীর যে ধারা বয়ে এসেছে, সেটিই বেশী চওড়া। বেশ স্রোত বইছে নদীতে, দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। জল একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। দেখলে মুখে নিয়ে খাওয়ার ইচ্ছা হবে। তখন দোকানপাট সবে বসছে। আমরা একটি ছোট্ট জ্যারিকেন কিনে, সঙ্গমের জল ভরে নিলাম। আমি একটি একশ গ্রাম মত ওজনের পাথর জলের নীচে থেকে তুলে ব্যাগে ভরে নিলাম। আমার টেবিলে রুদ্র প্রয়াগের দুটি পাথরও আছে।

Smaller one is of Narmada

সঙ্গমের কাছে গোটা তিনেক ছোট গাধা দেখে ছবি তুলে নিলাম। এবার আমরা দ্বীপের উত্তর দিক ধরে হাঁটব। উঠে এসে সেই পাথর বাঁধানো পরিক্রমার পথে পড়তেই, ডান দিকে একটু উপরে দেখলাম, ঋণমুক্তেশ্বর শিবের মন্দির। এই মন্দিরের কথাও পড়েছি, শাস্ত্রী মশাই এর বইতে। কিন্তু আমরা এই মন্দিরে ঢুকলাম না। আমার এখন আর কোন জাগতিক ঋণ নেই। যে দুই মহাজনের ঋণ,মানুষ জন্মজন্মান্তর ধরেও শোধ করতে পারে না ,সেই বাবা মা তো কবেই চলে গেলেন। সেই " স্বর্গাদপী গরীয়সী" দেব দেবীর ঋণ শোধ করতে কোন ফাঁকিবাজির আশ্রয় নিতে আমি রাজী নই। পথে চলতে চলতে আমার স্ত্রীকেও সেই কথা বললাম। এই ( সরকারী)

বৃদ্ধ বয়সে এসেও যদি এটুকু সততা না থাকে, তাহলে বৃথাই আমার তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানো। এদিকে রাস্তাটা একটু উপরে। প্রায় দ্বীপের মাথার উপর দিয়ে চলেছে। বাম দিকে নদী দেখা যায় না। এখানে রাস্তার পাশে পাশে বেশ কিছু বাড়ী, চটি, মন্দিরও আছে। কয়েকটি বাচ্চা পিঠে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে স্কুলে চলেছে। ওদের দেখে মনে পড়ল, আমার ছোট্ট ব্যাগে কিছু লজেন্স আছে। ওদের থামিয়ে কটা কথা বলে, জানতে চাইলাম, ছোট লজেন্স নেবে কি না। গোটা পাঁচ ছয় লজেন্স বের করে ওদের দিলাম। ক্লাশ শিক্সে পড়া ছেলেটি লজেন্স নিয়ে, আস্তে করে বলল, “নর্মদে হর!” আমার স্ত্রী বুঝতে পারেনি ছেলেটি কি বলল। আমি বুঝেই বললাম, “ হর নর্মদে।” এটা আমি শাস্ত্রী মশাই এর বই পড়ে জেনেছি। উপরের ঐ রাস্তার পাশে কিছু গ্রামের মত বাড়ী ঘর দেখলাম। সবকটা মন্দিরে ঢোকার সময় ছিলনা।

Gouri Somnath Temple

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম, সেই ষাট ফুট উঁচু আদি শঙ্কর মহারাজের মূর্তির কাছে। ওখান পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে। এই রাস্তা নীচে PWD অফিসের দিক থেকে উঠেছে, দেখে এসেছি। কয়েকটি ছবি তুলে নিলাম। মূর্তির সামনে, পাহাড় কেটে সমতল মাঠের মত করা হয়েছে। এখনও কোন দোকান পাট বসেনি। ওখানেই দেখা হল বেশ বৃদ্ধ এক সাধুর সাথে। লাঠি  হাতে ঘুরছিলেন। (পরে মনে হল, আচ্ছা, উনি রঞ্জন মহারাজ নয় তো!) ওনাকে জিজ্ঞেস করে পরিক্রমার রাস্তা জেনে নিলাম। ওখানে পাহাড় কেটে মাঠ তৈরীর জন্য বাঁধানো রাস্তা হারিয়ে গেছে। দ্বীপের উত্তর ঢালে কিন্তু এখনও কিছুটা জঙ্গলের মত থেকে গেছে। বেশ বোঝা যায় শাস্ত্রী মশাই সত্তর বছর আগে এখানে যে বনের মধ্যে তপোবন এর কথা লিখেছেন, সবই সম্ভব। মাঝে মাঝে কিছু পাথরের তৈরি গেটের ভেতর দিয়ে পরিক্রমার রাস্তা চলেছে।

আমরা একটি দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে চা খেলাম। ঐ দোকানে ডিপ ফ্রিজে চকলেট, আইসক্রিম রাখা হয়েছে। একটা জায়গায় প্রায় একশ সিঁড়ি বেয়ে নামতে হল, তারপর আবার একশ সিঁড়ি উঠতে হল।

শেষ এক জায়গায় এসে, পঞ্চাশ সিঁড়ি নেমে , পাহাড়ের গায়ে তৈরী একটা দেড়শ মিটার মত সিমেন্টের করিডোর ধরে এগিয়ে ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের কাছে ঝুলাপুল এর অন্য পারে পৌঁছে গেলাম।

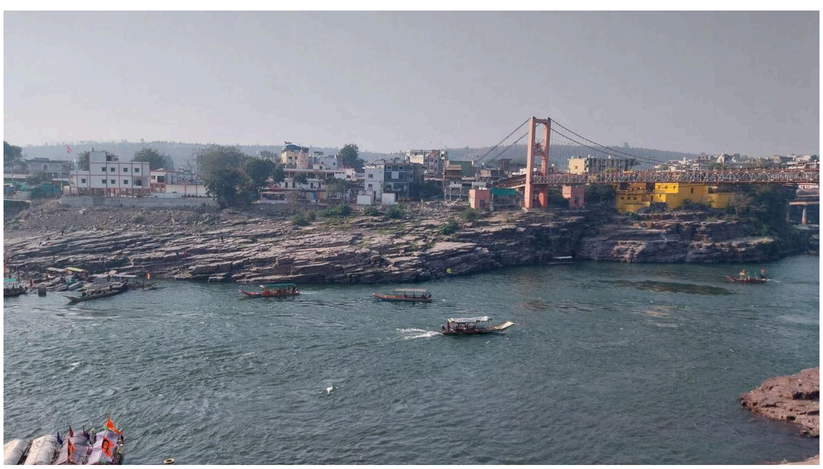

Hanging bridge from other side

হোটেলে ফিরে স্নান করেই আমাদের বেরনোর কথা। সাড়ে নয়টার হোটেলে ঢুকে দেখি লোড শেডিং চলছে। ফ্রন্ট ডেস্ক এ বলতে, ইনভার্টার চালু করলো। কিন্তু গিজার আর চলল না। একবার ভাবলাম, নর্মদায় স্নান করতে চলে যাই। শেষে ঠাণ্ডা জলে স্নান করেই রওনা দিতে হল। এবার আমাদের গন্তব্য মহেশ্বর। ঘন্টা দুই আড়াই লাগবে গাড়ীতে। ফাঁকা মাঠের ভিতর দিয়ে ছুটল গাড়ি। দুই পাশে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। গম আর ছোলার চাষ হয়েছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছোলা ক্ষেতের ছবি তোলা হল। ২৫.১২.২৪.

- পরিক্রমা পথের পাশে বেশ প্রাচীন মন্দিরের অবশেষ কিছু এখনও আছে। এই দ্বীপ পরিক্রমা না করলে, ওমকারেশ্বর ভ্রমণ এর কোন মানে নেই।

দ্বীপে জঙ্গল

Steps down towards corridor

শৈব তীর্থে 5

আমরা উনিশ ডিসেম্বর দুপুরে ওঙ্কারেশ্বর-এর হোটেলে পৌঁছে গাড়ীর মালিককে জানিয়েছিলাম, পরদিন সোজা না ফিরে মহেশ্বর হয়ে ফিরতে চাই। অতিরিক্ত এক হাজার টাকা লাগবে, জানিয়ে দিয়েছে। এদিকের রাস্তা বেশ ভালো। আমরা বারোটার পর পরই মহেশ্বর পৌঁছে গেলাম। ছোট্ট শহর। ড্রাইভার একটা জায়গায় গাড়ী থামিয়ে বলল, এখানে নেমে হেঁটে যেতে হবে। আমরা নামলে, গাড়ী ডান দিকে সরু গলির মধ্যে পার্কিং এর জন্য গেল। নামার সাথে সাথেই একজন লোক এসে হাজির; বলল সে গাইড। দরাদরি করে তিনশ টাকায় রফা হল। গাইড বলল, সে গাড়ী ভেতরে নিয়ে যেতে পারবে। তাকে গাড়ী পার্কিং থেকে আনতে পাঠিয়ে আমরা পাশের একটি দোকানে চা খেতে ঢুকলাম। বড় ছড়ানো কড়াইতে রাবড়ি তৈরী করা হচ্ছে দেখে জানতে চাইলাম, ওটা কি হচ্ছে? দোকানদার ভদ্রলোক জানালেন, রাবড়ি। দাম জেনে এক পাত্র দিতে বললাম। এর মধ্যে আমাদের ড্রাইভার ফোন করে জানতে চাইল, গাইডের কথা মত গাড়ী নিয়ে আসবে কি না। আসতে বললাম। চা খেতে যেটুকু সময় লাগে তার মধ্যে দোকানদারের সাথে দুই একটা কথা হল। আমাদের গর্বের রাজ্যটি সম্বন্ধে বাইরের সাধারণ মানুষের কি সাংঘাতিক ধারণা, ওনার কথায় বুঝলাম। কি বললেন উনি? সে বড় বিশ্রী ব্যাপার। লিখতে ভয় পাচ্ছি। শুধু এটুকু বলি; ওনার ধারণা, বুড়ো বয়সে একটু শান্তিতে থাকতে, আমরা বোধহয় ওদিকে চলে যাওয়ার মত জায়গা খুঁজতে বেরিয়েছি। আমরা রাবড়ি আর চা খেয়ে, অন্য একটা মিষ্টি কিনে, গাড়ীতে উঠে পড়লাম। মিনিট পাঁচেক চলে একটা হোটেলের পার্কিং-এ গাড়ী রেখে চললাম, গাইডের সাথে। এসব জায়গার ইতিহাস আমার প্রায় কিছুই জানা নেই। তাই গাইড যা বলে তাই শুনে নিই। তাছাড়া এই মহেশ্বর আমার এবারের ভ্রমণসূচীতে ছিল না, তাই কোন ইউটিউব ভিডিও দেখেও যাওয়া হয়নি। গাইডের কাছে যা জানলাম: এটি মহারানী অহল্যাবাই এর শেষের দিকের রাজধানী। ঐ মহীয়সী মহিলা নিজের প্রজাদের জন্য অসংখ্য কর্মকাণ্ড করে গিয়েছেন। সেজন্য ওনাকে দেবী মনে করতেন, প্রজারা।

ওনার “রাজোয়াড়া” অর্থাৎ সভাগৃহ একটি দোতলা কাঠের বাড়ী। ইনি খুবই শিব ভক্ত ছিলেন। আর ছিলেন মা নর্মদার ভক্ত; সেই জন্যই নর্মদা নদীর তীরে এই রাজধানী সরিয়ে আনেন। ঐ রাজোয়াড়ার ভেতরে দাঁড়িয়ে সোজা নর্মদা নদী দেখা যায়; রাণীমা সকালে উঠে আগে নর্মদা দর্শন করে, দিনের শুরু করতেন। ঐ বাড়ীতে ঢুকতে, জুতো খুলে ঢুকতে হয়, মন্দিরে ঢোকার মত। গেটের বাম দিকের দেওয়ালে একটি ভারতের মানচিত্রে

দেখানো হয়েছে, হিমালয় থেকে রামেশ্বরম পর্যন্ত মোট ঊনত্রিশ জায়গায়, মহারানী অহল্যা দেবী, শিব মন্দির, নর্মদা আর গঙ্গার ঘাট ইত্যাদী করে গিয়েছেন।

যে কোন রাজবাড়ীর মিউজিয়াম যেমন হয়, এখানেও তেমনি একটি ছোট্ট মিউজিয়াম দেখার মত, ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পরদিন আমরা ইন্দোরের রাজোয়াড়া প্যালেসেও এরকম মিউজিয়াম দেখেছি। ভেতরের উঠানে একটি তিন তলার সমান উঁচু গাছ দেখলাম। গাইড বলল, এই একটি মাত্র গাছই গোটা পৃথিবীতে আছে; এটি একটি বেল গাছ, প্রতিটি বোঁটায় বারোটি করে পাতা আছে। গাছে ফলও হয়। পিছন দিকে একটি ঠাকুর ঘর আছে। সেখানে "সোনার" সিংহাসনে , সোনার বিষ্ণু মূর্তি আছে। দেখলাম। আর আছে অনেক শিব লিঙ্গ।

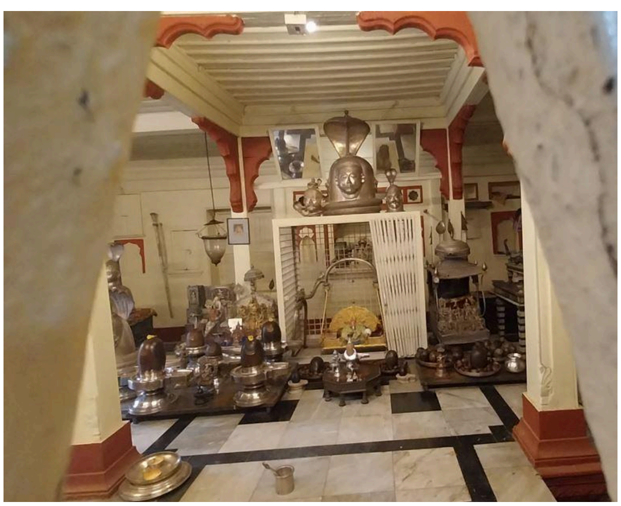

সেই কয়েকশ বছর আগে থেকেই চলে আসছে একটি প্রথা; প্রতিদিন এগারো হাজার না কি এগারোশ, কালো মাটির শিব লিঙ্গ তৈরী করে পূজা করা হয়। সেগুলি দুপুরের পর নর্মদা নদীর জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। একটি গামলায় ওগুলি রাখা ছিল দেখেছি। নদীর ঘাটের দিক থেকে ফেরার সময় দেখলাম, একজন মহিলা সেই গামলা

মাথায় নিয়ে নদীর দিকে চলেছেন। বাইরের উঠানে রাখা বিরাট কামানের সামনে বসে অনেকে ছবি তুলছে, আমরাও তুললাম। একটু কালচে রঙের দুর্গের মত গঠনের বাড়ীর ভিতরে একটি বড় শিব মন্দির।

মন্দির দেখে বেরিয়ে গেলাম নর্মদার ঘাটে। মন্দির থেকে অন্তত পঞ্চাশ ষাট সিঁড়ি সোজা নেমে গেছে নদীর জলে। ঘাটের উপর কয়েকজন পূজার ডালা, মাছকে খাওয়ানোর জন্য আটার গুলি ইত্যাদী বিক্রী করছে। কিছু যন্ত্র চালিত নৌকাও আছে। নৌকা ভ্রমণের টিকিট ঘরে গিয়ে জানলাম, মাথা পিছু মাত্র পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মিনিট দশেক ঘোরা যায়। আমরাও একটি দলের সাথে উঠে পড়লাম নৌকায়। সেই কালচে পাথরের দুর্গের মধ্যে দুটি আধুনিক, সিমেন্টের তৈরী ছোট মন্দির আছে।

একটি মন্দির বলল, পরশুরামের তৈরী; সেই মন্দিরের ভিতরে এগারোটি অক্ষয় প্রদীপ জ্বলছে। এদিক থেকে দেখলাম, দুর্গের গা ঘেঁসে একটি চার তলা আধুনিক হোটেল। আমাদের গাড়ী ঐ হোটেলের বাইরে, উপরে রাখা ছিল। পরে গাইড, আমাদের গাড়ী নিচের পার্কিং এ আনতে বলেছে। আমরা মন্দির দেখে ফিরে যখন জুতো পরছি, মন্দিরের পুরুতটি আমাদের গাইডকে ডেকে কিছু বলল। গাইড এসে বলল, ঐ হোটেলের মালিক এই পুরুত। হোটেলের পার্কিংয়ে গাড়ী রাখার জন্য গাইডের কাছে টাকা চাইছে। গাইড সাধারনত যেটা বলে সেই কথা আমাদের ড্রাইভার বলল। শাড়ীর দোকানে যাওয়ার কথা ড্রাইভার মনে করাল। আমরা জানতাম, এই সব জায়গায় দোকানে নিয়ে গিয়ে শাড়ী কেনাতে পারলে , গাইড কিছু কমিশন পায়। গাড়ী থেকে নামার সময়

দেখেছি, ঐ চত্বরে তাঁত চলছে, শাড়ীর দোকানও আছে। আমিই বললাম, চলো শাড়ী বোনা দেখি। আমার স্ত্রী আদৌ আগ্রহী ছিল না। দুর্গের মধ্যেও অনেক তাঁত চলছে, মহিলারা তাঁত চালাচ্ছেন দেখেছি। এ সবই মহারানীর ব্যবস্থা; মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে। আমরা তাঁত চালানো আর শাড়ীর দোকান দেখলেও, কিনিনি। জানলাম, মহেশ্বরী শাড়ীর ভালো নাম ডাক আছে। সিল্ক আসে কর্নাটক থেকে। গাইডকে বিদায় দিয়ে আমরা ইন্দোর ফেরার রাস্তা ধরলাম। প্রায় আড়াইটা বাজে, এবার কোথাও খেতে হবে। ড্রাইভার বলল, হাইওয়েতে ভালো হোটেল আছে। তাই চললাম। আধ ঘন্টা চলে, বড় রাস্তার পাশের একটি হোটেলে ঢুকলাম। আমাদের আগে যে ছয় সাত জনের দলটি হোটেলে খেতে বসেছিল, তাদের গোটা দুই ছেলে আমাদের দেখে হৈ হৈ করে উঠল; আবার দেখা হয়ে গেল বলে। আমি কিন্তু প্রথমে মনে করতে পারিনি , কোথায় ওদের সাথে দেখা হয়েছিল। পরে মনে পড়ল, এক ঘন্টা আগেই ওদের সাথে, মহেশ্বরের নর্মদা নদীতে নৌকায় উঠেছি। ওরা চলেছে মহাকাল দর্শনের জন্য। হোটেলে আমাদের খাওয়া খুবই সামান্য, সাদা দৈ আর সাদা ভাত। এখানে ডাল নিয়ে দেখি, ডালেও শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া। ওমকারেশ্বের এর মাইল চারেক আগে একটি বাজার মত জায়গায় দেখেছি, রাস্তার দুই পাশে অন্তত পঞ্চাশ জায়গায়, রাশি রাশি শুকনো লঙ্কার ছোট খাট পাহাড় সাজিয়ে বসেছে।

হোটেলের বিল মেটানোর সময় , আমরা কোথা থেকে আসছি, কোথায় চলেছি এরকম কিছু কথা হচ্ছিল। হোটেলের লোকটি বলল, এত কাছে দিয়ে চলে যাচ্ছ, মান্ডুও ঘুরে যাও। বড় রাস্তা থেকে কুড়ি পঁচিশ কিমি দূরে হবে জেনে, ঘুরেই যাই ঠিক করলাম। আবার গাড়ীর মালিককে ফোন করে বললাম। আরও সাতশ টাকা দিতে রাজী হয়ে, চললাম মান্ডু। ড্রাইভার বলল, যেতে এক ঘন্টার মত লাগবে; বেশী সময় খোলা পাবেন না। তাই সই। এই রাস্তায় যেতে যেতে , পাশে কিছু তুলা চাষের ক্ষেত দেখলাম; এক জায়গায় নেমে ছবিও তুললাম।

কার্পাস তুলা চাষ

মহেশ্বর আর এই পথেও কিছু মানুষকে লোটা কম্বল আর লাঠি নিয়ে হাঁটতে দেখেছি। এরাই সম্ভবত "পরিক্রমাবাসী", নর্মদা পরিক্রমা করছেন। কারো সাথে কথা বলার সুযোগ হয়নি। মান্ডু পৌঁছতে প্রায় সাড়ে চারটা বেজ গেল। কয়েক মাইল আগে থেকে রাস্তার পাশে, মাঠের ভিতর এক রকমের গাছ দেখা যায়; আফিকার বাওবাব গাছ মনে হবে। কাণ্ডটি জালার মত অনেকটা, উপরের দিকে কিছু ডাল। কিন্তু কোন গাছে কোন পাতা নেই। দু একটা গাছে অনেকটা শিমুল ফলের মত কয়েকটা ফল , দূর থেকে দেখেছি। গাড়ী পার্কিংয়ে রেখে আমরা হাঁটা শুরু করতেই একজন লোক বলল সে গাইড। পাঁচশ টাকা চাওয়ায় আমরা রাজী হলাম না। ফোর্ট এর গেট পর্যন্ত পাঁচশ মিটার মত রাস্তা হেঁটেই চললাম। কিছু লোক ই-রিক্সায় উঠে যাচ্ছে আসচে দেখলাম। এই রাস্তাটিও মহাকাল করিডোরের মত, লাল পাথরে বাঁধানো চলছে। শেষ একশ মিটার রাস্তার পাশে দোকান পাট বসেছে। অন্তত আট দশ জন ঝুড়িতে করে একরকমের ফল বিক্রি করতে বসেছে। ছোট ফলগুলি অনেকটা শিমুল ফলের মত। কিন্তু বড় কিছু ফলের আকার আকৃতি পেট মোটা পুরুলের মত। ওরা এই ফলগুলিকে "ইমলী" বলছে।

মান্ডুর ইমলি

কি হয় এই ফল দিয়ে? প্রশ্ন শুনে, প্লাষ্টিক প্যাকেটে রাখা সাদা রঙের নুড়ি পাথরের মত জিনিস দেখালো। ঐ ফলের মধ্যে এরকম জিনিস আছে। দশ টাকা দিয়ে একটা প্যাকেট কিনে, মুখে একটা নুড়ি নিয়ে দেখলাম, তেঁতুল এর মত একটু স্বাদ। কিন্তু ৯৫% ই বীজ। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা ফল কিনে আনার ইচ্ছা থাকলেও, বোঝা বাড়ছে ভেবে নেওয়া হল না। ফেরার পথে আলো কমে যাওয়ায়, গাছের ছবিও তোলা হল না। ফোর্ট এর গেটের

কাছে জন তিনেক ছেলে, গলায় আই কার্ড ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের একজন এগিয়ে এসে জানাল সে গাইড। তিনশ টাকা নিতে রাজী হল; ওকে নিয়ে চললাম। এই মান্ডু ফোর্ট এর গেটে টিকিট কাটার অত্যাধুনিক ব্যবস্থা আছে। QR scan করে নাম ঠিকানা লিখে, অনলাইনে টিকিট কাটতে পারেন, বা অতিরিক্ত পাঁচ টাকা দিয়ে সাধারণ ভাবেও টিকিট কেটে ভেতরে যেতে পারেন। আমি মোবাইলে টিকিট করলাম, কুড়ি টাকা করে। ভেতরে ঢোকার পরই ডান দিকের একটি বাড়ীতে মিউজিয়াম। পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যায়, তাই গাইড বলল, আগে দেখে আসুন। একটিই বড় ঘরে পুরাতন পাথরের মূর্তি,লিপি, মাটির আর ধাতুর বাসন ইত্যাদী সাজানো আছে।

বেরিয়ে এসে গাইড এর সাথে সামনে সুন্দর করে সাজানো বাগান, জলাশয়, পুরনো জাহাজমহল এইসব দেখতে দেখতে চললাম। গাইড ছেলেটি শিক্ষিত। বি এস সি পাশ করে গাইডের ট্রেনিং নিয়েছে। আমরা ঘন্টা খানেক ভেতরে ঘুরে, সবকিছু দেখে ফিরে এলাম। গাড়ীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তার পাশে একটি দোকানে বসে চা খেলাম। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। ওদিকে আরও প্রায় চল্লিশ মিনিট পর সূর্য ডোবার কথা। একটা সানসেট পয়েন্ট থাকলেও আমরা আর এগোলাম না।

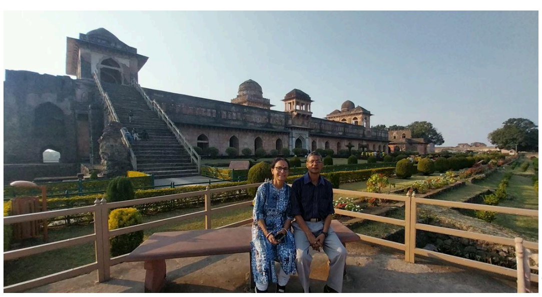
মান্ডু জাহাজ মহলের সামনে

ডক্টর পাত্র আবারও ফোন করে খবর নিলেন। আমরা সকাল থেকে অনেক হাঁটাহাঁটি করে আর ওনার বাড়ীতে যাওয়ার উৎসাহ পেলাম না। বড় রাস্তায় গাড়ী পৌঁছতেই বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। সন্ধ্যা ছয়টার পর থেকেই, ড্রাইভারের মোবাইলে বার বার ফোন আসতে থাকল। আমার মনে ছিল, এবার ইন্দোরের Retiring room সন্ধ্যা আটটা থেকে; আগে পৌঁছলে বাইরে বসে থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে কুড়ি তারিক সন্ধ্যায় ছাপান্ন বাজার ঘুরে নেব। কিন্তু আমাদের স্টেশনে পৌঁছতে ঠিক আটটাই বেজে গেল। এত পরিশ্রান্ত লাগছিল যে, ঐ রাত্রে আর কোথাও বেরোলাম না। ইন্দোরের শহরতলীর কাছে পৌঁছে ড্রাইভার জানাল যে, আজ তাঁর সাত বছর বয়সের মেয়েটির জন্মদিন, তাই মেয়ে বারবার ফোন করছে। সে সাতদিন পর আজ বাড়ী ফিরছে, গাড়ীতে গাড়িতেই ঘুরে চলেছে। সতের বছর গাড়ী চালাচ্ছে, এবার ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো কাজে লাগবে ভাবছে। মেয়ের

জন্মদিনের খবরটি শুনে একটু খারাপ লাগল। মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে নিশ্চয়ই আমাদের গাল দিয়েছে। এ ব্যাটারা দুপুরের পর ফেরার কথা, তাই না করে আরও দুই জায়গা ঘুরে রাত করে ফিরল। এবার আমাদের Retiring room এর ঘরের নম্বর চার। একটু পুরনো ধাঁচের বাথরুম। পরদিন সকালে উঠে দেখি ইঁদুরে খাওয়ার রাখার ব্যাগটি ফুটো করে, আমাদের বাড়ী থেকে ভেজে নিয়ে যাওয়া চিনা বাদাম এর প্যাকেট ফুটো করে, বাদাম খেয়েছে। ইঁদুরের কথা মাথায় ছিল না; সেক্ষেত্রে ব্যাগটি দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা যেত। অনেক বছর ধরেই আমরা রেলের রিটায়ারিং রুমে থাকছি, এমন অপ্রস্তুত আর কোথাও হতে হয়নি। যারা এরকম, রেলের Retiring room এ কখনও থাকবেন, এই ব্যাপারটি মাথায় রাখবেন। আর একটি অসুবিধা হল, টাওয়েল দেবে না; আপনাকে গামছা নিয়ে যেতে হবে। আর গামছা মেলার জন্য, দড়ি। এর পরের Retiring room প্রয়াগরাজে। সেখানে আমার নিজের অমনোযোগের জন্য একটা বিশ্রী ব্যাপার হতে হতে বেঁচে গেলাম। ২৬.১২.২৪.

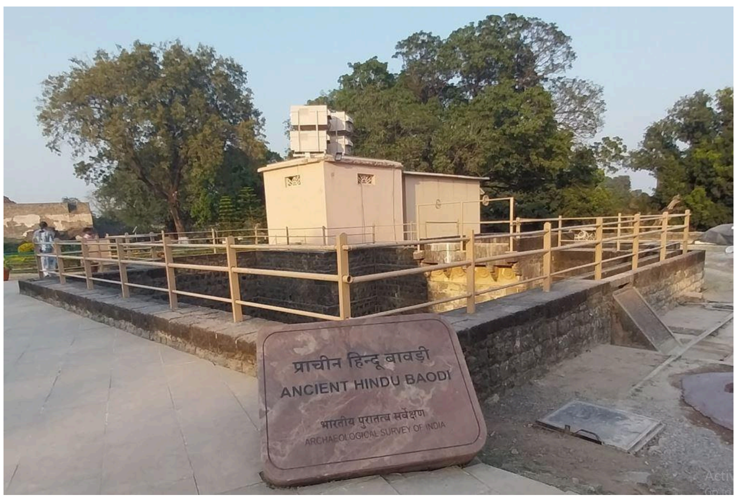

বাউডি অর্থাৎ কুঁয়া

শৈব তীর্থে ভ্রমণ 6

আগেই বলেছি, ২১ শে ডিসেম্বর দুপুরে আমরা ইন্দোরের এক নম্বর প্লাটফর্ম থেকে প্রয়াগরাজের ট্রেনে উঠেছি। এদিক থেকে যাওয়ার সময় গোটা দুই অভদ্র ছেলে আমাদের সহযাত্রী হয়েছিল; উল্টো দিকের ট্রেনে একটি অত্যন্ত ভদ্র শিক্ষিত ছেলে আমাদের সাথে গোটা রাস্তা এল। ছেলেটি আমার মেয়ের থেকেও বছর পাঁচেকের ছোট। ওদের সরকারী চাকরীর প্রাথমিক অবস্থায় আছে। এবার উজ্জয়িনী পর্যন্ত দিনের বেলায় এলাম। ট্রেন লাইনের দু'পাশেই সবুজ গমের ক্ষেত। উজ্জয়িনী পেরনোর সময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আরও ঘন্টা খানেক চলার পর ট্রেন পৌঁছল সন্ত হিরদারাম নগর স্টেশনে। এখানে এমনিতেই মিনিট পনের দাঁড়ানোর কথা; ট্রেন পৌঁছেছে প্রায় আধ ঘন্টা আগেই। তাই অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকল। আমিও প্লাটফর্মে নেমে একটু হাঁটাহাঁটি করে নিলাম। ওদিকে যাওয়ার সময় দেখেছি, আমাদের সহযাত্রী সেই "কিন্নোর বাচি" বাচ্চাটি তার বাবা মায়ের সাথে এখানেই নেমেছিল, ভূপাল যাওয়ার জন্য। এই সন্ত হির্দারাম নগর স্টেশনের প্লাটফর্মে নেমে অনেকে পোহা আর ধোকলা খাচ্ছে দেখে আমরাও এক পাত্র ধোকলা কিনে খেলাম। ডাল বাটা দিয়ে তৈরি; না মিষ্টি, না নোনতা, কেকের মত একটি সস্তা খাদ্য। এই ট্রেনও নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট আগেই প্রয়াগরাজে পৌঁছে গেল। তখনও সূর্য ওঠেনি। প্লাটফর্ম থেকে শুরু হল, সঙ্গমে নিয়ে যাওয়ার অটো আর গাড়ীর ড্রাইভারদের ঝোলাঝুলি। ঘন্টা দুই- তিন পরেই বেশ বুঝেগেলাম, কুম্ভ মেলার মাহাত্ম। একজন গাড়ীর ড্রাইভার আমাদের নিয়ে, রাস্তা দেখিয়ে কোথায় Retiring room এর জন্য কাগজ পত্র দাখিল করতে হবে, কোন দিকে সিঁড়ি সবই দেখাল। পারলে আমাদের ট্রলি ব্যাগ একেবারে দোতলায় পৌঁছে দিতে চায়। ওর সাথে কথা হয়ে গেল, আটটা থেকে বারোটা চার ঘন্টা গাড়ীতে ঘোরাবে। শহরের গোটা তিনেক দর্শনীয় স্থান দেখিয়ে সঙ্গমের ঘাটে নিয়ে যাবে; ভাড়া চারশ টাকা। ওর ফোন নম্বর নিয়ে বিদায় করলাম। এই প্রয়াগরাজের Retiring room আমার বুক করা ছিল, আগের সন্ধ্যা আটটা থেকে, তাই সকাল ছয়টায় ঢুকতে কোন অসুবিধা নেই। আমার হাওড়া ফেরার গাড়ী বিকেল সাড়ে চারটায়। সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত বুকিং। আমরা আটটায় বেরিয়ে একটায় ফিরলেও দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘন্টা তিনেক বিশ্রাম নিয়ে নীচে নামব; এই ছিল আমাদের হিসেব। এই যে প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার সাত-আট দিন পর আমরা প্রয়াগরাজে পৌঁছব, এরকম কোন চিন্তা মাথায় ছিল না। চার মাস আগে টিকিট কাটার সময়, ইন্দোরের থেকে সোজা হাওড়া ফেরার টিকিট RAC হয়ে গেল। মনটা খুঁতখুঁত করছিল; আবার IRCTC ওয়েবসাইট খুলে, খোঁজাখুঁজি করে দেখলাম, প্রয়াগরাজে নেমে, ট্রেন পাল্টে এলে দুটি ট্রেনেই কনফার্ম টিকিট হচ্ছে। তাই নিয়ে নিলাম। মেলার কোন খবরই আমার কাছে ছিল না। আগের মেলার শেষের দিকে বেনারস থেকে গিয়ে একদিন ঘুরে এসেছিলাম। সেবার মেলা প্রায় ভেঙ্গে গেলেও গাড়ী চলাচলে অনেক বিধিনিষেধ ছিল। আমাদের সেবারের ড্রাইভারও একটু জেদি লোক ছিল। আমাদের শুধুই গঙ্গার উত্তর পারে নিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছিল। শহরে প্রায় ঢোকাই হয়নি। এবার তাই শহরটা দেখব, সময় থাকলে যমুনার দিক দিয়ে সঙ্গমে যাব, এরকম ভাবা ছিল। হাতে অনেক সময় ছিল, তাই ফেরার পথে আর একটা তীর্থও ঘোরা হবে, এই পর্যন্ত। এখানে রেলের RAC টিকিটের ঝামেলার ব্যাপারটা একটু বলে রাখি। এবার যে তিন চার বার ট্রেনে ঘুরলাম, তাতে দেখলাম RAC কনফার্ম হয় না। পাশের নিচের বার্থে দু'জন, আঠাশ তিরিশ ঘন্টা যাওয়া বেশ কষ্টকর। এই RAC ব্যাপারটা

বেশ গণ্ডগোলের। আইনের ফাঁকে, রেল আপনাকে বসার জায়গা দিয়ে, শোয়ার ভাড়া নিচ্ছে। ধরুন আপনারা দুজন হাওড়া থেকে RAC টিকিটে বসে চলেছেন। মাঝে বারাণসীতে আপনার পাশের বার্থের একজন নেমে যাচ্ছেন। আপনি ভাবছেন, তাহলে তো বারাণসী থেকে আপনি ঐ বার্থ পাচ্ছেন। সেটা হবে না। বারাণসী থেকে অন্য একজন ঐ বার্থের কনফার্ম টিকিট নিয়ে উঠবেন; টিটি সাহেব এর কিছু করার নেই। লোকজন কী কষ্ট করে RAC টিকিটের এক বার্থে দুজন চলেছেন, এবার অনেক দেখলাম। তাই আমার পরামর্শ হল, ট্রেন বা তারিক পাল্টান; পারতপক্ষে RAC টিকিটের ভরসায় দূর পাল্লার ট্রেনে উঠবেন না।

আমরা প্রয়াগরাজের Retiring room এর দোতলায় উঠে দেখলাম, একজন কর্মচারী চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে আছে। তাকে কাগজ দেখলাম; দু'শ সাত নম্বর ঘর তিন তলায়, যেতে বলল। তিন তলায় চেয়ার টেবিল থাকলেও কোন কর্মচারি নেই। ২০৭ নং এর দরজা খোলা দেখে আমরা ঢুকে গেলাম। ব্যাগ পত্র রেখে, ঘরে তালা ঝুলিয়ে আমরা বাইরে বেরোলাম, চা খেয়ে, গাড়ীর ভাড়া ইত্যাদীর একটু খোঁজ নিতে। স্টেশনের নিচে থেকে রাস্তা পর্যন্ত জন পাঁচ ছয় লোক, প্রয়াগের সঙ্গমে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঝোলাঝুলি করে গেল। আমাদের গাড়ী ঠিক করা আছে বলে কাটিয়ে দিতে পড়লাম। প্রথম ড্রাইভার চারশ টাকা বলেছিল, এরা কেউ কেউ বারোশ টাকাও বলছে। Retiring room এ ফিরে এসে খেয়াল করলাম, বালিশের কভার কেমন তেল লেগে আছে মনে হল। শুধু এই জন্যই, তিন তলার কর্মচারীর খোঁজ নিতে নীচের লোকটির কাছে গেলাম। সে বলল, ওপরে অন্য লোক আছে, পাশের ২০৫ নম্বরে শুয়ে থাকতে পারে। উপরে এসে তিন তলার মহিলা কর্মচারীকে খুঁজে বের করলাম। সে তো, আমরা ২০৭ নম্বরে নতুন এসেছি শুনে অবাক। লোকজন ওকে না বলে চলে গেছে বলে বিরক্ত। যাইহোক, দুটি বালিশের কভার পাল্টে দিয়ে আমার বুকিং এর কাগজটি নিয়ে খাতায় লিখতে গেল। পাঁচ মিনিট পর ফিরে এসে বলল, তোমাদের তো সকাল আটটা পর্যন্ত বুকিং, সময় শেষ। আমি নিজের ভুলের জন্য অপ্রস্তুত হলেও, আটটায় বেরিয়ে যাবো, বলে দিলাম। ঐ মহিলা অবশ্য একবার বলেছিল, নিচে গিয়ে কথা বলতে পার। আমাদের তো গাড়ী আটটায় বলাই আছে, তাই তাড়াতাড়ি স্নান করে নিতেই ব্যস্ত হয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী বলেছিল, নীচের অফিসে লেখা দেখেছে, 25% অতিরিক্ত দিয়ে সময় বাড়ানো যায়। গাড়ীতে দুটি ট্রলি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, তাই আর ওসবে গেলাম না। পরে নীচে নেমে খোঁজ নিয়ে জানলাম, আটটার আগে এলে, সময় বাড়ানো যেত। সে তো হল; কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। বালিশ ময়লা না থাকলে তো আমরা ঐ মহিলাকে খুঁজতেই যেতাম না; আটটায় ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে যেতাম। পরে যারা আসত, তারা একটা হুজ্জতিতে পড়ে যেত। এবার আমাদের হুজ্জতি শুরু হল। মহা কুম্ভের মহা হুজ্জ্যোতি!

আমরা ঠিক আটটায় Retiring room এর বারন্দায় বেরোতেই একটি লোক আমাদের পিছনে পড়ে গেল। সে তার গাড়িতেই আমাদের ঘোরাবে। প্রথমে আমরা বেশ বিরক্ত হলেও লোকটির অসিম ধৈর্যের কাছে হার মানতে হল। ওকে প্রথমেই বলেছি, আমাদের গাড়ী ঠিক করা আছে। কার গাড়ী? নরেন্দ্র ভাইয়ার। লোকটি আমাদের সাথে সাথে নিচে নেমে এসেছে। Retiring room এর অফিসে জন তিনেক লোকের পিছনে আমি লাইনে দাঁড়িয়ে; এই লোকটিও পাশে দাঁড়িয়ে। নরেন্দ্রকে ফোন করতে সে এসে গেল। এরা তিন চার জন মিলে তাকে ভাগিয়ে

দিল। এবার আমি একে ধমকেই বললাম, তুমি আমার পিছনে এলে আমি পুলিশ ডাকব। একটু সরে গেল। বুঝলাম, ষ্টেশন এলাকা এদের; নরেন্দ্র বাইরের লোক।

লোকটি খারাপ না

রাস্তায় বেরিয়ে ফোন করলাম, নরেন্দ্র আর ফোন ধরল না। পুলিশকে বললাম ব্যপারটা। একটু বয়স্ক পুলিশ বলল, না, এসব চলবে না। কোন লোক তোমাকে বিরক্ত করছে? আমি তখন রাস্তা থেকে অন্য গাড়ী ধরার চেষ্টা করছি। পিছন দিক থেকে একটি গাড়ী এসে আমাদের ডাকছে। ড্রাইভারের মাথার মঙ্কি ক্যাপ নেই, তাই এগিয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী ওকে ঠিক চিনেছে। তাও ওকে জিজ্ঞেস করলাম কত টাকা নেবে? ছয়শ টাকা। ব্যাগ পত্র নিয়ে উঠে বসলাম। ও কিন্তু নির্বিকার ভাবে আমাদের প্রায় দেড়টা পর্যন্ত ঘোরাল। শেষে আমি নিজেই ওকে আটশ টাকা দিলাম। প্রথমে ঢুকলাম, হনুমান মন্দিরে। বেশ বড় বাঁধানো চত্বর। কিন্তু খুবই সাদামাটা মন্দির।

হনুমান মন্দির

মন্দিরের পর গেলাম, এক সত্যিকারের মহান স্বাধীনতা শহীদের মূর্তি দেখতে। এই জায়গার নাম, আজাদ পার্ক। এখন যেই জায়গায় এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর মূর্তি সেই জায়গায় উনি শহীদ হয়েছিলেন। বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্দ্রশেখর আজাদ মহাশয় এইখানে ব্রিটিশ পুলিশের সাথে গুলির লড়াই করে শহীদ হয়েছিলেন। বীর শহীদের পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে ছবি তোলা হল।

তারপর গেলাম ভরদ্বাজ আশ্রম। শহরের মধ্যেই এটি। আশ্রম বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু নেই। অনেকটা জায়গা নিয়ে , লাল পাথরে বাঁধানো উঠান, কয়েকটা ছোট ছোট লাল পাথরে তৈরি মন্দির। কোন বাগান, গাছ বা কোন সাধুও নেই।

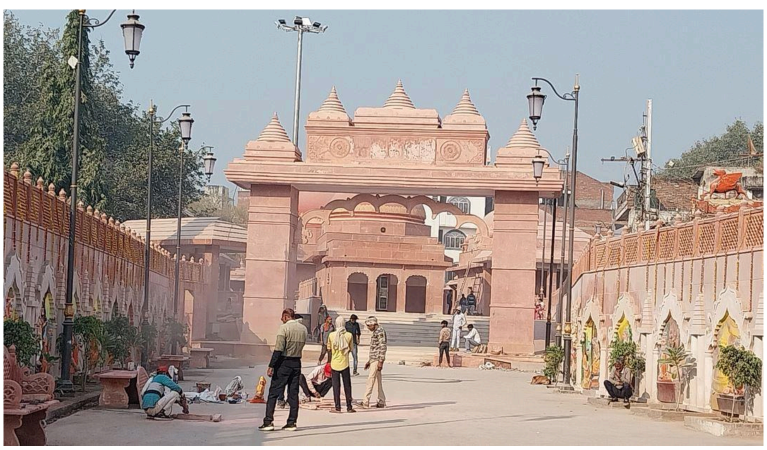

ওর প্রায় উল্টো দিকে আনন্দ ভবন। এটা মতিলাল নেহেরুর বাসস্থান ছিল। পরে , নেহেরুদের রমরমার সময় এটিকে একটি মিউজিয়ামে পরিবর্তন করা হয়েছে। মতিলাল নেহেরুর ব্যবহৃত আসবাব, অনেক ছবি ইত্যাদী দিয়ে , পরিপাটি করে সাজানো। বেশ বড় এলাকা নিয়ে, সুন্দর বাগান ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। মাথাপিছু পঁচিশ টাকা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। ওখানে একটি তারা মণ্ডলও আছে। আমরা সাড়ে দশটা থেকে আধ ঘন্টা দেখে নিতে পারতাম। আমার স্ত্রী উৎসাহ দেখাল না।

ওখান থেকে গেলাম, সতী পিঠ মন্দির ( জালপা দেবী) দেখতে। একটু অগোছাল, ভাঙ্গাচোরা পাথুরে চত্বর পেরিয়ে শক্তি পিঠ। মন্দিরে মূর্তি কিছু দেখলাম না; একটু অদ্ভুত কাপড়ের তৈরী চোঙ মত লম্বা জিনিস ছাদের থেকে ঝুলছে, সেখানেই লোকে ডালা দিচ্ছে। পিছন দিকে ঘিঞ্জি করে বসা প্রচুর ডালা বিক্রির দোকান। প্রায় সবাই কাঁচের চুড়ি বিক্রী করছে। একটি মন্দিরের চাথালে, একজন রক্তম্বর পরিহিত প্রৌঢ় মানুষ, ঝাঁপিতেএকটি গোখরো সাপ নিয়ে বসে গেছে। লোকে সাপ দেখে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। এই মন্দিরেরও লাল পাথরে উন্নয়ন হচ্ছে।

সতী পিঠ মন্দির ( জালপা দেবী)

এবার সোজা চললাম কুম্ভ মেলায়। যমুনার তীরে পৌঁছনোর জন্য বেশ ঘুরে ঘুরে যেতে হল। এখন থেকেই তাঁবু পড়তে শুরু করেছে। ট্র্যাফিক জ্যাম কমাতে গাড়ী ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাস্তার পাশে পাশে বায়ো টয়লেট বসে গেছে। গঙ্গার উত্তর পারে কয়েক কিমি যায়গা নিয়ে তাবুর মেলা দেখা যাচ্ছে। গঙ্গার উপর অস্থায়ী ভাসানো সেতু। আগেরবার এই রকম একটি সেতুর ওপর দিয়ে আমাদের গাড়ী নদী পেরিয়েছিল। এবার আমরা যমুনার এই পারে থেকে গেলাম। কয়েকশ গাড়ী আর অটোর জটলায় আমাদের গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভার নেমে আসতে বলল। গাড়ীতে জুতো খুলে রেখে বালীর উপর দিয়ে হেঁটে চললাম নৌকা ধরতে। ড্রাইভার এর মধ্যে মোবাইলে নৌকার লোককে ডেকে নিল। বেশ দরাদরি করে বাইশ’শ টাকায় রফা হল। দাঁড় টানা নৌকায় আমরা দুই জনই উঠলাম। দলের সাথে উঠলে ফিরতে চার পাঁচ ঘন্টা লেগে যায়, এরকম নানান যুক্তি দিয়ে, আমাদের একটি

নৌকা নিতে বলল। দলে গেলে সময় বেশী লাগবে ঠিকই। কারণ দলের দশ জন যদি আলাদা আলাদা করে পূজা পাঠ, স্নান ইত্যাদি শুরু করে, কত সময় লাগবে বলা মুস্কিল। আমরা মিনিট দশেক সময়ে যমুনা পেরিয়ে মাঝখানের চড়ে পৌঁছলাম।

যমুনা নদীতে নৌকা

আমাদের আশেপাশে কয়েকশ নৌকা ঘোরাফেরা করছে। মাঝি জানাল, মোট দশ হাজার নৌকা ওখানে চলছে। চড়ে সব নৌকা বাঁধার জায়গা নেই; একটি নৌকা থেকে আর একটিতে পা দিয়ে চড়ে বাঁধা পাণ্ডার নৌকায় পৌঁছতে হয়। আমি নৌকাতে জামা প্যান্ট পাল্টে, গামছা নিয়ে পাণ্ডার নৌকায় উঠেছি। কিন্তু পান্ডা দেখে নিয়েছে, এই নৌকায় মহিলা বসে আছে। দুজনকে পূজা করিয়ে বেশী দক্ষিণা নেবে, তাই নানান ভাবে বুঝিয়ে একেও ডেকে আনল। এবার আমাদের দুজনের ছোট হাতব্যাগ দুটি নিয়ে আমার স্ত্রীও পাণ্ডার নৌকায় এল। একটি থালায় পাঁচটি নারকেল দিয়ে, আমাদের মাথায় একটু জল দিয়ে, মন্ত্র পাঠ করিয়ে, কত টাকা দক্ষিণা নেবে তাই নিয়ে জোর দরাদরি করলো। শেষ পর্যন্ত আমি সাড়ে সাতশ টাকা দিয়ে রফা করলাম। নারকেল ওদের মাচার পাশেই জলে ভাসিয়ে থালা ফেরৎ দিলাম। ঐ নারকেলই আগামী তিনমাস ধরে জলে ভাসবে আর পাণ্ডার ছেলে তুলে তুলে থালায় সাজাবে। আমি একাই ,চশমা আমার স্ত্রীর কাছে রেখে, চড় পেড়িয়ে, সঙ্গমে ডুব দিতে চললাম। আমার স্ত্রী পাণ্ডার নৌকায় বসে মোবাইলে ভিডিও, ছবি তোলার চেষ্টা করে গেল। চড়টি প্রায় দু -তিনটি ফুটবল মাঠের মত হবে। এদিকে পান্ডাদের নৌকা আর মাচা। ওদিকে বেশ কিছু ডালার দোকান।
চড়ের থেকে ফুট পনের দূর দিয়ে, প্লাষ্টিকের বড় বড় ফাঁপা ভাসানোর জিনিস দিয়ে বেড়া দেওয়া। বেড়া পর্যন্ত হাঁটু জল। বেড়ার উপর দিয়ে পেরিয়ে গঙ্গার দিকে অন্তত পঞ্চাশ ষাট ফুট এড়িয়ে হাঁটুর উপর জল পেলাম। সেখানেই একটা ডুব দিলাম। কিছু কিছু লোক একশ দেড়শ ফুট এগিয়েছে, সেখানেও কোমর জল নেই।

স্নান করার পর আমার মনে হলো, প্রয়াগ সঙ্গমের জল একটু বাড়ী নিয়ে যাই। পাণ্ডার নৌকায় ফিরে গিয়ে, স্ত্রীর কাছে দশ টাকা নিয়ে আবার গঙ্গার দিকে চললাম। একটা জল নেওয়ায় জ্যারিকেন কিনে, বেড়ার ওপার থেকে জল ভরে নিলাম। আমি যাওয়ার আগে থেকেই কেউ কেউ প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করছিল, তারা তখনও পূজা করে

চলেছে। আমাদের নৌকায় ফিরে জামা প্যান্ট পরে নিলাম। দুপুরের রোদে , আমরা যমুনা পেরিয়ে ফিরে আসার মধ্যেই আমার গামছা শুকিয়ে গেল। বালু চরের দু 'শ মিটার মত উপরে "শুয়ে থাকা হনুমানের" মন্দির আছে। গাড়ী ওদিকে নিয়ে যেতে দিচ্ছে না। আমরা আর ওদিকে হেঁটে এগোলাম না। সোজা স্টেশনে ফেরার রাস্তা ধরলাম।

২৩.১২.২৪। সকাল ৬টা ১০ এ , হাওড়া ব্রীজের কাছে

RPF Route March at Prayagraj Stn

স্টেশন রোডে এসে ড্রাইভার কে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় খাওয়া যায়? সে স্টেশনের উল্টো দিকে চলে যাওয়া একটি রাস্তা দেখিয়ে বলল, ঐ দিকের দোকানগুলি ভালো, ষ্টেশন রোডের দোকানগুলি ভালো না। আমাদের ট্রলি ব্যাগ দুটি ছিল বলেই সোজা স্টেশনে ফিরে এলাম। স্টেশনের ভোজনালয়ে খেয়ে নিয়ে, প্রতিক্ষালয়ে এসে ঢুকলাম। ট্রেন দুই আড়াই ঘন্টা পর। ফাঁকা ফাঁকা প্রতীক্ষালয়ে অনেকে লম্বা ধাতব বেঞ্চে লম্বা হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে; আমিও ঘন্টা খানেক শুয়ে থাকলাম। ট্রেন আসচে বিকানিরের দিক থেকে। প্রয়াগ রাজে মিনিট কুড়ি পরে এলেও, হাওড়ায় কয়েক মিনিট আগে পৌছে গেলাম। দূরের ট্রেনে মাঝ পথে ওঠার কিছু সমস্যা থাকে। আমরা যেই জায়গায় আমাদের বার্থ পেয়েছি, তার আশে পাশে যারা আসচে আগে থেকেই, তাদের বিরাট বিরাট ব্যাগ, বোঝায় সিটের তলা ঠাসা; আমাদের ব্যাগ রাখার জায়গা নেই। মহিলারা উপরের বার্থে বসেই যা খাচ্ছে, তার খোসা, প্যাকেট সব নীচে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। সামান্য বোধ বুদ্ধিও নেই। ভাগ্য ভালো, ঐ দলটি এক ঘন্টা পরই নেমে গেল। ওদের গোটা দশেক বোঝা বেরকরে নেওয়ার পর দেখা গেল, একেবারে গোয়াল ঘর বানিয়ে রেখে গেছে। পরিষ্কার করার লোকজনকে ফোন করে ডেকে আনা হল। ওরা দুজনে একটা বড় প্লাষ্টিকের ব্যাগ

এনে, ময়লায় ভরে নিয়ে গেল। ভোরের বেলা হাওড়ায় নেমে, বহুদিন পর বাস ধরে শিয়ালদা স্টেশনে এলাম। শিয়ালদাতো আমাদের পাড়ার স্টেশন। সকাল সাতটার আগেই বাড়ী ফিরে এলাম। ২৭.১২.২৪.

** কিছু মান্যজন আমার এই লেখাগুলি এক জায়গায় গুছিয়ে , PDF করে দিতে আদেশ দিয়েছেন। কাল থেকে সেই কাজে হাত দেব। আজই মাদুরাই এর ওদিকের সব হোটেল বুকিং করে নিলাম।

* 2019 সালে মেলা ভাঙ্গার সময় বেনারস থেকে কুম্ভে গেছলাম। সেই লেখাটা সাথে দিলাম।

বারানসী- বার্ধক্যের আগেই ( 2018)

মাস তিনেক আগে ট্রেনের টিকিট কাটার সময় মেয়ের ফেরার ট্রেন নিয়ে একটু অনিশ্চয়তা ছিল ; তাই ওর ট্রেনের থেকে দু ঘন্টা পরের একটা বাজে ট্রেনেই আমরা ফিরব ঠিক করেছিলাম। ট্রেন, বিশেষ করে ভারতীয় ট্রেন কোনদিনই সময়মত চলেনা, এটা কোন নতুন খবর নয়। তবুও মেয়েকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে, আমরা ঘন্টা দুই পরে ট্রেনে চাপার বুদ্ধিতে এই বাজে গাড়ীটার টিকিটই কেটেছিলাম। বেনারসে সন্ধ্যা আটটায় নির্দিষ্ট সময় ছিল এ গাড়ীর। আটটা পর্যন্তই রিটায়ারিং রুম নেওয়া ছিল। ব্যাগপত্র গুছিয়ে বেরনোর সময়ই দেখলাম, গাড়ী তিন ঘন্টা লেটে চলছে।

নিচে নেমে চা খেয়ে ওয়েটিং হলে ঢুকলাম আটটা নাগাত। ঢুকতে ঢুকতেই শুনলাম ঘোষনা হচ্ছে, ঐ গাড়ী এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরীতে আসছে। বসেই আবার রেলের আপ খুলে দেখলাম। এখানে দেরীর হিসেবে কোন ভুল নেই। তবুও, ইংরেজী মতে আজই ট্রেনটাতে চড়ার একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে বসেছি। সময় কাটানোর তাগিদেই শুরু করলাম লেখালেখি।

আলেকজাণ্ডারের সৌভাগ্যের জন্য এক এক সময় ঈর্ষা হত। এখন দেখছি ওনার দুর্ভাগ্য যে উনি সেলুকাসকে নিয়ে,"বিচিত্র এই ভারতীয় রেল " দেখে যেতে পারেন নি। একই বেনারস থেকে মেয়ে তিন ঘন্টা আগে ট্রেনে উঠেছে। সেই ট্রেন আমাদের ট্রেনের এক ঘন্টা পরে আসানসোলে পৌঁছেছে।

ওটা কোন অভাগা ট্রেন? হ্যা, বাঙালির আর এক দুর্বলতা, বেনারস যাওয়ার 'বিভূতি এক্সপ্রেস'। বিভূতি নামটার উৎস কি জানিনা। বাংলার প্রিয় সাহিত্যিকের নামে হলে তো অবশ্যই গর্বের। কিন্তু বাবা বিশ্বনাথের বিভূতি হলে তো, কলিকালে সে বিভুতি এমন চার ঘন্টা পরেই মালুম হবে।

শেষ পর্যন্ত আমরা মাত্র তিন ঘন্টা দেরীতে কোলকাতা ষ্টেশনে পৌঁছতে পেরেছি। কিন্তু বিভুতি এক্সপ্রেস হাওড়ায় পৌঁছেছে সাড়ে ছয় ঘন্টা দেরীতে।

তা, ঐ যে বাবার বিভূতির কথা বললাম; আমাদের এবারের ভ্রমণে ওরকম কোন বিভুতির আকাঙ্ক্ষা ছিল না। সাহিত্য সিনেমায় বেনারসের গল্প অনেক শুনেছি। বিশ্বনাথ দর্শনের কোন পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। দশাশ্বমেধ ঘাট, বেনারসের গলি এমনকি গলিত ঘোরা ষাঁড় দেখার ইচ্ছা নিয়েই গেছলাম।

ষ্টেশন থেকে অটো ধরে ঘাটের কাছে হোটেলে যেতে হয় জানতাম। গুগুলদাদার হিসেবে ওটা চার কিমি রাস্তা। ষ্টেশনে নামার সাথে সাথেই অটোওলা পিছনে পড়ে থাকল। ভাড়া দুশো টাকা। কিন্তু হোটেল থেকে এক কিমি দূরে

নামাবে। বড় রাস্তার উপর অনেক ভালো হোটেল আছে, একথা বলতেই, ওদের অটোওলা না ভেবে, হোটেলের দালাল মনে হল। দুজনকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করলাম। আমাদের হোটেল অনলাইন বুকিং করাই ছিল। অটো ষ্টান্ডে পৌছতে এক বয়স্ক চালক ডেকে জানতে চাইল, কোথায় যেতে চাই। ভাড়া ঐ দুশো টাকাই। হোটেলে ফোন করে জানতে বলল, হোটেলের কাছে কোথায় পর্যন্ত অটো যায়। পরে নিজেই হোটেল মালিকের সাথে কথা বলে জানাল যে, ঐ এক কিমি দূরেই দাঁড়াবে। তবে দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌছে ফোন করলে, হোটেলের লোক এসে নিয়ে যাবে।

চার কিমির জন্যে দুশো টাকা ভাড়া যথেষ্টই বেশী ; কিন্তু ট্যুরিস্টের কাছে ভাড়া বেশী নেবে, এটাই এ দেশের দস্তুর। ষ্টেষন থেকে প্রথম এক কিমি রাস্তা বেশ চওড়া। এরপর অটো সরু সরু গলিতে বেশ ঘুরল। সেটা ঐ দুশো টাকাকে বেশী না মনে হয় সেজন্য, নাকি বড় রাস্তায় আরও বেশী সময় লাগত, ঠিক বুঝলাম না। ঘুরেফিরে এক সময় বড় রাস্তায়ই পৌছলাম। নামিয়ে দিয়ে সোজা রাস্তায় হাঁটতে বলল।

সত্যিই ও রাস্তায় অটো চলা সম্ভব নয়। আমাদের তিনজনের হাতেই হালকা ব্যাগ। তবুও অষ্টমীর সন্ধ্যায় কলকাতার রাস্তায় হাঁটার মত, ধাক্কাধাক্কি করতে করতে এগোলাম। হোটেলের নাম বলে সুবিধা হবে না বুঝলাম। মুন্সীঘাট কোনদিকে জানতে জানতে এগোতে থাকলাম।

একটা গলি মত রাস্তাদিয়ে ডানদিকে চললাম। পরে বুঝেছিলাম, গলি বললেও, ওটাই একটা ব্যস্ত রাস্তা। অনেক ছোটখাটো হোটেল আছে ঐ রাস্তায়। গলির গলি, তস্য গলি পেরিয়ে, একসময় আমাদের হোটেলে পৌছলাম। এত সুন্দর একটা হোটেলের ঢোকার মুখটা কত সংকীর্ণ হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল।

হোটেলের ঘরে ব্যাগপত্র রেখে ঘাট দর্শনে বেরোলাম।

হোটেলের মেয়েটি যদিও বলেছিল, এইতো সামনেই ঘাট, আমরা সেই বড় গলিতে নেমে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলাম। এক সময় মনেহল, বোধহয় ভুল রাস্তায় এগোচ্ছি। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে আবার পিছিয়ে আসতে হল। ঐ গলিতে এগোতে গিয়েই একটা সাধারণ জিনিষ লক্ষ্য করলাম। এক বুড়িমা রাস্তার পাশের পৌঠায় বসেছিলেন। ঠেলা গাড়ীতে সব্জিওলা যাচ্ছিল; তাকে পরিস্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, "পালং শাক আছে?" পরে মুদির দোকানে সাবান কিনতে গিয়েও দেখেছি, দোকানদার পরিস্কার বাংলায় কথা বলছে। ওটা যে বাঙালীটোলা, বেশ মালুম হচ্ছিল। পরে সারনাথের শাড়ীর দোকানেও দেখেছি, বিক্রেতা সুন্দর বাংলা বলছে।

ঐ বড় গলি থেকে কয়েক সিঁড়ি উঠে , আরও সরু গলি ধরে , একে বেঁকে তিরিশ গজ মত গিয়ে হঠৎ সামনে দেখি, সুন্দর নীল জলের গঙ্গার দিকে নেমে গেছে অনেক সিঁড়ি। ওটা নারদ ঘাট। ঐ সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ চওড়া করে , ডান দিকে, বাম দিকে রাস্তা হয়ে চলে গেছে। বাম দিকে মুন্সি ঘাটের পরই দশাশ্বমেধ ঘাট।

দশাশ্বমেধ ঘাট

বেনারসের সাথে বাবা বিশ্বনাথের নাম যতোটা জড়িয়ে, তার থেকেও বেশী বোধহয় দশাশ্বমেধ ঘাটের নাম জড়িয়ে। আজকের প্রজন্মের কোন কুইজে বিশ্বনাথ মন্দির কোন শহরে জিজ্ঞেস করলে হয়তো আশি শতাংশ ছাত্র একবারে উত্তর দেবে; কিন্তু দশাশ্বমেধ ঘাটের নাম করলে, একশ শতাংশই মুহূর্তে ঠিক উত্তরটি দেবে। এবং অবশ্যই এ কৃতিত্ব সত্যজিতবাবুর।

আমরাও বেনারস বেড়াতে যাওয়ার জন্য হোটেল খোঁজার সময়, প্রথম শর্তই ছিল, ঐ দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে হতে হবে। সেই স্বপ্নের ঘাটের কাছে পৌছেই গেছলাম অবশেষে।

আমার যে কোন ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লেখার প্রধান শর্তই হল, জায়গাটার সব রকম বর্ণনা, যাওয়ার রাস্তা, খরচ খরচা সব লিখব, কিন্তু আমার কেমন লাগল, সেকথাটা মানে মানে পাশ কাটিয়ে যাব। আমার একটা জায়গায় গিয়ে কেমন লাগল, আর মেদিনীপুরের চপমুড়ি খেয়ে কেমন লাগল, দুটোই একান্তই যার যার ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। আমার নোনতা পছন্দ বলে সবারই নোনতা ভালো লাগবে, এমন তো কোন আইন তৈরী হয়নি!

আমরা নারদ ঘাটের বেশ কয়েকটা সিঁড়ি নেমে এলাম। সামনে স্বচ্ছ জলের গঙ্গায় অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা চলছে। যতো নৌকা চলছে, বাঁধা আছে তার দশগুণ। বেশকিছু নৌকা ভুটভুটি যন্ত্রে বেশ জোরেই ছুটছে; আবার একজন মাঝীই দুটো দাঁড় টেনে নৌকা চালাচ্ছে, কোন হাল নেই, এমনও অনেক। একটা ব্যাপার ওপর থেকে বোঝাই যাচ্ছিল না, সেটা হল নদীর স্রোতের মুখ কোনদিকে!

পরে জলে স্নান করতে নেমেও দেখেছি, স্রোত প্রায় নেই। ঘাটের উল্টোদিকের পাড়ে বিস্তীর্ণ বালুচর। ওপাড়েও অনেক লোক নৌকাকরে গিয়ে স্নান করছে। ওপাড়ে গরু কুকুরও ঘুরছে। পরে, বিকেলে নৌকায় ঘোরার সময়, মাঝিকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যে,ওপাড়ে জলের তলায় শুধুই বালি,আর জল অনেক দূর পর্যন্ত অগভীর,তাই লোকে ওদিকে স্নান করতে যায়। কিন্তু আমার ধর্মভীরু সেজদার মতের ওটা বিপরীত। সেজদার মতে, " গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল।"

আমরা বাঁদিকে একটু হেঁটে দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌছে গেলাম। সব ঘাটেই কিছু লোক স্নান করছে। তবে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানের যাত্রী অনেক বেশী। আমাদের ঐটুকু হাঁটার মধ্যেই জনাদুই নৌকার দালাল এসে পিছনে পড়ল। আমি কমাস আগে ঘুরে আসা, ভ্রাতৃপ্রতীম ডাক্তার প্রসূনের কাছে নৌকার ভাড়া ইত্যাদি জেনেই গেছলাম। দুপুরে আমাদের নৌকায় ঘোরার কোন পরিকল্পনা ছিল না। তবে এটুকু বুঝলাম, বেশ দরদাম করতে হবে। মুন্সীঘাটে ফিরে এসে আমি আর আমার স্ত্রী স্নান করলাম। ঠিক মাঝ দুপুর। তার ওপর ষ্টেষনে নেমে হোটেলে পৌছতে প্রায় ঘেমেই গেছলাম। তাই , পূণ্য লাভের থেকেও, ওরকম টলটলে জলে স্নান করার লোভই বেশী হল। গামছা , কাপড় চোপড় প্লাস্টিকের ব্যাগে নিয়েই বেরিয়েছিলাম। স্নান করার জন্য একটা সাবান কিনতে ওপরে উঠতে হল। জলের কাছ থেকে একেবারে ওপর পর্যন্ত পঞ্চাশটি সিঁড়ি উঠতে হাঁটু ব্যথা হয়ে গেল।

আমরা যে জায়গায় স্নান করতে নামলাম, আমাদের ঠিক আগেই একজন মহিলা আর তাঁর স্বামী ওখানে স্নান করছিলেন। প্রায় পনের কুড়ি ফুট দূরেও ভদ্রলোকের নাভি সমান জল দেখেছি। জলের তলার গোটা দুই সিঁড়ি বেশ পিছল। সাবধানে পা টিপে টিপে নামতে হল। তারপর পলি মাটিতে পা কিছুটা বসে যাচ্ছিল। কোমর জলে নেমে দেখলাম, নদীর জল কিন্তু পুকুরের মত, কোন স্রোত নেই। তবে জল বেশ ঠান্ডা। ছোটবেলায় গ্রামের পুকুরে স্নানের অভিজ্ঞতা থেকে জানি,জলে একটা ডুব দিতে পারলে আর ঠান্ডা লাগে না। প্রায় বছর আটেক পুকুরে স্নানের সুযোগ হয়নি। বারানসীর গঙ্গায় দশ ফুট মত সাঁতারও কাটলাম।

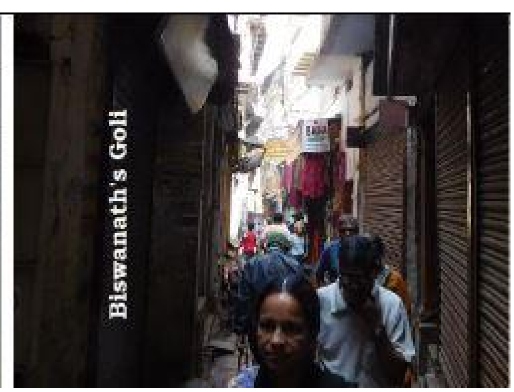


আমার স্ত্রী ঘাটেই রাখা একটা টিনের বাক্স মত ঘরে ঢুকে কাপড় পাল্টে নিল। পরদিন ভোর থেকেই দেখেছি, প্রথমদিন দুপুরেও দেখলাম, দশাশ্বমেধ ঘাটে অসংখ্য নারী পুরুষ পাশাপাশি স্নান করছে। ওখানে পোষাক পাল্টানোর কোন ঘর নেই।

মুন্সীঘাট থেকে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে এগোতেই দু'তিনজন নাঙ্গা সাধু চোখে পড়ল। একটা পাথরের চাথাল মত জায়গায়, অতিসাধারণ একটা কালো প্লাস্টিকের ত্রিপল টাঙিয়ে তার তলায় আশ্রয় নিয়েছে। ত্রিপলের ঠিক বাইরে অনেকটাই ধুনীর ছাই জমা হয়ে আছে। ঐ নাঙ্গা সাধুদের মত দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছাকাছিই আরও অন্তত আট দশজন নাঙ্গা সাধু দেখলাম। সবারই একটা জিনিসে মিল, তা হল সবাই গায়ে বেশকরে ছাইভস্ম মেখে নিয়েছে। বেশীরভাগই নিজের তালে আছে,কিংবা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। এক দুজনকে দেখলাম, আমাদের মত সাধারণ যাত্রীদের কাছে হাত পাতছে।

ওদের জীবনদর্শন বা সাধনা নিয়ে সামান্য যেটুকু পড়াশুনা করে জেনেছি, তার সাথে এই ঘাটের হট্টমেলায় বসে থাকাকে মেলাতে পারলাম না। ভোর থেকেই দলে দলে যাত্রী, বোচকা বুচকি নিয়ে আসছে। ঘাটের ওপর ব্যাগপত্র রেখে, স্নান করতে নেমে যাচ্ছে। পুরুষরা কেউ জাঙ্গিয়া পরে, কেউ গামছা পরে নামছে। মহিলারা প্রায় সবাই শাড়ী ইত্যাদি সবকিছু পরেই ঘাটে নেমে, কোমরজলে ডুব দিচ্ছে। ডুবদিয়ে উঠে, দু'চার সিঁড়ি উপরেই যে যার মত পোষাক পাল্টে নিচ্ছে।

হয়তো একশো ফুট চওড়া হবে এই দশাশ্বমেধ ঘাট। জল থেকে পাঁচ সাত সিঁড়ি উপর থেকেই পূজারী পন্ডিতদের বসার চৌকিগুলি পাতা। চৌকি আর পাথরের চাথাল মিলে অন্তত জনাকুড়ি পন্ডিত বসার ব্যবস্থা। এই পূজারী পন্ডিতদের সবারই পোশাক প্রায় একই রকম। রঙীন পাঞ্জাবি আর ধুতি। কপালে তিলক কাটা। ভোর সাড়ে পাঁচটাতেই দেখেছি, অন্তত দশজন পন্ডিত সেজেগুজে, তিলক কেটে বসেগেছে।

এই পন্ডিতদের একজন, সূর্যোদয়ের আগেই চাথালে পূজার দোকান সাজিয়ে বসেছিল। কোন একজনকে সম্ভাব্য খদ্দের বুঝে, " হ্যালো বাবু, ইধার আইয়ে", বলে ডাকাডাকি করতে শুরু করল। ঘাটের চাথালের আশেপাশে দু একজনের মাথা ন্যাড়া করা হচ্ছে দেখলাম। ওরাই সম্ভবত ঐসব পূজারী পন্ডিতদের কাছে শ্রাদ্ধ শান্তি ইত্যাদি করে। এইসব পূজারীদের পসরাই, বড় বড় বাঁশের তৈরী ছাতার তলায়। বাঁশের চাঁচের তৈরী ছাতাগুলির ওপর পলিথিনও লাগানো আছে। বৃষ্টি রোদ দুইই আটকাবে।

আমরা সূর্যোদয় দেখতেই ভোরে গিয়েছিলাম। বেনারসে বোধহয় কলকাতার থেকে আধঘন্টা মত দেরীতে সূর্য ওঠে। কিন্তু স্নানের যাত্রী ভোর পাঁচটাতেই কয়েকশ এসেগেল। সন্ধ্যার মত ভোরেও অনেকে নদীতে প্রদীপ ভাসাচ্ছিল। আর ছিল ফটোগ্রাফারদের দৌড়ঝাঁপ। বেশীরভাগই আমার মত মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তুলতে ব্যস্ত। অনেক বিদেশিনী বড় ক্যামেরায় ছবি তুলেই যাচ্ছে দেখলাম। অনেকক্ষণ ধরেই দেখছিলাম এক মেমসাহেব আর তাঁর কিশোরী কন্যা নৌকায় ওঠার ভাসানো জেটির ওপর উঠে,

স্নানার্থীদের সামনে থেকে ছবি তুলছে। একসময় দেখলাম, ছোটখাট চেহারার, সম্ভবত চিনা মহিলা, ঐখানে নেমেগিয়ে প্রবল উৎসাহে ছবি তুলেই যাচ্ছে। ওদের দেখে আমিও নিচে নেমে কয়েকটা ছবি তুললাম।

বিকালের মত ভোরেও নদীতে অনেক নৌকা ঘুরছে। দূরে একটা নৌকার পিছন পিছন, কয়েকশ পাখীর একটা ঝাঁক উড়তে দেখে ছবি তোলার চেষ্টা করলাম। ঐ নৌকার কোন যাত্রী সম্ভবত পাখীগুলিকে কিছু খাওয়ার ছুড়ে দিচ্ছিল। পাখিগুলির নাম জানিনা। সাধারনভাবে যাদের সী-গাল বলাহয়, এগুলি সেরকমই। আমরা প্রায় ফেরার রাস্তা ধরার পর, দূরে বালুচরের ওপাড়ে গাছপালার মাথার উপর সূর্যোদয় হতে দেখলাম।

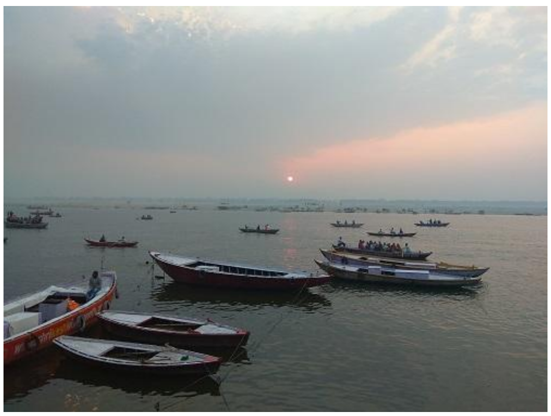

আমাদের হোটেলে ফিরেই আবার এলাহাবাদ রওনা দেওয়ার তাড়া ছিল, তাই  সকালের স্নিগ্ধ গঙ্গাকে পিছনে রেখে, মুন্সীঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম।

আগেরদিনই আমরা বিকেলে গঙ্গায় নৌকাভ্রমণ আর সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতি দেখেছি। আগেই বলেছি, ঘাটের কাছে নতুন লোক দেখলেই, নৌকার দালাল এসে ঘুরঘুর করতে থাকে। ওরা চৌষট্টি ঘাট, চল্লিশ ঘাট ইত্যাদি নানান হিসেব বলবে। আমরা চৌষট্টিটা ঘাটই দেখব বলে, একটা দাঁড়টানা নৌকায় উঠলাম। তিনজনকে নিয়ে সবকটা ঘাট দেখাবে, চারশ টাকায়। একজনই মাঝি, সেই গাইড। হালের কোন ব্যাপার নেই। পড়ন্ত বিকেলে বারাণসীর গঙ্গায় ঘুরতে ঘুরতে আমার, হাসনাবাদের ইছামতিতে নৌকা করে ভাসান দেখার কথা মনে পড়ছিল। আমি যেবার ভাসান দেখতে গেছলাম, সেবার যেন ইছামতিতে ঢেউ আরও বেশী ছিল।

নৌকা থেকে ঘাটগুলি

নৌকার মাঝি তার মতো করে এক একটা ঘাটের নাম বলে, তার একটু ইতিহাস শোনাচ্ছিল। অনেক ঘাটেরই নাম পাথরে বড় বড় করে লেখা, মাঝ নদী থেকেই দেখাযায়। মাঝির জ্ঞানবুদ্ধি মত সে যা গল্প বলছিল, আমার কাছে বেশিরভাগই গ্রহনযোগ্য মনে হয়নি। যেমন তার বক্তব্য হল, দশাশ্বমেধ ঘাটে রাজা দশরথ দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। একজন রাজা তার জীবনকালে দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন,এ তথ্যটাই অবাস্তব। আমি যা জানি, এই ঘাটে স্নান করলে, দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সমান পূণ্য হয়! বুঝতেই পারছেন,এ সব নিতান্তই প্রচলিত লোককথা।

তবে কিনা,মধ্য যুগের রানী অহল্যাবাই বেনারসের গঙ্গার পাড়েও একটা ঘাট বানিয়েছিলেন,এটা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু " কলকাত্তাকা রাণী রাসমনি", ওখানে একটা ঘাট বানিয়েছিলেন, একথা কখনো পড়িনি। আর প্রখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিকের নামে, "মুন্সীঘাট ", এটা ভাবলে মতে তৃপ্তি আসে; কিন্তু উনি নিজেই ঐ ঘাট বানিয়েছিলেন, এ বড় কষ্ট কল্পনা। মিনিট পনের নৌকা চলার পর পৌঁছলাম, হরিশ্চন্দ্র ঘাটের কাছে। গোটাদুই কাঠের চুল্লিতে দাহকাজ চলছে। ওপরে বৈদ্যুতিক চুল্লির চিমনিও দেখা যাচ্ছিল। একটা খাটুলিতে একটি মৃতদেহ নিয়ে তিনচার জন লোক হাঁটু জলে নেমে এল। খাটুলি সহ দেহটি গঙ্গায় একবার ডুবিয়ে ঘাটে তুলেনিয়ে গেল। খাটুলি বাহকদের একজন, মাথায় পাগড়ী শিখ দেখলাম। হরিশ্চন্দ্র ঘাটের কাছ থেকেই নৌকা ফেরার রাস্তা ধরল।

আবার উল্টোদিকে নৌকা চলতে শুরু করল। দশাশ্বমেধ ঘাট ছাড়িয়ে, গোটা চারেক ঘাটের পর মণিকর্ণীকা ঘাট। নিচে, জলের কাছে তিনটি, আর দোতলায় দুটি কাঠের চিতা জ্বলছে।

মাঝি জানাল, মণিকর্ণীকা ঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লি নেই। হরিশ্চন্দ্র আর মণিকর্ণীকা দুই ঘাটেই কয়েটি করে গরু ঘুরতে দেখেছি। ওরা বোধহয় মৃতদেহের সাথে আসা ফুল খেতে আসে। পরদিন গাড়ী করে শহরের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় একটি শবযাত্রীর দল দেখেছিলাম। ওরা গঙ্গার ঘাটের দিকে যাচ্ছে, এরকম কিছু বলায়, ড্রাইভার নিজেই জানাল, হরিশ্চন্দ্র ঘাটে যাচ্ছে। ওর মতে, হরিশ্চন্দ্র ঘাটই আসল জায়গা, মণিকর্ণীকা পরে তৈরী, ওটা নিয়ে অকারণ মাতামাতি। মণিকর্ণীকা থেকেই আবার দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে ফিরতে শুরু করলাম। আমার স্ত্রীর মনে হল, চৌষট্টিটা ঘাট তো দেখা হল না। মাঝি বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলল, "আমি তো দাঁড় টানাতেই ব্যস্ত, গুনে দেখেছেন তো আপনারা!" বাস্তবে, আমাদের মাঝি, গোটা পনের ঘাটের নামই বলেছিল।

নামার সময় মাঝি নৌকা থেকেই ঘাটের গোটা দশেক সিঁড়ি ওপরে একটা কাঁচের বড় জানালা মত দেখাল। বলল, ওখানে বেনারসী শাড়ী তৈরী হয়।আমরা শাড়ী কিনব না, এটা ঠিক করাই ছিল। আর ঐ মাঝির যে কিছু দালালির ব্যাপার আছে, সেটা সবাই বোঝে। তবুও,যেহেতু সন্ধ্যার গঙ্গা আরতি শুরু হতে বেশ দেরী আছে, আমরা দোকানটা একবার ঘুরেই এলাম। ঘাটের ওপর একটা দোকানে চা খাওয়ার আগেই একজন মাঝ বয়সি মাঝি, নৌকায় বসে আরতি দেখার দরদাম বুঝিয়েছে। চা খেয়ে ঐ মাঝির ছোট্ট ডিঙি নৌকায় উঠলাম।

দশাশ্বমেধ ঘাটের আরতি এখন দুভাগে ভাগ হয়েগেছে। একদিকে পাঁচজন আর একদিকে ন জন আরতি করে। আমাদের নৌকা, বেশ কসরত করে, ঠেলে ডাঙা থেকে কুড়ি ফুট মত দূরে, অসংখ্য ওরকম ছোট বড় নৌকার ভীড়ে, একটা জায়গায় রাখা হল। এখান থেকে দু দিকের আরতিই দেখা যায়। আমরা সন্ধ্যা ছটার আগেই নৌকায় বসে গেছলাম। নৌকায় হাজার খানেক দর্শক আর ঘাটের ওপরেও হাজার দুই লোক। ছটা থেকে ঘাটের ওপর নানা রঙের আলো জ্বলে উঠল। বেশ একটা উৎসব উৎসব ব্যাপার। আমরা মোবাইল ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে তৈরী, ভিডিও তোলার জন্য। নৌকা থেকে বাঁদিকের আরতির জায়গায় পাঁচজন জমকালো পোশাকের যুবক আরতি শুরু করল। মাইকে ভজন বাজছে, দুদিকে দু রকম। আরতি মোটামুটি ঐ ভজনের তালে হলেও, দুদিকে দুরকম গান বাজায়, গানের কথা বিশেষ কিছু বোঝা গেল না।

ডানদিকের দল আরতি শুরু করল মিনিট পাঁচেক দেরীতে। দু দিকেই, ওপরে ঝোলানো মাঝারি মাপের ঘন্টাগুলি লাগাতার একই ছন্দে বেশে গেল, ভক্তদের দড়ির টানে; পুরো এক ঘন্টা ধরেই। ডান দিকের আরতির সামনে, নদীতে গোটাচারেক বজরার মত বড় নৌকা, তার ছাদে বসার জন্য চেয়ার পাতা। আমাদের মাঝির হিসেবে,চেয়ারে বসার জন্য চারগুন বেশী খরচ। আরতি শুরুর আগে থেকে শেষ পর্যন্তই,চায়ের কেটলি ষ্টোভ ইত্যাদি নিয়ে, চার পাঁচ জন চাওলা, নৌকায় নৌকায় ঘুরে চা বিক্রী করেই গেল। তা করুক; এক ঘন্টা বসে বসে আরতি দেখে অনেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, একটু চা না হলে চলে! কিন্তু ঐ চাওলারা যখনই আমাদের ডিঙি নৌকায় লাফিয়ে পড়ছিল, নৌকা বিপজ্জনক ভাবে হেলে যাচ্ছিল। আমাদের মাঝিও সমানে ঐসব চাওলাকে ধমক দিয়ে যাচ্ছিল। সাহস আছে বলতে হয় মাঝির ; এই দু হাজার উনিশ সালে বসে, চাওলাকে ধমকানো! দশাশ্বমেধ ঘাটের মাঝি বলে কথা,এও তো আর যে সে লোক নয়। আরতি শেষ হতেই মাঝি, দড়ি ধরে টেনে নৌকা পাড়ের কাছে আনল। আমরা এক এক করে নেমে ঘাটে উঠলাম।

সন্ধ্যার গঙ্গা আরতি আমরা হরিদ্বারে আর হৃষীকেশেও দেখেছি। হরিদ্বারের আরতী, গঙ্গার খালের অন্যপাড় থেকে, হরকি পৌড়ীতে বসে দেখেছি, ভালো লাগেনি। হৃষীকেশের ত্রিবেণী ঘাটের আরতি অনেক সংঘবদ্ধ। কিন্তু সেখানে গঙ্গায় জল খুব কম। তবে আমাদের মত, ভক্তিহীন ট্যুরিষ্টের কাছে, সবই সমান। ভ্রমণস্থানের হরেক মজার, এও এক রঙ্গ!

সারনাথের স্তুপ

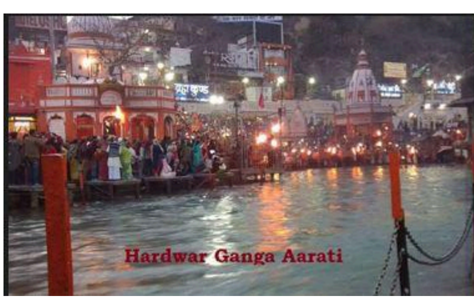
Hardwar Ganga Aarati

Hrishikesh Ganga Aarati

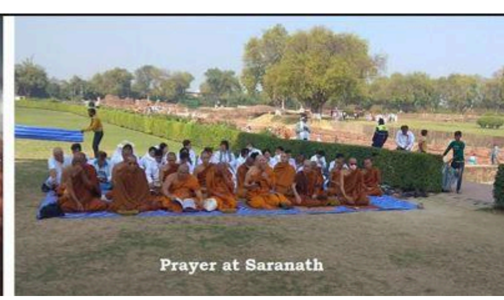
Prayer at Saranath

বিশ্বনাথ মন্দির অ-দর্শন

দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা আরতি শেষ হওয়ার পর আমরা বিশ্বখ্যাত বিশ্বনাথ মন্দির দেখার চেষ্টা করব, এরকমই ঠিক ছিল। সন্ধ্যায় কটা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে, জানতে চাওয়ায়, মাঝি জানিয়েছিল, মন্দির তো খোলা থাকবে, কিন্তু আরতির পর সবাই মন্দিরের দিকে ছুটবে, তাই ওসময় ভীড় হবে। এই ভীড় আর দীর্ঘ লাইনের কথা চিন্তা করেই, কোথাও কোন মন্দিরেই প্রায় আমাদের পূজা দেওয়া হয় না। প্রসূনভাই ডিসেম্বরে ঘন্টা ছয়েক লাইনে দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজা দিয়েছে; এসব শুনেই, পূজা আমাদের ভ্রমণসূচি থেকে বাদ দেওয়াই ছিল।

আমাদের তাড়া কিছু ছিল না। আরতির পর, পাড়ে সিঁড়িতে যারা ছিল, আমরা পাড়ে ওঠার আগেই প্রায় নব্বই শতাংশ ওখান থেকে চলে গেছে। ঘাট থেকে রাস্তায় আসতে তাই খুব ভীড় ঠেলতে হল না। দুপুরে ঐ রাস্তা দিয়ে আসার সময় দেখেছি, কলকাতায় পূজার সময় যেমন করে, রাস্তার একপাশ দিয়ে, শাল বল্লার বেড়া দিয়েছে। যারা পূজা দেবে, সম্ভবত গঙ্গায় স্নানের পর সোজা এসে ঐ বেড়ার ভেতর লাইনে দাঁড়িয়ে গেছে। একটা বড় চৌরাস্তার থেকে, দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে এগোলে, মাঝামাঝি জায়গায় একটা সিমেন্টের বড় গেট আছে মন্দিরে ঢোকার। সকালে বোধহয় ঐ গেট দিয়ে ঢোকার অনুমতি ছিল না। পূজার ডালা হাতে লোকজন ঐ চৌরাস্তার দিকে এগোচ্ছিল। সন্ধ্যায় ওরকম কোন লাইন ছিল না। আমরা ঐ বড় গেট দিয়ে বাজারে ঢুকলাম।

যাবো তো মন্দির দেখার জন্য ; তাহলে বাজারে ঢুকলাম কেন? আসলে ঐ বাজারের ভেতর দিয়েই মন্দিরে যাওয়ায় রাস্তা। শ্যামবাজার বা কলেজস্ট্রিট মার্কেটের ভেতর যেমন, দু দিকের দোকান পাটের মাঝে যেমন চার ফুটের মত রাস্তা থাকে, এও প্রায় তাই। নানান জিনিষের দোকান। কাপড় জামা, পান মশলা, মিঠাইয়ের দোকানের মাঝে মাঝে পূজার ডালা বিক্রীর দোকান।

সম্ভবভ পৃথিবীর প্রাচীনতম মন্দির। শুনেছিলাম বিশ্বনাথের গলি বেশ সরু; কিন্তু সে যে এত সরু হয়ে যাবে, গলির শেষ পঞ্চাশ ফুটে না পৌছন পর্যন্তও বুঝিনি। প্রায় একশ গজ আগে থেকেই, ডালার দোকানে জুতো মোবাইল ইত্যাদি রেখে যেতে বলছিল। এক তো আমরা পূজা দিতে যাচ্ছি না; তাই ডালা কেনার প্রশ্নও নেই। অনেকেই উল্টোদিকের থেকে, জুতো পায়েই আসছে। তাই আমরা না থেমে এগিয়েই গেলাম। কিন্তু শেষ পঞ্চাশ ফুটের মত জায়গায় এসে বুঝলাম, আর জুতো পায়ে এগোনো যাবে না। একটা ডালার দোকানে দেখলাম, জুতো রাখা আর মোবাইল জমা করার লকারের ব্যবস্থা আছে। ওখানে জুতো মোবাইল রেখে, লকারের চাবি পকেটে নিলাম। কত টাকা দিতে হবে জানতে চাইলে, দোকানদার জনাল, ওর জন্য টাকা লাগবে না, ডালা নিলেই হবে। দুশো টাকার একটা ডালার চকচকে প্যাকেট নিয়ে ওখানেই লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম।

কলকাতার বিখ্যাত পূজা প্যান্ডালের ঢোকার লাইনের মত, একবার দাঁড়িয়ে গেলে আর ফেরার উপায় নেই। কিন্তু এখানে ফেরার রাস্তাও ঐ সাড়ে তিন ফুটের গলি। মাঝে মাঝে ঐ দুই লাইনের ভেতর দিয়ে, ষ্টেনগান কাঁধে পুলিশও এদিক ওদিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সে সময় দুই লাইনের লোককে কাত হয়ে জায়গা দিতে হচ্ছে। মন্দিরে ঢোকার তিরিশ ফুট মত আগে, ভাল মত সিকিউরিটি চেক হল। একটা অতি প্রাচীন বাড়ীর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। দশ ফুট মত যাওয়ার পর দেখি উল্টো দিকের থেকেও, আমাদের মত আর একটা লাইন আসছে।

মুখোমুখি দুই লাইনের একজন দুজন করে ডান দিকের দু ফুটের দরজা দিয়ে ঢুকতে থাকলাম। বোধহয় এক সেকেন্ডের জন্য একবার মুখ তুলে, মন্দিরের চেহারাটা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। দাঁড়ানোর কোন উপায়ও নেই। একটু সোনালি রঙের মন্দিরের চুড়াটা যেন এক ঝলক দেখতে পেলাম। একটা জায়গায় এসে লাইনটা যেন একটু ছড়ানোর জায়গা পেল। ডানদিকে, মেঝেতে চৌকো মত খোপের ভেতর অনেক ফুল বেলপাতা দেখে, আমার স্ত্রী বোধহয় ভেবেছে, শিবলিঙ্গ ওখানেই আছে। দু একজন ঐ ফুল বেলপাতার স্তুপের ওপর আরও ফুল বেলপাতা চাপাচ্ছে দেখে, মেয়ের হাতে কটা ফুল বেলপাতা দিয়ে, ওখানে চাপাতে বলল। দু একজন, ডালার দোকানে কেনা, কাগজের কাপের দুধও ঐ ফুল বেলপাতার স্তুপের ওপর ঢালল। এত সহজে, এমন বিখ্যাত দেবতার মাথায় পূজা চাপানো যাবে, এটা আমি মানতে পারছিলাম না।

সেজন্যই বোধহয় লাইন ছেড়ে বের হইনি। ডানদিকে ঐ ফুল বেলপাতা ভরা চৌবাচ্চার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই বাঁদিকে তাকালাম। ওদিকে একটা বড় জানালার মত দরজা আছে। দরজায় দুজন ধুতি শার্ট পরা লোক দাঁড়িয়ে, হাত থেকে ডালার প্যাকেটগুলি প্রায় কেড়ে কেড়ে নিচ্ছিল। ঐ ঘরের ভেতরও একটা, সম্ভবত রূপা বাঁধানো চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার ভেতর ফুল বেলপাতার স্তুপের ভেতরই বাবা বিশ্বনাথের অবস্থান, এটুকু বোঝার চেষ্টা করছি; এমন সময় দেখি ডান পাশ থেকে কেউ একজন আমার ডান হাত ধরে টানছে। আমাদের কলকাতার ভীড় বাস ট্রেনে চলার অভ্যেস। মুহূর্তের জন্য মনে হল, পকেটমার। যদিও পকেটে লকারের চাবি ছাড়া আর কিছুই ছিল না ; তবুও হাতটা পকেটেই চেপে রইলাম। কে টানে হাত? বোঝার জন্য মুখ ফেরাতে দেখি আমার মতই সাধারণ প্যান্ট শার্ট পরা একটা লোক, হাত জোড় করে দেখিয়ে বলছে, হাত ঐ ভাবে রাখতে হবে। ঘোর সংসারী মনটাকে ভক্তির পথে ফেরানোর আগেই বুঝলাম, বাবার প্রবল ভক্তদের ঠেলায়, বাবার দরজা ছাড়িয়ে অনিকটাই এগিয়ে গিয়েছি।

লোকটা হাত ধরে টানাটানি করার সময়ই একবার চোখে পড়েছে যে, দরজায় দাঁড়ানো একজন লোক, হয়তো বা পান্ডাই হবে, আমার স্ত্রীর হাত থেকে ডালার প্যাকেটটা নিয়ে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে, পাশ ফিরে, ঐ ফুল বেলপাতার স্তুপের দিকে হাতটা বাড়িয়েই ফেরৎ এনে, আমার স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে, দক্ষিণার জন্য হাত পেতেছে। এদিকে আমার স্ত্রীর হাতে যে পাঁচ বা দশ টাকার কয়েনটি ছিল, সেটিকে ও সামনেই একটা দানবাক্স দেখে তার মধ্যেই ফেলে দিয়েছে। ওর এই কান্ড দেখে পান্ডা মশাই তো একেবারে চমকে উঠেছে। এমন অদ্ভুত ভক্ত সচরাচর তো ওরাও দেখে না। বাবার দরজার সামনে থেকে চার পাঁচ ফুট এগিয়ে আসার পর, আমার স্ত্রী জানতে চাইল, বাবা বিশ্বনাথের অবস্থানটা কোথায়? আসলে ওর ঐ হাত থেকে ডালার প্যাকেটটা ছিনতাই হয়ে, যেভাবে মুহূর্তের ভেতরই প্রসাদ হয়ে ফিরে এসেছে, সেই ম্যাজিকটা বুঝতেই ওর ঐ সময়টা চলে গেছে; বাবার রূপা বাঁধানো চৌবাচ্চা বা ফুল বেলপাতার স্তুপের দিকেই ওর চোখ যায়নি।

সত্যি বলতে কি, এসব বিখ্যাত মন্দিরে পূজা দেওয়ার জন্য লোকে ছ ঘন্টা সাত ঘন্টা লাইন দিয়ে, কখনো কয়েকশো টাকার টিকিট কেটে তবেই পৌছয়। এত কম পরিশ্রমে, এত কম সময় নষ্ট করে, বাবার দর্শন হয়ে গেল; এসব বাবারই ঘোর অপছন্দের। থাক বাবা তাঁর মহিমা নিয়ে। আমরা ঘোর ভক্তিহীণ ট্যুরিস্ট, বাবার মন্দিরের থেকে বেরিয়ে আসার পথে, কোনরকম হুড়োহুড়ি ছাড়াই, মা অন্নপূর্ণার মন্দির দর্শন করে ধন্য হলাম।

ডালার দোকানে ফিরে, লকার খুলে মোবাইলগুলি নিলাম। জুতা পরে ফেরার পথ ধরলাম। ঐ বাজারের গলিতেই একটা দোকানে রাবড়ি বিক্রী হচ্ছে দেখে দাঁড়ালাম। বেনারসের রাবড়ি না খেলে নাকি জীবনটাই বৃথা। ঠিক আছে, চল্লিশ টাকা দিয়ে একশ গ্রাম রাবড়ি কিনে, তিনজনে ভাগকরে খেয়ে জীবন ধন্য করলাম। ফেরার পথে, আমাদের হোটেলের কাছেই একটা ট্র্যাভেল এজেন্টের দোকানে, পরদিন সকালে এলাহাবাদ যাওয়ার জন্য একটা গাড়ী ঠিক করে হোটেলে ফিরলাম।

আমার কুম্ভ মেলা দর্শণ

এবার বারানসী বেড়ানোর পরিকল্পনা করার সময় একবারও মাথায় আসেনি যে ঐ সময় কুম্ভ মেলাও চলবে। সত্যি বলতে কি, কুম্ভ মেলা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমাদের ছিল না। আমাদের বেড়ানোর পরিকল্পনা সব সময়ই ছেলে মেয়ের পরীক্ষার তারিখ ইত্যাদি দেখেই করা হয়। এবারও তিন সাড়ে তিন মাস আগে, ট্রেনের টিকিট কাটা। অতো আগে, মেলার দিন ক্ষণ জানার কোন চেষ্টাও করিনি। আর আমাদের এবারের বেড়ানোর পরিকল্পনা ঐ বারাণসী আর তার আশেপাশের জায়গায়। যে ট্রেনে যাচ্ছি, ওটাই যে আর দু ঘন্টা বসে থাকলে, একেবারে কুম্ভ মেলায় পৌছে দেবে, এটা ভাবার কোন প্রশ্নই ছিল না।

আমার বন্ধুদের ভেতর গোস্বামীবাবুর মত ভ্রমণপাগল লোকও আছেন। কিন্তু বারাণসীর মত অতি বিখ্যাত জায়গায় যাওয়ায় আগে ওনাকে জিজ্ঞেস করে, ওনাকে বিরক্ত করতে চাইনি। একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেনে বসে মনে হল, গোস্বামীবাবুকে একটা বার্তা পাঠিয় রাখি। বর্তা পেয়েই উনি উত্তরে লিখলেন, এলাহাবাদটাও একদিন ঘুরে আসুন। এবার আর ওটা হবে না, জানানানোর পরই উনি হিসেব করে দেখিয়ে দিলেন, আমার ঐ দু রাত তিন দিনের ভেতরেই বারাণসী, তার আশেপাশের কয়েকটা জায়গায় ঘুরেও, একদিন এলাহাবাদটাও দেখে আসতে পারি। তবুও খুব একটা উৎসাহ দেখালাম না। তখনই, সম্ভবত আমার আগ্রহ বাড়াতে, উনি জানালেন যে, কুম্ভ মেলা এখনও চলছে।

অবশ্য কুম্ভ মেলায় যাওয়ার সাহস হয়নি কোনদিন। শুধু মাত্র ভীড়ের ভয়েই, ওসব মেলা ইত্যাদি আমরা এড়িয়ে চলি। তবুও এবার কেমন যেন মনে হল, গোস্বামীবাবু এত উৎসাহ দিচ্ছেন, খোঁজখবর নেওয়াই যায়। পরদিন সকালে ট্রেনে বসেই, মোবাইলের নেট ঘাঁটাঘাঁটি করতে শুরু করলাম। একটা সংস্থা, মাথাপিছু মাত্র সাড়ে সাতশো টাকায় বেনারসের থেকে এলাহাবাদ নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে আনবে।খুব উৎসাহ পেলাম।কিন্তু ওদের ফোন করলে জানাল যে, ওটা এখন আর চালু নেই। ষ্টেশনের থেকে অটো নিয়ে আমাদের হোটেলে যাওয়ার সময় প্রায় এক কিমি দূরে নামিয়েছিল। বাকীটা হাঁটার সময় দু একটা গাড়ী ভাড়ার দোকান চোখে পড়েছে। কিন্তু সন্ধ্যায় মন্দির থেকে হোটেলে ফেরার রাস্তায় ঐ একটিই দোকান দেখলাম। একজন মাঝ বয়সি লোক একাই চুপচাপ বসে ছিলেন। এলাহাবাদ গিয়ে ফিরে আসার গাড়ীর কথা বলতেই বুঝলাম, ওটা ওখানে বেশ চালু ব্যাপার। মোটামুটি পাঁচ হাজারের মত লাগতে পারে, এমন একটা ধারনা গোস্বামীবাবুর সাথে আলোচনা করে বুঝেছিলাম। এখন তাই সাড়ে তিন হাজার টাকা বলায়, একবারেই রাজী হয়ে গেলাম। এক হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে, সকালে কোথা থেকে গাড়ীতে উঠব জেনে হোটেলে ফিরলাম।

ট্রাভেল এজেন্ট ভদ্রলোকের একটা কথা আমাদের একটু চিন্তায় রাখল। গাড়ী এলাহাবাদ শহরে নাও ঢুকতে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে টোটো বা অটো করে সঙ্গম পর্যন্ত যেতে হবে। উনি আমাদের সকাল ছটাতেই রওনা হতে বলেছিলেন; কিন্তু আমরা স্নান করে, আটটা নাগাত বেরতে চাই জানালাম। যদিও উনি মুখে কিছুই বলেননি, ওনার মুখ দেখে আমার মনে হল, বেশ অবাকই হয়েছেন। আসলে এমন বিচিত্র লোকজন তো সহসা দেখাও যায় না। বাড়ীতে খেয়েদেয়ে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে যাব বললে যেমন হয় আর কি!

যাচ্ছি কুম্ভমেলায়, প্রয়াগের সঙ্গমে ডুব দেওয়ার জন্যই তো কোটি কোটি মানুষ, আসমুদ্রহিমাচল থেকে জীবন বাজী রেখে দৌড়ে আসছে, মাস দেড়েক ধরে। অবশ্য নিজেদের আকাট না ভেবে একটু উকিলের যুক্তিতে, নিজেদের বড় ভক্তও ভাবতে পারি। বলাতো যায় না, উনি হয়তো ভাবলেন, এরা সকালে বারানসীর গঙ্গায় পূণ্যস্নান করে দুপুরে প্রয়াগে ডুব দেওয়ার মানত করে এসেছে।

কথামত পরদিন সকালে আটটার দশ মিনিট আগেই ঐ ভদ্রলোককে ফোন করে জানালাম যে আমরা বেরচ্ছি। উনিও ঠিক সময়েই দোকানের সামনে এসে অপেক্ষা করতে থাকলেন। আমাদের হোটেল থেকে বেরনোর সময় একটা ছোটখাট নাটকে মিনিট পনের দেরী হয়ে গেল। কারনটা প্রায় হাস্যস্কর, কিন্তু আমার মেয়ের জেদের জন্য, ভাষা দিবসের পরের দিন সকালেই, এমন একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, ভাষা নিয়ে মাতামাতি করার কিছু নেই।

আমাদের হোটেলের বুকিং ছিল একটা লাঞ্চ আর একটা ব্রেকফাস্ট সহ। কিন্তু হোটেলের একটিই মাত্র কর্মচারি ছেলেটি বলছিল যে, সাড়ে আটটার আগে ওদের রান্নার লোক আসে না। তাই আটটায় ব্রেকফাস্ট দিতে পারবে না। আমার মেয়ে ছেলেটিকে ধমক দিয়ে বলেছে, দরকার হলে বাইরের দোকান থেকে খাওয়ার কিনে আনতে হবে। আমরা আটটার মিনিট পাঁচেক আগে নেমে দেখি, হোটেলের গেট বাইরে থেকে তালা দেওয়া। রিসেপসনে এক চিনা ভদ্রলোক বসে ফোনে কথা বলছে। শুধুমাত্র " উখী, উখী " ছাড়া আর কোন কথাই বুঝতে পারছিলাম না। আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম, হোটেলের ছেলেটি বাইরে থেকে আমাদের জন্য খাওয়ার আনতে গিয়েছে। হঠাৎ দেখি ঐ চিনা ভদ্রলোক রিসেপসনের ল্যান্ড ফোনের রিসিভার এক হাতে, আর অন্য হাতে ফোনের বাক্সটা নিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে আমাদের ডাকছে; বার বারই বলছে, " ক্ষোলিং, ক্ষোলিং"!

আমি ফোনটা ধরে, হ্যালো বলায়, ওদিক থেকে একজন লোক বলল, সে হোটেলের মালিক। আমি ভারতীয় কি না জেনে, ইংরেজীতেই জানতে চাইল, হোটেলের কর্মচারি কাউকে দেখছি কি না। ওরা কেউ নেই, হোটেলের মেইন গেট তালা দেওয়া ; আমরাও হোটেল ছেড়ে বেরনোর জন্যে অপেক্ষা করছি জানালাম। ফোন ছাড়ার পর, চিনা ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা কি! আমি ইংরেজী ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করে দেখলাম, কিছুই বুঝছেন না। আমি ইংরেজী ভাষায় বলছি কি না বোঝার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, পকেট থেকে মোবাইল বের করলেন। সম্ভবত, মোবাইলের অনুবাদক সফ্টওয়ার চালিয়ে, আমাকে লিখতে বললেন। কি বোর্ড দেখিয়ে বললেন, " এ বি চি!"

আমি ইংরেজী ভাষায় ওনার মোবাইলে লিখলাম, আমরাও হোটেল ছেড়ে বেরনোর জন্যে অপেক্ষা করছি। হোটেলের ছেলেটি বাইরে আছে। সাথে সাথে প্রতিটা শব্দ, চিনা ভাষায় মোবাইলের স্ক্রিনে ফুটে উঠছে দেখলাম। এর মধ্যে হোটেলের ছেলেটির মোবাইলে একটা ফোন আসায় বুঝলাম, সে মোবাইলটাও রিসেপসনের টেবিলে রেখে গেছে। চিনা ভদ্রলোক আমাকে পাখির মত ডানা মেলে ওড়ার ভঙ্গি করে বোঝালেন, ওনার প্লেনের সময় হয়ে আসছে। কটায় ফ্লাইট জানতে চাওয়ায়, আঙুল তুলে জানালেন, নটায়।

এর মধ্যে আরও একটি পরিবার ব্যাগপত্র নিয়ে নিচে নেমে এসেছে। আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট ভদ্রলোকের ফোনও এর মধ্যে এসেছে। উনিও আমাদের এত দেরী দেখে চিন্তায় পড়েছেন। ওনাকে ব্যাপারটা বোঝাতে বোঝাতেই, হোটেলের ছেলেটি সাইকেল চালিয়ে এসে গেল। ওকে কলাপ্সেবল গেটের বাইরে দেখেই চিনা ভদ্রলোক দৌড়ে গেছেন। হৈ হৈ করে কি বলছেন, বোঝার কোন উপায় নেই। ছেলেটি হন্তদন্ত হয়ে রিসেপসনের দিকে চলল। হাতের খাবারের প্যাকেট দুটি সামনের টেবিলে রেখেই, হোটেলের বড় খাতাটা বের করে দিল,সই করার জন্য। এই দেড় দুই সেকেন্ডের ভেতরই, চিনা ভদ্রলোক মুকাভিনয় করে ওকে বুঝিয়েছেন, উনি প্লেন ধরার জন্য দৌড়চ্ছেন; ঘুসি পাকিয়ে ওকে দেখিয়ে বোঝালেন, খুব রেগে গেছেন।

আমরাও ঐ পুরি আলুর তরকারির প্যাকেট তুলে নিয়ে রওনা দিলাম। খাতায় সই করার সময়ই শুনলাম, ছেলেটি ওর মালিককে ফোনে জানাচ্ছে যে, ওর আর এক সহকর্মী হঠাৎই অনুপস্থিত হয়েছে। আমরা তস্য গলি থেকে বড় গলিতে নেমে দেখলাম, ঐ চিনা ভদ্রলোক উল্টোদিকে তাকিয়ে প্রবল বেগে সিগারেট টানছেন। তখন সোয়া আটটা বাজে; কি করে বত্রিশ কি মি দূরের বেনারস এয়ারপোর্টে নটায় পৌছতে পারবেন বুঝলাম না।

আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট ভদ্রলোকের দোকানটা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিলাম। উনি উল্টোদিকের একটা বাড়ীর পৈঠায় বসে ছিলেন। আমার স্ত্রী আর মেয়েকে দেখে চিনতে পেরে হৈ হৈ করে উঠলেন। তখনও একটা দুটো করে দোকানপাট খুলছে। অন্য একজন দোকানদারই সম্ভবত, আমরা গলি ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিলাম বুঝে একটু রসিকতাও করলেন," ইয়ে বেণারসকা গলি"! আমরা ট্রাভেল এজেন্ট ভদ্রলোকের পিছন পিছন চললাম বড় রাস্তায় গাড়ী যেদিকে রাখা আছে সেদিকে। প্রায় আধ কিমি হাঁটলাম। আর সত্যিই বুঝলাম," বেনারসকা গলি" কী বস্তু।

একটা বড় রাস্তার ওপর আমাদের জন্য গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। পরের দিনের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করে আমরা চললাম, অমৃত কুম্ভের সন্ধানে।

সেই ১৯৮৮ সাল থেকেই শুনে আসছি, কুম্ভ। কোনদিনই ঐ অমৃতের লোভ আমার ছিল না। সমরেশ বাবু, নবনীতা দেবসেন মহাশয়া আর হালের ভাস্কর বাবুর লেখা ; সব লেখকই মেলায় সারা ভারতের বিচিত্র মানুষ দেখার উপরেই জোর দিয়েছেন। পূণ্যলোভাতুর ভারতের আম জনতার একটা আভাস দশাশ্বমেধ ঘাটেই পেয়েছি। এমন কি নাঙ্গা সাধুদের আর রঙ্গসন্ধানী বিদেশিনীদেরও দেখা পেয়েছি ঐ দশাশ্বমেধ ঘাটেই। তবুও প্রয়াগরাজে কুম্ভের মাঝেই গিয়ে হাজির হব, এমনটাতো বাড়ী থেকে বেরনোর সময়ও ভাবিনি।

এ গাড়ীর ড্রাইভার বেশ চালাক চতুর লোক। কথায় কথায় জানলাম, এবারই কুম্ভ মেলা উপলক্ষে, অন্তত পঁচিশবার বেনারস থেকে এলাহাবাদে এসেছে। কত সময় লাগবে জানতে চাওয়ায়, সব ড্রাইভার যেমন একটু টেনে বলে, এও সেভাবেই বলল, রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামে না পড়লে তিন ঘন্টা লাগবে। এরও সেই বক্তব্য, বেশ সকালে বেরতে পারলে, ভীড় ইত্যাদির আগেই যাওয়া যেত। শহরে ঢোকা যাবে কি না, বা শাস্ত্রী ব্রীজের উপর দিয়ে যাওয়া যাবে কিনা, সবই নির্ভর করছে ওখানে গিয়ে কেমন ভীড়ের মধ্যে পড়ি, তার উপর।

একশ কুড়ি কিমি  রাস্তার অর্ধেক মত চওড়া হাইওয়ে ; অনেকটাই এদিক ওদিক ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। মাঝে তেমন বড় শহর আর নেই। গোটা তিন চার গঞ্জের মত পড়ল। রাস্তার দুপাশে গম আর সর্সের ক্ষেত। এক ঘন্টা চলার পর, রাস্তার পাশের একটা সাধারণ চায়ের দোকানে বসে চা খেলাম। আর আমাদের যুদ্ধ করে আনা, পুরি আলুর তরকারি।

এলাহাবাদ শহরে ঢোকার মাইল চারেক আগে একটা জায়গায়, ডানদিকে ফাঁকা মাঠের ভেতর কয়েকটা বাস দাঁড়িয়ে আছে, দেখাল আমাদের গাড়ীর ড্রাইভার। মেলার ভীড়ের সময় ঐখানেই সব গাড়ীকে থেমে যেতে হয়েছে। বেশকিছু নতুন হলুদ রঙের বাস, এখান থেকে যাত্রীদের নিয়ে মেলায় ঢুকিয়েছে। ড্রাইভার বেশ ভক্তিভরে ওদের মূখ্যমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করে জানাল যে, উনি পূণ্যার্থীদের জন্যে বিনা পয়সায় এসব ব্যবস্থা করেছেন। এটাও জানাল যে, তবুও হাজার হাজার মানুষ রাস্তা ধরে হেঁটে মেলায় গিয়েছে। আমরা হাঁটার লোক একজনও দেখিনি; তবে ওরকম হলুদ বাস দু চারটে দেখেছি রাস্তায়।

সব জেলা শহরে যেমন হয়, এলাহাবাদেও তেমন, শহরে ঢোকার দু তিন কিমি আগে থেকেই রাস্তায় গাড়ীর গতি ক্রমশ কমতে শুরু করল। আমাদের ড্রাইভার একটা জায়গায় বাম দিকে নামার চেষ্টায় বড় রাস্তা থেকে সরে এল। কিন্তু ওখানে একেবারে বন্দুকধারী পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশের কাজ করছে। ওরা জানাল একটু আগে বাঁদিকে নামা যেত; এখন আর কিছু করার নেই, সামনে এগিয়ে গাড়ী ঘুরিয়ে আনতে হবে। এবার ড্রাইভার সোজা গাড়ী চালিয়ে শাস্ত্রী ব্রীজের উপর দিয়ে চলল।

এই সেই গোস্বামীবাবুর প্রিয় শাস্ত্রী ব্রীজ। উনি ব্রীজে দাঁড়িয়ে নিচের মেলা দেখতে বলেছিলেন। এই ব্রীজে গাড়ী দাঁড়ানো অসম্ভব। চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়ে নিচের মেলার ছবি তোলার চেষ্টা করলাম, সুবিধা হল না। দু দিকেই যতোদূর চোখ যায়, শুধুই তাঁবু আর তাঁবু। দিনের আলোতে বিশেষ দর্শনীয় মনে হল না। তবে রাত্রে যখন হাজার হাজার আলো জ্বলবে, নিশ্চয়ই সুন্দর লাগবে।

গাড়ী ব্রীজ পেরিয়ে বাঁদিকের রাস্তায় চলল। এপাড়ে রাস্তায় জ্যাম ক্রমশ বাড়ছে। রাস্তার বাঁদিকে সেই তাঁবু ভর্তি মাঠ।

এই রাস্তার পাশে কিছু লোকজনকে দেখে মনে হল, স্নান করে ফিরছে। ব্রীজ থেকে আধ কিমি মত এগিয়ে একটা ফ্লাই ওভারের তলাদিয়ে গাড়ী ডানদিকে ঘুরে ফেরার রাস্তা ধরল। আবার প্রায় এক কিমি ওরকম জ্যাম রাস্তায় চলে, গাড়ী ডানদিকে নেমে গেল বড় রাস্তা থেকে। একেবারে নদীর কাছে এসে বোঝা গেল, ঐ রাস্তায় গাড়ী আসছে উল্টোদিকের থেকে। ঐ রাস্তাটা একটা সরু ভাসানো পুলের দিক থেকে আসছে। অগত্যা গাড়ি ঘুরিয়ে আবার বড় রাস্তায় উঠতে হল।

পরের ভাসানো পুলের ওপর দিয়ে আমাদের গাড়ী আবার গঙ্গা পেরিয়ে পুবপাড়ে এল। ডাইনে বাঁয়ে এরকম ভাসানো পুলের সংখ্যা দশ বারোটা বোধহয়। বড় বড় ড্রামের ওপর পুরু রবারের চাদর ফেলে তৈরী এই পুলগুলী। মেলার ভেতর প্রায় সব রাস্তাই বালির ওপর ওরকম রবারের চাদর ফেলে তৈরী। সমস্ত রাস্তা জল ছিটিয়ে ভেজানো, কোথাও ধুলো উড়তে দেখিনি।  পুলের ওপর দিয়ে গাড়ী চলার সময়ই দেখেছি, দুপাড়ের বালুচরে যতোদূর চোখ যায়, মেলার তাঁবু। পুবপাড়ে, শাস্ত্রী ব্রীজের উত্তরে, অনেকদূর পর্যন্ত নদীর জলের কয়েক ফুট দূরে, অনেকগুলি টিনের খোপ খোপ করা। ওগুলী স্নানের পর পোষাক পাল্টানোর ঘর। আমরা পুবপাড়ে এসে আবার ডানদিকে চললাম। শাস্ত্রী ব্রীজের তলা দিয়ে অন্তত দু কিমি মত দক্ষিণদিকে এগিয়ে গেলাম।

গাড়ীকরে চলতে চলতেই  দেখতে পেলাম অসংখ্য তাঁবুর সারি। লোকজন প্রায় নেই। রাস্তার পাশে একেকটা আখড়ার বড় বড় গেট। গেটে বড় বড় হিন্দী হরফে আখড়ার নাম আর প্রধান বা ঐ জাতীয় কোন সাধু মহারাজের ছবি। গেটের পিছনে বিরাট বিরাট ম্যারাপ বাঁধা। আমাদের পরিচিত গেরুয়া গোষ্ঠীর একটা ম্যারাপও চোখে পড়ল।  বেশ কয়েকটি লরীতে, প্যান্ডালের খোলা বাঁশ কাঠ বোঝাই হচ্ছে দেখলাম। রাস্তার একেবারে পাশে, কয়েকটা খোলা তাঁবুর জায়গায়, খড় বিচালি ছড়ানো। একটা জায়গায় পর পর দমকলের আপিস আর থানা দেখলাম। করুগেটেড  টিনের তৈরী ঐ সব আপিসে লোকজন বিশেষ চোখে পড়ল  না।

ঐ বিচালি দেখে একটা ভয়ের কথা মাথায় এল। কুম্ভ মেলায় তো দেশের যত বিখ্যাত গাঁজাখোরের জমায়েৎ হয়। তাছাড়াও বেণারসেই দেখে এলাম, নাঙ্গা বাবাদের আখড়ার কাঠের আগুনও সব সময় জ্বলছেই। ঐ সব আখড়ার মেঝেতেও কি খড় বিচালি পাতা থাকে?

দু চারটে রাস্তা দিয়ে নদীর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে, শেষে একটা বড় হাতির মাথাওলা গেট দিয়ে নদীর দিকে যাওয়ার রাস্তা পেল। গাড়ী একেবারে নদীর জল থেকে তিরিশ ফুট মত দূরে গিয়ে থামল। আরও এগোন যেত; কিন্তু গোটা মাঠটা কাদা হয়ে থাকায় আমাদের গাড়ী আর এগোল না। শেষ প্রায় একশ গজ জায়গায় কোন তাঁবুর ব্যবস্থা ছিল না, বোঝা যায়। আমরা হেঁটে একেবারে জলের কাছে চলে গেলাম। তখন একেবারে ভর দুপুর, ছাতা ছাড়া দাঁড়ানোর উপায় নেই। আমার গায়ে একটা শীতের জামা ছিল ; গরমে একেবারে ঘেমে গেছলাম। টলটলে পরিস্কার নদীর জল দেখে স্নান করার ইচ্ছা হল। এপাড়ে দু চারজন করে লোকই স্নান করতে নামছে। ওপাড়ে লোক পিলপিল করছে। এদিকে পাড়ের থেকে পনের কুড়ি ফুট দূরদিয়ে, প্লাস্টিকের ভাসানো বাক্সের বেড়া চলে গেছে, ডানদিক বাঁদিকে যতোদুর চোখ যায়।

ওপাড়ের কাছে, জলের উপর এক ঝাঁক কালো পাখি বসে আছে। এতদূর থেকে চেনার কোন উপায় নেই। চেহারা কিন্তু শকুনের থেকেও বড়। ওরা ছাড়াও বেশ কিছু সাদা পাখিও ওদের কাছে বসছে আর উড়ছে। এই সাদা পাখি বেণারসেই অনেক দেখে এসেছি। আমার মেয়ে ক্যামেরায় যে ছবি তুলেছিল, বাড়ী এসে সেগুলিই বড় করে বোঝা গেল, ঐ বড় পাখীগুলি একরকম বড় পানকৌড়ি। আর ওরা নদীর বুকে চড়ায় বসে ছিল।

আমি গাড়ী থেকে গামছা এনে, নদীতে নেমে স্নান করলাম। পূণ্য কিছু হল কি না জানিনা ; প্যাচপেচে গরমের থেকে শরীর আরাম পেল। ঐ প্লাশটিকের ভাসানো বাক্সের বেড়ার ওপাশে কয়েকটা মাছ ধরার নৌকার মত দেশী নৌকা বাঁধা ছিল। ওদের কাছে জানতে চাইলাম, সঙ্গমে নিয়ে যায় কিনা। আমার সহকর্মী, ডাক্তার দাস সেরকমই বলেছিলেন। ওরা জানাল, ঐ দিন, ওপাড়ে কোন মন্ত্রী বা ওরকম কেউ আসায় নৌকা বিহার হবে না। আমি স্নান করে উঠে ওখানেই পোষাক পাল্টে, গামছা রোদে মিললাম। দুটি একটি করে গাড়ীতে আমাদের মত দু চারজন করে যাত্রী আসছে যাচ্ছে। কেউ কেউ স্নান করছে। পাড়ে যথেষ্ট পুলিশ আর অন্যান্য কর্মচারি আর স্বেচ্ছাসেবক ও ইতস্ততঃ অলস ভাবে ঘুরছে। মহিলাদের পোষাক পাল্টে নেওয়ার জন্য একরকমের চার দেওয়ালের তাঁবুর মত নিয়ে, কিছু মহিলা স্বেচ্ছাসেবক কসরত করে যাচ্ছে। এক আধজন মহিলা স্নান সেরে ঐ খোপে ঢুকেও যাচ্ছে।

জলের কাছে, পাড়ের উপর একজন মহিলা, চরের মাটির উপরেই পূজার সরঞ্জাম নিয়ে দোকান বসিয়েছে। নারকেল, ধুপ, সিঁন্দুরের প্যাকেট ইত্যাদি। এছাড়া আর দোকানপাট কিছু নেই। গাড়ীর কাছে ফিরে এসে একজন আইসক্রীম বিক্রেতাকে পেলাম। আইসক্রীম কিনে খেতে শুরু করতেই, একজন ভিখারিনী এসে হাত পাতল। আইসক্রীম খেতে চায় কিনা জেনে, ওকেও একটা দিতে বললাম। তীর্থক্ষেত্রে ভিখারি বলতে ঐ একজনই। দুটি ছেলেকে দেখেছি, স্নানের জায়গায় বারবারই ডুব দিয়ে, পয়সা তুলে আনছে। বাইশ না বত্রিশ কোটি লোক এবার কুম্ভে স্নান করেছে; তাদের পাঁচ শতাংশও যদি গঙ্গায় টাকা পয়সা ছুড়েছে, কত কোটি টাকা ঐ প্রয়াগের গঙ্গায় ডুবে আছে, তাই ভাবছি।

আমার গামছা মিনিট দশেক রোদ পেয়েই শুকিয়ে গেল। তারপরই ফেরার রাস্তা ধরলাম। ফেরার পথে, বালুচরের উপর সারি সারি বায়ো টয়লেট দেখে আন্দাজ করতে পারলাম, আজকের ঐ ধু ধু প্রান্তরে কদিন আগেই, লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিল।

ড্রাইভার যে রাস্তা দিয়ে মেলায় ঢুকতে গিয়ে বাধা পেয়েছিল, সেই রাস্তা ধরে বেনারসের বড় রাস্তায় উঠে এলাম। গোস্বামীবাবু বলছিলেন, এলাহাবাদের মিউজিয়ামটা দেখে নিতে। ড্রাইভার দেখলাম, ঐ মিজোরামের ব্যাপারে বেশ বিতশ্রদ্ধ। আমাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য নাক কুঁচকে বলল, ওখানে আছে তো একটা নেতার কিছু জামা কাপড় ; যেমন জামা প্যান্ট আপনি পরে আছেন, তার সাথে কোন পার্থক্যই নেই। তারজন্য ঐ জ্যাম রাস্তায় ফিরে যাওয়া অনর্থক। ওর রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্যই সম্ভবত ওর ঐ অবজ্ঞা। ঠিকই তো, অমৃত কুম্ভের সন্ধানে এসে কেউ, রাজনৈতিক নেতার পোশাকের প্রদর্শনশালা দর্শণ করতে যাবেই বা কেন?

ভাঙা হলেও, কুম্ভ দর্শণতো হল। স্নানের পর গামছা রোদে দিয়ে অপেক্ষা করার সময় দেখেছি, আট দশজন মেরুন রঙের ইউনিফর্ম পরা লোক এসে, কোরাসে গান গেয়ে গেল। নিতান্তই অনিচ্ছা সত্ত্বেও গানের দু চারটে শব্দ কানে এল। গান্ধীজীর স্বপ্ন পূরণ করা........... ঐ রকম কিছু কথা। এটুকু মনে আছে, মেয়েকে বলেছিলাম, এরা সব সাফাইকর্মী, এদের গানে, ঐসব " স্বচ্ছ ভারত " জাতীয় কিছু বক্তব্য আছে। বাড়ী ফিরেই, টি ভিতে দেখলাম, ওদের নিয়েও, রাজনীতির বাজার বেশ গরম করা হচ্ছে। আমরা ভেতো বাঙালী পর্যটক। ফেরার পথে, হাইওয়ের পাশে একটা ধাবায় খেতে গিয়ে, মাছ ভাত পেয়ে পুলকিত হয়েছি। ঐ মেরুন পোশাকের লোকগুলির সাথে একটা সেল্ফি তুলে আনলেও বেশ আত্মশ্লাঘা অনুভব করা যেত। আসলে কুম্ভের পূণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে কোন ভন্ডামী করার কথা মনেও আসেনি। এটাই তো কুম্ভ স্নানের পরম প্রাপ্তি।

নৈনিতাল-এর দিকে ২০২৪

নৈনিতাল এর কথা ছোটবেলা থেকে শুনেছি। কিন্তু এতদিন যাওয়া হয়নি। এছাড়া রানীক্ষেত, আলমোড়া, এত নাম শোনা। চাকরী থেকে অবসরের পর, অন্তত দেশের মধ্যে যে সকল ভ্রমণস্থান এর নাম খুব শোনা যায়, সেগুলি ঘোরার ইচ্ছা আছে। মার্চের মাঝামাঝিই উত্তরাখন্ড রাজ্যের নৈনিতাল আর তার আশপাশের কয়েকটি জায়গা ঘোরার জন্য, ট্রেনের টিকিট কেটে রাখলাম। কলকাতায় জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত বেশ গরম থাকে। ঐ সময় নৈনিতালের এদিকে বর্ষা নামে কি না জানা নেই। এখন যে কোন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার আগে, ইউ টিউবে বেশ কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যায়। হাওড়া থেকে লালকুঁয়া এক্সপ্রেস সকাল আটটা পনেরোতে ছেড়ে পরদিন সকালে সাতটার আগে পৌঁছয় লালকুঁয়াতে। এটা সপ্তাহে একদিন, শুধু শুক্রবারই হাওড়া থেকে ছাড়ে। আর একটা ট্রেন ,হাওড়া কাঠগোদাম বাঘ এক্সপ্রেস সবদিনই ছাড়ে, কিন্তু সময় বেশী লাগে।

গুগুলের সাহায্যে ভ্রমণ স্থানগুলির অবস্থান আর দূরত্ব দেখে নিলাম। এ ব্যাপারে বিখ্যাত ইউটিউব চ্যানেল-এর শিবাজী পালের পরামর্শ বেশ কাজের। লালকুয়া থেকে ভীমতাল 45 কিমি মত। এখান থেকে নৈনিতাল বাইশ কিমি মাত্র। আমি কিন্তু এখান থেকে সোজা নৈনিতাল যাবো না। আমরা এখান থেকে যাব রানীক্ষেত।

লালকুয়া এক্সপ্রেস নির্দিষ্ট সময়ে হাওড়া থেকে ছাড়ল। ট্রেন ছাড়ার প্রায় সাথে সাথেই আমাদের আশেপাশের সহযাত্রী সবার সাথে আলাপ হয়ে গেল। আমাদের সাথেই বসেছে তিনজন বন্ধু, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। জোয়ান তিন বন্ধু চলেছে ট্রেকিং করতে। হুগলীর সিঙ্গুর এর একটি বিরাট দল চলেছে আমাদের মত ভ্রমণে। আমাদের সাথে বৃদ্ধ বৃদ্ধা দুজন চলেছেন, ঐ সিঙ্গুর এর দলের সাথে। ঐ দাদু বেশ আলাপি। বয়স বললেন পঁচাত্তর। তাঁর উপর সবে পেটের ক্যান্সার এর চিকিৎসা শেষ হয়েছে। দিদার পা ভাঙ্গার পর অপারেশন হয়েছে। এদের ভ্রমণের উৎসাহ দেখলে বেশ অনুপ্রাণিত হতে হয়। দাদু দিদা তো গোটা পাঁচেক করে ব্যাগ নিয়েছেন। ব্যাগে মুড়ি, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, ভাত তরকারী সব নিয়ে চলেছেন। দাদুর ওষুধের পোটলাটি প্রায় মুড়ির ব্যাগের সমান। আমরা সকালে বাড়ী থেকে ছাতু মুড়ি খেয়ে বেড়িয়েছি। কটা বাপুজী কেক আর একটা বিস্কুটের ছোট প্যাকেট নিয়েছি। আমি Zoop থেকে একটি লাঞ্চ প্যাক এর অর্ডার দিয়েছি। ওরা ধানবাদে ঠিক সময়ে পৌছে দিল। খাওয়া যায়। আমাদের বাড়ীর মত তেলঝাল ছাড়া রান্না বাইরে বেরিয়ে আশা করি না। রাতের জন্য ও একটি প্যাকেট অর্ডার দিয়েছি। বেনারসে একটা মজা হল। আমি Zoop এ টাকা দিয়ে রেখেছি। ওদের ছেলে এসে আমার নাম আর সিট নম্বর মিলিয়ে ব্যাগ থেকে প্যাকেট বের করার আগেই আর একটি ছেলে এসে আমার নাম জেনে একটি প্যাকেট দিয়ে টাকা চাইল। টাকা দেওয়া আছে জেনে একটু অবাক হল। আমি মোবাইল খোলার আগেই প্রথম ছেলেটি আমার নাম লেখা প্যাকেট বের করে দিল। এবার পরের ছেলেটি বলল, তাহলে অর্ডার ক্যান্সেল করলেন? বলেই তার প্যাকেট তুলে নিয়ে চলে গেল। এ খাদ্যও কষ্ট করে খেতে হল। ট্রেকিং এর ছেলে তিনজন বাড়ী থেকে রুটি তরকারী নিয়ে এসেছিল ; দু বেলা খেয়েও শেষ করতে পারল না। সকালে উঠে দেখি ট্রেন দেড় ঘন্টা লেটে চলছে। হোটেলের থেকে সকালেই ফোন করে জেনে নিয়েছে কটা নাগাদ আমরা পৌঁছব। গাড়ীর জন্য সেই মাস দুই আগেই অগ্রিম টাকা দিয়ে রেখেছি।( Car Lalkuan, Dinesh Joshi : 9690819548) লালকুয়া স্টেশনে নেমে ড্রাইভারকে বার তিনেক ফোনাফুনি করে অসংখ্য গাড়ী আর অটোর

ভেতর থেকে আমাদের গাড়ী খুঁজে পাওয়া গেল। সকাল সাড়ে আটটার সময় বাইরে যা গরম দেখলাম, কলকাতার থেকে বেশীই মনে হল। প্রায় মাইল দশ চলার পর পাহাড়ী রাস্তায় উপরে উঠতে থাকল গাড়ী। আরও প্রায় এক ঘন্টা চলার পর গাড়ীর এ সি বন্ধ করা গেল। আমরা এগারোটার আগেই ভীমতালের পারে আমাদের হোটেলে পৌঁছলাম। ঘরে ফ্যান চলছে। কিন্তু জল গরম করে স্নান করতে হল। আজ ১৫ ই জুন, ২০২৪.

ভীমতাল

ভীমতালে দুপুরের আগে পৌঁছে রোদের জন্য কোথাও বেরোলাম না। হোটেলের ম্যানেজারের কাছে জেনে নেওয়া গেল, এখানে দেখার কি আছে। আমাদের ড্রাইভারকে বললাম, বিকেলে সাততাল দেখতে যাব। সেই মত বিকেল চারটার পর বেরোলাম। কলকাতার মত গরম না হলেও বেশ রোদ ছিল। আধ ঘন্টা মত চলে পৌঁছলাম সাততাল।

সাত তাল

ভীম তালের পাশের পাহাড়গুলি একটু নেড়া নেড়া। এদিকে বেশ গাছপালা আছে। রাস্তায় একটা জায়গা থেকে অনেক নিচে একটি ছোট পুকুর মত দেখা গেল। নাম জানলাম, গরুড় তাল। সাততালের পাড়ে গাড়ী রাখার জায়গা পাওয়াই মুশকিল। যেখানে গাড়ী পার্ক করা হল সেখান থেকে বাঁধানো রাস্তা লেকের দিকে নেমে গেছে। রাস্তার দুই পাশে শুধুই দোকান। ফার্স্ট ফুডের দোকানের ভিড়ে রাস্তাই হারিয়ে গেছে। আমরা একটি দোকানে চা খেয়ে জলের দিকে নেমে গেলাম। শত শত নৌকা সাজানো আছে। নানান রকমের নৌকা। কম বয়সী ছেলে মেয়েরা সেই সব নৌকায় চড়ে লেকের জলে ঘুরছে। মাঝে একটি ছোট সেতু আছে। আমরা সেই সেতু পেরিয়ে অন্য পারে গেলাম। দু চারটি ছবি তুলে গাড়ীতে ফিরে এলাম। আবার সেই ছায়া ঘেরা রাস্তা দিয়ে ফিরলাম। এক

জায়গায়, নিচে একটি পাড় বাঁধানো জলাশয় দেখিয়ে ড্রাইভার বলল, ওটা মানুষের তৈরী লেক। নাম নল -দময়ন্তী তাল। আমাকে গৌতমবাবু জানিয়েছেন, পাঁচশো বছর আগে, এক ভূমিকম্পে নৈনিতাল, ভীমতাল প্রভৃতি লেক গুলি তৈরী হয়েছে। সন্ধ্যায় হোটেলে বসে ক্রিকেট খেলা দেখে সময় কাটাব ভেবেছিলাম; খেলা তো হলই না। রাত্রে আলো জ্বলে ওঠার পর লেকের পাশের পাহারগুলিতে আলো ঝলমল করে সুন্দর দৃশ্য তৈরী করল। রাত্রেও এখানে গায়ে চাদর গায়ে দিতে হল না। ভোরে উঠে আমাদের অভ্যাস মত হাঁটতে বেরিয়ে দেখি মেন গেটের তালা খোলা হয়নি। নীচে নেমে একজন কর্মচারীকে ডেকে তালা খোলা হোল। পাড়ার ভেতরের প্রায় সোজা রাস্তা ধরে একটু একটু করে উঠতে থাকলাম। আধ মাইল মত উঠে আবার ফিরে এলাম। একটি আম গাছের থেকে কয়েকটা কাঁচা আম রাস্তায় পড়ে আছে দেখলাম। একটি বাড়ির উঠানে একটি গাছে বড় কুলের মত অনেক ফল ধরে আছে দেখলাম। প্রথমে মনে হল আপেল। ভালো করে দেখে বোঝা গেল, ন্যাসপাতি।

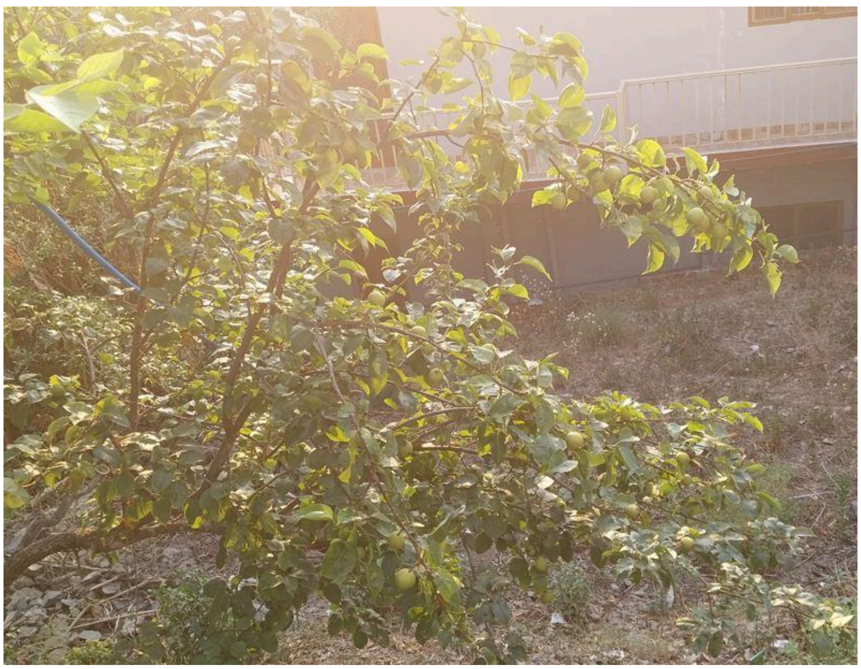
ন্যাসপাতি গাছ

পরে রানীক্ষেত থেকে কৌশানি যাওয়ার রাস্তার পাশে অনেক এই রকম ন্যাসপাতি গাছ ফলে ভরে আছে দেখেছি। একশ মিটার মত নেমে ভীমতাল লেকের পার ধরে হেঁটে চললাম। এপারে পরপর অনেক হোটেল। দু জায়গায় বেশ কিছু বাচ্চা সাঁতার শিখছে দেখলাম। কয়েক জায়গায় শত শত মাছ ঝাঁক বেঁধে ঘুরছে; কেউ কেউ ওদের পাউরুটি ছুঁড়ে দিচ্ছে। অনেক সাদা রাজ হাঁস জলে সাঁতার কাটছে। আমরা লেকের একেবারে উল্টো দিকে পৌঁছতেই চায়ের দোকান থেকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। এটি দোকানে বসে চা আর বাটার টোস্ট দিয়ে টিফিন সারলাম।

পূজার পর পর ট্রেনে দিল্লির দিকে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। গতকাল দেখেছি, প্রথম দিনেই রাজধানীর সব টিকিট শেষ। আজ তাই ঠিক আটটায় মোবাইলে টিকিট কাটতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এলাম। এদের WiFi ভালো। পাঁচ মিনিট আগে থেকেই **IRCTC app** এ লগইন করে বসে থাকলাম। ঠিক আটটায় খুলল।

৩৫৫ টি বার্থ দেখাল। আমাদের দুজনের নাম লিখে, অনলাইনে টাকা দিতে মিনিট দশেক লাগল। এর মধ্যেই ২০০ বার্থ বিক্রী হয়ে গেছে। মানে, ঘন্টা দুই তিন পর আর পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ন'টা নাগাদ বের হলাম রানীক্ষেত এর উদ্দেশে। মাঝে পড়বে এদিকের নিব কোরোরি বাবার কাইচি ধাম আশ্রম। গতকাল ওখানে মেলা ছিল, রাস্তা বন্ধ ছিল। আজও রাস্তায় প্রচুর গাড়ী। ধামের আট দশ মাইল আগে থেকেই গাড়ী আর এগোয় না। ধাম পেরোতে তিন ঘন্টা লাগল। একটু আগে থেকেই পাহাড়ের উপরের রাস্তা থেকে নিচে আশ্রমের মন্দির, ভিড় সব দেখতে পাচ্ছিলাম। ড্রাইভার একবার জানতে চাইল, আশ্রমে ঢুকতে চাই কি না। ঐ ভিড় দেখেই আমাদের সব আগ্রহ শেষ। বিকেল তিনটা নাগাদ রানীক্ষেত পৌঁছলাম।

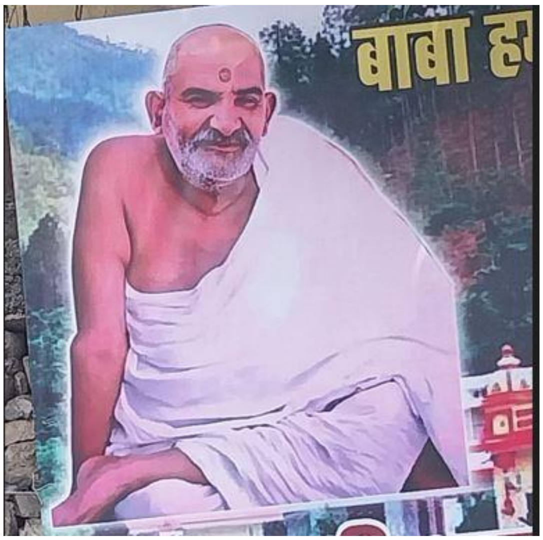

নিব করোরী বাবা

রানীক্ষেত এ পৌঁছেছি কি না বোঝার আগেই রাস্তার পাশে দেখি, মেঘদূত হোটেল। গাড়ী থামাতে বললে ড্রাইভার বলল, আগে মন্দিরটা দেখে আসি। হোটেল ছাড়িয়ে দেড় দুই কিমি এগিয়ে পৌঁছলাম, ঝুলা দেবী মন্দির। ছোট একটি মন্দির। কিন্তু ঢোকার রাস্তার উপরে আর দুপাশে অসংখ্য ঘন্টা ঝুলছে। এখানে মানত করে কিংবা মনস্কামনা পূর্ণ হলে, লোকে একটি করে ঘন্টা ঝুলিয়ে রেখে যায়। ছোট বড় বিভিন্ন মাপের ঘন্টা, কত বছর ধরে ঝুলছে বোঝার উপায় নেই।

মন্দিরে যাত্রী তেমন নেই। দুজন একজন করে যাত্রী আসছে। ওখান থেকে ফেরার সময়ও হোটেলে গাড়ী দাঁড়াল না। ড্রাইভার বলল, মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাবে, আগে দেখে আসি। রানীক্ষেত কুমায়ুন রেজিমেন্ট এর হেড অফিস। গোটা শহরটাই আসলে মিলিটারী ক্যান্টনমেন্ট। অত্যন্ত সুন্দর সাজানো রাস্তাঘাট। শুধু শহরটাই দেখার জন্য আসা যায়। মাথা পিছু পঁচাত্তর টাকা করে টিকিট কেটে মিউজিয়ামে ঢুকলাম। সেই টিপু সুলতানের সময় থেকে হালের কার্গিল যুদ্ধ পর্যন্ত ইতিহাসের নানান ছবি, তরোয়াল, বন্দুক ইত্যাদি সাজানো আছে। আর আছে এই কুমায়ুন রেজিমেন্ট এর বহু বীরের ছবি আর তাদের বীরত্বের ইতিহাস। ভেতরে ছবি তোলার অনুমতি নেই। বাইরেও কয়েকটি কামান সাজানো আছে।

ওখান থেকে শহরের ভেতর দিয়ে গিয়ে , অন্য প্রান্তে একটি ছোট্ট পাহাড়ের নীচে পৌঁছে ড্রাইভার বলল, ওপরে মন্দির আছে দেখে আসুন। গাছের ছায়ায় ছায়ায় শ'খানেক সিঁড়ি ভেঙ্গে একটি ছোট্ট মন্দিরে পৌঁছলাম। মন্দির এখানে দুটি, কালী আর দূর্গা। এখানে আসার আগেই আমরা আরও একটি জায়গায় মন্দির, গীর্জা আর গুরুদ্বারা দেখেছি। রেজিমেন্টের সেনাদের ট্রেনিং শেষ হলে, এই জায়গায় শপথ নিতে হয়। শহরের মধ্যেই একটি গল্ফ গ্রাউন্ড এর পাশ দিয়ে গেলাম। এটিও একটি দেখার মত জায়গা। কিন্তু অনেকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় ঘাসের রং ধূসর। মনে পড়ল , উটি যাওয়ার পথে কান্নরে সুন্দর সবুজ গল্ফ গ্রাউন্ড দেখেছিলাম। পরে ঐ ক্যান্নোর এ সেনা প্রধান এর হেলিকপ্টার ভেঙ্গে পড়ে জায়গাটা কুখ্যাত হয়েছে। আমরা হোটেলে ঢুকলাম সাড়ে তিনটা চারটার দিকে। এই মেঘদূত হোটেল এর বাড়ীটি একটি বহু পূরাতন বাড়ী, 1911 সালে তৈরী। বেশ বড় হোটেল, যাত্রীও অনেক এসেছে দেখলাম। হোটেলের নীচের রেস্টুরেন্টও বেশ বড়। ভোরে উঠে আমরা পিছনের দিকের সরু রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলাম। একটু দূরে একটি ময়ূর রাস্তা পেরিয়ে গেল দেখলাম। কাছে গিয়ে ছবি তোলার সময় দেখলাম, ওটা অন্য পাখী। পরে ছবি দেখে অনেকে জানিয়েছেন, ফিজেন্ট । বড় রাস্তায় ফিরে এসে দেখি দুটি বাসে করে 50-60 জন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীকে এনেছে। পরে ওরা রাস্তা ধরে দৌড় দিল।

আমরা ন'টা নাগাদ হোটেল ছেড়ে কৌশানীর দিকে রওনা দিলাম। ঘন্টা খানেক গাড়ী চলার পর আমার স্ত্রী বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। মাঝের বড় সিট এ ওকে শুইয়ে বাকী রাস্তা এলাম। হোটেলে পৌছেও সারাদিন শুয়েই থাকল। আমার কাছে কিছু ওষুধ ছিল, কিছু পাশের একটা দোকান থেকে কিনে আনলাম। হোটেল থেকে একশ দেড়শ মিটার উপরেই গান্ধী আশ্রম। ড্রাইভারের সাথে আমি একাই হেঁটে উঠে দেখে এলাম। এই আশ্রমের নাম অনাসক্তি আশ্রম।

গান্ধী আশ্রম, কৌশানি

এখানে থাকার সময় সুন্দর প্রকৃতি দেখে, গান্ধীজী একে মিনি সুইজারল্যান্ড বলেছিলেন। আকাশ পরিষ্কার থাকলে, আশ্রমের চত্বর থেকে হিমালয়ের বরফ ঢাকা শৃঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না। বিকেলে আমার স্ত্রী একটু সুস্থ হয়ে ,হোটেলের চত্বরে হাঁটার সময় এক বাঙালি মহিলার সাথে আলাপ করে জানল, ওনারা একটি দল বদ্রিনাথ থেকে ফেরার পথে এখানে বিশ্রাম নিতে থাকছেন। আসার পথে দেখেছি, কৌশনী থেকে কর্নপ্রয়াগ প্রায় দু'শো কিমি। আমার তো পাহাড়ী রাস্তায় 60-70 কিমি একদিনে যেতেই কষ্টকর মনে হয়। বিশেষ করে দুপুরে তো বেশ গরম পড়ছিল। পরদিন সকালে উঠে আমরা দুজনে গান্ধী আশ্রম ঘুরে এলাম। সকালে দেখি আমারও পেট খারাপ। এই নিয়ে আরও দিন চারেক বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে। একটু ঝামেলায় পড়তে হল। দু' লিটার ORS খেয়ে বিনসার এর উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। 18.6.24.

কৌসানির হোটেলে থেকে বেরিয়ে উল্টো দিকে দুই কিমি মত নেমে একটা চা বাগানের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখানে কিছু দোকানপাট আছে। বিশেষ করে শাল ফ্যাক্টরি। এই শাল ফ্যাক্টরি ব্যপারটা এখানে কুটির শিল্পের মত। এদিক ওদিক অনেক আছে। আমরা শাল কিনব না, তাই আর শাল তৈরীও দেখলাম না। একটু ওপরে উঠে চা ফ্যাক্টরি। ঢোকার জন্য টিকিট কাটতে হবে। চা বাগানের অবস্থাই করুন দেখলাম। আগে আমরা চা ফ্যাক্টরি দেখেছি, তাই আর ঢুকলাম না। কৌশণী থেকে রাস্তা নামতে নামতে একেবারে সমতলে চলে এল। এখানে একটা সরু নদী আছে, শুধুই পাথর, জল দেখা যায় না। ঐ নদীর দুই পাড়ে ধানের চাষ হচ্ছে। নদীর পাশ দিয়ে কয়েক কিমি এগিয়ে আবার আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠতে থাকল রাস্তা। একটা সময় ডান দিকের পাহাড়ের গায়ে বেশ বড় শহর দেখা গেল। আলমোড়া শহর। আমরা শহরের দিকে না গিয়ে বিনসারের দিকে চললাম। আলমোড়া থেকে আধ ঘন্টা মত এগিয়ে পৌঁছলাম চিতোই গোলু দেবতার মন্দিরে।

মন্দিরে ঘন্টার সাথে লেখা মনস্কামনা চিঠি

YouTube এর কল্যাণে এই মন্দিরের খবর জানা ছিল। বড় রাস্তার পাশে, মন্দিরে ঢোকার গেটের পাশে বেশ কয়েকটি দোকান রাস্তার উপরে বসে গেছে। দূর থেকেই দেখা যায়, প্রচুর ঘন্টা সাজিয়ে রেখেছে। পূজার ডালি আর ঘন্টা বিক্রী করছে। এরাই জুতো জমা রাখছে। আমরাও একটা পূজার ডালি কিনে নিয়ে ঢুকলাম। কয়েকটি সিঁড়ি ওঠার পরই ঘন্টা আর ঘন্টা। যেদিকেই তাকানো যায় শুধু ঘন্টা ঝুলছে, হাজারে হাজারে। ছোট বড় নানান সাইজের ঘন্টা। ছোট বড় যে যেখানে হাত পাচ্ছে ঘন্টা বাজিয়ে দিচ্ছে। ডান দিকে একটি বাঁধানো চত্বরের পাশ দিয়ে পূজা দেওয়ার লাইন একেবেকে চলেছে। আমরাও লাইনে দাঁড়ালাম। এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে পূজা দেওয়া গেল। কিন্তু দেবতার মূর্তি কিছুই বুঝলাম না। নারকেলটি রেখে বাকী জিনিস ফেরৎ দিল। একটি প্রায় 100 কেজি ঘন্টার ছবি তুলে ফিরে এলাম।

গাড়ী চলল বিনসারের দিকে। রাস্তার পাশে ঘর বাড়ী খুবই কম। ওপরে নীচে পাহাড়ের গায়ে গায়ে শুধুই চীর গাছ। সোজা সোজা দাঁড়িয়ে আছে, পাতা খুব কম। দেখলে মনে হবে, কেউ বোধহয় গাছগুলি লাগিয়েছে। যেদিকেই তাকানো যায় শুধুই ঐ একই রকম গাছ।

চীর বন

পরে বিনসর অরণ্যেও দেখেছি ঐ একই দৃশ্য। অন্য গাছ হাজারে একটা হবে। মুন্সিয়ারি যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে কাঁচা রাস্তা ধরল গাড়ী। মাইল তিনেক খুবই অসমান পাথুরে রাস্তা। অন্য কোন গাড়িও দেখলাম না। মাইল দুই যাওয়ার পর গোটা দুই হোমস্টে। আরও এক মাইল গিয়ে আমাদের হোমস্টে পেলাম। ডান দিকে দুরে দূরে পাহাড়। গাছ শুধুই চীর। বাতাসে সো সো শব্দ। এদের ঘরে কোন ফ্যান নেই। বুঝলাম, তেমন গরম পড়ে না। পরদিন সকালে সামনের মাঠে হাঁটতে গিয়ে দেখলাম ঠাণ্ডা লাগছে। এবার পাহাড়ে ভ্রমণ করতে এসে এই প্রথম একটু ঠান্ডা পেলাম। সকাল আটটার পরই বেরিয়ে পড়লাম।

আজকের গন্তব্য কাছেই, মাত্র 16 কিমি দূরের কাসার দেবী। এটা আলমড়া শহরের বাইরে। আমাদের সেই দূর্গম হোমস্টে থেকে বেরিয়ে প্রথম তিন কিমি মত পাথুরে রাস্তা। তারপর পাকা রাস্তা। পিছন দিকে এ রাস্তা চলে গেছে মুন্সিয়ারি। এবার আমরা ওদিকে যাব না। আলমোড়া থেকে প্রায় পৌনে দুশো কিমি। সেই দাদুদের সিঙ্গুর এর দলটি মুন্সিয়ারি যাবে। শীতকালে ওখান থেকে হিমালয়ের বরফ ঢাকা শৃঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। আমরা তো কৌশানী থেকে কিছুই দেখতে পেলাম না। এই পাকা রাস্তা ধরে কয়েক কিমি এগিয়ে আমাদের গাড়ী ডান দিকে একটা ছোট রাস্তা ধরল। একটু এগিয়েই দেখি সেই পাথুরে রাস্তা। দুপাশের পাহাড়ে সেই চীর গাছ আর চীর গাছ। প্রায় এক ঘন্টা নির্জন বনের ভেতর দিয়ে চলে একটি মন্দিরের নীচে পৌঁছলাম। এই এক ঘন্টার রাস্তায় আর একটিও গাড়ী দেখিনি। মাঝে মাত্র তিনজন দেহাতি মহিলা ঘাসের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখেছি। এটাও বিস্তার জঙ্গল। একটি পাখিও নেই। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকও নেই। এই মন্দিরটিও গোলু দেবতার। যাত্রী প্রায় নেই। মন্দিরের পরই বড় রাস্তা। ডান দিকে চলে গেছে যাগেশ্বর। আমরা বাঁ দিকে আরও আধ ঘন্টা চলার পর কিছু কিছু বাড়ী ঘর দেখা গেল। রাস্তার পাশে আমাদের হোটেল দেখতে পেলেও আরও এগিয়ে গেলাম। একটা মোড়ের মাথায় গাড়ী দাঁড়াল। আমরা নেমে পাহাড়ের গায়ে বাঁধানো সিঁড়ি ধরে মন্দিরের দিকে উঠলাম। শ খানেক সিঁড়ির উপর কাসার দেবীর মন্দির। ছোট্ট মন্দির। খুবই সাদামাটা। যাত্রীর লাইন নেই, তবে কিছু যাত্রী আছে। মন্দির ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে, আবার কুড়ি পঁচিশ সিঁড়ি উঠে শিব মন্দির। শিব মন্দিরে ওঠার আগে, বাঁ দিকে একটি সরু পায়ে হাঁটার রাস্তা। লোকজন ওদিকে কেউ যাচ্ছে না। আমরা একজনকে জিজ্ঞেস করে এগিয়ে গেলাম। YouTube এ দেখা ছিল, তাই চিনলাম। একটি বড় পাথরের গাড়ী বারান্দার মত; এর নিচেই সেই বিখ্যাত গুহা। এক জ্যোতিষ দুজন খদ্দের পেয়ে ব্যস্ত আছে দেখলাম। ওখানে একটু বসার ইচ্ছা থাকলেও হতাশ হলাম। এবার চোখে পড়ল নীচে একটি সংকীর্ণ গুহা। সেখানে দুটি আসন পাতা রয়েছে। বুঝলাম ওটিই সেই মোক্ষম জায়গা যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যান করেছিলেন। আমি সাবধানে নেমে গেলাম সেই গুহায়। আসনে বালি থাকলেও একটিতে বসে গেলাম। মিনিট পাঁচেক বসে উঠে এলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান গুহা

এই জায়গা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। এ জীবনে ওখানে পৌঁছতে পেরেছি সেটাই সৌভাগ্য। এই কাসার দেবী মন্দির এর পাহাড়ে নাকি বিশেষ মহাজাগতিক চুম্বক ক্ষেত্র আছে। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এখানে এসে ধ্যান করেছিলেন। পরে উপরের শিব মন্দির চত্বরে দেখলাম, কয়েকজন চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। বিশেষ কোন অনুভূতি হল কিনা, কয়েকজন জানতে চেয়েছেন। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। কুমোরের বাড়ীতে এক তাল মাটি নিয়ে ঢুকলেই কি একটু ঘট নিয়ে বেরিয়ে আসা যায়। মাটির তাল থেকে ঘট তৈরীর যে সাধনা সেটা অর্জন করতে কুমোর এর কত বছর লাগে!

কাসারদেবী মন্দির থেকে নেমে আসার পর আমাদের ড্রাইভার বলল, 200 মিটার এগিয়ে গিয়ে সারদা মঠ দেখে নিন। পাহাড়ের গা বেয়ে পাকা রাস্তা। নিচে, বহু নিচে মাঠ দেখা যাচ্ছে। অনেক দূরে কয়েকটা বাড়ী ঘর। একটু দূর থেকেই সারদা মঠের বড় লোহার গেট দেখা যায়। বন্ধ। পাশে ছোট্ট একটি গেট আছে। ভেতরে একটু পাহাড়ের ঢাল ধরে রাস্তা উঠেছে। প্রথমে নিবেদিতা ভবন। তার পিছনে ছোট মন্দির। মন্দিরের তিনটি দরজা, ভেতর থেকে বন্ধ। কাচের ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখে ফিরে আসছি, এমন সময় একজন ব্রহ্মচারিণী এসে একটি দরজা খুলে দিলেন। মন্দিরে ঠাকুর, মা আর স্বামীজী তিন জনের ছবি রাখা আছে। প্রণাম করে ফিরে এলাম। পাহাড়ের উল্টো দিকে আমাদের হোটেল। কাসার দেবী মন্দিরের প্রায় নিচেই। বিকেলে আবার হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের দিকে চললাম। এবার খেয়াল করলাম, হোটেলের অনেক কাছেই মন্দিরে ওঠার রাস্তা আছে। বেশ মেঘ করে এসেছে। কিন্তু অনেক লোক জনও উঠছে। আমরা এবার ও শিব মন্দির চত্বরে ঘুরে এলাম। বৃষ্টি আসতে পারে দেখে সকলে নেমে চললাম। পাহাড়ের প্রায় নিচে নামার পর টিপ টিপ বৃষ্টি নামল। পা চালিয়ে হোটেলে পৌছে চাবি নিতে নিতেই জোরে নামল বৃষ্টি। দুপুরে ছিল প্রচণ্ড গরম। রাত্রে কম্বল গায়ে ঘুমিয়েছি। সকালে উঠে প্রথমে হাঁটতে হাঁটতে সারদা মঠ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। মন্দিরের নিচের রাস্তা থেকে উল্টো দিকের পাহাড়ে আলমোড়া শহর দেখা যায়। বোঝা যায় না যে ওটা দশ কিমি দূরে। পরদিন সকালে যাওয়ার সময় আমাদের পঁচিশ কিমি ঘুরে যেতে হল। সকালে উঠে চা খাওয়ার অভ্যাস থাকলে এসব জায়গায় মুশকিল। হোটেলের চা আটটার আগে হয় না। বাইরেও চায়ের দোকান খোলে না। আমরা হোটেলের নীচের রাস্তা ধরে উল্টো দিকে চলতে থাকলাম। ওদিকেও কয়েকটা হোটেলের বোর্ড দেখা যাচ্ছে। এক দেড়শ মিটার এগিয়ে দেখি একটি বৌদ্ধ আশ্রম। এরা মোনাস্ট্রী লেখেনি। আমাদের গেটের বাইরে দেখে এক মহিলা এসে গেট খুলে দিলেন। দুটি বড় লোমওলা কুকুর ভেতরে ঘুরছে। ওরা কিন্তু ডাকাডাকিও করল না। মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। এক লামা এসে দরজা খুলে দিলেন। আমরা ভেতরে ঢুকে কয়েক মিনিট বসে বেরিয়ে এলাম। হোটেলে ফিরে স্নান করে আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। আজ আমাদের গন্তব্য নৈনিতাল। আমরা আলমরা শহর ঘুরে যাব।

আমাদের ড্রাইভার লালা বদ্রিদাসজীর বাড়ী জানেনা। বাজারের ভেতর ঐ বাড়ী বলায় ও বলল, বাজারে গাড়ী যাবে না, হেঁটে যেতে হবে। আমরা তাতেই রাজী। শহরটা প্রায় এক পাক ঘুরে আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে পৌঁছলাম। এর নাম রামকৃষ্ণ কুটির। রাস্তার পাশে তুরিয়ানন্দ গেট। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে স্বামী বিবেকানন্দ এর বড় মূর্তির কাছে পৌঁছতে হল। এখানে কোন মন্দির দেখলাম না। ওখান থেকে কিছুটা এগিয়ে, জেলা হাসপাতালের কাছে গাড়ী দাঁড়াল। ড্রাইভার বলল, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বাজার। গাড়ী আরও এক পাক ঘুরে

নিচের রাস্তায় থাকবে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর কাছে গাড়ী পাব। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বাজার পেলাম। বাজারের দোকানপাট সবে খুলছে। বেশ জমজমাট বাজার। সেই বাড়িটি আমি দেখলেই চিনব। তবুও একজনকে , স্বামী বিবেকানন্দ যে বাড়ীতে ছিলেন, বলার আগেই আরও এগোতে বললেন। লালার সেই বিখ্যাত বাড়ীর বাইরে স্বামীজীর ছবি দেওয়া বোর্ড আছে। নিচে দু একটা দোকান আছে। কিন্তু বাড়ীটির দরজা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নিচের এক দোকানে জানতে চাইলে বলল, ওনার সব ঘুরতে বেরিয়ে গেছেন। ভেতরটা দেখা হল না। রাস্তার উল্টো দিকে একটি লাল রঙের বাড়ীতে স্বামীজীর ছবি দেওয়া বোর্ড আছে।

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা স্থান

এই বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বামীজী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দু একটা ছবি তুলে ফিরে এলাম। আলমোরার বাজার থেকে একটা ছোট্ট শীতের পোশাক কিনে ফিরে এলাম। গাড়ী চলল নৈনিতালের দিকে। ভীমতাল থেকে যে পথে ওদিকে গেছলাম, সেই পথেই অনেক সময় ফিরে এলাম। আবারও পড়ল কাইচি ধাম। ভাবলাম মেলা চলে গেছে দিন চার পাঁচ আগে, তাহলে আর ভিড় হবে না। একবার বাবার ধাম ঘুরে যেতে পারি। কিন্তু ধামের কাছে এসে দেখি, সমান ভিড়। ওপর থেকে দেখতে পেলাম বিশাল লম্বা লাইন। ভাওয়ালি শহরে পৌঁছে ডান দিকের রাস্তা ধরে গাড়ী চলল। এখান থেকে নৈনিতাল এগারো কিমি। যখন আর নয় কিমি বাকী, ভাবলাম প্রায় পৌঁছে গেলাম। এই সময় একটি দুই রাস্তার মোড়ে এসে গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল। পুলিশ সব গাড়ী আটকে দিয়েছে। কোন গাড়ী নৈনিতাল যাবে না। কি ব্যাপার? কেন গাড়ী যাবে না, কেউ কিছুই বলতে পারল না। ফিরে এলাম ভাওয়ালী।

ভাঁওয়ালি ঢোকার মুখে একটি রাস্তার পাশের হোটেলে ঢুকলাম। এখানে দুপুরে কিছু খেয়ে পরে আবার নৈনিতালের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে দেখব। এদের সকলের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল আজ আর নৈনিতাল যাওয়া হবে না। একমাত্র নৈনিতাল এর হোটেলের ম্যানেজার ফোনে জানাল, দু এক ঘন্টা পর পর গাড়ী ছাড়ে। আমরা এক ঘন্টা পর ফিরে এসে দেখি, কোন গাড়ী দাঁড়িয়ে নেই, পুলিশও নেই। নৈনিতাল শহরে ঢোকার প্রায় আধ কিমি আগে থেকে গাড়ী শম্বুক গতিতে চলল। লেকের পাড়ে পৌঁছে বোঝা গেল কেন শহরে গাড়ী ঢুকতে

দিচ্ছিল না। অসংখ্য গাড়ী, তার থেকেও বেশি মানুষ রাস্তা দিয়ে চলেছে। লেকের যে পারে মল রোড সেদিকে নিচের রাস্তা একদিকে আর উপরের রাস্তা দিয়ে উল্টো দিকে গাড়ী চলছে। ড্রাইভার আমাদের বলে রেখেছিল, নীচের রাস্তায় তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে হবে। কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে মল রোড পেরিয়ে আমাদের হোটেল। রাস্তা থেকে কুড়ি তিরিশ ফুট উপরে আমাদের হোটেল। ট্রলি ব্যাগ দুটি টেনে উঠতে হল। আমাদের ঘর দিয়েছে ছয় তলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। লিফ্ট ছাড়া এতোটা অনেকদিন ওঠা হয়নি। কিন্তু হাফাচ্ছি না দেখলাম। ঘরের ভেতর থেকেই লেকের জলে নৌকা চলছে দেখলাম। বিকেলে লেকের পাড়ে হাঁটতে বেরোলাম। এরকম ভিড়ের বেড়ানোর জায়গা কোনোদিন দেখিনি। ভিড় ঠেলতে ঠেলতে নয়না দেবীর মন্দির এ পৌঁছলাম। বাইরে থেকে পূজার ডালি কিনে নিয়ে মন্দির চত্বরে ঢুকলাম। যাত্রী অনেক আছে, কিন্তু পূজা দেওয়ার লাইন নেই। মন্দির ছাড়িয়ে বাজারের ভেতর দিয়ে লেকের অন্য পারে চলে এলাম। এদিকে খুব একটা লোক জনও নেই। রাস্তাও খুব ভালো নয়। এ পারে কয়েকটা ছোট ছোট মন্দির আছে। এখানে সন্ধ্যা হয় অনেক পরে, প্রায় সাতটা নাগাদ। সব মন্দিরে ঘন্টা বাজিয়ে সন্ধ্যা আরতি শুরু হল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা জায়গায় পৌঁছে দেখি, রাস্তা প্রায় বন্ধ। ওপর থেকে ধ্বস নেমেছে। সারানোর কাজ চলছে। গোটা লেক একপাক ঘুরে হোটেলে ফিরতে রাত আটটা বেজে গেল। এদের ঘরের টিভিতে ক্রিকেট বিশ্বকাপের খেলা দেখতে পেলাম।

পরদিন ভোরে উঠে আবার সেই নয়না দেবীর মন্দির এর দিকে হেঁটে চললাম। গতকাল বিকেলের মেলার মত ভিড়ের কিছুই নেই। দোকানপাট সব বন্ধ। পাশেই একটি বিশাল মাঠ। মাঝে একটা হকি খেলার মাঠ। তাছাড়া আরও যা জায়গা আছে, দু টি ফুটবল খেলার মাঠ হয়ে যাবে। গোটা দুই ফুটবল মাঠের মত জায়গায় কয়েকশ গাড়ী রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য পাশের বাস্কেট বল খেলার মাঠে যোগ দিবস পালনের তোড়জোড় চলছে। আমরা পৌনে সাতটা নাগাদ নৌকার ঘাটের কাছে এসে দেখি , তখনও বোটিং শুরু হয়নি। সাতটা বাজতে আমাদের ডেকে নিল। আমাদের সাথে আর একটা নৌকায় তিনটি ছেলে উঠল। একজন মাঝি দু হাতে দাঁড় টেনে আমাদের আধ ঘন্টা ঘুরিয়ে আনল। মাঝির কাছেই কয়েকটা খবর জেনে নিলাম। লেকের জলে যে ঝাঁক ঝাঁক মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে, সরকারই মাঝে মাঝে বড় মাছ ধরার ব্যবস্থা করে। মে জুন নৈনিতালের সবথেকে বেশী টুরিষ্ট আসার সময়। জুলাই থেকে পূজার ছুটি পর্যন্ত নৌকা প্রায় চলেই না। তখন ওরা গ্রামে গিয়ে চাষ আবাদ করে। সাড়ে নটায় আমাদের ড্রাইভার আমাদের ডেকে নিল। বেরোলাম নৈনিতালের দর্শনীয়

স্থানগুলো দেখতে। শহর থেকে বেরিয়ে মাইল তিন চার দূরে হনুমান মন্দিরে পৌঁছলাম। অনেকটা জায়গা জুড়ে হনুমান, মা অঞ্জনা, শিব মন্দির ছাড়াও নিব করোরি বাবার প্রার্থনা গৃহ দেখে নেমে এলাম। একটু ছোলা সেদ্ধ প্রসাদ দেওয়া হল। এরপর গেলাম, জল প্রপাত দেখতে। পঞ্চাশ টাকার টিকিট কেটে, শ দেড়েক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখলাম জলপ্রপাত। ফুট দশেক উপর থেকে জল পড়ছে। অনেকেই জুতো খুলে, জলে নেমে ছবি তোলার চেষ্টা করছে। সিকিম, মেঘালয়, পাঁচমারিতে এত সব লম্বা লম্বা জলপ্রপাত দেখেছি যে এটাকে তেমন দেখার মত মনে হল না। ওখান থেকে চললাম, বোটানিক্যাল গার্ডেন। এই তিন চার কিমি যেতে ঘন্টা দেড়েক লাগল। গোটা রাস্তায় শুধুই ট্যুরিস্ট গাড়ী। পাহাড়ের ধাপে ধাপে নানান রকমের গাছ। গাছেদের নাম লেখা বোর্ড। আমাদের ভালো লাগল, পতঙ্গ সংগ্রহশালা। বিষধর প্রজাপতিও যে হয়, এই প্রথম জানলাম।

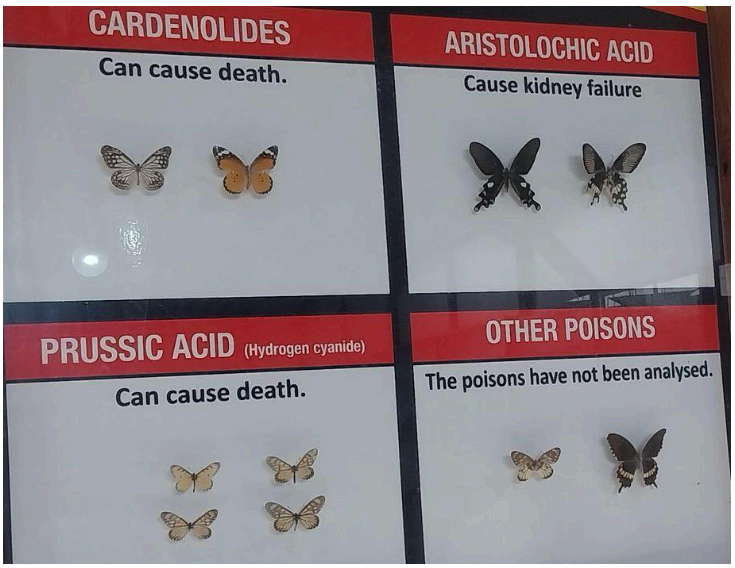


এর পরের গন্তব্য ছিল কেভ গার্ডেন। গাড়ীর জ্যামের জন্য আর কোথাও নামার উৎসাহ পেলাম না। সোজা হোটেলে ফিরে এলাম। বিকেল চারটে নাগাদ প্রবল বৃষ্টি নামল। এক দেড় ঘন্টা চলল বৃষ্টি। ছটার পরও মেঘ করে থাকল। বেরোব কি না ভাবতে ভাবতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। অনেকেই ছাতা নিয়ে বেরিয়েছে। আমরা ঘন্টা খানেক রাস্তায় ঘুরে এলাম। বৃষ্টির পর রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেল। 22 তারিখ আমাদের নৈনিতালে শেষ সকাল। ভোরে উঠে বেরোনোর সময় সোয়েটার গায়ে দিতে হল। আজও সকালে রাস্তায় চা খেতে হল। আজ হাঁটতে হাঁটতে বড় বাজারের দিকে চলে গেলাম। নৈনিতালের জেলা হাসপাতালের কাছে এই বড় বাজার। দু একটি দোকান এই সকালেই খুলে গেছে। আমরা বাজারের অন্য দিক দিয়ে নেমে এলাম নয়না দেবীর মন্দির এর কাছে। মন্দিরের পাশেই গুরুদ্বয়ার। আমরা জুতো খুলে ঢুকে যাচ্ছিলাম; ডেকে মাথা ঢাকতে বলল। একটি পাত্রে কিছু কাপড়ের টুকরো রাখা ছিল, তার একটি নিয়ে, মাথায় রুমালের মত বেঁধে নিলাম। ভেতরে ভক্তি সঙ্গীত বাজছিল। আমরা প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। একজন ডেকে প্রসাদ দিল। হোটেলে ফিরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, রান্নার ছেলেরা তখনও আসেনি। আবার বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে বাস ষ্ট্যান্ড এর কাছে এসে দেখলাম দু একটা দোকান খুলেছে। আমরা এক জায়গায় ব্রেকফাস্ট করে নিলাম। একটি বড় ফলের দোকান থেকে কিছু ফল কিনে হোটেলে ফিরে এলাম। গাড়ীর মালিক দীনেশ জোশি জানালেন যে অন্য গাড়ী আসবে। এ

কদিন যে ড্রাইভার আমাদের নিয়ে ঘুরেছে, সে আগের রাতে একটা ছোট এক্সিডেন্ট করেছে। নতুন ড্রাইভার অন্য গাড়ী নিয়ে আসবে। আমরা দশটার আগে স্নান করে, ব্যাগ গুছিয়ে বসে থাকলাম। ঠিক সাড়ে দশটায় গাড়ী এসে গেল। আমরা লালকুয়ার উদ্দেশে রওনা দিলাম। এবার বাড়ী ফেরার রাস্তা।

কদিন ধরে নৈনিতাল ঢোকা বেরোনোর রাস্তায় যা গাড়ীর জ্যামের অবস্থা দেখেছি, তাতে করে অনেক সময় নিয়ে বেরোনোই উচিত। আজ কিন্তু তেমন অবস্থা দেখলাম না। যদিও শহরের বাইরে একটা জায়গায় দেখলাম , গাড়ী আটকাচ্ছে। আধ ঘন্টা মত নেমে আসার পর গাড়ী মেঘের ভেতর দিয়ে চলল। আরও কিছুটা চলার পর বৃষ্টি নামল। একটা দোকানের কাছে গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভার বলল, চা খেতে চাইলে নামতে পারেন। বৃষ্টির জন্য নামা গেল না। ড্রাইভার বলল আর মিনিট পনেরোর মধ্যে কাঠগোদাম পৌঁছে যাব। এই সময় থেকেই দেখলাম, রাস্তায় বেশ গাড়ীর ভিড়। কাঠগোডাম পৌঁছনোর অনেক আগেই বৃষ্টি থেমে গেল। কাঠগোদাম সমতলে। এখানে রাস্তাও বেশ চওড়া। দূর থেকে কাঠগোদাম রেল স্টেশন দেখলাম। আমাদের গাড়ী লালকুয়া স্টেশন থেকে। বড় রাস্তায় বেশ জোরে গাড়ী চালিয়ে, মিনিট কুড়ির মধ্যে আমাদের লালকুয়া পৌঁছে দিল। যাওয়ার দিন দেখেছিলাম , গাড়ী লোকজনের ভিড়। আজ আমরা আমাদের গাড়ী ছাড়ার সাত ঘন্টা মত আগেই এসেগেছি। স্টেশনে ঢোকার আগে বড় রাস্তায় একটা হোটেলে খেতে গেলাম। খুবই সাধারণ হোটেল। স্টেশনে ওয়েটিং রুমে এসে বসলাম। সে সময় আর চার পাঁচ জন যাত্রী শুয়ে বসে ছিল। বেশ গরম ছিল। এটা খুবই ছোট স্টেশন, এখানে এসি ওয়েটিং রুম নেই। পরে পরে , দলে দলে যাত্রী এসে পৌঁছতে থাকল। সবই পাহাড়ের দিকে ভ্রমণ করে ফিরছে। সবই প্রায় বাঙালি। আসলে এই ট্রেন টি সপ্তাহে একদিন করে চলে। হাওড়া থেকে শুক্রবার সকালে ছেড়ে শনিবার সকালে লালকুয়া পৌঁছয়। আবার শনিবার সন্ধ্যায় ছেড়ে রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়ায় ফেরে। এদিকে যারা ঘুরতে আসে, তারা সেই মত ঘোরার প্ল্যান করে। গরমের মধ্যে ছয় সাত ঘন্টা বসে কাটানো বেশ কষ্টকর। আমাদের দিনেই ট্রেনটা আবার দেরী করে ছাড়ল। বিকেল পাঁচটা থেকে লাগাতার ঘোষণা করে গেল , ঠিক সময়ে সন্ধ্যা সাতটা পঁচিশ এ ছাড়বে। সাতটা পঁচিশ পর্যন্ত গাড়ীর দেখা নেই। তখন বলতে শুরু করল , সাতটা চল্লিশে ছাড়বে। তখনও গাড়ী লুপ লাইনে দাঁড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত আটটা দশ নাগাদ গাড়ী দিল। প্রায় এক ঘন্টা দেরী করে গাড়ী ছাড়ল।

এবারের যাত্রায় ট্রেন খুব একটা ভালো পেলাম না। এই হাওড়া লালকূয়া এক্সপ্রেস ট্রেনটা একটু অভাগা গাড়ী। দেরী করে ছাড়লেও সকালে বারাণসী পৌঁছে গেছে ঠিক সময়ে। কিন্তু বারাণসী স্টেশনে প্রায় এক ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখল। কত দেরী করে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবে জানি না।

আমি বিশেষ করে শিবাজী পালের আর অনিন্দ্য বাবুর ইউটিউব চ্যানেল দেখে এবারের ট্যুর প্রোগ্রাম করেছি। অনিন্দ্যবাবু গাড়ীর জন্য দীনেশ জোশির ফোন নম্বর দিয়েছিলেন। আমি প্রায় তিনমাস আগে ট্রেনের টিকিট কেটেই দীনেশজীকে ফোন করে, আট দিনের জন্য গাড়ী বুক করেছিলাম। প্রতিদিন তিন হাজার টাকা করে। ড্রাইভার এর থাকা খাওয়ার দায়িত্ব ওদের। ভালো গাড়ী পেয়েছি। হোটেল সবই Make My Trip আর Go ibibo এর মাধ্যমে নেওয়া। আমার খরচের হিসাব অনুযায়ী ঠিকঠাকই হোটেল পেয়েছি। আমাদের খাওয়া

দাওয়া খুবই সংক্ষিপ্ত। তাই বাইরের তেল মশলা দেওয়া রান্না আমাদের জন্য একটি সমস্যা। এ ছাড়া বেড়ানোর কোন অসুবিধা হয়নি।

Nainitaal Lake.

আসাম শিলং ভ্রমণ ( ২০২৩)

আজন্ম শুনে এসেছি কুন্ডু স্পেশাল এর নাম। এই প্রায় বৃদ্ধ বয়সে এসে ওদের সাথে বেড়াতে যাওয়ার যোগাযোগ হল। আসাম আর মেঘালয় ঘুরে এলাম। 2023 এপ্রিল মাসের ছয় তারিখ সকালে কোলকাতা বিমান বন্দর থেকে প্লেনে চড়লাম। এক ঘন্টার কম সময়ে গুয়াহাটি পৌছে গেলাম। গুয়াহাটি বিমান বন্দর এর বাইরে কুণ্ডু স্পেশাল এর লোকজন অপেক্ষা করছিলেন। আমরা প্রায় তিরিশ জন এসে পৌঁছতে তিরিশ পয়ত্রিশ মিনিট লাগল। ওদের লোকই আমাদের বড় ব্যাগ গুলি ওদের ভাড়া করা মিনি বাসে তুলল। তিনটি ট্রাভেলার মিনি বাস আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিল, ঘন্টা খানেক সময় লাগল। কুণ্ডুর লোক অমাদের সকলকে চা দিল। পরে জানলাম , ওদের চারজন রান্নার লোক আর একজন ম্যানেজার আগের দিন ট্রেনে পৌঁছে গেছেন। পৌঁছনোর এক ঘন্টা পর হোটেলের থাওয়ার জায়গায় আমরা সবাই খেতে নামলাম। কুণ্ডুর লোকই রান্না করেছিল। পরের সাতদিন চার বেলার থাওয়া ইত্যাদি সবই এরাই ব্যবস্থা করে।

দুপুরে থাওয়ার পর এক দেড় ঘন্টা বিশ্রাম এর পর আবার সবাই দল বেধে নিচে নামলাম। সেই তিনটি মিনি বসেই চললাম বশিষ্ঠ আশ্রম দেখতে।

গুয়াহাটি শহরের এক প্রান্তে বশিষ্ট আশ্রম। আমরা পৌঁছলাম সূর্য ডোবার পর, সন্ধ্যা হয়ে আসছে তখন। পাহাড়ের কুড়িটা মত সিড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠলাম। ছোট পুরাতন মন্দির, ভেতরে কোন বিগ্রহ নেই। একটা তেল সিঁদুর মাখিয়ে রাখা বড় পাথরের কাছে একজন পুরোহিত বসেছিলেন। মন্দিরের পিছন দিকে পাহাড় থেকে একটা ঝর্ণা ধারা পাথরের খাঁজে খাঁজে নেমে আসছে। পর্যটকেরা অনেকে সেখানে ছবি তুলছে দেখলাম। ঐ ঝর্ণার পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে এলাম। গাড়ী যেদিকে রাথা হয়েছিল সেদিকে কয়েকটা চায়ের দোকান দেখে এগিয়ে গেলাম। মাটির গ্লাসে চা খেলাম, কুড়ি টাকা দাম। পরে অবশ্য ওদিকে যেখানেই চা খেয়েছি, কাগজের কাপেও কুড়ি টাকা। সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরেই কুণ্ডুর লোক তেলে ভাজা আর চা দিয়েছিল।

বশিষ্ট আশ্রম থেকে গেলাম শহরের ভেতরে বালাজী মন্দিরে। অনেকখানি ছড়ানো ছিটানো জায়গা নিয়ে তিনটি দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির।

রাতের খাওয়া হল হোটেলের খাওয়ার ঘরে, রান্না আর পরিবেশন কুণ্ডুর লোকের। রাতের খাওয়া র সময়ই পরের দিনের ভ্রমণ সূচী জনিয়ে দেওয়া হল। ভোরে উঠে গরম জলে স্নান করে কামাখ্যা মন্দির দর্শনের জন্য রওয়ানা হলাম। ভোরে ফাঁকা রাস্তায় মন্দিরে পৌঁছতে আধ ঘন্টা মত লাগল। বাস থেকে নামার সাথে সাথেই কুণ্ডুর লোক সকলের হাতে হাতে একটা করে মজবুত ব্যাগে , সকালের প্রাতরাশের প্যাকেট দিয়ে দিল। ৭ই এপ্রিল সকালে গুয়াহাটি তে জল গরম করে স্নান করতে হয়েছে, ভাবা যায়।

সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কামাখ্যা মন্দির চত্তরে ঢুকলাম। ঢুকেই দেখি একটা লম্বা লাইন। জানলাম , ওটাই ভি আই পি টিকিট কাটার লাইন। আন্দাজে মনে হল পাঁচ সাতশ লোকের পিছনে আমরা দাঁড়িয়েছি। সকালে টিকিট দেবে দুশো জনকে। কুণ্ডুর ট্যুর ম্যানেজার দুজন এদিক ওদিক ঘুরে, পান্ডা ধরে কিছু করা যায় কি না চেষ্টা করে গেল। ঘন্টা দেড়েক লাইনে দাঁড়ানোর পর জানা গেল, দুশো টিকিট শেষ। বহু লোক লাইন ছেড়ে চলে গেল। আমাদের ম্যানেজার বলল, লাইন ছাড়বেন না, বারোটার পর আবার টিকিট দেবে। আমি মিনিট পনের পরে ম্যানেজার কে জানিয়ে দিলাম, আমার ও ভাবে মন্দিরে ঢোকার দরকার নেই। আমার স্ত্রী আরও অনেকের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে রইল। এবার একে একে প্রায় সবাই পাশের পাথরের বসার জায়গায় বসে প্রাতরাশের প্যাকেট খুলে খেয়ে নিলাম। আমি এবার একা একাই মন্দির চত্বর ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম।এক সময় দেখলাম , পাশের একটা দরজা দিয়ে অনেকেই মন্দিরের ভেতরে যাচ্ছে, আমিও অনেক ভেতরে গিয়ে দেখে এলাম।পরে জানলাম , মন্দিরের গর্ভ গৃহ ছাড়া সবই দেখেছি। ক্রমে ক্রমে মন্দির চত্বর মেলার মত ভিড় হয়ে গেল। গেটের বাইরে বেরিয়ে একটা গলির ভেতর দোকানে চা খেলাম। ঐ গলি দিয়ে কিছুটা উপরে গিয়ে মন্দিরে ঢোকার সাধারণ লাইনটা ও দেখে এলাম।

বেলা এগারোটা নাগাদ মনে পড়ল , একটা বইতে পড়েছিলাম, ভুবনেশ্বরী মন্দিরের কথা। দু চার জনকে জিজ্ঞেস করে রাস্তাটা জেনে নিলাম। দু একটা সাইন বোর্ড ও চোখে পড়ল। খাড়া পাহাড়ী গলি ধরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম।প্রায় পাঁচশ সিঁড়ি ভেঙ্গে একটা পিচ ঢালা পাহাড়ী রাস্তা পেলাম। ডান দিকে একটা ভিউ পয়েন্ট তৈরী করা আছে। গোটা দশ বারো সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। নিচে অনেক দূরে গুয়াহাটি শহরের বাড়ী ঘর দেখতে পেলাম। ঐ পিচ ঢালা রাস্তার একটু উপরে ভিআইপি পার্কিং। কিন্তু কোন মন্দির দেখা যায় না। একজন লোক উপর থেকে নেমে আসছিল, তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, মন্দির আরও উপরে। চড়াই রাস্তায় আরও প্রায় একশ ফুট ওপরে উঠতে হল। এবার দেখলাম একটা সিমেন্টের নতুন তোরণ দ্বার। তার ভেতর দিয়ে আরও তিরিশটি মত সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দির চত্তরে পৌঁছলাম। ছোট্ট সুন্দর মন্দির। আমি ছাড়া আর দুজন মাত্র যাত্রী। খুবই নির্জন পরিবেশে একটু এদিক ওদিক ঘুরে এলাম। মন্দিরের পিছন দিকে গিয়ে দেখলাম, অনেক নিচে ব্রহ্মপুত্র নদী। মাঝে মাঝেই চড়া দেখা যাচ্ছে। দূরে গুয়াহাটি শহর ও দেখা যায়। কয়েকটা ছবি তুলে নেমে এলাম কামাখ্যা মন্দির চত্তরে।

ওখানে আমাদের দলের সবাই ভিআইপি টিকিটের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রায় পৌনে একটার পর ওরা সকলে পূজার লাইনে ঢুকে গেলে আমি আবার নিজের মত ঘুরতে শুরু করলাম। ওদের পূজা দিয়ে বেরোতে চারটা পেরিয়ে যাবে শুনলাম। আমার স্ত্রী কে বললাম, আমি উমানন্দ দেখে হোটেলে চলে যাচ্ছি। মন্দির এলাকা থেকে বেরিয়ে একটু নিচে নেমে দেখি অনেক লোক লাইন দিয়ে ভান্ডারায় প্রসাদ খেতে ঢুকছে; আমিও ঢুকে পড়লাম। কয়েকশ লোক একসাথে স্টিলের থালায় খিঁচুড়ি নিয়ে খেলাম। ওখান থেকে বেরিয়ে বাস অটো যেখানে দাঁড়ায় সেদিকে চললাম। এমন সময় আমাদের এক ম্যানেজার মোবাইলে ফোন করে বলল, সকলে খেতে বেরোচ্ছে আমি ভান্ডারায় খেয়ে নিয়েছি জানালাম। আরও জানালাম আমি উমানন্দ দেখতে যাচ্ছি। পাশ থেকে এক অটো রিক্সা চালক শুনতে পেয়ে বলল, আমি অটো রিক্সা নিয়ে যাচ্ছি, চলুন। ওর আরও দুজন যাত্রী ছিল, তাদের সাথে আমাকেও উমানন্দের ঘাটে পৌঁছে দিল। সাথে সাথেই টিকিট কেটে লঞ্চে উঠলাম। মাত্র মিনিট দশেকেই উমানন্দ ঘাটে পৌঁছে দিল লঞ্চ। ঘাট থেকেই খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে মন্দির চত্তরে। অন্তত দুশো সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। পাহাড়ের মাথায় একটা ভলি বল খেলার মাঠের মত জায়গা। তাতেই তিনটি ছোট ছোট মন্দির। পূজা দেওয়ার জন্য জনা পঞ্চাশেক লোকের লাইন পড়েছে। আমি আর পূজার লাইনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম না। নিচে লঞ্চ ঘাটে নেমে এলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লঞ্চ ছেড়ে দিল। এপারে ফিরে এসে আবার সেই আগের অটো রিক্সা ই পেলাম। বিকেল পৌনে চারটার দিকে হোটেলে ফিরে এলাম। আমাদের দলের সবাই ফিরল প্রায় ছয় টা নাগাদ। স্ত্রীর কাছে জানলাম, ওদের আর উমানন্দে যাওয়া হয় নি। সারাদিনের ধকলের পর আমার স্ত্রী আর বেরোতে চাইল না। আমি একাই বেরিয়ে পল্টন বাজারে আধ ঘন্টা মত ঘুরে এলাম।

নিয়ম মত রাত্রে খাওয়ার সময় ম্যানেজার জানিয়ে দিল পরের দিন কখন রওনা দিয়ে কোথায় যাওয়া হবে। সকাল সাড়ে সাতটায় রওনা দিয়ে যাওয়া হবে কাজিরা ঙ্গা। আড়াইশো কিলোমিটার মত রাস্তা। আমরা যাবো সেই তিনটি ট্রাভেলার মিনি বাসে। পুরো লটবহর যাবে। তাই আমাদের বড় স্যুটকেসগুলি কুণ্ডুর লোক আর হোটেলের ছেলেরা মিলে এক ঘন্টা আগেই বাসে তুলল। আমরা প্রাতরাশ করে বাসে উঠলাম। বাস ছাড়ার সাথে সাথেই কুণ্ডুর একজন লোক আমাদের একটা করে লজেন্স চকলেট এর প্যাকেট দিল। মিনিট কুড়ি শহরের রাস্তায় চলার পর আমরা শহর ছাড়িয়ে হাই ওয়ে তে চলতে শুরু করলাম। রাস্তার পাশের বাড়ী ঘর, চাষের জমি আমাদের বাংলার মতোই।

একটানা ঘন্টা তিনেক চলার পর আমাদের গাড়িগুলি হাই ওয়ে ছেড়ে একটা সরু রাস্তায় ঢুকল। তিন কিলোমিটার মত চলে একটা মন্দিরের কাছে মাঠে গিয়ে দাঁড়ানো হল। মন্দিরটি ঠিক একটি শিব লিঙ্গের আকার। দোতলা মন্দিরটি চল্লিশ ফুট মত উচু হবে। বেশ রোদ ছিল, আমাদের ছাতা স্যুটকেসে, তাই রোদের মধ্যেই ধুধু প্রান্তরের মাঝে মন্দির দেখতে গেল সকলে। আমার আর মন্দিরে ঢোকার আগ্রহ ছিল না। দূর থেকেই দু একটা ছবি তুলে একটা চায়ের দোকানে বসলাম। ভালো কথা, মন্দিরটির নাম শুনলাম মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দির। আবার সেই তিন কিলোমিটার ফিরে হাই ওয়ে ধরলাম।

ঘন্টা দেড়েক চলবার পর একটা জায়গায় থামা হল। এক ম্যানেজার আর একজনকে নিয়ে রাস্তার পাশের বড় ধাবায় ঢুকল। দু চার মিনিট পরই সকলকে নামতে বলল। হাই ওয়ে র পাশের ধাবা বললে আমরা যা বুঝি এটা সেরকম নয়। সামনে বিরাট রেস্টুরেন্ট। পিছনে বাগানের মধ্যে আবার খড়ে ছাওয়া বসার জায়গা। আমরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলাম। কুণ্ডুর লোক বাগানের পাশে একটা শেডের তলায় খাওয়ার গরম করে নিল। আধ ঘন্টার মধ্যেই আমাদের মাছের ঝোল ভাত দিয়ে দিল। সবার খাওয়া হলে ওরা নিজেরা খেয়ে, বাসনপত্র ধুয়ে বেঁধে বাসে তুলল। সব মিলে ঘন্টা দেড়েক। আবার বাস ছাড়লে সকলকে একটা করে ট্রপিকানা র প্যাকেট দিল। ঘন্টা দেড়েক চলার পর কাজীরাঙ্গা জঙ্গলের এলাকার মধ্যে দিয়ে বাস রাস্তা চলল। সে এক সুন্দর অভিজ্ঞতা; পরে লিখব।

কাজিরাঙ্গা ভ্রমণ

হাইওয়ে ধরে চলতে চলতে মাঝে মাঝে বড় সাইন বোর্ড দেখতে পেলাম, লেখা, জঙ্গলের প্রাণীদের পারাপারের জায়গা, গাড়ী আস্তে চালান। ওসব জায়গায় রাস্তার পাশের জঙ্গল বেশ ঘন। এক জায়গায় আমাদের গাড়ী থেমে গেল, ড্রাইভার বাম দিকে মাঠের মধ্যে একটি গণ্ডার দেখাল। সবাই বেশ উত্তেজিত; সকলেই মোবাইলে ছবি তুলেছিলাম। আমাদের সামনের গাড়ীর কয়েকজন নেমে রাস্তার পাশে গিয়ে ছবি তুলল। ওখান থেকে কাজীরাঙ্গা জঙ্গলে ঢোকার মূল রাস্তাটি প্রায় দশ কিলোমিটার। আবার একটু এগোনোর পর বা দিকে মাঠের মধ্যে দুটি হাতি দেখতে পেলাম। তারপর আবার এক জায়গায় একটি বাচ্চা সহ মা গণ্ডার। এসবই বাস রাস্তা থেকে একশ মিটার মত দূরে। পরে পাঁচ শ মিটার মত দূরে আরও দূ একটা গণ্ডার দেখলাম। এই ভাবে কখনও জোরে কখনও আস্তে চলে আমাদের গাড়ী রিসোর্ট এ পৌঁছাল প্রায় বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ। খুব ছড়ানো ছিটানো জায়গা নিয়ে রিসোর্ট এর কটেজ গুলি। আমাদের কটেজ এর চাবি দিয়ে দিল, নিজেরাই এক একটি কটেজ খুলে ঢুকলাম। মিনিট দশেকের মধ্যে আমাদের স্যুটকেস কটেজে পৌঁছে গেল। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই তেলেভাজা আর চা এসেগেল। সন্ধ্যার মুখে আমরা এক এক করে বেরিয়ে রিসর্টের বিরাট এলাকার মধ্যে ঘুরে দেখতে লাগলাম। একটা ফুটবল মাঠের মত জায়গার এক পাশে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে বিহু নাচ এর মহড়া দিচ্ছিল, আমরা দেখলাম। রাত নটার পরই কুণ্ডুর লোক খাওয়ার জায়গায় সকলকে ডেকে নিয়ে গেল। রাতের খাওয়ার সময় ই ম্যানেজার জানিয়ে দিল, পরদিন সকাল আটটায় জঙ্গল সাফারী করার জন্য রিসর্টের সামনে জীপ এ উঠতে হবে।
কাজিরঙ্গা তেও সকালে জল গরম করে স্নান করতে হল। সকালেই টি ভি র খবরে দেখলাম, কলকাতায় তাপপ্রবাহ চলছে। খোলা জিপে জঙ্গলে ঘুরতে হবে বলে কেউ কেউ ছাতা নিয়ে উঠলো, কোথাও ছাতা মাথায় দিতে হয়নি।

জীপে ওঠার আগে মাথাপিছু ছয়শ টাকা করে ম্যানেজারকে দিলাম। প্রতিটা জীপে ছয় জন করে বসার ব্যবস্থা। অন্যান্য জাতীয় অভয়ারণ্যে জীপে একজন করে গাইড থাকে, এখানে ড্রাইভারই গাইড। পরিচয় পত্র ও কেউ দেখতে চাইল না। রিসোর্ট থেকে মিনিট দশেকের মধ্যে আমাদের জীপগুলি চেক পোষ্ট এ পৌঁছে গেল। অন্তত পঁচিশ তিরিশটি জীপের লাইন পড়ল। রাস্তার ডানদিকে নিচে একটা মাঠের মধ্যে গোটা পনের গাড়ী পার্কিং করা আছে দেখলাম। পরে জানলাম যারা হাতীর পিঠে সাফারী করতে গিয়েছে, তাদের গাড়ী ওগুলি। মিনিট দশ পনের লাগল আমাদের দলের কাগপত্রগুলো ঠিক করতে। তার পর জীপ চলল। চেক পোষ্ট এ ভালো করে পরীক্ষা করা হয়েছিল, কারও কাছে কোন খাওয়ার আছে কি না। একশ গজ মত ঢুকেই দেখি বাম দিকের মাঠের থেকে দুটি হাতী আসছে, তাদের পিঠে দুজন যাত্রী আর মাহুত। ওদিকের মাঠেই, রাস্তা থেকে তিন চারশ মিটার দুরে দুটি গণ্ডার চরে বেড়াচ্ছে। রাস্তার ডান দিকে একটা বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম, ওখানে আরও চার পাঁচটি হাতী। লোকজন ঐ প্ল্যাটফর্ম এ সিঁড়ি বেয়ে উঠে, হাতীর পিঠে চাপছে।

আমাদের জিপগুলি মাঠের ভেতরের আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে চলল। রাস্তার পাশে দু দিকেই মাঠ, জলা জমি। বেশীর ভাগই আট দশ ফুট উঁচু ঘাসের জঙ্গল। বড় গাছের গভীর জঙ্গল খুবই কম। মাঝে মাঝেই জলার ধারে একটি দুটি করে গণ্ডার, হাতী, হরিণ দেখতে থাকলাম। সবাই মোবাইলে ছবি তুলতে থাকলাম। কোথাও কোথাও চার পাঁচটা হাতীর দল, বুনো মহিষের দলও দেখলাম। একটা কাঠের সাঁকো র নিচে একটা বড় শোল মাছ অনেকক্ষণ এক জায়গায় থেকে আমাদের দর্শন দিল। কয়েকটা বুনো শুয়োর, একটা কচ্ছপ আর একটা মাছরাঙা পাখি দেখলাম। এই জঙ্গলে পাখী বিশেষ দেখলাম না। একটা লম্বা জলার এক পাশে, ফাঁকা মাঠে চারটি বাচ্চা নিয়ে চারটি মা হাতী, তাদের কাছেই দুটি গণ্ডার চরতে দেখে প্রায় সবকটি জীপ দাড়িয়ে গেল। আমরা প্রচুর ছবি তুললাম। ঐ জলার উল্টো দিকে একটা ফাঁকা মাঠে একটি ওয়াচ টাওয়ার। অনেকে উঠে দেখছে। আমাদের গাড়ীর একজনও টাওয়ার ঘুরে এলেন। আমার আর নামার ইচ্ছা হল না। আসলে এর মধ্যেই এত বেশী বন্য প্রাণী দেখে নিয়েছি যে নতুন আর কিছু দেখার আগ্রহ ছিল না। জীপ গাড়ী ঘন্টা দুই সময় আমাদের প্রায় আট দশ কিলোমিটার ঘুরিয়ে এনেছে। সাড়ে দশটা এগারোটা নাগাদ রিসোর্টে ফিরে এলাম। আমাদের দলের সবাই প্রচুর বন্য প্রাণী দেখে খুব খুশী।

বিকেলে তিনটে নাগাদ আবার মিনি বাসে করে সকলে চললাম, মাইল খানেক দূরের অর্কিড হাউস দেখতে। ওখানে গিয়েও দেখলাম গোটা তিরিশ গাড়ী করে অনেক পর্যটক পৌঁছে গেছেন। দেড়শ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। একটি সবুজ জালে ঘেরা অর্কিড হাউস অসংখ্য অর্কিড এ সাজানো। ওর উল্টো দিকে একটি ছোট মিউজিয়াম। আসামের , বিশেষ করে উপ জাতীয় লোকেদের তৈরী নানান রকমের জিনিষ দিয়ে সাজানো। পাশেই একটি বাড়িতে নানান রকমের বাদ্য যন্ত্র দিয়ে মিউজিয়াম করা হয়েছে। একজন শিল্পী প্রতিটা বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে, গান গেয়ে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। একটা মুক্ত মঞ্চ মত চালায় বেশ কিছু শিল্পী বিহু নাচ গান করে দেখলেন। ঐ মঞ্চে সন্ধ্যে সাড়ে ছয় টা থেকে সাড়ে আটটা অনেক অনুষ্ঠান হয়। তার জন্য পরে আবার টিকিট কেটে ঢুকতে হয়; আমাদের দেখা হয়নি। গেটের বাইরে বেশ কিছু অস্থায়ী দোকানে নানান রকম স্থানীয় জিনিস বিক্রী হচ্ছে। আমরা কলকাতায় দুষ্প্রাপ্য কালো চাল কিনলাম এক কেজি। মাত্র একশ টাকা দিয়ে।

পরদিন সকালে আবার সবার স্যুটকেশ আগেই বাসে তুলল কুণ্ডুর লোক আর হোটেলের ছেলেরা। আটটা নাগাদ বাস তিনটি ছাড়ল। এবারে আমাদের গন্তব্য সোজা শিলং শহর। ফেরার পথেও রাস্তার পাশের মাঠে সাত আটটা গণ্ডার দেখলাম। আমরা গোটা ছয়েক জাতীয় অভয়ারণ্যে সাফারী করেছি, এত সংখ্যায় বন্য প্রাণী কোথাও দেখিনি। কোলকাতা থেকে প্লেনে বা ট্রেনে গুয়াহাটি পৌঁছে ঐ দিনই আড়াইশ কিমি দূরে কাজিরাংগা চলে যাওয়া যায়। ওখানে অনেক হোটেল। পরদিন সকালে সাফারী করে ঐ দিন ই গুয়াহাটি ফেরা যায়। গুয়াহাটি থেকে জোরহাট অনেক বাস চলে, তাতে করেও কাজীরাঙ্গা যাওয়া যায়।

শিলং

কাজীরাঙ্গা থেকে আমাদের তিনটি মিনি বাস সকাল আটটায় রওনা দিল শিলং শহর এর উদ্দেশ্যে। গুয়াহাটি থেকে যে রাস্তা দিয়ে গেছলাম, সেই রাস্তা ধরেই ফেরা। শুধু গুয়াহাটি শহরে না ঢুকে এক পাশ দিয়ে চলে যাওয়া। ফেরার পথে বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটেনি। ঘন্টা দুই চলার পর বড় রাস্তার পাশে অনেক ডাব বিক্রী হচ্ছে দেখে নামা হল। এক বুড়িমা ডাব বিক্রী করছিলেন। আমার আগে মুখার্জীবাবু দাম জেনে ডাব কেটে দিতে বলেছেন; দাম জানলাম তিরিশ টাকা। আমিও একটা কেটে দিতে বললাম। মুখার্জী বাবু একটা একশ টাকার নোট দিলে বুড়িমা চল্লিশ টাকা ফেরৎ দিলেন। তাই নিয়ে অশান্তি। বুড়িমা বারবারই বলছেন দাম শাটি টাকা। আর মুখার্জী বাবু বুঝছেন থার্টি টাকা। আমি বুঝে গেলাম শাটি মানে উনি ষাট বলছেন। আবার একটা বড় ধাবায় দুপুরের খাওয়া হল। তারপর একটানা ঘন্টা চারেক চলে শিলং শহর। গুয়াহাটি থেকে এক ঘন্টা মত চলার পর পাহাড়ী রাস্তা শুরু হল। আকাবাঁকা রাস্তা ক্রমশ উপরে উঠতে থাকল।এক জায়গায় না থেমেই ডান দিকে দেখতে বলল ড্রাইভার। দেখলাম একটা নদীর মত; ড্রাইভার বলল, বড়া পানী লেক। পরে জেনেছি ওর নাম উমিয়াং লেক। অনেকে ওখানে বোটিং ও করে। শিলং শহর এর রাস্তা বেশ সরু, গাড়িও প্রচুর। শহরে ঢুকে আমাদের হোটেলে পৌঁছতে ঘন্টা খানেক লাগল। সন্ধ্যায় আর কোথাও বেরলাম না। পাহাড়ী শহর হিসেবে যেমন ঠান্ডা লাগবে ভেবেছিলাম তেমন ঠান্ডা ছিল না। রাত্রে ডিনার হলেও সোয়েটার লাগলো না। ভোরে উঠে রাস্তায় হাটতে বেরোনোর সময় সোয়েটার গায়ে বেরোলাম, কিন্তু আট টায় আর সোয়েটার গায়ে রাখা গেল না।

শিলং এর দ্বিতীয় দিনে আমরা চেরাপুঞ্জি পর্যন্ত দেখে এলাম। সকাল আটটায় বাস ছাড়ল। শহরের রাস্তায় এই সকালেই গাড়ীর জ্যাম। আমরা সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ শিলং এর ঠাকুর বাড়ী পৌঁছে গেলাম। একশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়ীতে ছিলেন। এখন সেই বাড়ীতে একটি ছোট মিউজিয়াম হয়েছে। অত সকালে মিউজিয়াম খোলা ছিল না। বাড়ীর সামনে কবির পূর্নাবয়ব মূর্তি; সবাই সেখানে ছবি তুলেছিলাম। তারপর গাড়ী চলল চেরাপুঞ্জির পথে। গোটাটাই আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা। আমরা ঘন্টা তিনেক চলে পৌঁছলাম, নৌয়াকালিকাই জলপ্রপাতের কাছে। ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যে দেড়শ মিটার মত হেঁটে ভিউ পয়েন্ট। অনেক ওপর থেকে জলপ্রপাত দেখলাম। সকল ভ্রমণ স্থানের মত এখানেও বেশ কিছু অস্থায়ী দোকানে স্থানীয় জিনিস বিক্রী হচ্ছে। আমরা দারচিনি কিনলাম। ফেরার পথে পাশেই সোহরা রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট এলাকা। আমরা সবাই নেমে স্কুল আর মন্দির দেখে এলাম। এই মিশন ১৯৩১ সালে তৈরী। অতদিন আগে ঐ দূর্গম জায়গায় এই মিশন স্থাপন করা হয়েছে ভাবলে রোমাঞ্চ বোধ হয়। এক মহারাজের ভাষণে শুনেছি, চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে, সপ্তাহে একবার জীপ গাড়ী নিয়ে গৌহাটি শহরে বাজার করতে আসা হত।

Shilong Rabindra Bhawan

এরপর আমরা পৌঁছলাম একটা গুহার কাছে। টিকিট কেটে গুহার একদিক দিয়ে ঢুকে আর এক দিক দিয়ে বেরোলাম। একশ পঁয়ত্রিশ মিটার রাস্তা , বেশ রোমাঙ্ককর। ভেতরটা বেশ আঁকাবাঁকা। এক এক জায়গায় একটু অসাবধান হলেই মাথায় ঠোক্কর লাগার সম্ভাবনা। আমাদের দলের চার পাঁচ জনই গুহায় ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেড়িয়েছি। সামনে বিরাট চত্বরে গাড়ী রাখার জায়গা। বেশ কিছু গাছের তলা সিমেন্ট বাঁধানো। কুণ্ডুর লোক আমাদের হাতে হাতে দুপুরের খাওয়ার প্যাকেট দিল। ঐ সব বাঁধানো গাছের তলায় বসে সকলে খেয়ে নিলাম। মিনিট পনের চলার পর বড় রাস্তার পাশে এক জায়গায় বাস থামল। সবাই নেমে উল্টো দিকে সেভেন সিস্টার ফলস দেখতে গেলাম। জলপ্রপাত একেবারেই জল শুন্য। একটু বৃষ্টি হলে সাতটা ধারায় জল নামে জানলাম। আমাদের অনেকের ধারণা ছিল, চেরাপুঞ্জি তে বৃষ্টি দেখা যাবে। এপ্রিল এর এগারো তারিখ এক টুকরো মেঘ ও আকাশে ছিল না। শিলং এর অনেক কাছে এসে, বড় রাস্তা থেকে বাম দিকের ছোট রাস্তা ধরে

একটি ভেতরে ঢুকলাম। এখানে এলিফ্যান্ট ফলস জলপ্রপাত। তিনটি ধাপে জলপ্রপাত। এখানে বেশ জল ছিল। এক এক করে আমরা একেবারে নিচে পর্যন্ত নেমে দেখে এলাম। ওঠার সময় গুণে দেখলাম , একশ ছিয়াশি সিঁড়ি। ওখান থেকে সোজা শিলং এর হোটেলে ফিরে এলাম। শহরে সকালের থেকে বেশী জ্যাম, হোটেলে পৌঁছতে বিকাল পাঁচ টা বেজে গেল। আমাদের দলের কয়েকজন ট্যাক্সি নিয়ে পুলিশ বাজার ঘুরতে গেলেন, আমার উৎসাহ ছিল না।

পরদিন সকালে উঠে আমরা হোটেল থেকে নিচের দিকে হাঁটতে গেলাম। কিছুটা উৎরাই নেমে আবার চড়াই রাস্তায় উঠলাম। বেশ কিছুটা হেঁটে একেবারে একটা পাহাড়ের মাথায় পৌছে প্রায় সমতল রাস্তা পেলাম। হাটতে হাটতে একটা বড় ফুটবল মাঠে পৌঁছে গেলাম। কিছু ছেলে ফুটবল খেলছে, অনেকে মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওখান থেকে দু দিকেই পাহাড় দেখা যায়, বেশ সুন্দর দৃশ্য। দ্বিতীয় দিনে আমরা চললাম মাউলিংনন গ্রামের দিকে। এটা অনেক টা চেরাপুঞ্জি র রাস্তায় এগিয়ে চল্লিশ কিমি মত গিয়ে বাম দিকের রাস্তা ধরতে হয়। মাঝে পাঁচ কিমি মত রাস্তা খুব খারাপ। ধূ ধু প্রান্তরের মাঝে রাস্তার পাশে একটা খুব ঝক ঝকে হোটেলের সামনে গাড়ী দাঁড়াল। সকলে হোটেলের টয়লেটে গিয়ে প্রস্রাব পায়খানা করে নিলাম। এমন বিচ্ছিন্ন জায়গায় এত সুন্দর ব্যবস্থা দেখে সকলেই প্রশংসা করলাম। এখন থেকে আরও মাইল পাঁচেক এগিয়ে, বড় রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে বেশ সরু রাস্তায় গাড়ী ঢুকল। এই রাস্তা শুধু সরুই নয়, একেবারে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলল। দশ কিলোমিটার মত চলার পর আমরা মাওলিংনন গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামে ঢুকতে একটা চেক পোষ্ট, এখানে মাথা পিছু তিরিশ টাকার টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। একটু পাহাড়ী রাস্তা একশ গজ মত নেমে একটা বেশ ছড়ানো, পিচ ঢালা মাঠে পৌঁছল। ওখানে সবাই গাড়ী থেকে নামলাম। ঠিক দুপুর বেলা। ঝক ঝকে রোদ, কিন্তু কলকাতার মত আগুন গরম নয়। একজন ম্যানেজার জানিয়ে দিল, এক ঘন্টা গ্রাম ঘুরে আবার সেই জায়গায় ফিরে আসতে হবে। ওখানেই একটা হোটেলে দুপুরের খাবারের আয়োজন। আমরা সোজা গ্রামে ঢুকব না পিছন ফিরে ঘুরে ঢুকব তাই নিয়ে একটু টানা টানি হল। শেষে দলবেঁধে সোজাই ঢুকলাম। একটু এগিয়ে বাঁশের তৈরী ওয়াচ টাওয়ার দেখতে পেলাম। এটা আমি আগে ইউটিউবে দেখেছিলাম। ওঠার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোন কারণে বন্ধ ছিল। আমরা আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিটেই গ্রামটা ঘুরে দেখলাম। পাহাড়ের ঢালে ঢালে বাড়ী। প্রতিটি বাড়ীতেই ফুল আর পাতা বাহার এর গাছ। গ্রামটা পরিচ্ছন্ন গ্রাম বলে প্রচার পেয়েছে। আমার কিন্তু গ্রামটাকে পরিষ্কারের থেকেও সুন্দর বেশী মনে হয়েছে। গ্রামের চার্চের এলাকায় ঢুকে ঘুরে দেখলাম। ফুটবল মাঠে ঐ দুপুরের রোদেও ছেলেরা ফুটবল অনুশীলন করছিল, আমরা মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে অন্য দিকে গেলাম। গ্রামটাতে ঘুরে বেড়ালে ও লোকজন প্রায় দেখাই গেল না। প্রায় প্রতিটা বাড়ীতেই হোমস্টের ব্যবস্থা করেছে। একটা দোতলা বড় হোটেলও দেখলাম। গ্রাম ঘুরে এসে একটা বড় হোটেলের চালার নিচে আমরা সবাই খেয়ে নিলাম ঘন্টা খানেক পর গাড়ী ছাড়ল। মিনিট পাঁচ সাত চলেই পৌঁছে গেলাম লিভিং রুট ব্রীজের কাছে। এই গাছের শেকড় দিয়ে তৈরী সেতু একটি দর্শনীয় জিনিস বটে।একটি তিরিশ ফুট মত চওড়া ঝোরার উপর এই সেতু। মনে হল এক পাশের দুটি গাছের শিকড় দিয়েই সেতুটি তৈরী। সেতু পেরিয়ে অন্য পাড়ে গিয়ে, নিচে নেমে , নানান ভাবে অনেক ছবি তোলা হল।সেতু তৈরীর গাছ দুটিকে বট গাছের মত লাগল। হাতের কাছে একটা নতুন ডালে কিছু পাতা দেখা গেল। অনেক টা আমরা যাকে রবার গাছ বলি, সে রকম পাতা। তবে আকারে অনেক ছোট। এই সেতু দেখার জন্য আমাদের চল্লিশ টাকা করে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়েছে। আমাদের গাড়ী অনেক টা নীচে একটা ছোট্ট মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই আমাদের বেশি হাঁটতে হয়নি। হয়তো একশ ধাপ ও নামতে হয়নি। কিন্তু আমাদের সাথে থাকা বয়স্ক লোকজন অনেকে ওখানে নামার সাহস পাননি।

**Living Root Bridge , Near Cherapunji**

ঐ দিন আর নতুন কিছু দেখা হয়নি, ঐ রুট ব্রীজ থেকেই সোজা শিলং এর হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন তো সকালে রওনা দিয়ে গুয়াহাটি ফিরে এসে দুপুরের প্লেন ধরে বিকেলে কলকাতা চলে এলাম। ঐ Mawlainong গ্রামের থেকে আবার চল্লিশ কিমি মত গেলে ডাউকি নামে একটি ভালো বেড়ানোর জায়গা আছে; আমাদের যাওয়া হয় নি। শিলং থেকে প্রথমদিনই চেরাপুঞ্জি গিয়ে আবার শিলং ফিরে না এসে, ঐ দিন ওদিকেই মাওলাইনোং গ্রামে গিয়ে থাকতে হত। তা হলে দ্বিতীয় দিনে ওখান থেকেই সকালে ডাউকি গিয়ে বিকেলে শিলং ফেরাটা কম পরিশ্রমের হত। সম্ভবত Mawlainong এ এত লোকের এক সাথে থাকার মত হোটেল না থাকায় কুণ্ডু স্পেশাল ওখানে রাত্রে থাকার কথা ভাবেনি। সব মিলে কুণ্ডুর ব্যবস্থাপনা ভালো। বিশেষ করে একটু বয়স্ক লোকজন এর জন্য তো আদর্শ। আর ওদের সাথে যেহেতু বাঙালি রান্নার লোক আর সরঞ্জাম যায়, খাওয়া নিয়ে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু পাঁচ ছয় মাস আগে থেকেই ট্যুর বুক করাটা সবার কাছে বাস্তব সম্মত না ও হতে পারে।

কাশ্মীর ভ্রমণ ( October 2024)

বাঙালি মাত্রেই একবার কাশ্মীর ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে। আমিও অনেক বছরই ভেবেছি। আমার কোন কোন বন্ধু তিনবারও ঘুরে এসেছে। গত বছর দুই অনেক ইউটিউবের ভিডিও দেখে কাশ্মীর নিয়ে আগ্রহ আরও বেড়েছে। চাকরী থেকে অবসর নিয়ে এবার শুধু দেশের বেড়ানোর জায়গাগুলি ঘুরে বেড়াবো, এরকম ভেবে রেখেছি। ইউটিউবে দেখে দেখে কোন সময় কাশ্মীর যাওয়া যায় তাই নিয়ে বেশ চাপে পড়তে হল। আমার একটা বিশেষ ইচ্ছা হল, আপেল বাগানে আপেল পেকে আছে, সেই সুন্দর দৃশ্য দেখতে হবে। পূজার সময় আপেল পাকে, এই খবরটা পেলাম। তাই ঠিক করলাম, পূজার সময়ই যাবো। মেয়েকে সাথে নিতে হলে পূজার সময় ঠিক হবে না, পূজার পর পরই যেতে হবে। এরপর ঠিক করতে হবে, প্লেনে করে যাব না , ট্রেনে।

এখন তো হাতে অঢেল সময়। হুশ করে প্লেনে করে গিয়ে আবার উড়ে ফিরে আসার দরকার কি! ট্রেনে গেলে জানালা দিয়ে মাঠ ঘাট দেখতে দেখতে যেতে পারি। ট্রেনের খবর খুব সুবিধার নয়। এদিক থেকে জম্মু তাওয়াই যাওয়ার দুটি মাত্র ট্রেন; দু রাত ট্রেনের মধ্যে বসে থাকা। তারপর দু'শো কিমি গাড়ী করে যাওয়া , বেশ ঝামেলার ব্যাপার। আর একটা রাস্তা আছে, দিল্লি থেকে আর একটা ট্রেন ধরে কাটরা যাওয়া যায়। এতে গাড়ীর রাস্তা চল্লিশ কিমি কমবে। তাছাড়া আমার অনেকদিনের একটা ইচ্ছা পূরণ করা যায়। ট্রেনের সময় সূচি দেখে বুঝলাম, রাজধানী ধরে গেলে সেই দিন সন্ধ্যার ট্রেনে দিল্লী থেকে কাটরা যাওয়া যাবে। পূজার ছুটির সময় ট্রেনের টিকিট কাটতে হলে, একশ কুড়ি দিন আগেই কাটতে হবে। ক্যালেন্ডার দেখে ঠিক ঐ একশ কুড়ি দিন আগের তারিখটা দেখে রাখলাম। ( তারপর তো এটা ৬০ দিন হয়ে গেল) কিন্তু ঐ তারিখটাতেই আমাদের ভিমতালে থাকার কথা। মোবাইলেই টিকিট কাটতে হবে। সাথে মেয়েকেও বলে রাখলাম, আমার কোন সমস্যা হলে ও যাতে বাড়ীতে বসে ল্যাপটপে টিকিট কাটতে পারে। এইবারই প্রথম, একেবারে টিকিট দেওয়া শুরু হওয়ার পনের মিনিটের মধ্যেই টিকিট কাটতে পারলাম। ঐ দিন দুপুর সাড়ে এগারোটায় সব টিকিট বিক্রী হয়ে,ওয়েটিং লিষ্ট শুরু হয়েছে দেখেছিলাম। পরদিনই দিল্লী থেকে কাটরা ট্রেনের টিকিটও কেটেছিলাম। ফেরার ব্যবস্থাও ঐ একই রাস্তায়। এসব খবর কিন্তু চার মাস আগের। এর মধ্যে রাঁচি ভ্রমণ করে এসেছি। আবার ডিসেম্বর মাসে মধ্য প্রদেশ ভ্রমণের জন্য টিকিট কেটে নিলাম।

রাজধানীতে প্রথম ভ্রমণের খবর আগেই লিখেছি। রাজধানী দিল্লী পৌঁছয় এগারোটা নাগাদ, কাটরা ট্রেনের সময় সন্ধ্যা সাতটা পাঁচ এ। দিল্লিতে এসে ঘন্টা সাত আট বসে থাকতে হবে। তাই ট্রেনের টিকিট কেনার সাথে সাথেই

রিটায়ারিং রুমও বুক করলাম। এদের আবার নানান রকম ভিরকুটি আছে। সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা আটটা , চাইলেও বুকিং হল না। কিন্তু আগের দিন সন্ধ্যা আটটা থেকে ২৪ ঘন্টার জন্য বুকিং পেলাম। রাজধানী এক্সপ্রেস দিল্লী পৌঁছল দশটা পঞ্চাশ-এ। প্লাটফর্মে নেমে খোঁজ করে জানলাম, রিটায়ারিং রুম ষোল নম্বর প্লাটফর্মে। ওদিকে গিয়ে, তিন তলায় উঠে জানলাম, ওখানেও আছে, কিন্তু আমাদের ১১৪ নং রুম এক নম্বর প্লাটফর্মে। আবার চলো উল্টো দিকে। খাতায় নাম লিখে চাবি নিয়ে রুমে ঢুকলাম এগারোটা পনের নাগাদ। স্নান করে দুপুরের খাবারের জন্য বেরোলাম। রেলের যে ভোজনালয় আছে, সেখানে রাজমা চাওল ছাড়া আর কিছু নেই। হেঁটে বড় রাস্তায় গেলাম। সামনের দোকানটাতেই ঢুকে পড়লাম। শুধুই ভেজ থালি আছে। তাই নিলাম। দাম দিতে গিয়ে বুঝলাম, ডাকাতের কবলে পড়েছি। যে থালীর দাম দেড়শ টাকা হলেই বেশী, তার দাম নিল সাড়ে তিনশ টাকা করে। রাতের ট্রেনে খাওয়ার জন্য রুটি তরকারী প্যাক করে নিতে আবার ঐ বাজারটাতে গেলাম। গলির ভেতর একটা দোকানে দেখলাম, স্পেশাল থালি একশ তিরিশ টাকা। মেয়ে একদিন কম ছুটি নেবে বলে আমাদের সাথে ট্রেনে আসেনি। পরদিন দুপুরে প্লেনে উঠেছে। হিসেব মত অন্তত এক ঘন্টা আগে দিল্লী স্টেশনে পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু পৌঁছল সাড়ে ছয়টা নাগাদ। শুধু ঢুকে আমাদের রুমটা একবার দেখল। আমরা সাত নম্বর প্লাটফর্মে পৌঁছনোর দশ মিনিট পর ট্রেন দিল। এই ট্রেনটা গোটাটাই রাত্রে রাত্রে; জানালার বাইরে দেখার কিছু নেই। ট্রেনে বসেও কাটরার গাড়ীর এজেন্টকে জানালাম, সকালে পৌঁছব। কাটরা পৌঁছে নতুন সিম কার্ড নিয়ে কাশ্মীর এ যেতে হবে। কিন্তু ভোরে জম্মু পৌঁছেই দেখলাম, মোবাইলে কোন সিগন্যাল নেই। কাটরা পৌঁছে দেখলাম, পৌনে ছ'টাতেও অন্ধকার। প্রায় সবাই প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়েই বৈষ্ণদেবী মন্দিরে যাত্রার জন্য নাম লেখাতে লাইন দিল। আমরা মন্দিরে যাব না। তাই বেরিয়ে ঠিক উল্টো দিকের দোকানে সিম কার্ড নেওয়ার জন্য দাঁড়ালাম। গোটা তিনেক লোক একটা করে টেবিল নিয়ে, দোকান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের তিন জনের সিম কার্ড নিয়ে, এক্টিভেট করতে মিনিট পনের কুড়ি লাগল। তারপর গাড়ীর জন্য ফোন করতে পারলাম। ড্রাইভার বলল, মিনিট পনের পরে আসছে। আমরা ঐ ট্রাভেল এজেন্সির দোকানে বসে চা খেলাম। সাতটার আগেই গাড়ী এসে গেল। ঠিক মত আলো ফুটতে প্রায় পৌনে সাতটা বেজেছিল।

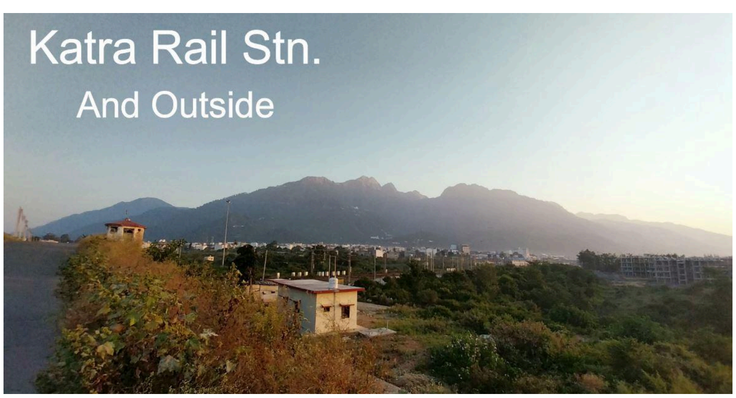

ড্রাইভার জানাল, শ্রীনগর পৌঁছতে সাত ঘন্টা লাগবে। সুন্দর রাস্তা ধরে চলল গাড়ী। দেড় ঘন্টার মত চলে রাস্তার পাশের একটা দোকানে প্রাতরাশ করতে থামলাম। পাহাড়ী রাস্তা, পাশে পাশে চলল চেনাব নদী। সাড়ে এগারোটায় একটা দোকানে চা খেতে বসলাম। দোকানদার বলল, এরপর ভালো রাস্তা, দু ঘন্টায় পৌঁছে যাবেন। রাস্তা বেশ ভালো। কিন্তু কয়েক কিলমিটার পরই জ্যামে পড়লাম। বানীহাল শহর পেরোতেই দেড়টা বেজে গেল। রাস্তার পাশের একটি হোটেলে পৌঁছে দুপুরের খাওয়ার খেয়ে নিলাম। বানিহাল পর্যন্ত গোটা তিন চার টানেল পেলাম। প্রথম টানেলটি সাড়ে নয় কিলো মিটার।

9 কিমি লম্বা টানেল

বাণীহাল পেরিয়ে আধঘন্টা মতো চলার পর আবার একটা নয় কিমি টানেল পেরোলাম। তারপর থেকেই সোজা চওড়া রাস্তা। পাশে পাশে ধানের ক্ষেত। ধান কাটা হয়ে গেছে।

গাড়ী সোজা চলল হু হুঁ করে। এক জায়গায় শুরু হল ক্রিকেট ব্যাট তৈরীর কারখানা। রাস্তার দু পাশের প্রায় সব বাড়ীতেই ব্যাট তৈরীর কাঠ সাজানো। এরকম অন্তত তিন -চার শ বাড়ী দেখলাম। তারপর আবার শুরু হল কেশরের দোকান। শক্তিগরের ল্যাংচা দোকানের মত , মাইল চারেক ধরে চলল কেশর দোকান। হাজার থানেক। শ্রীনগর পৌঁছতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। তার মানে রাস্তায় রাস্তায় দু দিনের বেশী কেটে গেল। ১৭.১০.২৪.

কাশ্মীর ভ্রমণ 2

কাশ্মীর ভ্রমণ করতে এসে একটা দিন পথে পথে কেটে যাবে? এখানে সূর্য ডোবার সময় কলকাতার থেকে প্রায় চল্লিশ মিনিট পর। আমরা হোটেলে ঢুকে মুখ হাত ধুয়ে, একবার ডাল লেক থেকে ঘুরেই আসি, এই ভেবে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের হোটেল ডাল লেক থেকে দেড় কিমি দূরে। রাস্তায় একটা অটো নিলাম, একশ টাকা ভাড়া। লেকের পাড়ে হাঁটতে শুরু করতেই শিকারাওলা ছিনে জোকের মত ধরে ফেলল। অন্তত আধ ঘন্টা দিনের আলো আছে দেখে রাজী হয়ে গেলাম। বেশ দরাদরি করে , এক ঘন্টা, আটশ টাকায় রফা হল। বহু প্রতীক্ষিত ডাল লেকে শিকারা ভ্রমণ শুরু করলাম। এই ভ্রমণের জন্য কোন তিথি নক্ষত্র দেখে বেরোইনি। ঘটনাচক্রে এটা ছিল, কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যা। আমরা ঘটনাচক্রেই ঠিক সন্ধ্যার মুখে শিকারায় উঠেছি। একটু পরেই দেখি পাহাড়ের মাথায় গোল চাঁদ উঠেছে।

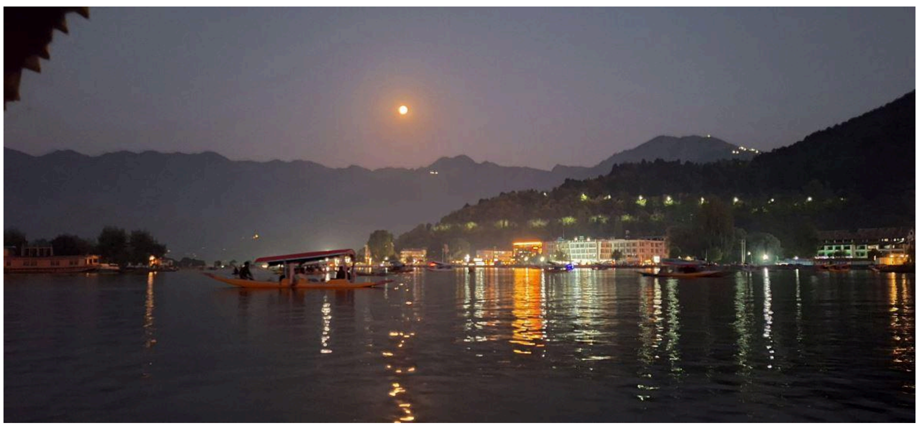

বেশ কিছু ছবি তোলা হল। আমরা এ বছরের প্রথম দিকে কেরালার ব্যাক ওয়াটারে হাউস বোট এ থেকেছি। সেখানে বড় বজরা মাইলের পর মাইল জলে ঘুরে বেড়ায়। ডাল লেকের ধারে ধারে অসংখ্য হাউস বোট। এরা চলে না। তাই এতে থাকার আগ্রহ ছিল না। আমরা শিকরা থেকে দেখলাম। শিকারা চলতে শুরু করতেই ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা করে নানান জিনিস বিক্রী করতে পাশে পাশে চলল। আমরা একটা ডিঙ্গি থেকে কাওয়া কিনে খেলাম। এটা কাশ্মীরের এক বিশেষ পানীয়। কফির থেকে দাম বেশী। আমার তেমন কিছু ভালো লাগেনি। শিকরা থেকে জলে ভাসা অনেক ছোট ছোট বালি হাঁসের মত পাখি দেখলাম। অন্ধকার হলে , সব হাউস বোট এ আলো জ্বলে উঠল।

জলের ধারে ধারে মীনা বাজার। শাল ইত্যাদির দোকান। আমরা নামিনি। ঘাটে ফিরে এসে কম বয়সের ছেলেদের কাছে চা খেলাম। সব ট্যুরিস্ট স্পট এর মত এরাও লোক ঠকাতে ওস্তাদ। চা তিরিশ টাকা বলে, দাম নেওয়ার সময় পঞ্চাশ টাকা নিয়ে নিল। এ এমন কিছু নয়। পরে আরও বড় ঠগের পাল্লায় পড়েছি। আবার একটা অটো নিয়ে ফিরে এলাম। আমাদের হোটেলের গলিতে ঢোকার আগের বড় রাস্তার পাশে প্রচুর দোকান পাট। কিন্তু সন্ধ্যার পর কোনোটাতে একটাও খদ্দের দেখলাম না। শিকারার থেকেও শুধুই বাংলা ভাষায় কথা শুনলাম। এদিকের দোকানে যে দু একটা খদ্দের দেখলাম, তারাও বাঙালি। ১৮.১০.২৪.

সকালে লালচকের রাস্তা

কাশ্মীর ৩

আজ সতেরই অক্টোবর, ২০২৪। শ্রীনগরে যা কিছু দেখার আছে আজ দেখে নিতে হবে। এখানে সকলেই প্রথমে যায় , শঙ্করাচার্য মন্দিরে। এটা একটা পাহাড়ের মাথায় শিব মন্দির। শঙ্করাচার্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বর্তমান মন্দিরটি ততোটা পুরনো নয়, পরের দিকে কোন রাজা পুরোনো মন্দিরটি সংস্কার করেছেন। এই মন্দিরে ওঠার সময়, পাহাড়ের মুখেই সি আর পি এফ ভালকরে পরীক্ষা করে তারপর গাড়ী ছাড়ে। পাহাড়ের পাকদন্ডি বেয়ে অনেকটা উঠে যায় গাড়ী। বড় ট্রাভেলার গাড়িগুলি প্রায় এক কিমি আগেই দাঁড়িয়ে যায়। চার চাকার গাড়ী আরও পাঁচ সাত শ মিটার উঠে যায়। ওখান থেকে দু তিনশ মিটার হেঁটে এগোতে হয়। বিশেষ করে ট্রাভেলার এর যাত্রীরা অনেকে অটো করে বাকী রাস্তা ওঠে। আবার বেশ ভালো করে চেকিং হল। তারপর প্রায় চারশ সিঁড়ি উঠতে হয়।

আমরা কিছুদিন আগেই রাঁচির জলপ্রপাত দেখতে কয়েক হাজার সিঁড়ি ওঠা নামা করেছি। এখানে সিঁড়ি বেশ উচু উচু, তাই পা ধরে যায়, অনেকেই বেশ হাঁপিয়ে যাচ্ছে দেখলাম। ওপর থেকে গোটা শ্রীনগর শহর দেখা যায়। সকলেই ছবি তোলার চেষ্টা করে, আমরাও করলাম। মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির মুখে সত্তর আশি জনের মত লাইন পড়ল। কিন্তু মিনিট পাঁচ সাত এর মধ্যে শিব লিংগ প্রদক্ষিণ করে বেরিয়ে এলাম।

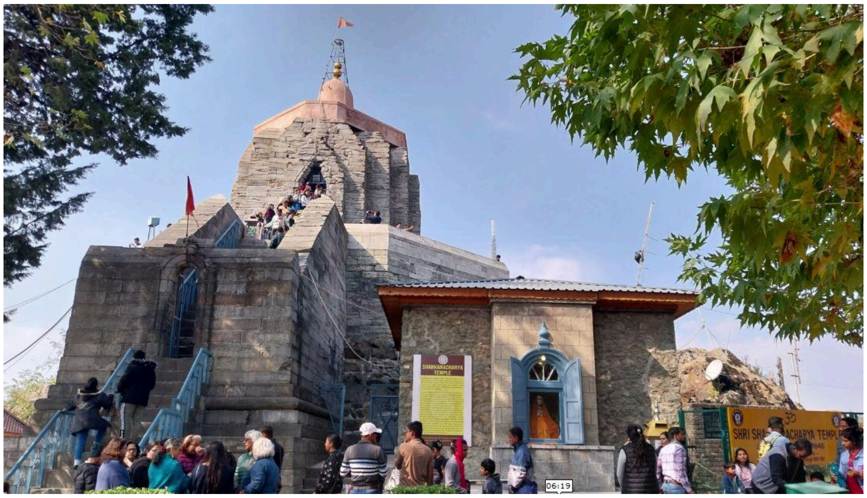

এরপর গোটা পাঁচেক সুন্দর বাগান দেখা। ডাল লেকের পাড়ে পাড়ে গাড়ী চলল কয়েক কিমি। এখানে লেক বেশ চওড়া। শিকারা প্রায় নেই এদিকে। চশমে শাহী বাগান দেখার জন্য দু কিমি আগেই গাড়ী পার্কিং এ রাখতে হল। অটো নিয়ে যেতে দু'শ টাকা, ফিরতে দু 'শ টাকা। বাগানগুলি সবই মোগল আমলের। কিন্তু এখনও বেশ ভালো আছে।

সবকটা বাগানেই ঢোকার টিকিট তিরিশ টাকা। বোটানিক্যাল গার্ডেন সম্ভবত অনেক পরের। শালিমার গার্ডেনের ভেতরে বেশ কিছু মোঘল আমলের স্থাপত্য ভেঙ্গে যাচ্ছে। ফোয়ারায় জল নেই। এই বাগানে বেশ কিছু পুরনো চীনার গাছ আছে। চিনার এদের গর্বের গাছ। এক একটা গাছের বয়স 375 বছরের বেশী। পরেও অনেক এরকম প্রাচীন গাছ দেখেছি। একেবারে রাস্তার মাঝে রাখা আছে বিশাল বিশাল চিনার গাছ। আমাদের এদিকে রাস্তার পাশে গাছ থাকলেই তাকে কাটা হয়। রাস্তার পাশে গাছ থাকবে কেন! সবকটা বাগান দেখা হলে হোটেলে ফিরে এলাম। সন্ধ্যা হলেই বেশ ঠাণ্ডা পড়ে যাচ্ছে, তাই আর বেরোনো হচ্ছে না।

আঠারো তারিখ সকালে বেরোলাম গুলমার্গ দেখতে। ঘন্টা দুই আড়াই সময় লাগে। গুলমর্গ পৌঁছনোর দশ বারো কিমি আগে থেকে পাহাড়ে ওঠা শুরু। সুন্দর পাইন গাছের ছায়ায় ছায়ায় পাকদন্ডি রাস্তা। মাঝে দু একটা ভিউ পয়েন্ট করা আছে, ছবি তোলার জন্য। পাহাড়ে অনেক হলুদ পাতার মাঝারী মাপের গাছ; ড্রাইভার বলল ওগুলি আখরোট গাছ। গুলমার্গ পৌঁছনোর সাথে সাথেই ঘোড়ার দালাল জুটে গেল। আমরা আগেই জানতাম, রোপওয়ে পর্যন্ত যেতে ঘোড়া না নিলেও চলে। কিন্তু গাড়ী নিলে পাঁচ ছয়টা পয়েন্ট দেখাবে বলে, গাড়ী নিতে রাজী করিয়ে ফেলল। শুরু করল ছয় হাজার টাকা থেকে। শেষে সাড়ে তিন হাজার টাকায় রফা হল। গাড়ী থেকে নেমেই বুঝলাম, এটার জন্য এক হাজার টাকা ভাড়া হওয়া উচিত। টুরিষ্ট স্পটে দালালের খপ্পরে পড়ে দরাদরি করতে হবে, এটা ঠিক আছে। কিন্তু এরকম ডাকাতের কবলে পড়তে হবে, কে জানত! ২০.১০.২৪.

বিখ্যাত কাঠের শিব মন্দির

কাশ্মীর ভ্রমণ 4

গুলমার্গের গন্ডোলা , মানে রোপওয়ে। এর টিকিট এর দারুন চাহিদা। আমরা দু'মাস আগে অনলাইনে টিকিট কেটে নিয়েছিলাম। চাহিদা ওখানে গিয়ে বুঝলাম। বিশাল লম্বা লাইন। আমাদের টিকিট এই আঠারই অক্টোবর সকাল এগারোটা পনের থেকে একটা পনের সময়ের। আমরা দশটা কুড়ি নাগাদ গুলমার্গ পৌঁছেছি। সাড়ে তিন হাজার টাকার গাড়ী আমাদের মিনিট চারেকে একটা জায়গায় এনে থামাল। রাস্তার বাম দিকে সুন্দর তৃণভূমি।

ছবি তোলার মতই। ডান দিকে কুড়ি ধাপ মত সিঁড়ি উঠে ছোট্ট মিলিটারী মিউজিয়াম। একটি হল ঘরে আধুনিক অস্ত্র ইত্যাদির প্রদর্শনী। আর অনেক ছবি। এখানে ছবি তোলা যায়। উল্টো দিকের হলে অনেক ঝকঝকে বসার চেয়ার। সিঙ্গারা আর সন্দেশ বিক্রি করছেন। আমি একটা সিঙ্গারা খেলাম। এরপর গন্ডোলা পর্যন্ত যেতে এক কিমি মত রাস্তা। পাশে পাশে গোটা চার পাঁচ জায়গায় নেমে দেখতে বলল। ব্রিটিশ আমলের গল্ফ গ্রাউন্ড, এই সব।

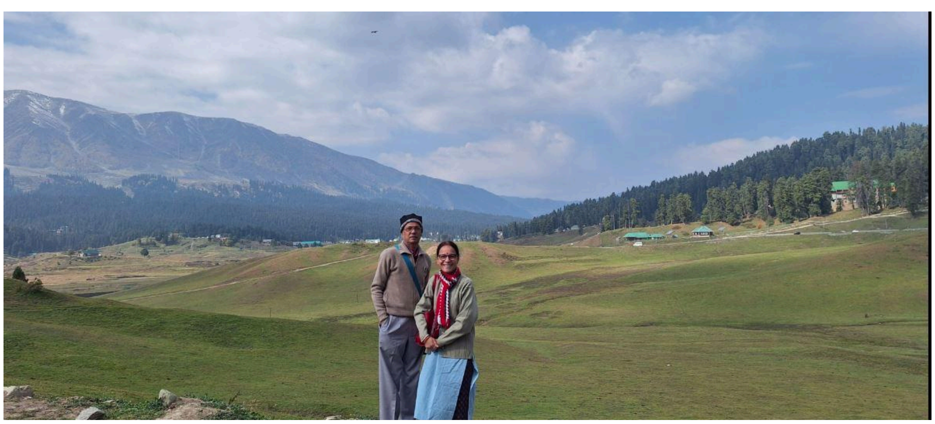

আমরা কোথাও না নেমে সোজা গিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। হলের বাইরে প্রায় চার পাঁচ শ লোকের পিছনে দাঁড়ালাম। কিছু লোক লাইন ভেঙ্গে এগোনোর চেষ্টা করছে দেখে সি আর পি জওয়ান দারুণ ধমক দিল। হলের ভেতরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রায় এক ঘন্টা লাইন চলল। এরপর টিকিটের কিউ আর স্ক্যান, আধার কার্ড মিলিয়ে ছাড়া হল। এক একটা গন্ডোলায় ছয় জনের বসার ব্যবস্থা। হিসেব করে করে বসানো। যেমন আমরা তিনজন, সাথে আর তিনজন ডেকে বসাতে হচ্ছে।

মিনিট দশ বারো চলার পর প্রথম ধাপ। ওখানে নেমে অনেকটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর মত আছে। এখন বরফ নেই। কিছু ছবি তুলে, দ্বিতীয় ধাপের জন্য লাইন দিলাম। আবার মিনিট দশেক উঠে গেলাম। ওখানে ধুধু প্রান্তর। পাথরের খাঁজে খাঁজে কিছু বরফ পেলাম। এই জায়গা প্রায়ই বরফে ঢেকে থাকে। আমরা আপেল দেখার জন্য এসেছি, এ সময় বরফ থাকে না। আবার সেই ফেরার লাইন। এক এক ধাপে এক ঘন্টা লাইন। প্রথম ধাপে নেমে, মাঠের অন্য প্রান্তে গিয়ে খেয়ে নিলাম। পরে অবশ্য বুঝেছি ঐ খাদ্য খুব স্বাস্থ্যকর ছিল না; আমাদের সবার পেট খারাপ হল।

ফেরার পথে আমাদের ভ্রমণের মূল আকর্ষণ; আপেল বাগানে গাছে পাকা আপেল দেখা , হল। কুড়ি টাকা করে দিয়ে বাগানে ঢোকা হল।

আমাদের আগে একটা বড় দল ঢুকেছে। বাগানে ঢুকে তো আমাদের আনন্দে আত্মহারা অবস্থা। এতোদিন ছবিতে দেখেছি, এবার নিজের চোখে দেখলাম। সবাই ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত। এটা ছোট একটি বাগান, সব গাছ ভরে আছে পাকা আপেল। খুব কড়া পাহারা। আগের দলের লোকদের প্রায় ঠেলে বের করছিল। বাগানের মধ্যে পেটি পেটি আপেল বিক্রী হচ্ছে। সাথে সাথে তৈরী করা আপেলের রস খেলাম। চল্লিশটি আপেলের একটি ছোট প্যাকেট চারশ টাকায় কেনা হল। আঠারো কেজির বড় পেটি, তাও দু একটা বিক্রী হল। পরে রস বিক্রেতার কাছ থেকে

জানলাম, এই বাগানের আপেল পাড়া হয় না, এগুলি শুধু ছবি তোলার জন্য রাখা। পরে আমরা অন্য বাগানে, একেবারেই গাছ থেকে পাড়া আপেল খেলাম। হোটেলে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। অপেলের পেটি গাড়িতেই থাকল। এই গাড়ী আমাদের কাটরা স্টেশনে পৌঁছে দেবে। ২১.১০.২৪.

on 18.10.2024.

# কাশ্মীর ভ্রমণ 5

19 অক্টোবর আমাদের সোনমার্গ যাওয়ার কথা। শ্রীনগর থেকে প্রায় নব্বই কিমি দূর, তাই সকালে আটটাতেই রওয়ানা হলাম। আমাদের এই ড্রাইভার খুব সময় মেনে চলে। শহরের বাইরে বেরনোর জন্য একটি সরু শহরতলীর রাস্তা ধরে অনেকটা চললাম। একটা জায়গায় রাস্তার পাশে পরপর বেশ কয়েকটি প্রাচীন চিনার গাছ আছে। প্রায় গোটা রাস্তার পাশে, এমনকি রাস্তার মাঝেও বিশাল বিশাল চিনার গাছ। কেউ কোনোদিন একটা ডালও কেটেছে বলে মনে হয় না। শহর থেকে দশ বারো কিমি বাইরে, শিন্ড নদীর উপর ব্রীজ পেরিয়ে অন্য পাড়ে গেলাম। গোটা রাষ্টাই এই নদীর পাড়ে পাড়ে চললাম। এটা কিন্তু ইন্ডাস বা সিন্ধু নদী নয়।

The Sind River , সিন্ধু নয়

এগারোটা নাগাদ সোনমার্গে গাড়ী পৌঁছল। গাড়ী থামার সাথে সাথেই ঘোড়ার দালাল এসে গেল। তিনটি ঘোড়ার জন্য বারো হাজার টাকা বলল। আমরা তিন বারো ছত্রিশ থেকে দরাদরি শুরু করে সাড়ে চার হাজার টাকায় রফা হল। আমরা কেউ কোনোদিন ঘোড়ায় চাপিনি। এগুলি সবই একটু নিচু। আসলে এরা সব খচ্চর। বাংলায় কেন যে এদের নিয়ে একটা গালাগালি চালু হয়েছে জানিনা। এরা কিন্তু বেশ বাধ্য হয়ে থাকে দেখলাম। আমাদের তিনজনের জন্য একজন সহিস। উনিশ বছরের ছেলে। ওই আমাদের গাইড। মুখে নানান শব্দ করে, শিষ দিয়ে ঘোড়াদের নির্দেশ দেয়। আমার স্ত্রী ওকে জিজ্ঞেস করল, তুমি একা তিনটি ঘোড়া কি করে সামলাবে? ও বলল, আমি দশটা ঘোড়া সামলাতে পারি। পঞ্চাশ মিটার মত বাঁধানো ফুটপাথ ধরে চলার পর, ডানদিকের রাস্তা ধরল ঘোড়ার মিছিল। সামান্য সময় পরই এবোরো খেবড়ো পাথরের ভেতর দিয়ে চলল। নীচের দিকে তাকালে মনে হবে , এই বুঝি ঘোড়া হোঁচট খেয়ে পড়ল। কিন্তু ওরা যে ওতেই চলতে অভ্যস্ত, একটা ঘোড়াও একবারও হোঁচট খেল না। সহিষ ছেলেটি পাশে পাশে ধারা বিবরণী দিতে দিতে চলল। ডান দিকে একটু নিচে একটা মাঠ মত দেখিয়ে বলল, ওখানে অমিতাভ বচ্চনের সিনেমার শ্যুটিং হয়েছিল; সিনেমার নামও বলল। আমার মত বেরসিকের কাছে সবই সমান, নামটা একটু পরেই ভুলে গেলাম। আরও একটা জায়গায় ঐ রকম সিনেমার শ্যুটিং এর খবর বলেছিল। এক কিমি মত চলে, আমরা ওপর থেকে দেখলাম নিচে একটা জায়গায় বেশ কয়েকটি ঘোড়া জড়ো হয়েছে। ছেলেটি বলল, ওটি এক নম্বর পয়েন্ট। আমরা আরও এগিয়ে যাব, তাই ওখানে নামব না। দু দিকেই বিশাল বিশাল উঁচু পাহাড়, মাঝে পাথর ছড়ানো নদীর পথ। সামান্য একটা জলের ধারা দেখা যায়। একটা জায়গায় উল্টো দিকের পাহাড়ে একটি হিমবাহ দেখিয়ে বলল, ওটি থাজিবাস হিমবাহ।

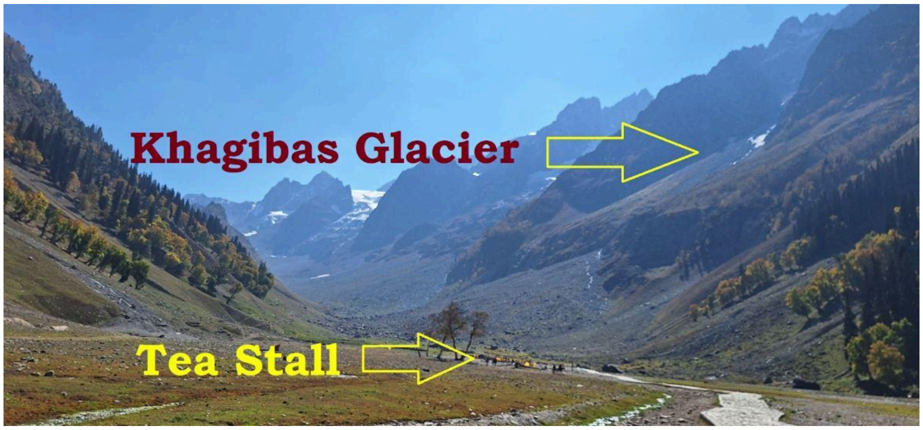


নদীর থেকে অন্তত হাজার ফুট উপরে সাদা বরফ নেমে এসেছে। আমরা এদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে চললাম। চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ঘোড়া নীচের দিকে নেমে একেবারে নদীর কাছে চলে এল। সহিশ ছেলেটি আমাদের দেখিয়ে দিল, কেমন করে লাগাম আলগা করে ঘোড়াকে জল খেতে দিতে হবে। পাথরের উপর দিয়ে কয়েক ইঞ্চি গভীর জল বয়ে যাচ্ছে। সব ঘোড়া ওখানে মুখ দিয়ে জল খেয়ে তারপর এগোল। নদীর পাশে অনেকটা মাঠের মত; তার মধ্যে একজন চা বিক্রী করতে বসেছে। আমরা ঘোড়া থেকে নেমে চা খেলাম। অনেকেই ওখানে চা খেয়ে ফেরার রাস্তা ধরল। আমাদের ঘোড়া চলল এগিয়ে। আবার একটু একটু করে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যেতে থাকল। সামনে আর ঘোড়া দেখতেও পাচ্ছিলাম না। একটু দূরে উঁচু পাহাড়ের খাঁজে আর একটা হিমবাহ দেখতে পাচ্ছিলাম। ঐ উপরে ওঠার কথা ভাবতেই পারছিলাম না। ক্রমশ উঠতে উঠতে নদীর জলের ধারা থেকে প্রায় হাজার ফুট উপরে উঠে গেলাম। একটি জায়গায় প্রায় পঁচিশ তিরিশ ফুট রাস্তা এক ফুট বা তারও কম চওড়া। ঘোড়া নিজের ছন্দে চলল। সেরকম লোক হলে নীচে নদীর দিকে তাকিয়ে ভয়েই শেষ হয়ে যেতে পারে। ঐ পথে ফেরার সময় উল্টো দিক থেকে গোটা চারেক ঘোড়া এসে গেল। দুজন মানুষ পের হওয়াই অসম্ভব। এদিকে একটা জায়গায় চারটি ঘোড়াকে থামিয়ে ওদের সহীশ ধরে দাঁড়িয়ে থাকল, আমরা পেরনোর পর ওরা গেল। আমাদের সহীস ছেলেটি বলল, আমি শিষ দিয়ে ওদের জানিয়ে থামতে বলেছি। পরের কথা আগে বলে দিলাম। ঐ ভয়ংকর মোড়টা পেরনোর পর সামনে গোটা দুই ঘোড়া দেখলাম। এক সাদা চামড়ার ছিপছিপে যুবক হাতে একটা হেলমেট ঝুলিয়ে হেঁটে ফিরছে দেখলাম। ঐ বিকট পাথুরে রাস্তায় কি করে হাটছে, ভাবাই যায় না। এক পাথর ছড়ানো জায়গায় পৌঁছনোর আগে, একটু বাম পাশে একটা খাদের উপরে একটা পাথরের সেতুর মত হয়ে আছে দেখলাম। ওটার কুড়ি পঁচিশ ফুট দূরে, ঘোড়া থেকে নামতে বলল। তারপর সামনের কাঠ কয়লায় ঢাকা একটা বিরাট চাথাল দেখিয়ে বলল, ঐ দেখুন গ্লেসিয়ার।

প্রথমে তো বুঝতেই পারিনি কোথায় দেখতে বলছে। পরে সেই ন্যাচারাল ব্রীজ এর অন্য প্রান্ত দেখে বুঝলাম, ওটা হিমবাহ গলে, একটা বিরাট খোদল মত হয়েছে। ওদিকে হলদেটে সাদা মার্বেল পাথরের মত ওটি আসল জমাট বাঁধা হিমবাহ। ওটিই সিন্ড নদীর উৎস। সোন মার্গে এসে যে একেবারে একটা নদীর উৎস পর্যন্ত যাওয়া যায়, আগে কেউ বলেনি। আমি ইউটিউব ভিডিও দেখেছি, থাজীবাস হিমবাহ সাদা বরফ নিয়ে নদীর কাছে নেমে এসেছে। সেই সময় আরও দেড় কিমি এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ফেরার জন্য ঘোড়ায় উঠতেই ঘোড়াগুলি যেন দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে শুরু করল। এবার আর নদীর কাছে নামাই হল না। উপরের পথ ধরেই চললাম। ঘোড়া মাঝে মাঝে পড়ে থাকা শুকনো পাতা খেতে থাকল। এ বেচারাদের কোন সময়ই বোধহয় পেট ভরে খাওয়া জোটে না। যেতে দু ঘন্টা, ফিরতে এক ঘন্টা লাগল। ফিরে ঘোড়া থেকে নামতেই ঘোড়ার আসল মালিক এসে গেল টাকা নিতে। সোহিস বলল, আমাকে বখশিস দিন। একশ টাকা দিলাম। মালিক লোকটিকে UPI Payment করতে গিয়ে পড়লাম বিপদে। এমন বিপদে এই প্রথম পড়লাম। সে এক ভিড়কুটি কান্ড। চলল প্রায় তিন দিনের বেশী। ২২.১০.২৪.

শীতের সোনমার্গ

কাশ্মীর 6 ( UPI ব্যবহার এর বিড়ম্বনা)

আমি অনেকদিনই SBI BHIM UPI ব্যবহার করি। ভীম মাঝে মাঝেই কাজ করে না। আসলে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এত বেশি যে, এতটুকু সন্দেহ হলেই, পেমেন্ট বন্ধ করে দেয়। আমার এই সমস্যা হচ্ছে দেখে, আমার মেয়ে বলল, বাইরে যাচ্ছ, ফোন পে লাগিয়ে দিচ্ছি। বাড়ীতে বসে দু চারটি লেনদেন করে , পরীক্ষা করে নিলাম। কাশ্মীরে গিয়েও ঠিকই কাজ করছিল। সোনমার্গে ঘোড়ার আসল মালিককে সাড়ে চার হাজার টাকা দিতে গিয়ে, ঝুলে গেল। Processing চলল তিনদিন ধরে। ঘোরাওলা বলল, এই সমস্যা হয় মাঝে মাঝে, দু দিনও লাগে। ওকে বললাম, ঐ আমাদের গাড়ী, ওখানে গিয়ে বসি। দেখি হয় কি না। ওর তাতে আপত্তি নেই। গাড়ীর ড্রাইভার মাঝে মাঝেই লোক নিয়ে আসে। রাস্তায় হোটেল, আপেল বাগান এসব জায়গায় ওকে চেনে দেখেছি। ওকে বললাম সমস্যাটা। ও জানাল , ঘোড়াওলার সাথে আলাপ নেই। আরও কিছুক্ষণ দেখার জন্য, ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড এর পাশের একটা সুন্দর হোটেলে ঢুকে বসলাম, দুপুরের খাবারের জন্য। আমাদের সবারই পেট বিগড়ে আছে। তাই খাবার প্রায় কিছুই পেলাম না। খিচুড়ি খেতে গিয়ে দেখি, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে, ভয়ংকর ঝাল করে দিয়েছে। তাই কয়েক চামচ খেয়ে তো রাত্রে আমাকে বার চারেক উঠতে হল। আমাদের বেড়ানোর এইটা সবথেকে বড় সমস্যা; বাইরের কোন খাওয়ার সহ্য হয় না। হোটেলের খাওয়ার টেবিলে বসে , আমার মেয়ে ফোনে নানান ভাবে চেষ্টা করে চলল, যদি ঐ UPI Payment টা বন্ধ করা যায়; হল না। আমার Bank of Baroda থেকে যদি payment Stop করা যায়, ওদের দুটি ল্যান্ড লাইনে ফোন করলাম। ফোন বেজেই গেল, কেউ ধরল না। Phone pay Customer care এ কয়েকবারের চেষ্টায় কানেকশন হল। কিন্তু OTP তো আসবে কলকাতার মোবাইলে; সে তো ওখানে কাজ করে না। সব চেষ্টা ছেড়ে , শেষ পর্যন্ত ঘোড়াওলাকে ক্যাশ টাকা দিয়ে চলে এলাম। লোকটি ভদ্রলোক। টাকা ওর একাউন্ট এ ঢুকলে, ফেরৎ করে দেবে, এই আশা করে চলে আসা ছাড়া করার কিছুই ছিল না। অ্যাপ দেখাচ্ছিল, Processing, ৪৮ ঘন্টাও লাগতে পারে। পরের দুদিন একই জিনিস দেখিয়ে গেল। তিন দিন পর যখন প্রায় কাটরার কাছে ফিরে এসেছি, গাড়ীতে বসে অ্যাপ খুলে দেখি, পেমেন্ট হয়ে গেছে। মেয়ে সাথে সাথেই ঘোড়ার মালিককে ফোন করে জানাল। আমার ফোনের থেকে পেমেন্ট স্ট্যাটাস ওর Whats app এ পাঠাতেই , আমার UPI তে টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দিল। আজকাল UPI, কার্ড পেমেন্ট এসবের জন্য আমি তো ATM Card ও নিয়ে যাই না। ক্যাশ টাকা কিছু থাকে সাথে।

পরদিন সকালে আমরা শ্রীনগরের হোটেল ছেড়ে পাহেলগাও রওনা দেব। এই সব শীতের জায়গায় হোটেলের ছেলেগুলো আটটার আগে ঘুম থেকে উঠতে চায় না। আগের রাতে বলে, বিল তৈরী করে নিতে হয়। আমরা ভোরে উঠে, গরম জলে স্নান করে, আটটায় হোটেল ছেড়ে দিয়ে গাড়ীতে ওঠার জন্য তৈরী। মেয়ে বিল মেটাতে গিয়ে ফিরে এসে বলল, ATM এ যেতে হবে, এরা ক্যাশ টাকা দিতে বলছে। এত ভাল হোটেল, UPI payment নেবে না, ভাবি নি। হোটেলেরই একটি ছেলে আমাদের নিয়ে চলল ATM দেখাতে। এর মধ্যে আমাদের চার দিন থাকা হয়ে গেছে শ্রীনগরে। শহরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, আধুনিক অস্ত্র হাতে CRPF দেখে দেখে, ওটাই স্বাভাবিক বুঝে গেছি। এমন কি হাইওয়ের পাশে চাষের মাঠেও ওদের ডিউটি করতে দেখে দেখে, ওটাই স্বাভাবিক বুঝে গেছি। কিন্তু আজ সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে গলির মুখে আসতেই ওদের সংখ্যা অস্বাভাবিক বেশী দেখলাম।

বড় রাস্তা সকালে ফাঁকা ফাঁকা থেকেই; আজ লালচক সবদিক দিয়ে বন্ধ। গাড়ী ঢোকা তো বন্ধই, আমাদের হেঁটেও যেতে দিল না। ঘুরে গেলাম ATM এ। প্রথম ATM এ মেয়ে ঢুকে যতক্ষণে বেরল, বাইরে থাকা CRPF জওয়ান এর সাথে গল্প করলাম। একজন বাঙালি জওয়ান ছিলেন, তার সাথেই কথা হল। মেয়ে বেরিয়ে বলল, এখানে টাকা নেই। জওয়ানই দেখিয়ে দিলেন, উল্টো দিকে J & K ব্যাংক এর ব্রাঞ্চ অফিস। সেটার ভেতরেই ATM, কাজ হল। ফেরার সময়ও ঘুরে আসতে হল। লালচকে মাছি গলতে পারছে না। হোটেলের ছেলেটা দেখলাম নির্বিকার। সে বলল, আজ রবিবার, এই বড় রাস্তার পাশের ফুটপাথে বাজার বসবে, দশটার পর মেলার মত ভিড় হবে। ঐ রবিবারের হাটের জন্য এত কড়াকড়ি কি না বুঝলাম না। পরে খবরে দেখেছি, আগের দিন দূরে কোথাও জঙ্গি হানা হয়েছে। আমরা স্বাভাবিক ভাবেই পহেলগাও রওনা দিলাম। ঐ শ্রীনগরে ছাড়া আর কোথাও কড়াকড়ি দেখিনি এই কদিনে। প্যাহেলগাও এর গাড়ীর ড্রাইভার ছেলেটিও খুবই ভালো পেয়েছিলাম। সে নিজের থেকেই বলল, টিভিতে টেররিস্ট এ্যাটাক ইত্যাদি দেখিয়ে ট্যুরিস্টদের ভয় পাইয়ে দেয়। টুরিষ্টই তো আমাদের সব; ট্যুরিজম নিয়েই তো আমরা বেঁচে আছি। ঘোড়ার দালাল, বা গাড়ীর দালাল ছাড়া সবার ব্যবহারই বেশ আন্তরিক। আমার ঐ ঘোড়ার মালিক আমাকে টাকা না পাঠালে আমি কিই বা করতে পারতাম! পাহেলগাঁও ভ্রমণই কাশ্মীর ভ্রমণ এর আসল মজা। শেষ দুদিন ওখানে ছিলাম। ওখান থেকে ফেরার রাস্তাও আমাদের জন্য অনেক সুন্দর অভিজ্ঞতা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ২৩.১০.২৪.

গুলমার্গের মিউজিয়ামে

কাশ্মীরে ৭

কুড়ি তারিখ, রবিবার সকালে আমরা চললাম পাহেলগাম। আমি আগেই বলেছি, আমার এবার কাশ্মীর ভ্রমণ এর দিন ঠিক করেছি, বাগানে পাকা আপেল দেখার জন্য। আসার সময়ই গাড়ীর ড্রাইভার রিঙ্কু শর্মাকে বলেছিলাম, আপেল বাগানে দাঁড়াতে।সে বলেছিল, কত দেখবে? চল, দেখাবো। গুলমার্গ থেকে ফেরার পথে একটা ছোট একটা বাগানে ঢুকে, হা হয়ে গেছিলাম। আপেল ওখানে কিনেছি দেখে রিঙ্কু বলেছিল, এত আগেই না কিনে পহেলগাম এর রাস্তায় কিনতে পারতে। ঠিকই বলেছিল। কাটরা থেকে শ্রীনগর আসার সময়ই দেখেছি, অনন্তনাগ এর রাস্তা ডানদিকে চলে গেছে। এই রাস্তায় যেতে হবে পাহেলগাম। শ্রীনগর এর দিকে কিছুটা এগোনোর পর , দুই রকমের জিনিস চোখে পড়বেই। কয়েক মাইল ধরে হাইওয়ের পাশে পাশে চলল, ক্রিকেট ব্যাট তৈরীর কারখানা। প্রায় সব বাড়ীতেই। ছাদে সাজানো হয়েছে কাঠের টুকরো। নিচে, রাস্তার দিকে ব্যাটের দোকান। তার কয়েক মাইল পর শুরু হয়েছে কেশর এর দোকান। মনে হচ্ছিল, শক্তিগড় এর ল্যাংচার দোকান এর মত। কিন্তু পরে গুণতে গিয়ে দেখি কয়েক হাজার হতে পারে। মনে হবে, অভিধানে যত শব্দ আছে, সব দিয়ে দোকানের নাম আছে। রিঙ্কু বলেছিল, কিনতে চাইলে নামতে পার। আমাদের আগ্রহ ছিল না। ফাঁকা মাঠ দেখিয়ে রিঙ্কু বলেছিল, এইগুলিতে কেশর চাষ করা হয়। এবার পাহেলগামের দিকে যাওয়ার সময় ব্যাট তৈরীর কারখানা দেখার জন্য থামতে চাইলেও, ড্রাইভার থামল না। অনন্তনাগ জেলা শহরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। আবার দু দিকে ফাঁকা মাঠ। একটি আপেল বাগানের সামনে গাড়ী থেকে নামলাম। বাগানের মালিক বা মালিকের ছেলে রাজু এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল। বাগানে ঢুকে প্রথমে চোখে পড়ল, রাজুর মত আর একজন, কয়েকজনকে চেয়ারে বসিয়ে নানান জিনিস বিক্রী করতে ব্যস্ত। বোতলে ভরা আপেলের জ্যাম, ইত্যাদি বিক্রিতে ওদের বেশ আগ্রহ। আমি সোজা বাগানের মধ্যে ঢুকে ছবি তোলা শুরু করলাম। ভেতরের দিকে গাছে প্রচুর আপেল।

রাজুর বাগানে

রাজু নিজেই আপেলের রস বানিয়ে খাওয়াল। ছবি তুলে খুশী কি না জানতে চাইলে বললাম, গাছের থেকে আপেল পেড়ে খেতে চাই। সাথে সাথেই রাজী। আমাকে নিয়ে ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল। একটা গাছের থেকে টুকটুকে লাল আপেল পেড়ে দিল। আগেই দেখেছি, রিঙ্কু একটা বড় আপেল খাচ্ছে। আমার স্ত্রী কন্যা কিছু জ্যাম জেলি

ইত্যাদি কিনল। আরও ঘন্টা দেড়েক পর পৌঁছালাম পাহেলগম। বাজারের পাশেই আমাদের হোটেল। একটা নাগাদ হোটেল এ পৌঁছেছি। ওদের কাছে জানতে চাইলাম, তিনটা নাগাদ বেরিয়ে বৈসারণ যাব কি না। ওরা বলল , দুটোর আগে বেরিয়ে যাও। আমরা দুপুরে খেয়েই বেরোলাম। রিঙ্কুর গাড়ী এখানে দুদিন বসেই থাকবে; ও ওর বন্ধুর বাড়ী চলে গেল। আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে দু পা হাঁটতে না হাঁটতে ঘোড়ার জন্য এক বয়স্ক শহিস আমাদের ধরে, মালিকের কাছে নিয়ে গেল। মাঠে কয়েকশ ঘোড়া আছে। আবার দরাদরি শুরু হল। তিনটি ঘোড়া নয় না দশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে, পাঁচ হাজার টাকায় রফা হল। হোটেলের প্রায় পিছনের দিকে পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা। এবার তিনটি ঘোড়ার জন্য দুজন গাইড। একশ মিটার মত চলার পর শুরু হল বিভৎস পাথুরে রাস্তায় চড়াই। যেমন বাজে রাস্তা তেমনই খারাই। বড় বড় পাইন গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলল ঘোড়া। নিচের দিকে পাথরের মাঝে মাঝে কাদা। তারপর শুরু হল ধুলো। ঘোড়ার পায়খানার ধুলো। ফেরার সময় মাস্ক ব্যবহার করতে হল। ঐ খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে চলতে চলতে দু জায়গায় থেমে, কম বয়সের ছেলেটি বলল, এটা একটা পয়েন্ট। বিশেষ কিছু নেই। উঠতে উঠতে এক সময় দেখি কয়েকশ ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ওটাই বৈশারণ এর গেট। পঁয়ত্রিশ টাকার টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে দেখি, একটা বিশাল বিস্তীর্ণ সবুজ উপত্যকা। পাহাড়ের মাথায় এরকম একটা মাঠ হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কয়েকশ যাত্রী, কিন্তু একটুও ভিড় মনে হয় না। যে যার মত ঘুরছে, ছবি তুলছে।

বৈসারন

চারদিকের পাহাড় এর মাথায় এই সময় বরফ নেই। থাকলে এর মিনি সুইজারল্যান্ড নাম সার্থক। এখানেই একটি ছেলে একটি পশমিনা ছাগল নিয়ে এসে ছবি তোলার জন্য দরবার করলে, আমরা

দুটি ছবি তোলার জন্য ওকে কুড়ি টাকা দিলাম। অন্য জায়গায়, পরে আরও অনেক এরকম সাদা লোমশ ছাগল দেখেছি। এক ঘন্টা মত থেকে বেরিয়ে এলাম। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নামার সময় কিন্তু ভয় পাইয়ে দিতে থাকে। ঘোড়াগুলি যে এই রাস্তায় চলতে পটু, বোঝাই যায়। ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। পরদিন লোকাল গাড়ী নিয়ে অন্য দিকে যেতে হবে। আজ সন্ধ্যা টিভি দেখেই কাটালাম। ২৪.১০.২৪. ফেরার পথে, রাজধানী এক্সপ্রেস তিন ঘন্টা দেরী করে চলছে, বসে বসে লিখছি।

কাশ্মীরে ৮

পাহেলগামে একরাত থাকলে পরের দিন সকালে তিন চার ঘন্টার জন্য গাড়ী নিয়ে, তিনটি জায়গা ঘুরে, দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসা যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সামনের রাস্তায় চায়ের দোকান বসেছে। হোটেলের ছেলে শুয়েই থাকল। আমি নিজেই চাবি নিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। চায়ের দোকানেই গাড়ীর লোকের সাথে দেখা হল। ছোট গাড়ী বাইশ ‘শ টাকা বলল। আরও বলল, এখনই বেরোলে টোল এর টাকা লাগবে না। এত সকালে সবাই তৈরী হতে পারবে না, আধ ঘন্টা পর বেরোব জানালাম। সাড়ে আটটায় বেড়িয়ে চললাম আরু ভ্যালী। বারো কিমি রাস্তার পাশের প্রায় পুরোটাই পাশে পাশে লিদার নদী, উল্টো দিকের পাহাড়ে সুন্দর পাইন গাছের দৃশ্য। সব জায়গায়ই ছবি তোলার ইচ্ছা হবে। দু তিন জায়গায় নেমে ছবি তোলা হল।

টোলের গুমটিতে অত সকালে লোক আসেনি। আরু ভ্যালীতে নেমেই বুঝলাম প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আমি তো এমনিতেই শীতকাতুরে, টুপী গ্লাভস নিয়েই বেরোই। আমার স্ত্রী,  মাফলার হোটেলে রেখে চলে গেছিল; নেমে কাঁপতে থাকল। আরু ভ্যালী অনেকটা ছোট। বৈশরন এর দশ ভাগের এক ভাগও হবে না। পাহাড়গুলি মনে হয় হাতের কাছেই।

আরু ভ্যালি

একটি ভালো হোটেল আছে, মাঠের পাশে। একজন বয়স্ক মানুষ , কাশ্মীরি জোব্বা গায়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছিল; চা কফি খেতে। কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, আপনার দোকান কোথায়? বললেন, দোকান নয়, হোটেলেই পাবেন। ঢুকলাম, মূলত ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে। বিরাট ডাইনিং রুমে বসলাম। ওনার জোব্বার ভেতর থেকে কাঙ্গরি বের করে দিয়ে বললেন, হাত সেঁকে নাও।

এই কাঙরির কথা আমি পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, সার্জারী বইতে পড়েছি। এই প্রথম দেখলাম। বেশ আরাম করে হাত গরম করে নিলাম। বেতের বোনা ফুলের সাজির মত। মাঝে মাটির পাত্রে কাঠ কয়লার আগুন। পরে দেখেছি, রাস্তায় ছোট দোকানে বিক্রী হচ্ছে। কফি খেয়ে বেরিয়ে দেখি একটি ছেলে , শাল, মাফলার ইত্যাদির দোকান বসাচ্ছে, মাঠে। ওর কাছে , স্ত্রীর জন্য একটি সস্তা মাফলার কেনা হল। এরপর চললাম, বেতাব ভ্যালি। গাড়ীতে উঠে ড্রাইভার ছেলেটির সাথে নতুন করে দাম দর কষাকষি করেছি। ওদের হিসেবে, সকালের চার ঘন্টার জন্য বাইশ’ শ পঞ্চাশ টাকা। তিনটি জায়গায় এক ঘন্টা করে থাকা যাবে। তার বেশী হলে , ঘন্টায় সাড়ে চার শ টাকা করে। আর সাড়ে তিন হাজার টাকায় রফা হল, বিকেল পর্যন্ত থাকা যাবে। দু তিনটি অন্য জায়গায়ও নিয়ে যাবে। আরু থেকে আধ ঘন্টা মত লাগল বেতাব ভ্যালী যেতে। গাড়িতেই ড্রাইভার বলেছিল, ঘোড়ায় চড়ার জন্য চারশ টাকার বেশি রাজী হবেন না। নামার সাথে সাথেই ঘোড়ার দালাল জুটে গেল। তিনটি ঘোড়ার জন্য চার হাজার টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত নামাল। আমরা তো ঘোড়ায় আর চড়বই না। একশ টাকা করে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। প্রথম দিকে প্রায় সাত - আট শ’ মিটার এক রকম গাছের ছায়ায় ছায়ায় চললাম। পরে ঘোড়াওলা বলল, ওগুলি “ বীলু” গাছ। ঐ গাছের কাঠে ক্রিকেট ব্যাট হয় বলতে বুঝলাম, ওগুলি উইলো গাছ। উইলো বাগান ছাড়িয়ে পৌঁছে গেলাম সুন্দর একটি সবুজ প্রান্তরে। চারিদিকে পাহাড়। আমরা সোনালী রোদে বসে সময় কাটালাম, ছবি তোলা হল।

বেতাব ভ্যালি

এখানেও একজন , সাদা লম্বা লোমের পশমিনা ছাগল নিয়ে হাজির। এ ছাড়াও খরগোশ, সাদা পায়রা নিয়েও কম বয়সের ছেলে মেয়ে এসে বলছে, ছবি তোলার জন্য দশ কুড়ি টাকা দাও। বোঝা যায়, এদের পড়াশোনার কথা কেউ ভাবেনি, কম বয়সের থেকেই কিছু রোজগার করা শুরু করে দিয়েছে। এই দিনের ড্রাইভার আমাদের সেরকমই কিছু খবর বলেছিল। গ্রামে ওর নিজের মেয়েরা এখন স্কুলে পড়ছে। কলেজ সেই জেলা শহর অনন্তনাগে। আমাদেরকে বসে থাকতে দেখে প্রথমে এক ঘোড়াওলা এসে বলল, তিনশ টাকা দিয়ে চলুন। এদের জন্য মায়া হচ্ছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী কন্যা আর ঘোড়ায় চড়তে রাজী নয়। আবার একজন এসে বলল, দুই ‘শ

টাকা দেবেন, চলুন। বুঝলাম, সকাল থেকে বেচারার কোন রোজগার করা হয়নি। ওর জন্য বড় মায়া হল ; চললাম ওর সাথে। ঘাসের উপর বোধহয় ঘোড়া চালানোর অনুমতি নেই। নদীর তীরে, বালুচরে গোটা পঞ্চাশ ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে নিয়ে একটা কালো ঘোড়ায় তুলল। ঘোড়া সোজা নদীর জলে নেমে চলল। স্বচ্ছ জলের নীচে নুড়ি পাথর। জল ছয় আট ইঞ্চি হবে। ঘোড়ার পায়ের থেকে একটু জল ছিটিয়ে আমার পায়ে লাগছিল। জল পেরিয়ে নীচু ডাঙায় উঠে কালো ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকতে চাইল, একবার মনে হল, ফিরে যেতে চায়। কি ব্যাপার, জানতে চাইলে শহিষ বলল, ওর সঙ্গী আসেনি বলে ফিরে দেখছে। ওকে তাড়া দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। পনের মিনিট পর ফেরার সময়, ঘোড়াওয়ালার সাথে কথা বলতে বলতে আসছিলাম। ওর দুটি ঘোড়া। এই কালো আর একটা সাদা। বছর দশ বারো আগে বেশ দাম দিয়েই কিনেছে। আরু ভ্যালির লোকেরা বরফের সময়, নিচের দিকে নেমে আসে বলেছিল। এই ঘোড়াওয়ালা বলল, আমরা গ্রামেই বসে থাকি, জঙ্গলের থেকে কাঠ জোগাড় করে রাখি, তাতেই ঘর গরম করে নিতে হয়। গোটা মাঠ তো বরফে ঢাকা থাকে, ঘোড়া খায় কি? ও বলল, মকাই আর কি সব খেতে দিতে হয়। আমরা জল পেরনোর সময় দেখলাম, সাদা ঘোড়াটা আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ওর কাছে ফিরলে, যেন নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরল। নদীর দুটি ধারা পেরিয়ে, একটা পাথর ছড়ানো মাঠ মত; ওরা বলে, কোনি মার্গ। তারপর নদী বেশ বড় বড় পাথরের ভেতর দিয়ে ফুট পাঁচ সাত নিচে নেমে এসেছে। এটাকেই ওরা বলে, ওয়াটার ফলস। কিছুই দেখার নেই। কিন্তু আমাদের মত পর্যটকেরা না চাপলে ওদের রোজগার শূন্য। আর বাইরের দালালের খপ্পরে পড়ে হাজার টাকা দিলে, আটশ টাকাই জলে। ঘোড়া আর তার মালিকের কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম গাড়ীর কাছে।
এরপরের গন্তব্য , চন্দনওয়ারী। এই চন্দনোয়ারি থেকেই অমরনাথ যাত্রার জন্য পদযাত্রা শুরু হয়। এখন তো হুশ করে গাড়ী চলে গেল, প্রায় দশ বারো কিমি। যাত্রার সময় লাখ লাখ মানুষ হাজীর হয়, হাঁটাচলার জায়গাই থাকে না। চন্দনোয়ারি বেশ দোকান পাট নিয়ে জমজমাট জায়গা। গাড়ী , পার্কিং এর দিকে গেল, আমরা সোজা হাঁটতে শুরু করে কিছুটা বাম দিকে এগোলাম। এখানে শত শত পর্যটক। সবাই একবার অমরনাথ যাত্রার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার চেষ্টা করে। আমরাও করলাম।

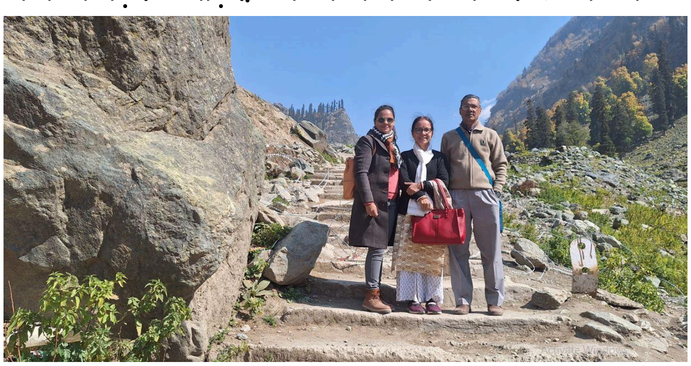

ভক্ত মানুষ ঐ সিঁড়িতেই মাথা ঠেকিয়ে অমরনাথকে প্রণাম জানাচ্ছে। যে কষ্টকর যাত্রা এ জীবনে আর কখনো হয়ে উঠবে না, সেখানে যে লক্ষ কোটি ভক্তের পদধূলি পড়েছে: সেই ধুলাই তো ভক্তের মাথায় উঠতে পারে। মনে মনে বাবা অমরনাথ কে প্রনাম জানিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। এখানে ঝালমুড়িওয়ালার কাছে কুড়ি টাকার সাদা মুড়ি কিনেছি। আমাদের ড্রাইভার সেটা দেখেছে। তাই বলল, পাহেলগাঁ বাজারেই পাবে এ জিনিস। ফেরার সময়, পাহেলগাম সোজা না ফিরে উপরে একটা রাস্তা দিয়ে ঘুরে ফিরলাম। ঐ রাস্তায় প্রায় শ খানেক কটেজ আছে। বরফের সময় যেখানে স্কি করা হয়, সেটাও দেখলাম। হোটেলের সামনে , গাড়ী থেকে নামার সময় , ড্রাইভার মুড়ির দোকান দেখিয়ে দিল। এক প্যাকেট মুড়ি কিনে হোটেলে ফিরে এলাম। বিকেলে নদীর উপর ব্রীজ পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের নিচে একটু ঘুরে এলাম। সন্ধ্যায় টিভি খুলে দেখি, নবান্নে জুনিয়ার ডাক্তারদের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর মিটিং দেখাচ্ছে। চার মাস আগে থেকেই ঠিক করে রাখা কাশ্মীর ভ্রমণ করতে চলে গেলেও মন পড়ে ছিল, ধর্মতলায়। প্রবল প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে, ছেলে মেয়েদের জেদি বক্তব্যগুলো

শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, কাশ্মীরে হয়তো আবারও আসব। কিন্তু সন্তানসম জুনিয়ার ডাক্তারদের এই মাথা উঁচু করে করা লড়াই, সারা জীবন মনে থাকবে। তোমাদের কুর্নিশ জানাই। ২৫.১০.২৪.

রাঁচি ভ্রমণ

আগষ্টের প্রথমে , দুদিনের জন্য রাঁচি ঘুরে আসার জন্যে ট্রেনের টিকিট কেটে ছিলাম। তখন জানতাম না, 2024 সালের সেপ্টেম্বর এর প্রথম সপ্তাহে এমন একটা মন খারাপ করে দেওয়া অবস্থার সৃষ্টি হবে। ভারাক্রান্ত মন নিয়েই রাঁচি রওনা দিলাম। রাত নটা দশে হাওড়া থেকে ট্রেন। এই প্রথম মেট্রো ধরে দমদম থেকে হাওড়া এলাম। গঙ্গার নিচে দিয়ে মেট্রো যাচ্ছে বলে আলাদা কোন অনুভূতি হলনা। ট্রেনে বসার পর ছেলের ফোনে জানলাম, কলকাতায় এত সংখ্যায় মিছিল বেরিয়েছে যে, রাস্তা দিয়ে আসার চেষ্টা করলে হয়তো ট্রেন পেতাম না। এই রাতের হাওড়া হাতিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনটি সকাল ছয়টার আগেই রাঁচি পৌঁছয়।

রাঁচি স্টেশনের থেকে বেরিয়ে বাম দিকে একশ মিটার মত হেঁটে গেলে অনেক হোটেল। আমাদের আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হোটেলও ঐ একশ মিটার মত দূরেই ছিল। আমরা যদিও জানতাম হোটেলে হেঁটেই যাওয়া যাবে, কি মনে করে একটা টোটোতে উঠে পড়লাম। সে বোকাটা আমাদের নিয়ে মেন রোডে চলে গেল। এক কিমি দূরে গিয়ে আমার মনে হল, কিছু একটা ভুল হচ্ছে। হোটেলে ফোন করে আবার স্টেশনে ফিরে এলাম। হোটেলে পৌঁছে আর এক সমস্যা। ওরা বলল, অনলাইনে হোটেল বুক করে এলে, দুপুর বারোটায় চেক ইন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সকাল সাড়ে ছয়টায় হোটেলের ঘরে ঢুকলাম। গাড়ীও আগেই ঠিক করা ছিল। আমরা সাড়ে সাতটার আগেই স্নান করে বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ীর ড্রাইভারকে ( Driver Sonu Kumar : 7654086308) প্রথমেই জানিয়ে দিলাম, আমরা জলপ্রপাত দেখতেই বেশী আগ্রহী, মন্দিরে পূজা দেব না।

রাঁচির জলপ্রপাতগুলি সবই শহর থেকে দূরে দূরে।

আমরা প্রথমেই গেলাম, হুন্ডু জলপ্রপাত দেখতে। এটা শহর থেকে দেড় ঘন্টার রাস্তা। ৪৫ কিমি দূরে। রাস্তা বেশ সুন্দর । তার থেকেও যেটা বেশী ভালো লাগলো, রাঁচি শহর আর গ্রামের সবুজ। যেদিকে তাকাই শুধুই সবুজ গাছপালা। মাঝে বেশ কিছু শালের জঙ্গল। হুন্ডু জলপ্রপাতের সিঁড়ির কাছে পৌঁছানোর কুড়ি পঁচিশ মিটার আগে, গাড়ী থেকে নেমে টিকিট কাটতে হল।

গাড়ী পার্কিং এর জন্য কুড়ি টাকা, আর মাথাপিছু দশ টাকা করে টিকিট। গাড়ী থেকে নেমে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে দুই পাশে আট দশটি চালা হোটেল। প্রতিটি হোটেলের সামনে খাঁচায় রাখা দেশী মোরগ। দেখলে মনে হয়, মুর্গীর মাংসের দোকান। এই সব দোকানে , চা, জলখাবার, ঠাণ্ডা পানীয় পাওয়া যায়। দুপুরের খাবারের অর্ডার দিয়ে নিচে নামলে ফিরে এসে মুর্গীর মাংসের ঝোল আর ভাত পাওয়া যায়। এই হুন্ড্রু জলপ্রপাতে সাড়ে সাতশ মত সিঁড়ি নামতে হয়। সুন্দর পাথর বাঁধানো ছোট ছোট সিঁড়ি। নামতে কোন কষ্ট নেই। ওঠার সময় সবারই কষ্ট হবে। হাঁটুর ব্যথা থাকলে, বা বেশী বয়সে না নামাই ভাল। সিঁড়ি দিয়ে একটু নামলেই জল পড়ার প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়। একেবারে নিচে কয়েকটা দোকান আছে। এরা ঠাণ্ডা পানীয় বিক্রী করলেও চা রাখে না। জলপ্রপাতের জল যেখানে পড়ছে তার থেকে তিরিশ ফুট মত দূর থেকে দেখতে হয়। আমরা কিছু সময় থেকে , কিছু ছবি তুলে ফেরার রাস্তা ধরলাম। ওপরে উঠে একটা দোকানে চা খেয়ে গাড়ীতে ফিরে এলাম। আমাদের এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে ড্রাইভার ভাবল আমরা বোধহয় নিচে পর্যন্ত নামি নি। মাইল দুই ফেরার পর, ডান দিকের রাস্তা ধরে আরও এক কিমি মত চলে পৌঁছলাম সুবর্ণরেখা নদীর উপর গেটালসুদ ড্যামে। বাঁধের মাঝামাঝি গিয়ে , কয়েকটি ছবি তুলে গাড়ীতে ফিরলাম। এখান থেকে গাড়ী চলল বিয়াল্লিশ কিমি দূরে সীতা জলপ্রপাতের দিকে। সেই সুন্দর সবুজ প্রকৃতির ভেতর দিয়ে, এক ঘন্টা চলল গাড়ী। এখানেও গাড়ী রাখার জন্য আর আমাদের দুজনের জন্য টিকিট কেটে নিলাম। এখানে প্রায় কোন দোকান পাট দেখলাম না। এখানেও সবুজ গাছপালা ঘেরা বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হল।

সীতা জলপ্রপাত

সেই রকম প্রচণ্ড জলের শব্দ। এখানে নতুন আর একটা জিনিস ছিল, পনের কুড়ি জন ছেলের হৈ হৈ চিৎকার। কিছুটা নেমে দেখতে পেলাম, পাথুরে পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে প্রবল জলের ঝর্না। অনেক উপরে, পাহাড়ের ধাপে অনেক ছেলে স্নান করছে আর হৈ হৈ করছে। আরও অনেক সিঁড়ি নেমে পুরো জলপ্রপাত দেখতে পেলাম। জল নিচে যেখানে নদীর মত বয়ে যাচ্ছে, কয়েকজন সেখানেও নেমে গিয়েছে দেখলাম। ওখানে যেতে হলে আরও একশ সিঁড়ি নামতে হয়। আমরা ওখানে নামলাম না। এরপর চললাম জোনা ফলস্ দেখতে। এটা মাত্র ছয় কিমি দূরে। এখানে টিকিট কেনার জায়গায় একসাথে গোটা চারেক গাড়ী এসে পড়ল। টিকিট নিল মাত্র কুড়ি টাকা। গাড়ীর জন্য টাকা নিতে ভুলে গেল নাকি! এখানেও বেশ কয়েকটি দোকান আছে। একটি দোকানে দুপুরের খাবারের কথা বলে জলপ্রপাতের দিকে এগোলাম।

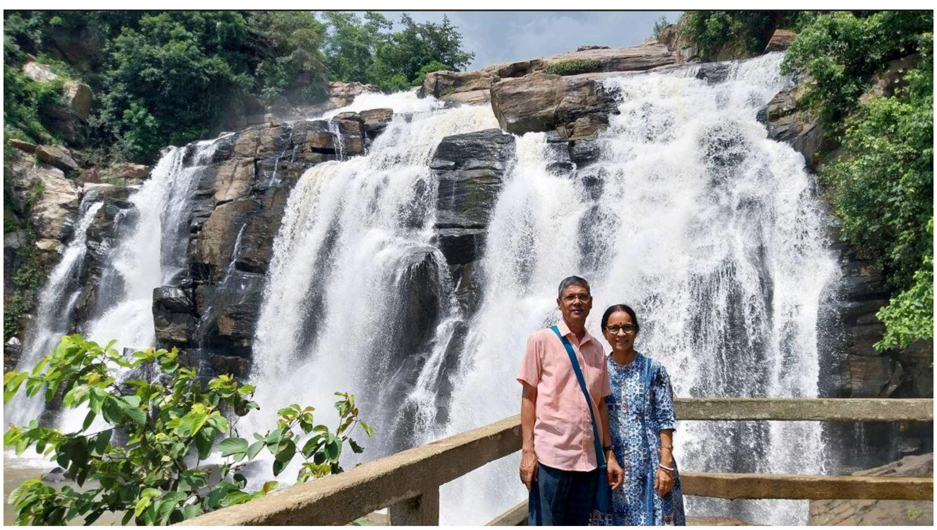

জোনা

রাঁচি ২

জোনা জলপ্রপাতে নিচে নামতে ছয়শো সাড়ে ছয়শ সিঁড়ি নামতে হয়। সিঁড়িগুলি গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় হলেও, একেবারে নিচে নেমে দেখতে হলে বেশ রোদে পুড়ে দেখতে হয়। এখানেও অনেক উপর থেকে জল পড়ার প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়। গোটা দুই বাঁধানো চাথল থেকে একটু উপর থেকেই গোটা জলপ্রপাত দেখতে পেলাম। নিচের চাথালে কয়েকজন ছবি তুলেছে দেখে আমরাও নামলাম। এখানে প্রপাতের জল এত কাছে যে জলের গুঁড়ো উড়ে এসে মোবাইল ভিজিয়ে দেয়। অনেকে আরও পঞ্চাশ সিঁড়ি নেমে জল ছুঁয়ে আসচে। আমাদের জল ছোঁয়ার উৎসাহ ছিল না। আস্তে আস্তে উঠে এলাম। আগের দুটি জায়গার থেকে এখানে যাত্রি একটু বেশী দেখলাম। সেটা হয়তো আগের দু'জায়গায় আমরা সকাল সকাল গেছলাম বলে। মিনিট দশেক বসার পর আমাদের খেতে দিল। গরম ভাত , শাল পাতার থালায়। চালা হোটেলে এর থেকে ভালো ব্যবস্থা আশা করলে হতাশ হতেই হবে। এরপর আমরা ফেরার রাস্তা ধরলাম।

রাঁচি শহর বেশ ছড়ানো। সকালে আমরা যেদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছলাম এবার তার উল্টো দিক দিয়ে চললাম। এদিকে অনেক ফাঁকা ফাঁকা ময়দানের মত জায়গার ভেতর দিয়ে চওড়া রাস্তা। যে কোন শহরে গেলে সেখানকার দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখা ছাড়াও শহরের রাস্তা, রাস্তার পাশের গাছপালা সবই আমি মন দিয়ে দেখি। রাঁচি শহর বেশ সবুজ। শহরের ভেতরে অনেক গাছ আছে। গাড়ি একটা টিলার উপরে উঠে দাঁড়াল। টিলার উপরে জগন্নাথ মন্দির। বাইরে জুতো খুলে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। ভেতরে ছবি তোলার কোন অনুমতি নেই। মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। দশ মিনিট পর খুলবে জানাল। অন্য দিকের সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নেমে দেখলাম, ওটাই মূল প্রবেশ দ্বার। বেশ কিছু গাছের নিচটা সুন্দর করে বাঁধানো। অনেক যাত্রী গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করছিল, আমরাও বসলাম। কয়েক মিনিট পর যাত্রীরা উঠে চলল মন্দিরের দিকে। আমরাও চললাম। পনের কুড়ি জন যাত্রীর পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন হল। মন্দির থেকে বেরিয়ে গাড়ীর কাছে এসে, দূরে দেখলাম, নিচে রাঁচি শহর দেখা যাচ্ছে; ছবি তুললাম। চারটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম। সন্ধ্যায় বেরিয়ে শহরের বড় রাস্তায় এক চক্কর ঘুরে এলাম। হোটেলের টিভিতে কলকাতার খবর দেখে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে সাড়ে ছয়টার মধ্যে হোটেল ছেড়ে বেরোলাম। ড্রাইভারকে বলেই রেখেছিলাম, তাড়াতাড়ি বেরোব। আগের দিনের মত একটি ছোট দক্ষিণ ভারতীয় খাওয়ার এর দোকানে বসে ইডলী আর ধোসা খেয়ে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে হল। সাড়ে সাতটায় গাড়ীতে উঠে চললাম , দশম জলপ্রপাত দেখতে। সকালে বিছানা থেকে নামার সময়ই বোঝা যাচ্ছিল, আগের দিন অনেক বেশি সিঁড়ি ওঠা নামা হয়েছে। পা এতো ব্যাথা করছিল যে মাটিতে পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। পরের তিন চার দিন ওরকম ব্যথা ছিল পায়ে।

দশম জলপ্রপাত রাঁচি শহর থেকে পঁয়ত্রিশ কিমি দূরে। অনেকটা রাস্তা কলকাতার দিকে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে এগিয়ে ছোট গ্রামের রাস্তা ধরতে হয়। এই গ্রামের রাস্তা প্রায় নির্জন। সবুজ প্রকৃতির ভেতর দিয়ে রাস্তা। এখানে কিন্তু জলপ্রপাত দেখতে কোন টিকিট কাটতে হল না। কয়েকটি দোকানপাট আছে। এখানেও নিচে পর্যন্ত নামতে শ' চারেক সিঁড়ি। মাঝে মাঝে বেশ কয়েকটি চাথাল আছে। কয়েক জায়গায় বসার জন্য বেঞ্চ আছে। এখানেও আমরা একেবারে নিচে পর্যন্ত নামলাম না। পঞ্চাশ সিঁড়ি মত বাকি ছিল। আমরা থাকতে থাকতেই কয়েকটি ছেলে

একেবারেই জলের কাছে নেমে গেল। আমরা বেশ কিছু ছবি তুলে গাড়ীতে ফিরে এলাম। এবার যাবো পাত্রাতু লেক। সেও ঘন্টা দেড়েকের রাস্তা।

দশম

রাঁচি ৩

পাত্রতু যাওয়ার রাস্তাও বেশ সুন্দর। পাত্রাতু পৌঁছানোর মিনিট পনের আগে একটি সুন্দর জায়গা আছে; গাড়ী সেখানে দাঁড়াল। এটি  পাত্রাতু ভ্যালি ভিউ পয়েন্ট। আরও কয়েকটি গাড়ীও দাঁড়িয়ে ছিল। কয়েকটা ফুচকার গাড়ী, ডাবের ঠেলা। নিচে আঁকাবাকা পাহাড়ী রাস্তা। অনেক দূর পর্যন্ত কালচে সবুজ উপত্যকা দেখা যায়। পত্রাতু লেকও দেখা যায়।

 কয়েকটা ছবি তুলে, একটা ডাব খেয়ে গাড়ীতে উঠে চললাম। পাত্রাতু লেকে ঢোকার জন্য আধুনিক টিকিট কাউন্টারে টিকিট কেটে ঢুকলাম। সুন্দর সাজানো পার্কের ভেতর দিয়ে লেকের পাড়ে পৌঁছালাম। যে কোন বেড়ানোর জায়গার মত প্রচুর গুমটি দোকান, নৌকা ভ্রমণের  নানান বন্দোবস্ত। স্পীড বোট, দাঁড় টানা নৌকা ইত্যাদি। আমরা খোঁজ নিয়ে জানলাম, এক ঘন্টা দাঁড়টানা নৌকায় চাপার খরচ পাঁচশ টাকা। আর দুজন যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করলাম প্রায় এক ঘন্টা, পাওয়া গেল না। আমাদের এই বয়সে নৌকা ভ্রমণের জন্য বিরাট উৎসাহ ছিল না। শেষ পর্যন্ত গোটা পার্কে একবার ঘুরে গাড়ীতে ফিরে এলাম।

পাত্রাতু লেক

 এরপর  কোথায় যাওয়া হবে জানতে চাওয়ায় ড্রাইভার বলল, কাছেই একটা জলপ্রপাত আছে। দুপুরে খাওয়ার জায়গার কথা জানতে চাইলে ড্রাইভার জানাল, পাশের ছোট হোটেলেই মাছ ভাত পাওয়া যায়। পাশের গ্রামের

রাস্তা ধরে গাড়ী এগিয়ে চলল। তিন চার কিমি দূরে আর একটি জলপ্রপাত এর গেটে পোঁছলাম। এখানে কোন টিকিট নেই। এটা পালানী জলপ্রপাত।

একশ মিটার মত রাস্তা হেঁটে পাহাড়ের নিচে পর্যন্ত পোঁছলাম I রাস্তার পাশে পাশে বাগানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু খুবই অযত্নে। সরু পাথুরে সিঁড়ি দিয়ে পঞ্চাশ সিঁড়ি মত নামতে হল। এখানেও দূর থেকে জল পড়ার প্রচণ্ড শব্দ। দশ বারোজন মত ছেলে ঝর্ণার জলে স্নান করছে দেখলাম। আমরা মিনিট দশেক থেকে কিছু ছবি তুলে ফেরার রাস্তা ধরলাম। গেটের কাছে একজন ভক্ত পোঁছে গেল। গেটের বাইরে একটিই ঠেলা দোকান। সেখান থেকে বিস্কুটের প্যাকেট কিনে ভক্তকে খাওয়ান হল। পাত্রতুর সেই হোটেলে ফিরে এলাম খাওয়ার জন্য। একেবারে চালা না হলেও রাস্তার পাশের অতি সাধারণ ভাতের হোটেল। মাছের ঝোল ভাত খেয়ে গাড়ীতে ফেরার রাস্তা ধরলাম।

ঘন্টা খানেক গাড়ী চলার পর ড্রাইভার জানাল, কাঁকে মেন্টাল হাসপাতাল আসচে। আমি ইউটিউবে দেখেছি, অনেকেই রাঁচি বেড়াতে গিয়ে এই কাঁকের হাসপতালের গেটে ঘুরে আসে। আমার কাছে ব্যাপারটা অশ্লীল মনে হয়েছে। এটাতে দেখার কি আছে জানিনা! সাধারণ একটা রাস্তার পাশের হাসপতালের গেট। রাস্তার একদিকে মহিলাদের আর অন্য দিকে পুরুষদের হাসপাতাল। আমাদের নামার কোন ইচ্ছাই ছিল না। এবার যে রাস্তা দিয়ে শহরে ঢুকলাম, সেই রাস্তায় বেশ গাড়ীর চাপ। শহরের ভেতরে একটি পার্কের বাইরে পোঁছে গাড়ী থেকে নামলাম। এর নাম রক গার্ডেন। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। এটা একটা পাথুরে পাহাড়। নাম গোড্ডা হিল। পাথরের মাঝে মাঝে অনেক বড় বড় গাছ। পিছন দিকে এগিয়ে গেলে ওপর থেকে নিচে দূরে একটি বড় জলাশয়।

নাম কাঁকে ড্যাম। এখান থেকেই রাঁচি শহর এর জল সরবরাহ করা হয়। লেকের জলে কচুরী পানা ভাসচে। কয়েকটি নৌকায় লোকজন ঘুরছে। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল, তবুও অনেক যাত্রী পাহাড়ে ঘুরছিল। আমরা ওখানে চল্লিশ মিনিট মত থেকে বেরিয়ে এলাম।

এরপর চললাম, টেগোর হিল। শহরের ভেতরে একটা গলির ভেতরে গাড়ী দাঁড়াল। একটা ছোট গেট দেখিয়ে ড্রাইভার ভেতরে যেতে বলল। কোন টিকিট কাটতে হল না। কিন্তু সিঁড়িগুলি বেশ অযত্নে পড়ে আছে। মেঘলা আকাশ, সিঁড়ি গাছের ছায়ায় ঢাকা। একটি বোর্ডে লেখা পড়ে জানলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে একটি বাড়ী করে অনেক বছর ছিলেন, একশ বছর আগে। এখন সেই বাড়ীতে কেউ থাকে না। বাড়িটা সম্ভবত এখন মেরামত করা হচ্ছে। প্রায় চারশ সিঁড়ি বেয়ে টিলার উপর উঠলাম। টিলার মাথা থেকে সবদিকে রাঁচি শহর দেখা যাচ্ছে।

টেগোর হিল থেকে রাঁচি

আমরা কিছু ছবি তুলে আস্তে আস্তে নেমে এলাম। আমরা আগেই জানতাম, বিকেলে ফিরে ঘন্টা পাঁচেক বসে থাকতে হবে। তাই স্টেশন রোডেই ফিরে এলাম। একটা সাধারণ হোটেলে ঢুকে পাঁচ ঘন্টার জন্য একটি রুমে ঢুকলাম। রাত নটা নাগাদ হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে সামনের একটি হোটেলে রুটি খেয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলাম। রাত দশটায় ট্রেন। আমরা আধ ঘন্টা আগে পৌঁছালাম। গাড়ী কিন্তু পৌনে দশটায় এসে গেল। গাড়ীতে উঠে মিনিট দশেক বসার পর ঠিক সময়ে গাড়ী ছাড়ল। সকাল ছয়টা পনের নাগাদ সাঁতরাগাছি স্টেশনে গাড়ী ঢুকল। আমরা তৈরী হয়ে বসে থাকলাম। টিকিয়াপাড়া ছাড়ার পর গাড়ী প্রায় এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকল। বসে বসে অত্যন্ত হতাশ হয়ে গেলাম। প্রায় সাড়ে সাতটার পর গাড়ী হাওড়ায় ঢুকল। ফেরার সময়ও মেট্রো রেল ধরে দমদমে ফিরলাম। ১৪.৯.২৪.

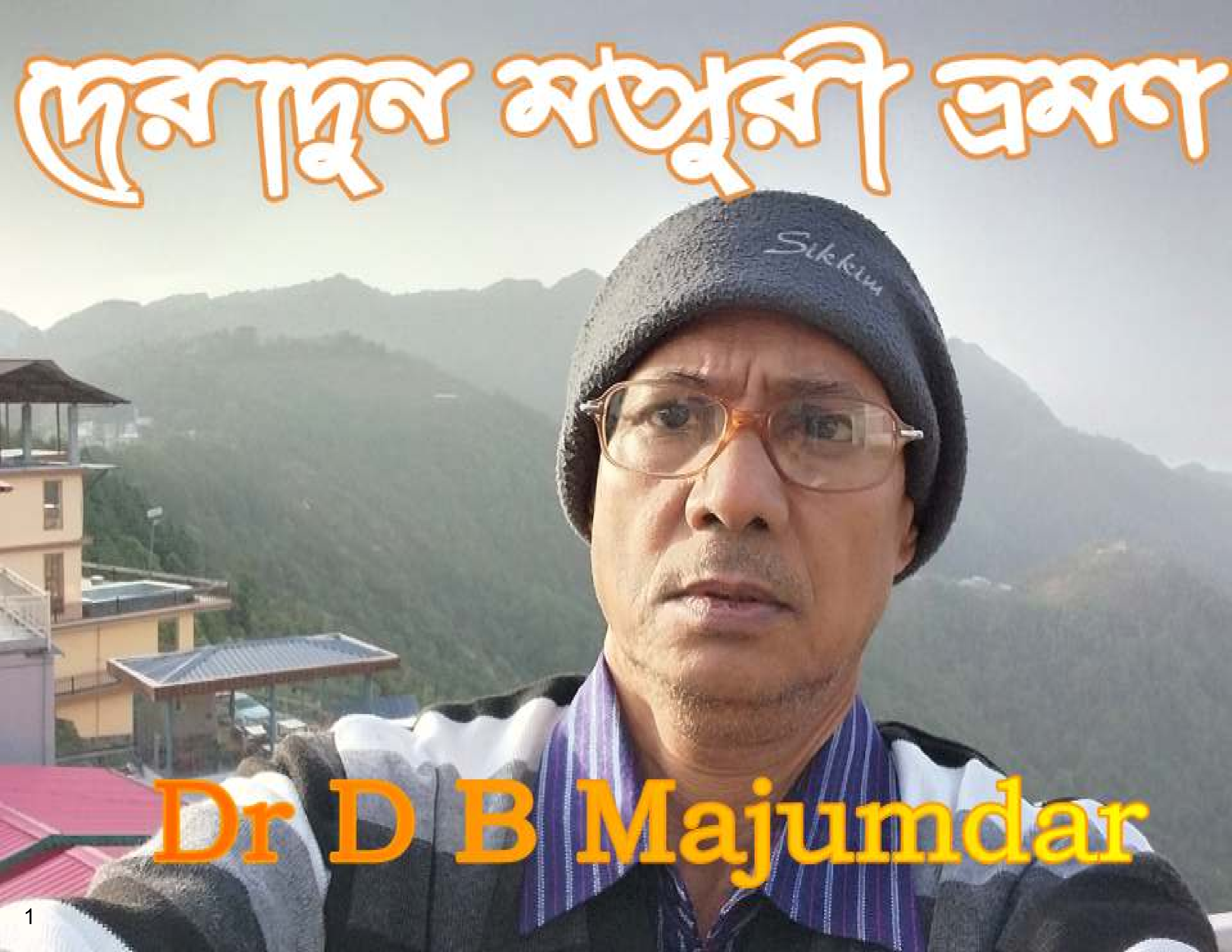


1

মসুরি ভ্রমণ

এ বছরের প্রথম ভ্রমণ শুরু হল আজ বৈশাখের তিন তারিখ। এবার চললাম দেরাদুন মুসৌরীর ( ওখানে গিয়ে জানলাম, ওরা মসুরি বলে)দিকে। ঠিক দুই মাস আগে, সকাল আটটায় টিকিট কেটে এই ভ্রমণের কাজ শুরু করেছি। টিকিট কাটার সাথে সাথেই দেরাদুনের স্টেশনে রিটায়ারিং রুমও বুক করেছি। হাওড়া থেকে প্রতিদিন এই একটি ট্রেনই ওদিকে যায়। দুপুর একটায় ছেড়ে পরদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ পৌঁছনোর কথা। এই জন্য একবার ভেবেছিলাম, দিল্লি গিয়ে সেখান থেকে ট্রেন পাল্টে যাবো। খুব একটা সুবিধা হবে না দেখলাম।

কুম্ভ এক্সপ্রেস

দেরাদুন তো এখন গরম থাকারই কথা। ওখান থেকে মুসৌরী গেলে একটু পাহাড়ি এলাকা। কিন্তু গত বছর নৈনিতালের দিকে গিয়ে দেখেছি, বেশ গরম পড়ে। পাহাড় বললে আমরা যেমন আমাদের দার্জিলিং বা সিকিম এর মত ঠাণ্ডা আবহাওয়া বুঝি, ওদিকে সেরকম একদিনও পাই নি। মুসৌরিও সেরকম হতাশ করবে না, আশা করছি।

এবার রিটায়ারিং রুম বুক করার সময় একটা সমস্যা হল। ফেরার দিন দেরাদুনের রিটায়ারিং রুম বুক করার টাকা কেটে নিল, বুকিং কনফার্ম হল না। পরে জানাল, টাকা দিতে দেরি হয়ে গেছে, টাকা ফেরৎ করে দিয়েছে। আমার বন্ধুর কন্যা মেঘা, দেরাদুনে কয়েক বছর থেকেছে। ওর মতে দেরাদুন মুসৌরি হট্টগোলের জায়গা, দেখার কিছু নেই। আমরাও দারুণ কিছু দেখার আশা করছি না। মাত্র কদিন আগে জানলাম, মুসৌরির দিকে ধনৌউলটি নামে একটি পাহাড়ি জায়গা আছে। ওখানে একদিন থাকব ঠিক করলাম।

এক বছরের বেশি হল বেশ কিছু ট্রেনে করে যাতায়াত করছি। এবারই প্রথম হল, ট্রেন ছাড়ার সময় পিছিয়ে দিয়েছে। দুপুর একটায় ছাড়ার সময় ছিল। সাড়ে নটা নাগাদ মোবাইলে মেসেজ এল, দুটো পঁয়ত্রিশ নতুন সময়। একদিক থেকে ভালই হয়েছে। আমাদের এগারোটার মধ্যে খেয়ে নিতে হত। আরও এক ঘন্টা পর বেরোলাম। দমদম থেকে মেট্রো করে হাওড়া স্টেশন এলাম। ঘন্টা দেড়েক আগে পৌঁছে গেলাম। মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখলাম, বেশ গরম। ট্রেন ছাড়ার মিনিট দশেক আগে প্ল্যাটফর্মে গাড়ী দিল। আমরা একটি করে ছোট ট্রলী ব্যাগ

নিয়ে উঠি। প্রায়ই দেখা যায়, লোকে এত বেশি বোঝা নিয়ে ওঠে যে সিটের নিচে সবার ব্যাগ রাখার জায়গা হয়না। এবারও দেখলাম, একটি বিয়ে বাড়ীতে যাওয়ার দল এত বেশী বোঝা নিয়ে চলেছে যে, দুইজন কুলী আর গোটা তিনেক জোয়ান লোক মিনিট পনের ধরে শুধু মালপত্র তুলেই গেল।

এই ট্রেন বর্ধমানে থামে না। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভেঙে দেখি বর্ধমান পেরিয়ে গেছে। রেল লাইন এর পাশে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের চাষ। আমাদের মেদিনীপুরের গ্রামের ওদিকে পয়লা বৈশাখের আগেই সব বোরো ধান কাটা হয়ে গেছে। এদিকে দেখছি ধান পাকতে আরও দিন পনের কুড়ি লাগবে। দুর্গাপুর কখন পেরিয়ে গেছে খেয়াল করিনি। সন্ধ্যার পরই ট্রেন বিহারে ঢুকে গেল। স্টেশনের নাম জামতাড়া। নাম দেখলেই মনে ভয় জাগে। কত রকম কারণেই এক একটা জায়গা বিখ্যাত বা কুখ্যাত হয়ে যায়।

এমনিতেই আমরা এখন রাত্রে তাড়াতাড়ি শুয়ে যাই। ট্রেনে তো আরও আগেই। প্রথম দিন বিশেষ কোন ঘটনা ছাড়া এই ভাবে শুরু হল এবারের ভ্রমণ।

রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে দেখলাম দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। সকাল হল উত্তর প্রদেশে। লখনউ এর একশ কিমি মত আগে থেকেই রেল লাইন এর পাশের মাঠের ছবি অন্য রকম দেখছি। এদিকে মাঠ ভর্তি শুধুই পাকা গম। কোথাও কোথাও গম কাটা হচ্ছে।

রাত্রে আমাদের পাশের বার্থে একজন টিটি এসে একেবারে অফিস খুলে বসেছে দেখেছিলাম। প্যান্ট্রি কারের ছেলেরা ওকে বেশ খাতির করছে দেখেছি। সকালে একজন সাদা জামা প্যান্ট পরে ভদ্র ছেলে এসে আমাকে জিজ্ঞেশ করে পাশে বসেছিল। একটু পরে সে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে দেখলাম। টিটি সাহেব এর জন্য একটি ছেলে , ছোট গ্লাসকে করে চা আনল। উনি আমার পাশের ছেলেটিকে দেখিয়ে বললেন, গার্ড সাহেবকেও চা দাও। ঘুম ভাঙ্গিয়ে চা দিতে গেলে, গার্ড সাহেব কিছুতেই চা নিলেন না। পরে বললেন, এরা যেভাবে চা বানায় একবার দেখেছি। ঐ দেখলে আর চা খাওয়ার ইচ্ছা হবে না। উনি দেখেছেন, এরা ট্রেনের টয়লেটের জল ড্রামে ভরে, স্নান করার জন্য যে বৈদ্যুতিক ডোবানো হিটার ব্যবহার করা হয় তাই দিয়ে জল গরম করে। সত্যিই এসব জানলে আর ট্রেনে চা খাওয়ার ইচ্ছা থাকবে না। লখনউ পেরোনোর পর একটা সময় , মাইল এর পর মাইল আমের বাগান দেখলাম। এবার এদিকেও ভালো আম হয়নি। চল্লিশ বছর আগে এদিকের মাঠে অনেক ময়ূর দেখা যেত, এখন আর একটাও নেই। ট্রেন এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেটে চলছে। দেরাদুনে সন্ধ্যায় পৌঁছলেই হল।১৮.৪.২০২৫.

দেরাদুনের দিকে 2

গমের মাঠে গম কাটা চলছে। বেশিরভাগই কাটা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মাঠের ভেতর বালির স্তুপের মত দেখছি; ওগুলি কি একটু পরেই দেখলাম। মাঠের মধ্যেই মেসিন দিয়ে গম ঝাড়াই হচ্ছে। ঐ বালির মত জিনিসগুলি গমের ভূষি। এগুলি নিশ্চয়ই কোন কাজে লাগবে। আমাদের ওদিক গমের চাষ নেই, তাই এসব দেখিনি।

মাঠে গমের ভূসি

উত্তর প্রদেশের গ্রাম গঞ্জের ভেতর দিয়ে ট্রেন চলেছে। খুব সকালে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে একটা জিনিস বোঝা যায়; এদিকে এখনও খোলা মাঠে পায়খানা বেশ চলছে। লখনউ পেরিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করেছে দশটা নাগাদ। মাইল এর পর মাইল আমের বাগান চলল এক সময়। ফারাক্কা পেরিয়ে মালদা জেলায় এরকম আমের বাগান দেখা যায়। আমাদের সাথে যে বিয়ে বাড়ীর দল চলেছে এদের সাথে একটি বছর চারেকের বাচ্চা ছেলে আছে। কাল সন্ধ্যায় ঘন্টা দুই ওর মামাকে ব্যস্ত রেখেছিল। আজ দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এক আঙ্কলকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখল। এই লোকটি বোধহয় ওদের কর্মচারী, বেচারা দুই ঘন্টা অত্যাচার সহ্য করে এক সময় উপরের বার্থে উঠে শুয়ে পড়ল। বাচ্চাটা একবার আমার কাছে এসে কিছু বলার চেষ্টা করছে দেখে ওর দাদু ওকে ফল খাওয়াতে ধরে নিয়ে গেল।

হরিদ্বারে ঠিক সময়েই পৌঁছে গেল ট্রেন। বিয়ে বাড়ীর দল এখানে নেমে গেল। নামার সময় দেখলাম ওদের লটবহর নামাতে নামাতে ট্রেন ছেড়ে দিল। একটু এগিয়েই আবার থামল। হরিদ্বার ছেড়ে মিনিট দশেক চলার পর রেল লাইন এর দুই পাশে বেশ ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ট্রেন চলল।

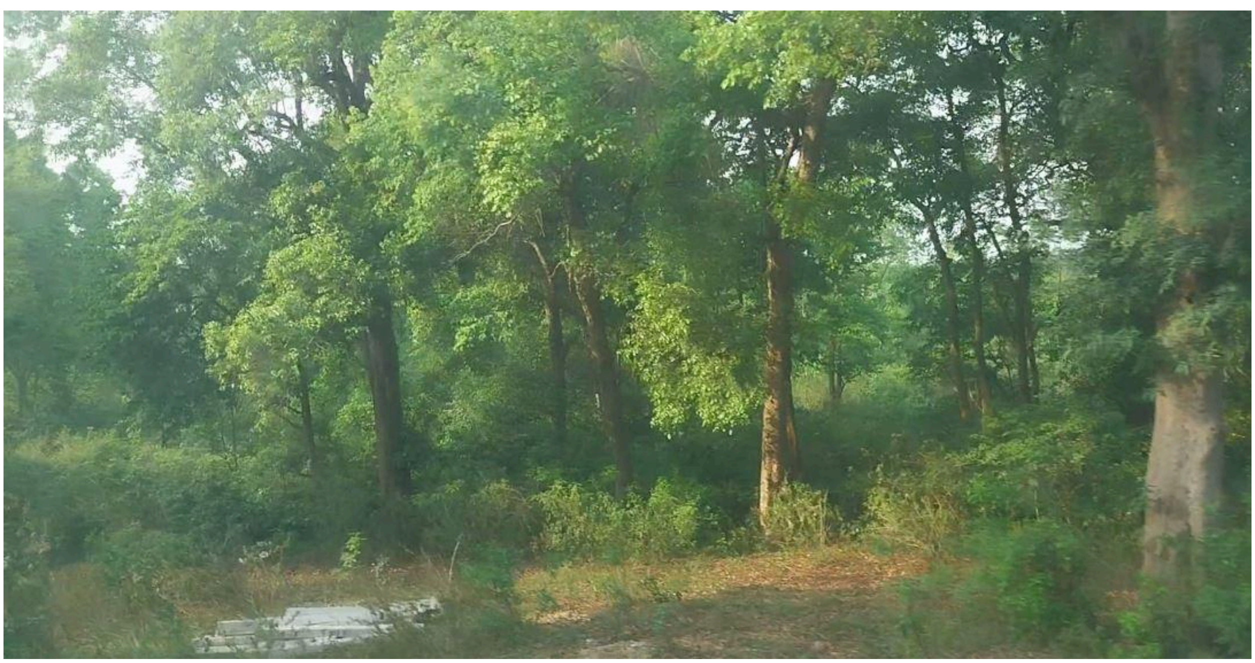

এখানেও কিন্তু জঙ্গল বেশ ঘন আর সবুজ। এটা রাজাজী ন্যাশনাল পার্ক। এখানে হাতি আর বাঘও আছে, বোর্ডে দেখলাম। আমি শুধু একটা শুকনো নদীর বুকে তিনটি ময়ূর দেখলাম। হরিদ্বার থেকে দেরাদুন সিঙ্গেল লাইনে ট্রেন চলে। মাঝে দৈওয়ালা স্টেশনে তিনটি লাইন আছে। এখানে আমাদের গাড়ী মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকল। উল্টো দিকের একটি ট্রেন পেরিয়ে যাওয়ার পর আমাদের গাড়ী ছাড়ল। ট্রেন ঠিক সময়ের একটু আগেই দেরাদুন পৌঁছে গেল। আমি কিন্তু চাইছিলাম, ট্রেন অন্তত এক ঘন্টা দেরী করে পৌঁছক। আমার রিটায়ারিং রুমের বুকিং আটটা থেকে। ঘন্টা দুই বাইরে বেঞ্চে বসে কাটালাম। এর মধ্যে আমি বাইরে বেরিয়ে বাস স্ট্যান্ড, ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড, অটো সব দেখে এলাম।

পরদিন সকালে দেরাদুনে দেখার জায়গাগুলি ঘুরে দেখার জন্য একটি অটোর সাথে কথা বলে তার ফোন নম্বর নিয়ে এলাম। স্টেশনের পাশেই দুটি ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড। ওরা জানাল, দেরাদুন লোকাল ট্যুর দুই হাজার দুশ টাকা। অটো বারোশ টাকা নেবে। এখানকার রিটায়ারিং রুম বেশ বড়। সবই ঠিক আছে, কিন্তু প্ল্যাটফর্মের সাথে হওয়ায় মাইকের অত্যাচার আছে। রাত পৌনে দশটা পর্যন্ত লাগাতার ঘোষণা চলল। দেরাদুনে এখনও কোলকাতার মত গরম পড়েনি। আমি তো রাত্রে কম্বল গায়ে ঘুমালাম। 21.4.25.

দেরাদুন দর্শন

19 এপ্রিল ঠিক সকাল আটটায় অটো এসে গেল। আমরা অবশ্য ভোরে উঠে ষ্টেশন এর বাইরে একটু হেঁটে ঘুরে এসেছি। ষ্টেশন এর এদিকটা একটু পুরনো শহর। ঠিক ষ্টেশন এর উল্টো দিকে একটা পাঁচ তলা নতুন হোটেল ; এ ছাড়া উঁচু বাড়ী প্রায় নেই। অটো প্রথমে চলল, সহস্ত্রো ধারা। আমাদের বাঙালি উচ্চারণে যেটা সহস্র ধারা, সেটাই এরা এভাবে বলে কি না জানিনা। রাস্তার পাশে সব সাইন বোর্ডে কিন্তু ঐ Sahastra Dhara Road লেখা। শহর ছাড়িয়ে বোধহয় দশ বারো কিমি দূরে এই ধারা। এদিকে যাওয়ার সময় দেখলাম বেশ কিছু পাকদণ্ডি দিয়ে রাস্তা নিচে নেমে গেল। ট্রেনে আসার সময় কিন্তু এতোটা উপরে উঠেছি, বোঝা যায় নি। ঐ ধারা একটি পাহাড়ী নদী। ধাপে ধাপে নামার সময় গোটা কুড়ি পাথরের আল মত দিয়ে জল আটকে স্নানের জায়গা করে রেখেছে। অনেক লোক সেই সকাল নটা নাগাদ স্নান করতে নেমে গেছে।

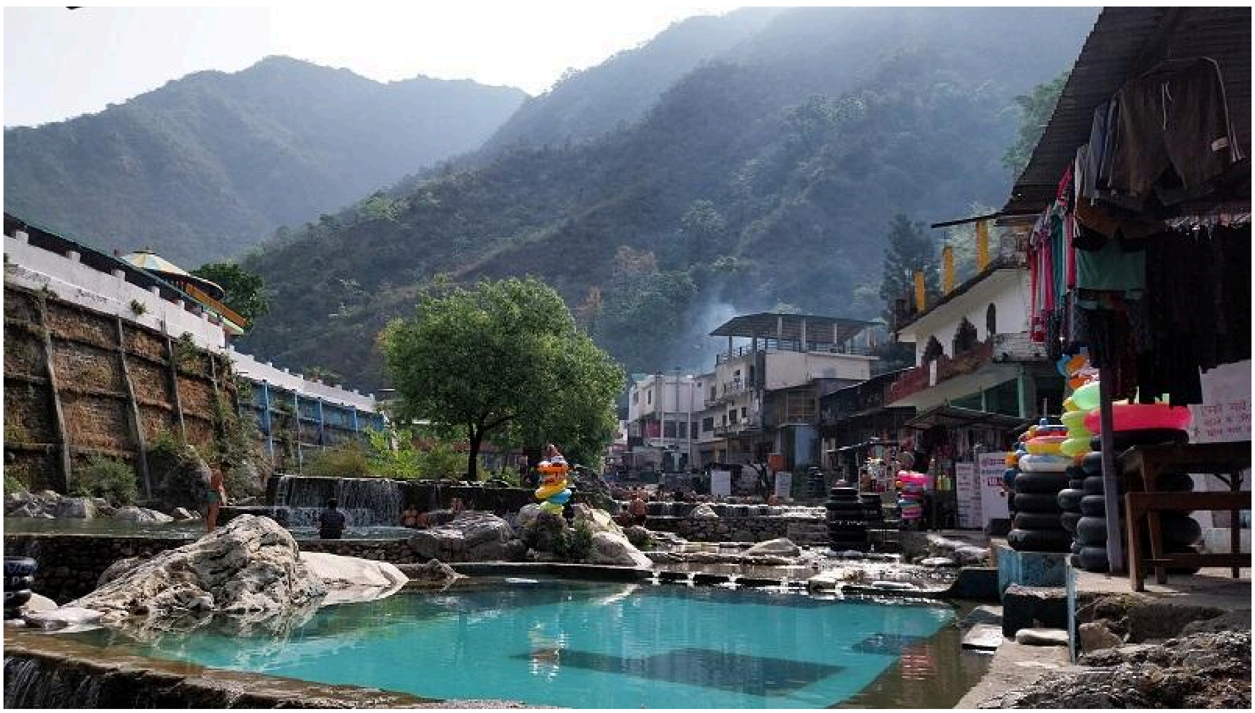

জল বেশ স্বচ্ছ। এই জলে নাকি প্রচুর গন্ধক আছে, চর্ম রোগের জন্য উপকারী। লোকে বড় বড় প্লাষ্টিকের ড্রাম কিনে তাতে করে জল নিয়ে যায়। হায়রে , কোলকাতার হাসপাতালের চর্ম রোগের বিভাগে প্রতিদিন চার পাঁচ শ রুগী হয়; সরকার এখানেও ঐ বিনা পয়সার জল এনে বিতরণ করতে পারে! উল্টো পারে পাহাড় থেকে বৃষ্টি পড়ার মতো জল পড়ছে। কিছু লোক সেই জলে একটু মাথা ভেজাতে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। আমরা একটু দূর থেকে দেখে এলাম। ফেরার পথে অটোর তার কেটে গেল। আস্তে আস্তে চলল অটো। দুই- তিন কিমি দূরে সাই বাবার মন্দির। সুন্দর। ভিড় বা হৈ হৈ নেই। ওখান থেকে চললাম গুচ্ছু পানী।

একটা বড় রাস্তা থেকে ছোট রাস্তা ধরে এক কিমি মত নামতে হয়। আমাদের অটো ড্রাইভার ঐ মোড়ে দাঁড়িয়ে, মিনিট পাঁচেক চেষ্টায় অন্য একটা ধরে আমাদের তাতে উঠিয়ে দিয়ে, নিজের অটো সারাতে চলল। অটো যেখানে নামাল সেখান থেকে চার পাঁচ শ মিটার হেঁটে গিয়ে টিকিট ঘর। রাস্তার পাশে পাশে ছোট ছোট দোকান , সবাই

প্লাষ্টিকের চটি ভাড়া দিচ্ছে। কেউ বলে দশ টাকা, কেউ বলে কুড়ি টাকা। তিরিশ টাকা করে টিকিট কেটে ভেতরে চললাম। বাচ্চা বুড়ো, ছেলে মেয়ে সবাই হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে জলের উপর দিয়ে ছপ ছপ করতে করতে এগিয়ে চললাম। ঠাণ্ডা জলের স্রোত নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে নেমে আসছে। দুই পাশের পাথরের দেওয়ালের মত পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে কোন রকমে দুই আড়াই জন লোক পেরনোর মত ফাঁকা। দেড়শ মিটার মত গিয়ে আর যাওয়ার রাস্তা নেই। তিন চার ফুট মত উপর থেকে জলপ্রপাতের মত জল নামছে। সব মিলিয়ে চল্লিশ মিনিট মত সময় লাগল। ফিরে এসে দেখি, আমাদের অটো চলে এসেছে।

এর পরের গন্তব্য টপ্লেশ্বর শিব মন্দির। আধ ঘন্টা মত চলে পৌঁছোলাম একটি ঘিঞ্জি জায়গায়। আশে পাশে অসংখ্য পূজার ডালা বিক্রীর দোকান। একটি দোকানে ডালা কিনে, জুতো জমা রেখে মন্দিরের দিকে চললাম। গোটা পঞ্চাশ সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটা জায়গায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পঞ্চাশ জনের লাইন পেরোতে মিনিট কুড়ি লাগল। একটি বেশ ছড়ান শিব লিঙ্গের মাথায় সবাই একটু করে জল ঢেলে পূজা দিচ্ছে। এই শিব লিঙ্গের মাথায় একটু বাটি মত করা আছে। অনেকে এরপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা ছোট জলের ধারার কাছে যাচ্ছে। আমরা অটোতে ফিরে এলাম। একটি পাড়ার মধ্যে দিয়ে অটো চলল। মিনিট পনের পর পৌঁছে গেলাম ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর গেটে।

পনের টাকা করে টিকিট, আর অটোর জন্য পঁচিশ টাকা। দুই পাশে জঙ্গলের মত গাছপালার ভেতর দিয়ে প্রায় এক কিমি রাস্তা দিয়ে, ইনস্টিটিউট এর পিছন দিকের পার্কিং এ পৌঁছলাম। বিশাল লাল ইটের বাড়ী। অটো ড্রাইভার জানাল, এই বাড়ী তৈরী করতে কোন সিমেন্ট ব্যবহার করা হয় নি। গোটা বাড়িটা ঘুরে দেখতেই আধ

ঘণ্টা লাগবে। টিকিট কেটে মিউজিয়াম দেখা যায়; আমরা দেখিনি। সামনের দিকে প্রায় এক কিমি মত বিস্তৃত প্রান্তরের মত বাগান। ফুলের গাছ প্রায় নেই। অনেক ছবি তুলে আমরা ফিরে চললাম।

একটার আগে স্টেশনে ফিরে এলাম।

স্টেশনের ভোজনালয়ে ডিম্ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম, মসুরির উদ্দেশ্যে। এদিকে এরা মসূরী বলে; আমাদের মত মুসৌরি বলে না। আমাদের এই বেরোনোর সময়টা ঠিক ছিল না। ঠিক মিনিট দশেক আগে দিল্লী থেকে শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেন এসে পৌঁছেছে। অনলাইনে কোন ট্যাক্সি নেই। ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড খালি, অনেক সময় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি পেলাম। বাসের জন্য লম্বা লাইন, কোন বাস নেই। অন্য সময় দেখেছি, চার পাঁচ জন লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। দেরাদুন থেকে আমরা ট্যাক্সিতে রওয়ানা দিলাম প্রায় দুটো নাগাদ। দেরাদুনে এখনও সেরকম গরম পড়েনি। ২২.৪.২৫.

দেরাদুন ৪

দেরাদুন শহরে মাঝে মাঝেই বেশ জ্যাম লেগে যায়। স্টেশনের কাছে রাস্তাগুলি জেলা শহরের মত। শহর থেকে বেরোতে আধ ঘন্টা লেগে গেল। কিছু সময় পর থেকেই সামনে , বাঁ দিকে পাহাড়ের উপর শহর দেখা দেয়। উপরে উঠে বুঝলাম, ওটাই মসুরী শহর। মসুরি ঢোকার তিন চার কিমি আগে থেকেই রাস্তায় বেশ জ্যাম। আমরা চারটা নাগাদ মসুরির লাইব্রেরী চকে পৌঁছে গেলাম। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি থেকে নামতেই একজন কুলী পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে দেখি ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। আমাদের হোটেল ম্যাল রোডেই। একশ মিটার মত এগিয়ে, এক তলা মত নিচে নামতে হল। খুব সকালে ছাড়া ম্যাল রোডে গাড়ী ঢুকতে দেয় না।

ঘন্টা দেড় পর আমরা সোয়েটার গায়ে বেরোলাম। সাড়ে পাঁচটা থেকে ম্যাল রোডে মেলার মত ভির। ভ্রমণ স্থানে ভিড় হয়, কিন্তু এরকম ভিড় আর কোথাও দেখিনি।

মসুরি ম্যাল রোড

লাইব্রেরী চক থেকে একটু নিচে নেমে ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড। এখানে পরদিন মশুড়ি ঘুরে ধনোউল্টি ছেড়ে আসার জন্য ট্যাক্সি ঠিক করে, পাঁচশ টাকা দিয়ে ম্যাল রোডে উঠে এলাম। ম্যাল রোড ধরে লোকজন হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাইব্রেরী থেকে পিকচার প্যালেস পর্যন্ত আড়াই কিমি রাস্তা। গোটাটাই মেলার মত। রাস্তার পাশে পাশে পার্কের মত কিছু বেঞ্চ করা আছে। হাঁটতে হাঁটতে একটু সময় বসে নিচ্ছে লোকে। কয়েকটা জায়গা থেকে দূরে নিচে দেরাদুন শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। সবাই ছবি তোলার চেষ্টা করছে। পিকচার প্যালেস এর দিকটা অনেকটা চড়াই উৎরাই আছে। এদিকে ভিড় যেন আরও বেশী। আমরা পুরোটা হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে এলাম। আমার তো মনে হচ্ছিল মাথায় টুপী পরলে ভালো হত। কেউ কেউ আবার হাফ হাতা জামা বা টি শার্ট পরে ঘুরছে। আমরা আটটার মধ্যে হোটেলে ফিরে এলাম।

ম্যাল রোড থেকে দেরাদুন

পরদিন সকালে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই বেশ সকালে উঠে হাঁটতে বেরিয়ে গেলাম। এবার আর ম্যাল রোডে না হেঁটে, আমরা ক্যামেল ব্যাক রোড ধরে চললাম। পাহাড়ী এলাকায় যেমন হয়, লোকজন বেশ দেরি করে ওঠে। এই ক্যামেল ব্যাক রোড দুই একজন করে লোক হাঁটতে বেরিয়েছে। এদিকে হোটেল বা দোকানপাট খুব কম। গাছপালা আছে। এক কিমি হেঁটে একটি ভিউ পয়েন্টে পৌঁছলাম। সামনেটা বেশ সুন্দর।

আকাশ ফাঁকা থাকলে এই দিকে হিমালয়ের বরফ সাদা চূড়াগুলি দেখা যায়। এবার আমরা একদিনও দেখতে পেলাম না। হোটেলে ফিরে, গরম জলে স্নান সেরে চেক্ আউট করে বেরিয়ে পড়লাম। ম্যাল রোড ধরে একশ

মিটার হেঁটে, লাইব্রেরী চকে পৌঁছে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ট্যাক্সি এসে গেল। আটটা থেকেই ঐ জায়গায় গাড়ীর ভিড় শুরু হয়েছে। ঐ দিকেই একটা সরু গলি মত রাস্তা দিয়ে চললাম কেম্পটি ফলস দেখতে। মাঝ রাস্তায় ডান দিকের সরু গলি দিয়ে গেলাম বুদ্ধ মন্দির দেখতে। সুন্দর সাজানো মন্দির। ঐ সকালে তেমন যাত্রীর ভিড় ছিল না। মন্দিরের গেটের উল্টো দিকে সরু রাস্তা উঠে গেছে দলাই হিলে। মিনিট দশেক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে চারি দিকে সুন্দর দৃশ্য। একটি বড় বুদ্ধ মূর্তি আছে। সকলে সেখানে ছবি তুলে নিচ্ছে।

এরপর মিনিট দশেক চলার পর কোম্পানি গার্ডেন। এখন নাম হয়েছে অটল উদ্যান। পঁচিশ টাকা করে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সুন্দর বাগান।

ভেতরেই কিছু খাওয়ারের দোকান আর শীতের পোশাকের দোকান। আমরা একটি দোকানে সামান্য কিছু কিনলাম। গেটের বাইরে একটি দোকানে বসে দু কাপ কফি খেয়ে আবার গাড়ীতে উঠলাম। এখান থেকে মিনিট কুড়ি লাগল কেমপ্টি ফলস যেতে। এক জায়গায় রাস্তার থেকেই দুরে জলপ্রপাত দেখতে পেলাম। রাস্তা ঘুরে গিয়ে ফলস্ এর ঠিক উপরে একটি বাজার মত জায়গায় পৌঁছে গেছে। এখানে নেমে সিঁড়ি দিয়ে একেবারে ফলস এর কাছে যাওয়া যায়। তিনশ দশ সিঁড়ি। ইচ্ছা করলে কেবল কারে চেপে আড়াইশ সিঁড়ি কমানো যায়। আমরা গোটাটাই সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। সিঁড়ির পাশে পাশে কয়েকশ দোকান। লোকে কিছু কেনাকাটি, দরদাম করছে। নীচের দিকে গোটা দশেক স্নানের পোশাক ভাড়া দেওয়ার দোকান। লোকে লকার নিয়ে তাতে ব্যাগ পত্র রেখে , স্নান করতে নেমে যাচ্ছে। জল যেখানে পড়ছে সেখানে একটা হাঁটুর ওপর জলের পুকুর মত। সেখানে শ'দেড়েক লোক নেমে হৈ হৈ করছে। আমরা মিনিট পনের একটা দোকানে বসে, চা খেয়ে উঠে এলাম।

গাড়ী এবার আমাদের নিয়ে চলল সোজা ধনোউল্টি। আবার সেই একই রাস্তা ধরে লাইবেরি চক হয়ে উল্টো দিকে চলল গাড়ী। ফেরার সময় রাস্তায় কয়েক জায়গায় জ্যাম পেলাম।

মুসুড়ি শহর ছাড়িয়ে এক দেড় কিমি নিচে নেমে, দেরাদুনের রাস্তা ডান দিকে রেখে, বাম দিকে গাড়ী চলল। আবার সেই পাহাড়ী আঁকাবাকা রাস্তা। মুসূরী থেকে ধনলটি তিরিশ কিমি রাস্তা। রাস্তার পাশে পাশে গভীর খাদ। কয়েকটি জায়গায় বাম দিকে হিমালয়ের বরফ সাদা চূড়া দেখার কথা। কিন্তু এবার আমরা একদিনও আকাশ পরিষ্কার পেলাম না। তবে কিনা, কলকাতায় যখন পোড়ানো গরম, মুসুরিতে আমাদের লেপ গায়ে ঘুমাতে হল। আমরা দেড়টা নাগাদ ধনোউল্টি পৌঁছে গেলাম। 23.4.25.

আজ ভোরে বাড়ী ফিরে এলাম।

দেরাদুন 5

ধনোউল্টি খুবই ছোট্ট একটি জায়গা। যেমন দার্জিলিং এর শহরের বাইরে অফ বিট জায়গাগুলি হয়, সেরকম। একটিই রাস্তা চলেগেছে গোঙ্গোত্রীর দিকে। তার পাশে পাশে গোটা পনের -কুড়ি হোটেল। একটি ছোট্ট বাজারে গোটা পনের -কুড়ি দোকান। আকাশ পরিষ্কার থাকলে নিশ্চয়ই হিমালয়ের চূড়াগুলি দেখা যায়। হোটেলগুলি শুরু হওয়ার একটু আগে থেকেই দুই -একটা ছেলে , রডোডেনড্রন এর লাল ফুলের গোছা হাতে নিয়ে গাড়ীর পাশে পাশে ছুটতে থাকে। পরে দেখলাম, এই ফুলের নির্যাস বোতলে ভরে বিক্রিও হচ্ছে। একটি দোকানে ঐ লাল সিরাপ দিয়ে শরবত করে খাইয়ে দেখাল। আমাদের ট্যাক্সির ড্রাইভার রাস্তায় যেতে যেতেই জানাল, আমরা ওর গাড়ীতে ধনোউল্টির কয়েকটি জায়গা দেখে পরদিন দেরাদুন ফিরতে পারি। আমি রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু পরে বুঝেছি, ওকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা না দিয়ে, অন্য গাড়ী নিয়ে ফিরল চার হাজার টাকা লাগত।

রডোডেন্ড্রন

হোটেলে খাওয়ার পর আমরা ধনোউল্টি দেখতে বেরোলাম। আমাদের হোটেল থেকে পাঁচশ মিটার মত এগিয়ে বাজার মত এলাকা। এটা ছাড়িয়ে আরও পাঁচশ মিটার এগিয়ে, ডান দিকে, পাহাড়ের ঢালে ইকো পার্ক। পঞ্চাশ টাকা করে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। ফুলের বাগান নেই। ধাপে ধাপে কিছু পাইন গাছ উঠে গেছে। নিচের দিকে একটা মাঠ মত জায়গায়, দুই দিকে লোহার সিঁড়ি দিয়ে উঠে, দড়ির মই এর উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মত কিছু এডভেঞ্চার স্পোর্টস এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা সব মিলে জন দশেক যাত্রী ছিলাম। ধাপে ধাপে একেবারে মাথায় উঠে গিয়ে উল্টো দিকের পাহাড় দেখে এলাম। বিকেলে হোটেলে ফিরে আর কিছু করার ছিল না। এখানে সারাদিন খুব বাতাস বইছে। সন্ধ্যার পর থেকে পরদিন সকাল নটা পর্যন্ত বেশ ঠাণ্ডা।

ইকো পার্ক

একুশ তারিখ সকাল নটা নাগাদ আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে বাজার ছাড়িয়ে দশ কিমি দূরের সুরকান্দা দেবী মন্দিরে চললাম। বাজারের পর পাঁচশ মিটার পর্যন্ত কিছু হোটেল আছে। তারপর ফাঁকা পাহাড়ী পথে এগিয়ে গেলাম। মন্দির একটি পাহাড়ের চূড়ায়। নিচে রাস্তার দুই পাশে গোটা কুড়ি ডালা বিক্রীর দোকান। একটি দোকান থেকে ডালা কিনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলাম। একশ মত সিঁড়ি ওঠার পর কেবল কার। পাশের বাঁধানো রাস্তা ধরে কেউ কেউ হেঁটে উঠছে। রোপওয়েতে আড়াই তিনশ সিঁড়ি কমিয়ে দেয়। উপরে মন্দির চত্বরে ঐ সকালেই একশ মত যাত্রী পৌঁছে গেছে। বেশ ছড়ানো চত্বর। মন্দির প্যাগোডার মত, সুন্দর। দেবী মূর্তি বেশ ছোট; ভালো করে বোঝা যায় না। আমরা মিনিট কুড়ি উপরে থেকে নেমে এলাম।

এবার আমরা সোজা দেরাদুন ফিরব। আমাদের ফেরার ট্রেন রাত পৌনে দশটায়। মাঝে দুই একটা জায়গা দেখে যাব। ফেরার সময় মসুরি শহরকে পাশে রেখে বড় রাস্তা ধরে নেমে চললাম। মসুরি থেকে কিছুটা নিচে মসুরি লেক। রাস্তা থেকে দেড়শ মত সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। একটা ঝর্নার জলকে আটকে একটা গোল সুইমিং পুলের মত করা হয়েছে। ওখানে বোটিং এর ব্যবস্থাও আছে। আর আছে বাঁধানো চত্বরের পাশে পাশে কিছু দোকানপাট। আমাদের মত বয়স্ক মানুষের কাছে অকারণে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা। এখানে একটা কথা বলি। যাওয়ার আগে আমার একটু হাঁটু ব্যথা ছিল। কেম্পটী ফলস এ তিনশ সিঁড়ি ওঠা নামা করার সময় কোন ব্যথাই ছিল না।

এরপর মিনিট পনের পর, ট্যাক্সি রাস্তা থেকে ডান দিকে সরু রাস্তা ধরে নিচে নেমে চলল। বেশ অনেকটা পথ নেমে আমরা ট্যাক্সি থেকে নামলাম। এই রাস্তাটা নামার জন্যও কেবলকার আছে। আমরা একটু পাথুরে রাস্তা ধরে নেমে গেলাম। এখানেও জলপ্রপাতের রাস্তার পাশে পাশে দোকানপাট। দোকানের ছাতার আড়ালে পড়ে আছে ভট্টা ফলস। কুড়ি পঁচিশ ফুট উপর থেকে পড়ছে জল।

ভাট্টা ফলস

আমরা মিনিট পনের থেকে গাড়ীর কাছে ফিরে এলাম। এখানে দোকান অনেক কিন্তু ভাত খাওয়ার মত হোটেল নেই। এদিকে রাস্তার পাশে পাশে অসংখ্য ম্যাগি দোকান। মসুরি ম্যাল থেকে শুরু করে যেখানেই গেলাম সবই ম্যাগি কর্নার। আমরা প্রায় দেরাদুনে পৌঁছনোর আগে একটা বড় ধাবায় ঢুকে ভাত খেয়ে নিলাম। দেরাদুনে আমাদের দেখার বাকি ছিল শুধু দুন স্কুল। ড্রাইভার বলল, পাঁচিলের দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। প্রচুর লোক দেখতে যেতো বলে ঐ ভাবে পাচিল দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। আমরা তিনটে নাগাদ দেরাদুন স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

আমাদের ট্রেন প্রায় সাত ঘন্টা পর। এই জন্য আমি ফেরার দিনের জন্য রিটেয়ারিং রুম বুক করার চেষ্টা করেছিলাম। আমরা তিরিশ টাকা ঘন্টা হিসেবে তিন ঘন্টার জন্য প্রাইভেট ওয়েটিং রুমের সিট বুক করে নিলাম। উপাসনা এক্সপ্রেস ছটায় পৌঁছে গেলেও আমরা উঠতে পারলাম রাত নটার পর। আগের দিন একটা জিনিস দেখে আমরা ভুল বুঝেছিলাম। আমরা যেদিন দেরাদুনে এলাম, সেদিন দেখেছি , লোকজন ছটা থেকে ট্রেনে উঠে বসে আছে। এসব ট্রেনের জেনারেল আর স্লিপার ক্লাশে ট্রেন এলেই সবাই উঠে যায়, কিন্তু এ সি কম্পার্টমেন্ট এর দরজা আধ ঘন্টা আগে খোলে। ট্রেন ঠিক সময়েই ছাড়ল। এই ট্রেন রাত তিনটায় হাওড়ায় পৌঁছনোর কথা। শুনেছিলাম , এই গাড়ী চার পাঁচ ঘন্টাও লেট করে। কিন্তু আমাদের একেবারে তিনটা বাজার আগেই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিল। তিরিশ ঘন্টা ট্রেনে বসে থাকা বিরক্তিকর। এই ট্রেন ফেরার সময় অনেকটা পথ বিহারের উপর দিয়ে, দিনের বেলা চলে। এ সি টু টায়ার এই দু চারজন টিকিট ছাড়া লোক উঠে বসে। দিনের বেলা উত্তর প্রদেশ আর বিহারের উপর দিয়ে গোটা রাস্তা এল গমের মাঠের মধ্যে দিয়ে। গোটা রাস্তাই গম কাটা আর মেসিন

গম ঝাড়া দেখতে দেখতে এলাম। তিন চার জায়গায় কিছু হরিণ জাতীয় প্রাণীর দল দেখলাম। এই নীলগাই এর মত প্রাণীগুলির ছবি তোলা হল না। মাঠে মাঠে গরু, মহিষ, ছাগল ছাড়াও এই আর একরকম নতুন প্রাণী দেখা গেল। এই ট্রেন যাত্রার সময় একটা নতুন হিন্দি কথা শিখলাম। ষ্টেশনে প্রতিক্ষালয়, শৌচালয় লেখা আগে দেখেছি; এবার দেখলাম " মুত্রালয়!" ভোর সাড়ে তিনটায় হাওড়া থেকে ইন ড্রাইভে ট্যাক্সি বুক করে দমদমে ফিরলাম। পার্কিং এর জন্য সত্তর টাকা আমাদের দিতে হল। ভ্রমণে বের হলে এরকম কিছু টাকা আক্কেল সেলামি দিতেই হয়। কিন্তু পাহেলগামে বেড়াতে গিয়ে প্রাণ দিয়ে আসতে হবে, এমন দুঃস্বপ্ন কে আর দেখেছে! ২৪. ৪.২৫.

# দয়াল বন্ধুর ই-বুক (২)

## ছবি যুক্ত করা হয়েছে

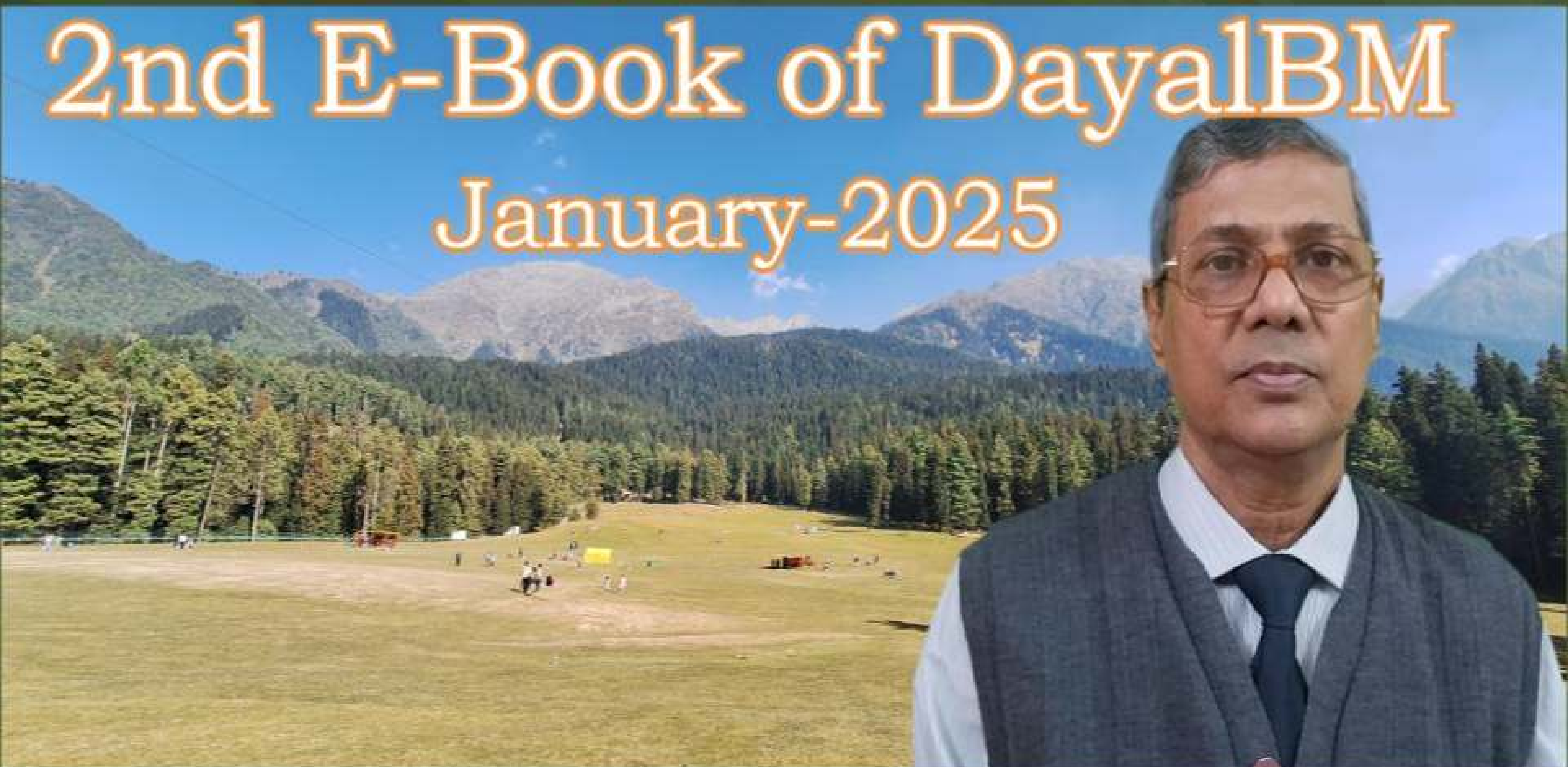


**Page Numbers Added**

২-য় ই-বুকের নিবন্ধ তালিকা

পৃষ্ঠা নং 2: সাফাই বা আমার বক্তব্য
পৃষ্ঠা 3; নে ঝোলা, চল ভোলা
পৃষ্ঠা 6; সিঁড়ি -১ পৃঃ 8; সিঁড়ি -২
পৃঃ 20: অকিঞ্চিৎকর একটা ফল
পৃঃ 22: এক ডাকাতির গল্প
পৃঃ 24: গীতার ২ য় অধ্যায়, ৪৭ নং শ্লোক
পৃঃ 25: রাজ কর্মচারি
পৃঃ 27: লাফ
পৃঃ 30: লোপামুদ্রা
পৃঃ 32: সব নাগ সাপ নয়
পৃঃ 37: সর্ষের ফুল।
পৃঃ 41: সস্তা
পৃঃ 45: সাদা চামড়ার লোক
পৃঃ 50: সাপের কামড় - কি করণীয়
পৃঃ 55: কয়েকটি কালাচ সাপের কামড় এর রুগী
পৃঃ 62: হাতখান ধৈরে দেখ ক্যানে
পৃঃ 64: হাতি।
পৃঃ 68: হাদু মাছ
পৃঃ 70: হোষ্টেল। পৃঃ 75: লক্ষী দিদি
পৃঃ 78: নাম করণের সার্থকতা
পৃঃ 81: সামান্য ফলের বিপুল সম্ভাবনা
পৃঃ: 84: ঘাট।
পৃঃ 88: সাপুড়ে
পৃঃ 91: সুধা সাগরের তীরে
পৃঃ 93: প্রধান শিক্ষক।
পৃঃ 96:নিতাই দাদা -১
পৃঃ 98- 105: নিতাই দাদা, ২ - ৪
পৃঃ 106: নিধিরাম সর্দারের আমলাগিরি
পৃঃ 112: বেচারাম ডিম বেচে, কেনারাম কেনে
পৃঃ 119: মিত্রা মাসী । * একটা পাথর আর ছুটি পরে যোগ করা হয়েছে।

# দয়াল বন্ধুর ই-বুক (২)

## ছবি যুক্ত করা হয়েছে

ছবি সহ ই - বুক (সাফাই)

মাস দুই আগে একটা ই - বুক তৈরীর চেষ্টা করেছিলাম। খুবই প্রাথমিক একটা প্রচেষ্টা ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই বেশ কিছু অসঙ্গতি ছিল। বন্ধুরা অনেকেই অনেক রকম পরামর্শ দিয়েছেন। ভ্রাতৃ প্রতীম ডা অরিন্দম , লেখার সাথে ছবি দিতে বলায় বেশ বিপদে পড়ে গেলাম। ছবির তো অভাব নেই। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা দেওয়া যায়, সেই বাছাই করা ব্যপারটা বেশ কঠিন। আসলে বেড়াতে গিয়ে এখন এত বেশী ছবি আর ভিডিও আনা হয় যে, ইউ টিউব ভিডিও করে সেগুলিকে জমিয়ে রাখতে হচ্ছে।

এই নতুন প্রচেষ্টায় ভ্রমণ কাহিনী বাদে বাকী কিছু লেখা এক জায়গায় করা হল। আমার পরিচিত যাঁরা, তাঁরা প্রায় সবকটি লেখাই কোন এক সময় পড়েছেন। অনেক লেখার সাথেই, বর্তমানে অর্থাৎ হয়তো আগে লেখার পাঁচ - সাত বছর পরে নতুন কিছু তথ্য পেয়েছি। এই লেখাগুলি আপনাদের পরিচিতরা পড়বে এই আশা নিয়েই নতুন করে সাজিয়ে লেখাগুলি প্রকাশ করছি। কিছু কিছু লেখাতে ছবি দেওয়ার মত প্রসঙ্গ নেই। আবার সিঁড়ি নামের লেখাটা সাজাতে গিয়ে এত বেশি ছবি দেওয়ার কথা মনে পড়ল যে বেশ সমস্যায় পড়ে গেলাম। আর, আসল কথাটা হল , চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পর সময় কাটানোর একটা গঠনমূলক উপায় হিসেবেই লেখার চেষ্টা করছি। ছাপানো বই কিনে পড়ার মানুষ একেবারেই মুষ্টিমেয়, তাই ওপথে আর যাচ্ছি না। আপনারা আপনাদের মতামত আমাকে ই - মেলে জানালে খুশি হবো। আমার মেল আই ডি dayalbm@gmail.com

ধন্যবাদান্তে, ডা দয়াল বন্ধু মজুমদার, দমদম, কলকাতা ৭০০০৩০. ২৮.১.২০২৫.

নে ঝোলা, চল ভোলা

খুব অকিঞ্চিৎকর, এমন কি বাজে লোকও অনেক সময় এক আধটা দারুন কথা কি করে যেন বলে ফেলে। আমাদের দপ্তরে একজন অত্যন্ত ফাঁকিবাজ করনীক ছিলেন। কোনদিন কোন কাজ করতে দেখিনি। আমরা যখন কোথাও কোন চক্ষু পরীক্ষা শিবির করতে যেতাম, লোকটা ঠিক সকাল সকাল এসে হাজির হত। গাড়িতে উঠে চলত আমাদের সাথে। শিবিরে গিয়েও ওর তেমন কোন কাজ থাকত না। কিন্তু সব জায়গায় গিয়ে মোড়োলি করে বেড়াত। এমন সব বড় বড় কথা বলে আসত যে পরে আমাদেরই বিপদে পড়তে হত। এরকম চালাকি করে তো সবদিন পার পাওয়া যায় না। ওর ভাঁড়ামী আর মোসাহেবী আমাদের বড় কর্তা বেশ উপভোগ করতেন। ঐ সব করতে গিয়ে একবার এমন পাকিয়ে তুলেছিল যে, বড় কর্তা লোকটিকে আমাদের দপ্তর থেকে তাড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর থেকে কয়েক বছর আর তাকে দেখিনি। একদিন শুনলাম চাকরী থেকে অবসর নিয়েছে । আবার একদিন শুনলাম লোকটা মরেই গেছে। ও চাকরী করার সময় এতই অনিয়মিত ছিল যে, কেউ কেউ মজা করে বলত, লোকটা বোধহয় মরে গেছে। তাই এখন যে লোকটা সত্যিই মরে গেছে, মাঝে মাঝে মনে হয়, আদৌ কি মরেছে? তো এই রকম একটা ভাঁড় একবার আমাদের সাথে একটু দূরের এক জেলায় চলল শিবির করতে। বিকেলের ট্রেনে গিয়ে , একরাত থেকে, পরদিন শিবির। এত দীর্ঘ সময় ওরকম একটা ভাঁড়ের সাথে থাকলে নানান রকম বিচিত্র গাল গল্প শোনা যাবে, এ আর আশ্চর্য কি।

ঐ সময় ওর মুখেই শুনেছিলাম যে , একবার নাকি বাড়িতে স্ত্রীর সাথে ঝামেলা করে মাস থানেকের জন্য বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। প্রচুর নগদ টাকা একটা পলিথিনের ব্যাগে ভরে পুটুলি করে নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের দিকেও চলে গেছল। ওর বলা গল্প বলেই, বেশীর ভাগই জল মেশানো বলেই জানতাম। ঐ গল্পের মাঝেই একটা সুন্দর কথা বলেছিল, " নে ঝোলা, চল ভোলা"! কথাটা সে নিশ্চয়ই কোন সাধু সন্তের কাছে শুনেছিল।

এই ঝোলা আর ভোলা কথা দুটিই বিশাল অর্থ বহন করে। ঝোলা বলতে সাধারণ ভাবে বোঝায় ভিক্ষার ঝুলি। একটা গামছা বা ধুতির টুকরোর চার কোণে গিট দিয়ে কাঁধে ঝোলানোর ব্যবস্থা। আমরা ছোট বেলায় গ্রামের দিকে দেখতাম , দু তিনিটি লোক , মাঝে মাঝে এসে হাজির হত। তাদের হাতে কর্তাল আর কাঁধে ঝোলা। গ্রামের বাড়ি বাড়ি গুরে ভিক্ষা করাই তাদের পেশা । ঐ রকম গামছা বা ধুতির টুকরোর ঝোলা বা ঝুলিকে আমরা ভিক্ষার ঝুলিই বলতাম। পেশাদার ভিক্ষাজিবী ছাড়াও আর কিছু ক্ষেত্রে ঐ ঝুলি অপরিহার্য ছিল। বামুন বাড়ীর ছেলেদের উপনয়ন বা পৈতা অনুষ্ঠানের একটা অংশ ছিল, ভিক্ষা। নেড়া মাথায় , গেরুয়া কাপড় পরে কাঁধে একটা ঝুলি নিয়ে , নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে ভিক্ষা নিতে হত। আবার পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের ঐ রকম একটা ঝোলা কাঁধে ছবি খুব দেখা যায়। সম্ভবত এই পরিব্রাজকের কাঁধের ঝোলা থেকেই ঐ নে ঝোলা কথাটা এসেছে। কথা হল , এই পরিব্রাজক বিবেকানন্দের সাথে কি ঘুনাক্ষরেও ঐ রকম “ বৌ এর সাথে ঝগড়া করে বাড়ী ছাড়া” ভাঁড়েদের তুলনা করা যায়?

আমারা সন্যাসি বললে , লোটা কম্বল নিয়ে পথে বেরিয়েপড়া বিবাগী লোকগুলিকেই বুঝি ।বেনারস্ , অমরকন্টক, হরিদ্বার, হৃষিকেশ প্রভৃতি তীর্থস্থানে যে সব গেরুয়া পোষাকের কিংবা নাঙ্গা সাধু দেখেছি, তাদের কাউকেই দেখে মনে হয়নি যে তারা একশো ভাগ ত্যাগি সন্যাসি। আমার মনে হয়েছে ঐ সব ট্যুরিষ্টদের কাছে হাত পাতা লোকগুলির সিংহভাগই আমদের এই ভাঁড় মশাই এর মত। আবার ঠিক উল্টোটাও দেখছি। চরম ক্ষমতা লোভী, ভোগী রাজনীতিবিদ , গেরুয়া পোষাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মন্দির ,আশ্রম ,দেবস্থান ,চরম ভোগী নৃশংস লোকেদের আখড়া হয়ে গেল। আমাদের ঝোলার অবস্থাও তাই হয়েছে। যে কেউ একটা ঝোলা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেই হল। এই ঝোলার কেমন বিবর্তন হয়েছে দিনে দিনে। উনিশশ বাহান্ন সালের দিকে নর্মদা পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন শৈলেন্দ্র নারায়ন ঘোষাল শাস্ত্রী মশাই। পরিক্রমায় বেরনোর সময় ওনাদের পোশাক পরিচ্ছদের যে নিয়মের কথা শাস্ত্রী মশাই লিখে গেছেন, তাতে একটা ছোট ঝোলার কথাও আছে। কমন্ডলুতে নর্মদার জল, একটা কম্বল ছাড়া ঝোলায় কোন টাকা পয়সা নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য সেই সময়ও কিছু কিছু সাধুর দলের সাথে আজকের ক্যাটারারের মত জিনিস পত্রের বোঝাও চলত। শুদ্ধ পরিক্রমাবাসি কখনও একদিনের খাদ্যও ঝোলায় বয়ে বেড়াতেন না। তেমনি তাঁদের ভিক্ষা দিতে পারলে মন্দিরের পুরোহিত থেকে সাধারণ গৃহস্থ সবাই নিজেদের ধন্য মনে করত।

সাহিত্যিক সমরেশ বসু মহাশয় পর্যটকের যে বৈরাগ্যের কথা বলেছেন, আজ পর্যন্ত একজনও তেমন পর্যটকের কথা কোথাও পড়িনি। সমরেশ বসু মশাই -এর মতে, পর্যটক শূন্য হাতে ঘুরে বেড়াবেন। দিনান্তে একবার গাছের তলায়, মাটির পাত্রে চাল ফুটিয়ে নেবেন। যাওয়ার সময় ঐ মাটির পাত্র ফেলে যাবেন।

আসলে ঐ রকম প্রায় শুন্য ঝোলা নিয়ে পর্যটন বা তীর্থে যাওয়ার একটা লোকও আজ আর নেই। এখন আমরা ট্যুরিস্ট। সাথে ঝোলা থাকে; একটা নয়, কয়েকটা। সে ঝোলা ঐ রকম গামছা বা কাপড়ে গিঁট দিয়ে তৈরী নয়। নামি দামি কোম্পানির ট্রলি ব্যাগ ট্যাক্সিতে তুলে হাওড়া স্টেশন, সেখানে কুলীর মাথায় চাপিয়ে ট্রেনের রিজার্ভ করা এ সি কামরায় পৌঁছয়। ঝোলা অবশ্য একটা থাকে, সেটা দলের কর্ত্রীর কাছে। সেটাকে হাতে ঝুলিয়ে নেওয়া হলেও সেটা কিন্তু ঝোলা নয়। সেটাকে এখন বলা হয় বটুয়া বা ইংরেজীতে হ্যান্ডব্যা( নবনিতা দিদিমনি বলেছেন, 'ফুটানিকা ডিব্বা') ওতে থাকে টাকা পয়সা, ডেবিট কার্ডের মত জরুরী জিনিস। শুধু বেড়াতে বেরনোর সময়ই নয়; এ রকম হাত ব্যাগ সারা বছরই মহিলাদের হাতে নিয়ে চলতে দেখা যায়। একটা নয়, কাউকে কাউকে দুটো তিনটে ঝোলা নিয়েও যাচ্ছে দেখা যায়। ছেলেরাও ঝোলা নেয় না বললে ভুল হবে। নানান মাপের, নানান রকমের ঝোলা। সব থেকে বেশী চলছে পিঠের ঝোলা। দুটি হাত খালি থাকে, চলতে ফিরতে বেশ সুবিধা। কিন্তু বাসে ট্রেনে এরকম একটা ঢাউস ঝোলা পিঠে নিয়ে উঠলে অন্য যাত্রীদের যথেষ্ট অসুবিধা হয়। এরকম পিঠের ঝোলা ব্যাগ কম বয়সি মেয়েরাও আজকাল খুব ব্যবহার করে।

কয়েক রকমের ঝোলা একটা বিশেষ শ্রেণীর চিহ্ন হিসেবেও বেশ প্রচার পেয়েছে। বিভিন্ন রঙের কাপড় জুড়ে তৈরী বাউল ফকিরদের ঝোলা একেবারে ওদের ট্রেড মার্ক। যদিও ওনাদের অনেকেই ওরকম বাউলের ঝোলা কাঁধে আমেরিকার প্লেনে উঠছেন; সেই প্লেনে ওনাদের ট্রলি ব্যাগ এর ব্যবস্থা স্পনসর বাবুরাই করে দেয়। একটা বেশ বাটিক ছাপ দেওয়া , কাপড়ের ঝোলা, মুখে খুব যত্ন করে রাখা অযত্নের দাড়ি, জিন্সের প্যান্টের উপর ঢোলা পাঞ্জাবী, এই হল আধুনিক কবিদের ট্রেড মার্ক করা পোশাক। এ রাজ্যে যখন বিপ্লবীদের শাসন একেবারে মধ্য গগনে, তখন আবার ওই কবিদের পোশাকে ভাগ বসিয়েছিলেন , সমাজ বদলের বিপ্লবীরা। যদিও শান্তিনিকেতনের সাথে ঐ বিপ্লব বা কাপড়ের ঝোলার কোন সম্পর্ক ছিল না, তবুও কি করে যেন ঐ ঝোলার নাম হয়ে যায়, শান্তিনিকেতনি ঝোলা।

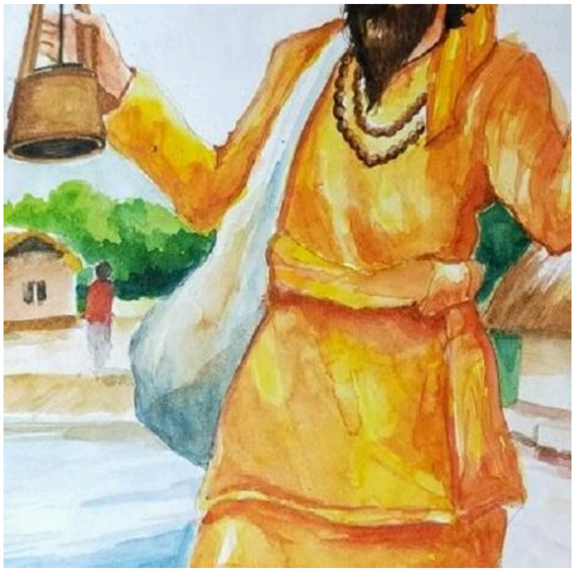
ঝোলা কাঁধে বাউল

আজকাল খুব একটা শোনা না গেলেও , মহিলাদের ঐ হাতের ঝোলার নাম ছিল ভ্যানিটি ব্যাগ। এমন সুচিন্তিত, যুক্তিযুক্ত নাম কেন যে বাতিল হয়ে গেল জানিনা। সত্যিই তো হাতের ঐ ঝোলাটাতে সকল রকম অহংকার ভর্তি করে নিয়েই চলেন সকলে। তা সে বাজারেই যান আর মন্দির আশ্রমেই যান। যে ভোলা বা ভোলানাথের নামে ঝোলা তোলার কথা বলা হয়েছে, তার মত আপন ভোলা , আশুতোষ আর কোন দেবতা নেই। ঐ ভোলানাথ -এর কৃপা লাভের জন্য পার্থিব জীবনের সব কিছু ফেলেই প্রার্থনা করতে হবে। নে ঝোলা না বলে , “ফ্যাল ঝোলা ডাক ভোলা” বললেই ফলদায়ক হবে। সারা জীবন ঐ অহংকার-এর ঝোলা বইতে বইতেই গেল। হাজার তীর্থে ঘুরেও তাই ভোলানাথের দর্শন হয় না।

সিঁড়ি

সিঁড়ি একটা খুবই সাধারন জিনিস। আমরা সকলেই, প্রতিদিনই সিঁড়ি ব্যবহার করছি। সবসময় পায়ের তলায় থাকলেও সিঁড়ির অবদান মাথায় তুলে রাখার মতই। জীবনে যেখানেই হোক আর যখনই হোক, উপরে উঠতে গেলে সিঁড়ি লাগবেই। সিঁড়ির বিকল্প লিফ্ট হলেও, সিঁড়ি কিন্তু রাখতেই হবে। আচ্ছা, এমন বাড়ী কি কেউ দেখেছেন, শুধুই লিফ্ট আছে, সিঁড়ি নেই? আসলে ঐ লিফ্টকেও আগে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়েছে।

বাড়ী ছাড়াও অনেক জায়গায় সিঁড়ি থাকে। সাধারণত বাড়ীর বারান্দা বা নিচের তলাটাও উঠান বা রাস্তা থেকে একটু উঁচু থাকে; দু এক ধাপ সিঁড়ি বেয়েই উঠতে হয়। আমাদের গ্রামের ওদিকে মাঝে মাঝেই বন্যা হয়েযায়। এজন্য বাড়ীগুলি রাস্তা থেকে বেশ উঁচু। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে অন্তত দশ বারো ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। ভেতরের উঠানে ওঠার জন্যও কয়েক ধাপ সিঁড়ি। এখন অনেক বিরল হলেও গ্রামের মাটির বাড়ীও দোতলা এমনকি তিন তলাও হয়। মাটিরই সিঁড়ি হয়। অনেক বাড়ীতেই কাঠের সিঁড়িও হয়। কাঠের সিঁড়ি বেশী দেখা যায় পাহাড় অঞ্চলে। এছাড়া জংগলের বাংলো বা রিসোর্টের সিঁড়িগুলিও কাঠের হয়।

পুকুর ঘাটের সিঁড়িও গ্রামে বহুল ব্যবহার হয়। এই সিঁড়ি পাকা বাঁধানো হতে পারে; কিন্তু বেশীরভাগই কাঠের গুঁড়ি বা বড় বড় পাথরের তৈরী। বর্ষায় যখন পুকুর জলে টৈ টুম্বুর হয়ে যায় এসব কাঠের বা পাথরের সিঁড়ি ডুবে থাকে।

আবার যখন একটু একটু করে জল নামতে থাকে, ঘাটের সিঁড়িও একটা করে জেগে ওঠে। এই সিঁড়ির ধাপে বসে, ছিপ দিয়ে পুঁটিমাছ ধরা, আমাদের ছোটবেলায় একটা ভালো খেলা ছিল। এখনও গ্রামের বাড়ী গেলে, একটু সময় পেলেই পুকুরের ঘাটে ছিপ ফেলতে চলে যাই। কৈশোরের স্মৃতি ফিরিয়ে আনার এক মরিয়া প্রচেষ্টা। এক একবার স্বপ্নের মত দেখতে পাই, একটা ছেলে ঘাটের সিঁড়িতে বসে ছিপ ফেলছে, চল্লিশ বছর বা তারও আগে।

ঘাটের সিঁড়িতে খেলার দারুন সব সুখ স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমাদের গ্রামের পাকা ঘাটের সাথে। হাসপাতাল অর্থাৎ গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঠই ছিল আমাদের খেলার মাঠ। মাঠের পাশেই সিমেন্ট বাঁধানো ঘাট। খুব ছোটবেলায় যখন মাঠের খেলায় জায়গা পেতাম না, ঐ পাকা ঘাটের সিঁড়িতে খেলতাম।

লাল সিমেন্ট বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি একটা একটা করে নেমে গেছে জলে। জল যতোই নামুক, শেষ সিঁড়িটা কখনওই বেরত না। ঐ সিঁড়িতে অনেকে সাবান দিয়ে কাপড় জামা কাচত। আমরা ওখানে ছিপ ফেলে মাছও ধরেছি। পরে অনেক জায়গায় পুরনো রাজবাড়ি বা মন্দিরের ঘাটের সিঁড়ি বড় দিঘী বা নদীতে নেমে গেছে দেখেছি। আমাদের পাকা ঘাটের সিঁড়ি বোধহয় বারো কি চোদ্দটা ছিল। দিনাজপুরের বাহীন রাজবাড়ির পিছনের ঘাটের গোটা পঞ্চাশ সিঁড়ি নদীতে নেমে গেছে।

ঘাটের সিঁড়ি বললেই মনে আসে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট। ঐ ঘাটের সিঁড়িও এক একটা সিনেমা বা উপন্যাসের চরিত্র। মনে আছে, জয়বাবা ফেলুনাথ? আর এক জায়গায় কয়েকশ সিঁড়ি নর্মদা নদীতে নেমেছে, ওংকারেশ্বরে। ঐ সিঁড়িতে বসেই প্রলয় দাসজী কত উপদেশ দিয়েছেন শৈলেনবাবুকে। হরিদ্বারের গঙ্গা আরতি দেখলাম সিঁড়িতে বসে। হৃষীকেশের ত্রিবেণী ঘাটের কাছেও সুন্দর সিঁড়ি নেমেছে গঙ্গায়।

যে কোন তীর্থ বা মন্দিরেই সিঁড়ি ভেঙেই উঠতে হয়। কয়েকমাস আগে ঘুরে এলাম রুদ্রপ্রয়াগ। সঙ্গমের জলের কাছে চলে গেলাম, কয়েকশ সিঁড়ি ভেঙেই। এই সিঁড়ি ভাঙার ভয়েই নামাহল না পাঁচমারীর বিখ্যাত বী ফলসে। আগেরদিন অবশ্য শ খানেক সিঁড়ি ভেঙেই উঠেছিলাম পান্ডব গুহায়। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে বলে জব্বলপুরে চৌষট্টি যোগিনী মন্দির দেখলাম না। উড়িষ্যার উদয়গীরি খন্ডগীরিও ওঠা হয়নি ঐ সিঁড়ির জন্যই। তবে অজন্তা আর ইলোরায় কয়েকশো সিঁড়ি ভাঙতেও কোন অসুবিধা হয়নি। বেড়াতে গিয়ে সবথেকে খাড়া সিঁড়ি ভাঙলাম দৌলতাবাদ দুর্গে। অবশ্য পাহাড়ের মাথায় একেবারে ফাঁকা একটা বাড়ী ছাড়া আর কিছুই নেই।

পুরীর মন্দিরেও অনেক সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। ওপরে যাওয়ার পর আবার বেশ সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে পাতালেশ্বর শিব দেখতে হয়।

কলকাতার পাতাল রেলে তো শুধুই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর নামা। কয়েকটা জায়গায় চলমান সিঁড়ি আছে বটে, তবে বেশীর ভাগই সিমেন্টের সিঁড়ি। দিল্লি আর হায়দরাবাদের মেট্রোতে চড়তে হলে সিঁড়ি দিয়ে অনেক উপরে উঠতে হয়।

গাড়ীর সিঁড়ির কথা যখন এসেই গেল, কোন কোন গাড়ীতে সিঁড়ি ছাড়া চলেনা, দেখা যাক। বাসে ট্রামে দরজায় দু তিন ধাপ সিঁড়ি। আগে যখন দোতলা বাস ছিল তখন দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। এক এক সময় ঐ সিঁড়িতে এমন ভীড় হত যে দম বন্ধ করে দিত। এক্সপ্রেস ট্রেনে ওঠার জন্য দরজায় সিঁড়ি আটকানো থাকে। লোকাল ট্রেনে সব দরজায় সিঁড়ি না থাকলেও আজকাল অনেক দরজার নিচে সিঁড়ি থাকছে। বাসের ছাদে ওঠার জন্য পিছনে সিঁড়ি থাকে। কিছু কিছু লোক প্রচন্ড ভারী বোঝা মাথায় করে ঐ সিঁড়ি দিয়ে বাসের ছাদে উঠে যায়।

লরীর পেছনে একটা শক্ত কাঠের সিঁড়ি লাগিয়ে মালপত্র তুলতে দেখেছি। নৌকা বা লঞ্চে ওঠার জন্যও ঐ রকম একটা পাটাতন সিঁড়ি খুব ব্যবহার হয়। চুচুড়ার লঞ্চে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেযেতে হয়। বড় বড় লঞ্চ বা জাহাজের বিভিন্ন তলায় ওঠা নামার জন্য সাধারণত কাঠের সিঁড়ি। জাহাজের মাস্তুল আর কারখানার চিমনির গায়ে লোহার সিঁড়ি তৈরী করা থাকে।

এরোপ্লেনে ওঠার জন্যও সিঁড়ি ব্যবহার করা হয়। তবে কোলকাতার মত বড় বিমান বন্দরে এখন সিঁড়ি ছাড়াও ওঠার ব্যবস্থা আছে। রেল ষ্টেষনে সিঁড়ি থাকেই। মাথার ওপর দিয়ে লাইন পেরনোর জন্য ফ্লাইওভারের সিঁড়ি। আগে সবই কাঠের ছিল; এখন নতুন সব সিমেন্টের হচ্ছে। ছোটবেলায় কাঠের ফ্লাইওভারে উঠতে খুব ভয় পেতাম। সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে নিচে তাকালে মাথা ঘুরে যেত। এখন অনেক ষ্টেশনেই সাবওয়ে হচ্ছে। আমি দেখেছি ওভারব্রীজের থেকে সাবওয়ে বেশী সুবিধাজনক লাগে।

গাড়ী তো হল ; ঘোড়ায় চড়ার জন্যও কি সিঁড়ি লাগে? দেখিনি কোথাও। তবে হাতির পিঠে চড়ার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে জলদাপাড়া অভয়ারন্যে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা প্লাটফর্মে পৌছে হাতির পিঠে উঠেছিলাম। কুলিক পক্ষী নিবাসে সিঁড়ি দিয়ে অনেক উপরে উঠে সিমেন্টের টাওয়ার থেকে পাখি দেখা যায়।

সিঁড়ির রকমফের নিয়ে কটা কথা বলি। সাধারনভাবে পাকা বাড়ীর একতলা থেকে আরেক তলায় যাওয়ার জন্য যে সিমেন্টের সিঁড়ি হয়, সেগুলির অর্ধেক একমুখি নেমে একটু চওড়া জায়গা বা ল্যান্ডিং; তারপর আরেক মুখে বাকিটা ওঠার। অনেক বাড়ীতে একটু গোলকরে ঘুরিয়েও সিমেন্টের সিঁড়ি হয়। নিজের বাড়ী বেশ খরচ করে ডিজাইনার দিয়ে প্লান করে যারা বানায়, তাদের সিঁড়িই বাহারি হয়। ঐ সিনেমা বা সিরিয়ালে যেমন হয়। প্যাচানো লোহার সিঁড়ি দু একটা এখনও দেখা যায়। কলকাতার শহিদ মিনার আর দিল্লির কুতব মিনারের ভেতরে সিমেন্টের প্যাঁচানো সিঁড়ি আছে শুনেছি, ঢোকা হয়নি কোনদিন।

সিঁড়ি বললে কোন জায়গায় নির্দিষ্টভাবে আটকানো ওঠা নামার ব্যবস্থাই বোঝায়। আর সিঁড়ি যদি সরিয়ে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করার মত হয় তখন তাকে মই বলে। মই আমরা ছোটবেলায় বাঁশের তৈরীই দেখতাম। এখন কাঠের, লোহার, আলুমিনিয়ামেরও দেখা যায়।

বাস্তবের সিঁড়ি ছাড়াও কয়েকরকম সিঁড়ির কথা শোনাযায়। রাবন রাজা নাকি স্বর্গের সিঁড়ি বানাতে শুরু করেছিলেন। কবিরাতো স্বপনের সিঁড়ির কথা লিখেই গেছেন। স্কুলের অংকের ক্লাশে সিঁড়িভাঙা অংক আমরা করেছি। আমি অনেকদিন আগে একটি মুষ্টিযোগ শিখেছিলাম ; বিছানায় শুয়ে ঘুম না এলে, চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকুন, একটা লম্বা সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নামছেন। একটা একটা সিঁড়িতে পা দিয়ে দিয়ে নামছেন, সিঁড়ি শেষ হচ্ছে না। এক সময় ঘুমিয়ে পড়বেন।

একটা তলা থেকে আরেক তলায় যাওয়ার সোজা একটা সিঁড়িতে উঠতে কষ্ট বেশী হয়। মাঝে একটা ল্যান্ডিং থাকলে কষ্ট যেন একটু কম হয়।

চলমান সিঁড়ির মত আর একটা যান্ত্রিক সিঁড়ি হয়, দমকল দপ্তরের হাইড্রোলিক সিঁড়ি। অনেক উঁচুতে দ্রুত ওঠাযায়।

লোহার প্যাচানো সিঁড়ি ছাড়াও সোজা লোহার সিঁড়িও অনেক জায়গায় দেখেছি। আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ছাদে ওঠার লোহার সিঁড়ি হয়েছে অনেক পরে। আমাদের ছোটবেলায় কয়েকজন জানালা ইত্যাদিতে পা দিয়ে ঐ ছাদে উঠতে পারতো,তখন ওদের বীর ভাবতাম। অমর কন্টকের দুধধারায় পৌছতে শেষে এক জায়গায় লোহার সিঁড়ি হয়েছে এখন; আগে লোকে কি করে পৌছত জানিনা। দমদমে আমার ফ্লাটের লাগোয়া লোহার সিঁড়ি বিখ্যাত। পাড়া থেকে রেল লাইনে ওঠার পঁচিশ তিরিশ ধাপ সিঁড়ির মাঝের আট ধাপ লোহার,তাতেই নাম, লোহার সিঁড়ি।

সিঁড়িই হোক আর মই হোক, ওঠাটাই সহজ, আর সবাই উঠতেই চায়। যে কোন সিঁড়িতে নামার সময়ই বিপদগুলি হয় ; একটু অসাবধান হলেই পড়ে হাড় ভাঙ্গার সম্ভাবনা। লুডো খেলায় মই আর সাপ দুইই থাকে, তবু কেন সাপ লুডোই বলে জানিনা। বেচারা সাপগুলোর সম্বন্ধে শিশু বয়েস থেকেই বাজে ধারনা তৈরী হয়। আসলে টেনে নামানোর জন্য সাপেদের কোন অবদানই নেই। মানুষই মানুষকে টেনে নামায়। আর গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া, সে তো মানুষের একচেটিয়া অধিকার।

https://www.amazon.in/dp/8188036501/_encoding=UTF8?coliid=IC3KGMXZ3T9OM&colid=35GN1EMW6HCU7&psc=0

সিঁড়ি ২

কিছুদিন ধরে আমার পুরোনো লেখাগুলোকে সাজিয়ে, কিছু ছবি যোগ করে পিডিএফ আকারে একটা ই-বুক তৈরীর কাজ শুরু করেছি। এই কাজ করতে গিয়ে অনেক পুরোনো লেখা আবার পড়ছি। বেশ কিছু ছাপার ভুল (Typo mistake) ঠিক করাও গেল। কয়েকটা লেখাতে এর মধ্যে বেশ কিছু নতুন খবর যোগ করার মত হয়েছে। সিঁড়ি নিয়ে প্রথম লেখাটা শুধুই পিডিএফ পাচ্ছি; তাই নতুন তথ্য আর ছবি যোগ করার জন্য দ্বিতীয় আর একটা অংশ লিখতে হচ্ছে।

আপনারা অনেকেই জানেন, ২০২৪ সালের ৩১ শে মার্চ সরকারী চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পর আমি বেশ কিছু জায়গায় বেড়াতে যেতে পেরেছি। সেই সব জায়গায় অনেক কটি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে হয়েছে। সেগুলির ছবি দিলেই হবে না; তাদের সম্বন্ধে কিছু কথা লিখতেও হবে।

সবথেকে বেশি সিঁড়ি বেয়ে নামা ওঠা করতে হল, রাঁচির কাছাকাছি জলপ্রপাতগুলি দেখার জন্য। প্রথম দিনই তিনটি জলপ্রপাত দেখতে দেড় হাজার এর বেশী সিঁড়ি বেয়ে নামা ওঠা করতে হল। আমাদের প্রতিদিন সকালে হাঁটার অভ্যেস আছে তাই সিঁড়ি ওঠা নামা করতে বেশী কষ্ট হয়নি। হুঁড্রু জলপ্রপাত দেখতে নেমে আধ ঘন্টার মধ্যে উঠে আসা দেখে আমাদের গাড়ীর ড্রাইভার বেশ অবাক হয়েছিল। সে ভেবেছিল, এই বয়স্ক মানুষ দুজন বোধহয় নিচে পর্যন্ত নামেইনি। কিন্তু আসল মজা টের পেলাম পরদিন সকালে। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে দেখলাম পায়ের গোছে দারুণ ব্যথা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়ীতে উঠে বাকি তিনটি জলপ্রপাত দেখতে চললাম। সেই পায়ের ব্যথা দিন চারেক থাকল।

সীতা ফলসের সিঁড়ি

রাঁচি বেড়াতে যাওয়ার আগে আমরা দুটি রাজ্যের পাহাড়ি এলাকায় ঘুরে এসেছি। এপ্রিলে কালিম্পং আর দার্জিলিং জেলার কয়েকটা হোমস্টেতে ঘুরে এলাম। পাহাড়ে ঘুরতে গেলে কিছু উঁচু নিচু জায়গায় ওঠা নামা করতেই হয়। কিন্তু এই পাহাড়ী এলাকায় ওঠা নামার জন্য সেরকম সিঁড়ি বেয়ে উঠতে নামতে হয় না। রাস্তাগুলি পাকদন্ডি হয়ে ওঠে নামে। খুব কম জায়গায়ই এই পাকদণ্ডী রাস্তার ঘোরানো পথ সংক্ষেপ করার জন্য পাহাড়ের গায়ে কিছু সিঁড়ি দিয়ে ওঠার ব্যবস্থা আছে; আমরা সেরকম কিছু সিঁড়িতে উঠেছি।

জুন মাসে গেলাম নৈনিতালের দিকে। ওদিকেও পাহাড়ী এলাকা হলেও সেরকম সিঁড়ি বেয়ে উঠতে নামতে হয়নি। প্রথমে আমরা ছিলাম ভিমতালে। ভিমতাল হ্রদের পাড়ে বেশ কিছুটা উপরে আমাদের হোটেল হলেও, গাড়ী হোটেল পর্যন্ত উঠে গেল। পরদিন সকালে হাঁটতে বেড়িয়ে কয়েক জায়গায় সিঁড়ি ভাঙ্গলাম। রানিক্ষেতেও সেরকম সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার মত একটিই জায়গা পেয়েছি। দূর্গা -কালী মন্দিরের চত্বরে ওঠার জন্য একটা ছোট্ট টিলার উপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। কৌশানিতে পাহাড়ী এলাকা হলেও একবারই সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। গান্ধী অনাসক্তি আশ্রমে পাকদন্ডী দিয়েই ওঠা যায়। আমি গাড়ী ছাড়াই ড্রাইভারের সাথে হেঁটে ঘুরে আসতে গেলাম। গোটা পঁচিশ -তিরিশ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারলে অনেকটা রাস্তা কম হয়, তাই ঐ জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। বিনসারে কোথাও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়নি। আমাদের হোটেলটির সামনেই ধাপে ধাপে পাহাড় নেমে গেছে অনেক নিচে। ধাপে ধাপে অনেক সিঁড়ি নেমে গেছে। দুই একজন স্থানীয় লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে দেখেছি; আমাদের ঐ সিঁড়ি দিয়ে নামার কোন দরকার ছিল না। বিনসারের দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে চিতোই গোলু দেবতার মন্দিরে ঢুকে পূজা দেওয়া হয়েছে। ঐ মন্দিরে ওঠার জন্য সামান্য গোটা পঞ্চাশেক সিঁড়ি ছিল। পরদিন আলমোড়ার কাসার দেবী মন্দিরের দিকে যাওয়ার সময় আর একটি গোলু দেবতার মন্দিরে উঠেছিলাম, শ'খানেক সিঁড়ি বেয়ে। এখানে কিন্তু যাত্রি প্রায় নেই। কাসার দেবী মন্দিরের কাছে যেতে বড় রাস্তা থেকে একটু পাকদণ্ডি গাড়ীতে উঠে তারপর তিন -চার শ' সিঁড়ি উঠতে হল। দেবীর মন্দির ছাড়িয়ে আবার কিছু সিঁড়ি নেমে আবার পঞ্চাশ ষাট সিঁড়ি উঠতে হয় শিব মন্দির চত্বরে ওঠার জন্য। এই শিব মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় বাম দিকে খুবই নগণ্য একটি বোর্ড দেখে বুঝলাম, সিঁড়ি থেকে পাশের দিকে সরে পাহাড়ের গা বেয়ে একটা অতি নগণ্য পায়ে চলা রাস্তা ধরে যেতে হবে, বাঙালির প্রাণের মানুষ স্বামী বিবেকানন্দ-এর ধ্যান গুহায়। আমরা কিন্তু ঐ গুহা দেখতেই ওখানে গেছলাম। পাহাড়ের উপরে সে সময় প্রায় শ'খানেক লোক থাকলেও আমাদের আগে দুজন আর আমরা দুজন, মোট চারজন যাত্রি ঐ গুহা দেখতে পৌঁছেছিলাম। কথা হচ্ছে সিঁড়ি নিয়ে। আমরা নিচে গাড়ীর কাছে নামার সময় দেখেছি, কিছুটা নামার পর একটা রাস্তা বাম দিকে নেমে গেছে, আমাদের হোটেলের দিকে। বিকেলে আবার ঐ রাস্তা ধরে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছিলাম। এবার কিন্তু কয়েক মিনিট শিব মন্দির চত্বরে থেকেই নেমে আসতে হল; কাল বৈশাখীর মত মেঘ করে বৃষ্টি আসছে দেখে। সিঁড়ি দিয়ে বেশ দ্রুত পা চালিয়ে, শেষ একশ মিটার রাস্তা প্রায় দৌড়ে হোটেলে ঢুকে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ার সাথে সাথেই জোরে বৃষ্টি নামল। পাহাড়ী এলাকা হলেও ওদিকে কোথাও একটুও ঠাণ্ডা ছিল না। শুধু এই একটি মাত্র রাত্রে গায়ে কম্বল দিতে হয়েছিল। পরদিনই সকালে আমরা আলমোড়া শহর দেখে নৈনিতালের দিকে রওয়ানা হলাম। আলমোড়া বেশ বড় শহর। শহরে একদিক দিয়ে ঢুকে আর এক দিক থেকে বেরোতে হয়। বাঙালি এই বাণিজ্য শহরে যায়, স্বামী বিবেকানন্দ-এর পূণ্য স্মৃতি বিজড়িত একটি বাড়ী দেখতে। আমাদের ড্রাইভার আবার সেই বাড়িটি কোথায় জানে না। বিবেকানন্দ নামটি শুনেই আমাদের নিয়ে গেল , রামকৃষ্ণ মিশনের রামকৃষ্ণ কুটিরে। রাস্তা থেকে দশ পনের সিঁড়ি নেমে স্বামীজীর বড় স্ট্যাচুর কাছে পৌঁছনো গেল। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয় মিশনের অন্য বাড়িগুলি দেখতে।

আমরা বাজারের মধ্যে একটি বিশেষ বাড়ীতে যেতে চাই বলায় ড্রাইভার আমাদের একটি জায়গায় নামতে বলল। ঐ জায়গা থেকে সরু গলি উঠে গেছে, সিঁড়ির ধাপে ধাপে। গলির দুই পাশে অসংখ্য দোকানপাট। প্রায় একশ সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাজারের রাস্তায় পৌঁছলাম। লোকজনকে জিজ্ঞেশ করতে করতে এগিয়ে গেলাম, লালা বদ্রিদাসজির সেই বিখ্যাত বাড়ীর দিকে। এই বাড়ীতে স্বামীজী কয়েকদিন ছিলেন। সেই পবিত্র বাড়িটিতে একটি ছোট্ট নীল রঙের বোর্ড দেখে নিশ্চিত হলাম, ওটিই আমাদের পবিত্র তীর্থস্থানটি।

আলমোড়া বাজারে লালাজীর বাড়ী

বেশ পুরোনো বাড়ী। নীচের তলায় দোকানপাট। ওপরে ওঠার সিঁড়ি খুঁজে না পেয়ে নীচের একটি দোকানে জানতে চাইলাম। ওনারা বললেন, লালাজীর বাড়ীতে আজ কেউ নেই; গতকালই ওনারা বাইরে কোথাও গিয়েছেন। আবারও প্রমাণ পাওয়া গেল, তীর্থ দর্শন সবার ভাগ্যে জোটে না। ঐ বাড়ী থেকে কুড়ি পঁচিশ ফুট এগিয়ে বাম দিকে ফুটপাতের মত একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে স্বামীজী বক্তৃতা করেছিলেন। এই জায়গাটা রাস্তা থেকে তিন চার ধাপ সিঁড়ি উপরে। ওখানেও একটু উপরে ছোট্ট একটি নীল রঙের বোর্ড আছে। সেই বিখ্যাত জায়গায় দাঁড়িয়ে একটি ছবি তুলে, ফেরার রাস্তা ধরলাম।

বাজার তখনও ঠিক মত খোলেনি। আবার সেই গলি দিয়ে একশ মত সিঁড়ি বেয়ে নামতে হল যেখানে আমরা গাড়ী থেকে নেমেছিলাম সেই রাস্তায়। ড্রাইভার বলে দিয়েছিল, আরও কিছুটা নিচের রাস্তায় থাকবে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এর কাছে। সরু গলি দিয়ে আরও প্রায় পঁচিশ সিঁড়ি নেমে সেই নিচের রাস্তায় গিয়ে গাড়ী পেলাম। সোজা চললাম নৈনিতালের দিকে। নৈনিতাল শহরে পৌঁছনোর আট- দশ কিমি আগে গাড়ী আটকে দিল। পুলিশ জানাল , নৈনিতালে এত বেশি গাড়ী ঢুকেছে যে, আর গাড়ী ঢোকার জায়গা নেই। বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। পিছন দিকে প্রায় চার পাঁচ কিমি ফিরে এসে, ভাওয়ালি শহরের বাইরে একটা হোটেলে খেয়ে আবার নৈনিতালের দিকে এগিয়ে গেলাম। এবার আর রাস্তা বন্ধ নেই। নৈনিতাল শহরে ঢোকার আগে থেকে প্রচণ্ড জ্যাম জটে গাড়ী শম্বুক গতিতে চলল। লেকের পাড়ে, নীচের রাস্তা দিয়ে গাড়ী এগিয়ে লেকের মাঝামাঝি জায়গায় এলে, আমরা আমাদের দুটি ট্রলী ব্যাগ নিয়ে ঝটপট নেমে গেলাম। ড্রাইভার আগেই বলে দিয়েছিল। ঘুরে উপরের রাস্তায় আসতে হলে, আরও এক ঘন্টা লেগে যেত। নীচের রাস্তা থেকে উপরের রাস্তায় এলাম, ছয় আট ধাপ লোহার সিঁড়ি দিয়ে। তারপর রাস্তা পেরিয়ে , পাহাড়ী খাড়া রাস্তা দিয়ে অনেকটা উঠে আমাদের হোটেল পেলাম। আমাদের ঘর দেওয়া হলো পাঁচ তলায়। এদের লিফ্ট নেই, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে হয়। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকেই লেকের জলে ঘুরে বেড়ানো নৌকা দেখা যায়। যতবারই লেকের পাড়ে ঘুরতে যাচ্ছি, পাঁচ তলা সিঁড়ি বেয়ে নামতে উঠতে হচ্ছে। পরদিন সকালে বেরোলাম, নৈনিতালের আসেপাশের দর্শণীয় স্থানগুলি দেখতে। পাহাড়ী এলাকায় এসবের জন্য ওঠা নামা করতেই হয়। সব জায়গায়ই সিঁড়ি বা পাহাড়ের ধাপ। গাড়ীর জ্যামে সামান্য এক দেড় কিমি যেতেই প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেল। এদিকেও একটা জলপ্রপাত দেখতে সব পর্যটক হাজির হয়। এখানেও দেড়শ দুশো সিঁড়ি। কিন্তু অন্য সব জলপ্রপাতের ঠিক উল্টো। এখানে আগে রাস্তা থেকে উপরে উঠতে হয়, পরে রাস্তার কাছে নেমে আসা।

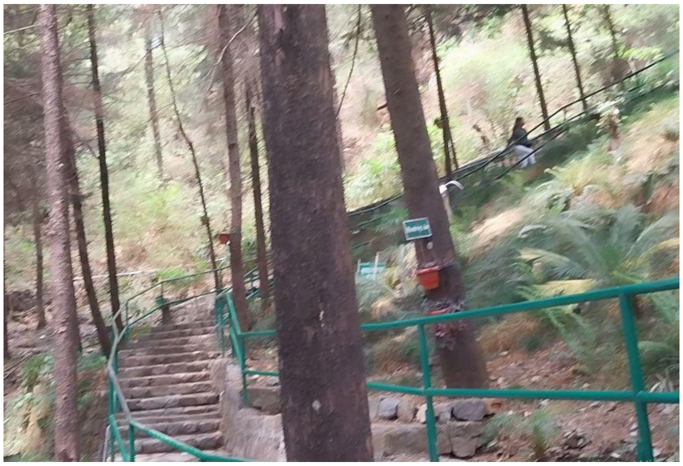
জলপ্রপাত দেখতে ওঠার সিঁড়ি

নৈনিতাল বোটানিক্যাল গার্ডেনেও পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে উঠতে হয়। অনেক সিঁড়ি। জ্যাম জটে এত দেরী হল যে আমরা অন্য দুই এক জায়গায় না ঢুকেই হোটেলে ফিরে এলাম। লেকে বোটিং এর জন্যও প্রায় কুড়িটি সিঁড়ি নেমে যেতে হয় রাস্তা থেকে।

রাঁচির জলপ্রপাত দেখতে কয়েক হাজার সিঁড়ি ওঠা নামা করে আমাদের মনোবল বেড়ে গেল। কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে, শ্রীনগরের শঙ্করাচার্যের মন্দিরে উঠতে হয় প্রায় শ'চারেক সিঁড়ি বেয়ে। সুন্দর পাথর বাঁধানো সিঁড়ি হলেও সিঁড়িগুলি বেশ উচু উঁচু। প্রায় সবাই উপরে উঠতে হাঁপিয়ে যাচ্ছিল। আমরাও হাঁপাতে হাঁপাতে উঠলাম। ওপরের চত্বর থেকেও প্রায় পঁচিশ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে শিব লিঙ্গের কাছে যেতে হল। শ্রীনগরের বিখ্যাত বাগানগুলি সবই পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে। এক এক ধাপে দশ বারো ধাপ করে সিঁড়ি।

শঙ্করাচার্যের মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি

আপনারা আমার ভ্রমণের লেখাগুলি যদি পড়েছেন, তাহলে জানেন যে, নভেম্বর মাসের শেষের দিকে এক রাত্রের জন্য সবুজ দ্বীপে ঘুরে এলাম। ওখনকার সব বাড়িগুলি, আপিস, কটেজ, রেস্টুরেন্ট সবই মাঠের থেকে দশ ফুট মত উপরে, থামের উপরে । সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। এছাড়া ওখানে একটা চার পাঁচ তলা বাড়ির মত উচু ওয়াচ টাওয়ার আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হল, সেটাই দস্তুর। এরকম ওয়াচ টাওয়ারে উঠেছি, রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষী নিবাসে আর জয়ন্তীর জঙ্গলে সাফারী করতে গিয়ে। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের ভেতরেও কয়েকটা ওয়াচ টাওয়ার আছে। এগুলি তিন তলার মত উঁচু হবে। যাত্রীরা হৈ হৈ করে উপরে উঠে মিনিট পাঁচেক থেকে নেমে আসে। ওখানকার কর্মচারীদের কাছে শুনেছি, বিদেশী পর্যটকেরা ঐ টাওয়ারে উঠে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে। তারা বাঘ দেখতেও পায়।

কুলিকের টাওয়ারে ( ১৯৯৪)

সবুজ দ্বীপের কটেজ

ইন্দোরের দিকে বেড়াতে গিয়েও অনেক জায়গায়ই সিঁড়ি পেয়েছি। এই দিকের বেড়ানোটিকে আমি ' শৈব তীর্থে ভ্রমণ ' বলেছি। বেশ কয়েকটি শিব মন্দিরে ঢুকে দেখে এলাম। মন্দিরগুলিতে কিছু সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা করতেই হয়। প্রথম অংশে বিশেষ করে উল্লেখ করেছি ওমকারেশ্বর মন্দিরের থেকে নর্মদা নদীর দিকে নেমে যাওয়া ঘাটের সিঁড়ির কথা। ওখানে গিয়ে দেখলাম, সেরকম উল্লেখ যোগ্য কোন সিঁড়ি নেই। মন্দির থেকে নর্মদা নদী পর্যন্ত যেতে কিছু পাথুরে ধাপ আছে; আমরা ওখানে নামার চেষ্টা করিনি।

ওমকারেশ্বর মন্দিরের নিচে নর্মদা

উল্টো দিকের অমলেশ্বর মন্দিরের চত্বরে ওঠার জন্য নর্মদা নদী থেকে একশ মত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হল। দ্বিতীয় দিন ভোরে উঠে আমরা বাজারের রাস্তা দিয়ে অমলেশ্বর মন্দিরে গেছলাম।

অমলেশ্বর মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি

এরপর ব্রীজ পেরিয়ে দ্বীপ পরিক্রমার রাস্তা ধরেছিলাম। ব্রীজ থেকে সামান্য দশ পনের সিঁড়ি নেমে, পাথর বাঁধানো পরিক্রমার রাস্তা। দ্বীপের দক্ষিণ দিকে সেরকম সিঁড়ি নেই। কিন্তু পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গমে পৌঁছতে, পরিক্রমার রাস্তা থেকে কুড়ি পঁচিশ ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। দ্বীপের উত্তর দিক দিয়ে যে পরিক্রমার রাস্তা চলেছে, সেই পথে অনেক জায়গায়ই সিঁড়ি আছে; কোথাও দশ ধাপ, কোথাও একশ ধাপ।

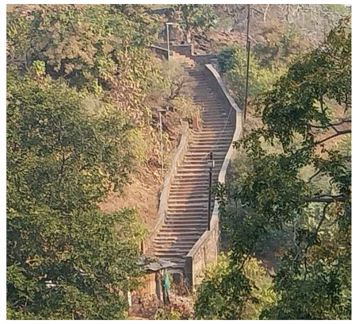

পরিক্রমা পথের সিঁড়ি

নর্মদার বাঁধানো ঘাট আর প্রশস্ত সিঁড়ি আছে মহেশ্বর-এ। মান্ডু দুর্গের জাহাজ মহলের উপরে উঠতে একটি খাড়া সিঁড়ি সোজা উঠে গেছে। প্রায় পঞ্চাশ ধাপ সিঁড়ি।

মহেশ্বরে নর্মদা ঘাট

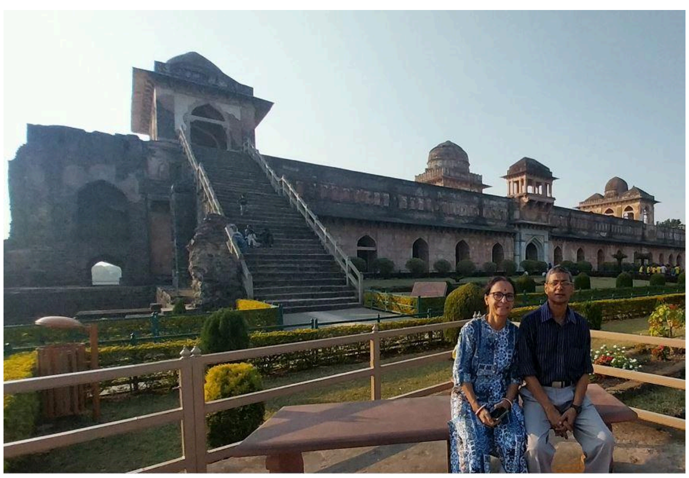

আমাদের পিছনে জাহাজ মহল

ফেরার পথে আমরা প্রয়াগ সঙ্গমের কুম্ভ মেলার প্রস্তুতি দেখে এলাম; নৌকা করে সঙ্গমে গিয়ে একটা ডুবও দিয়েছে। প্রয়াগ রাজ শহরে গোটা দুই তিন মন্দির - আশ্রম দেখলেও সেরকম সিঁড়ি কোথাও পাইনি। সঙ্গমে যাওয়ার নৌকা একটা চড়ায় নিয়ে যায়। ঐ চড়ায় পান্ডাদের মাচা বানিয়ে

শহিদ আজাদের পায়ের কাছে সিঁড়িতে আমি

প্রয়াগের হনুমান মন্দিরের সিঁড়ি

রেখেছে; নৌকা সোজা গিয়ে সেই মাচায় তোলে। এসব মেলা ইত্যাদিতে সব জায়গায়ই কমিশনের ব্যাপার থাকে, বোঝাই যায়। ঐ মাচা থেকে জলে নামার জন্য তিন চার ধাপ কাঠের সিঁড়ি করা ছিল। ঐটুকু না করলে, তীর্থ যাত্রীদের কাছে টাকা নেবে কি করে!

সঙ্গমের মাচায় পান্ডা

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি দুদিনের জন্য মেদিনীপুরের গ্রামে ঘুরে এলাম। বন্ধুবর যোগেশ এর বাড়ীর ছাদে ওঠার জন্য লোহার সিঁড়ি করেছে। এই " লোহার সিঁড়ি" শব্দ বন্ধে দমদমে একটি নির্দিষ্ট জয়গাকেই বোঝায়; সে কথা পরে বলছি। আমার গ্রামের বাড়ীর দোতলায় উঠে স্নান করতে হল, গরম জলের ব্যবস্থা দোতলায় বলেই। কিন্তু আমাদের বৌমা মার্বেল বাঁধানো সিঁড়ি গুলিকে এমন ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে যে, নামার সময় পা টিপে টিপে নামতে হল। ভেজা পায়ে নামতে হলে একটু অসাবধান হলেই পতন নিশ্চিত। নিজের বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে চলল আমার বন্ধু ডাক্তার পাঠক। একজন মানুষ তাঁর নিজের বাড়ীর দোতলায় উঠে যাচ্ছে, এটা আবার খবর কেন!!!? আসলে ওকে বছর সাত-আট আগে

এতই জুবুথুবু দেখেছিলাম যে, পয়ষট্টি বছর বয়সে নিজেই টকটক করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারছে, এটা দেখেই মন খুশিতে ভরে গেল। অবশ্য গতকালই আমার প্রতিবেশী , অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী ঘোষবাবুকে ছাদে উঠে যেতে দেখলাম, সিঁড়ি দিয়ে। আশির উপর বয়স। দুটি হাঁটুই পাল্টানো হয়েছে বছর দেড়েক হল। ওনাদের দেখলে মনে বল পাওয়া যায়। আমাদের স্কুলের গ্রামে আছে বিখ্যাত তালন্দমাতা শীতলা মন্দির। রাস্তা থেকে গোটা তিনেক গোল গোল সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের চাথালে উঠতে হয়। ছোট বেলায় ঐ চাথালে ওঠার সাহস হত না। এবার দেখলাম, আমার ভাগ্নে ভাগ্নী চাতালে তো উঠলোই , একেবারে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে মাকে প্রণাম করলো।

হ্যাঁ, দমদমের লোহার সিঁড়ি। আমি এখন যে আবাসনে থাকি তার পাশ দিয়েই একটা সিঁড়ি নেমে গেছে; রেল লাইন থেকে পাড়ার মধ্যে যাওয়ার জন্য। ওর বেশীর ভাগই সিমেন্টের। মাঝের গোটা পাঁচ ছয় সিঁড়ি লোহার। কি করে যেন ঐ জন্যই এই জায়গাটা " লোহার সিঁড়ি" নামে বিখ্যাত হয়ে গেছে। দমদমের পঁচানব্বই শতাংশ লোককে জিজ্ঞেশ করলে, এক বারেই বলে দেবে, " লোহার সিঁড়ি" কোথায়। একবার আসবেন নাকি দেখতে !!!?

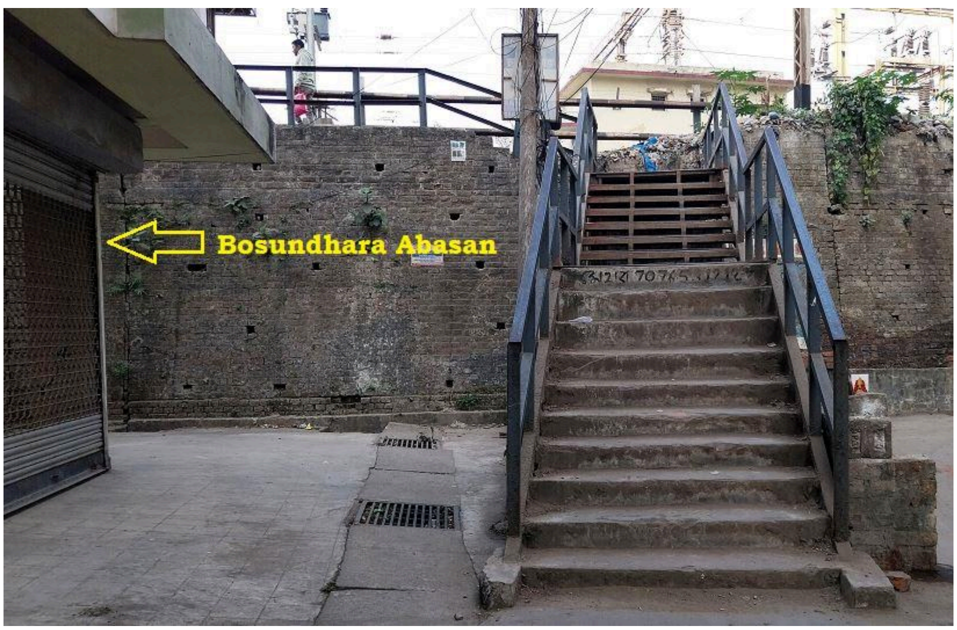

দমদমের লোহার সিঁড়ি

অকিঞ্চিৎকর একটা ফল

একটা অতি সাধারন গাছ ; বলা ভাল, গাছটির অকিঞ্চিৎকর কটা ফল কেমন করে আমার চোখ খুলে দিল ; আজ সেই গল্পই শোনাই। কদিন থেকেই সকালে হাঁটতে বেরিয়ে , দমদমের পাড়ার ভেতরের রাস্তায় , একটা গাছের তলায় বেশ কয়েকটা ফল পড়ে থাকতে দেখছিলাম। ফলগুলি একেবারেই অবহেলায় পড়ে থাকছে; গাড়ীর চাকায় , পায়ের তলায় থেঁতলে যাচ্ছে। একদিন গাছটার দিকে মুখ তুলে দেখলাম, প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু, সবুজ পাতায় ভর্তি। গাছে থোকায় থোকায় হলদে সবুজ ফল ধরে আছে। ঐ ফলই গাছের তলায় ঝরে পড়ছে। হাঁটতে হাঁটতেই ফলগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দিন দুই আগে; কেমন যেন চেনা চেনা লাগল । মনে পড়ল, দু' হাজার তিন সালে , মুম্বইয়ের এলিফ্যান্টা দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে, এরকমই ফল খেয়েছি। পাহাড়ের উপর, দুজন আদিবাসি মহিলা বসে বিক্রী করছিল । বোধহয় পাঁচ টাকায় দশ পনেরোটা ফল , পাতার ঠোঙায় করে দিয়েছিল । নুনও একটু দিয়েছিল। আমাদের গ্রামের টক কুলের মত কিছুটা খেতে। মাঝে আঠারো বছরে আর কোথাও ঐ ফল দেখিনি।

রামরাজাতলা রেল ষ্টেশনের এলাকায় একটা বড় গাছে , অনেকটা ঐ রকম ফল প্রচুর ফলে আছে দেখেছিলাম, ট্রেনে বসে। নেমে, কাছের থেকে দেখার মত সুযোগ সময় হয়নি। এখন বুঝতে পারছি, ওটা অন্য কোন গাছ ছিল। ঐ গাছটার পাতা সেগুন বা শাল পাতার মত দেখতে। আর , গতকাল সকালে যে গাছের ফল কুড়িয়ে এনে জানতে পারলাম, এই সেই এলিফ্যান্টার ফল, সেই গাছটার পাতা খুব ছোট ছোট, শিরীষ পাতার মত দেখতে।

দমদমের যে ফলের কথা বলছি, সেগুলি অনেকটাই হলুদ। বুঝতে পারছি, এগুলি পাকা ফল। মুম্বইয়ে, অক্টোবর মাসে সেই যে ফল খেয়েছিলাম, সেগুলি একটু ছোট আর অনেকটা সবুজ রং ছিল। ওগুলি বোধহয় তখনও কাঁচা ছিল। দমদমের ফলগুলি যেভাবে অবহেলায় পড়ে আছে, তাতে বোঝাই যায় যে, কেউ ঐ গাছের ফল কুড়িয়ে খায় না। আমিও নিশ্চিত না হয়ে মুখে দিইনি। ফলগুলি সম্বন্ধে জানতে চেয়ে, তিনটি ফলের ছবি তুলে, ফেসবুকে আর হোয়াটস অ্যাপ -এর দু'শ ছাপান্ন জনকে পাঠালাম। কয়েক মিনিটেই কয়েকটা উত্তর পেলাম। সারাদিনে প্রায় দশ রকম নাম জানলাম।

প্রথম জানালেন, আমার কলেজের দাদা। উনি শুধু লিখলেন, "হরবরোই"। বাংলাদেশে কুলকে বরোই বলে, জানতাম। কিন্তু এই নামটা আগে শুনিনি। বন্ধুবর ডাক্তার শীল জানালেন, নামটা মনে নেই, কিন্তু মাদুরাইতে থাকার সময় খেয়েছেন, অনেকটা আমলকীর মত টক। বুঝলাম, নাম যাই হোক, ফলটা খাওয়া যায়। আর, এটাই আমার সেই এলিফ্যান্টা দ্বীপের ফল। এরপর সারাদিনে গোটা পশ্চিম বাংলা থেকেই নানা জনে জানিয়েছেন, এই ফলের গাছ দেখেছেন , বা ফল খেয়েছেন। অনেকেই জানালেন, এ ফল তারা অনেকবার খেয়েছেন। কারো কারো বাড়িতে দু চার বছর আগেও গাছ ছিল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা থেকে তিন- চারজন প্রায় একই রকম নাম জানালেন। শীলাকুল বা সিল্লাকুল, শীল আমড়াও জানালেন একজন। এছাড়া "নোর" নামটাও কয়েকজন জানালেন। কেউ কেউ লিখলেন , " রয়াল" ফল ; নোরাইলও বলেছেন কেউ।

জানতে চাওয়ার মিনিট কুড়ির মধ্যে , পুর্ব মেদিনীপুরের পট্টনায়কবাবু একটা ছবি পাঠালেন। এই ফলের নাম সেখানে লেখা " অড়বড়ই"। সম্ভবত ওটা কোন আয়ুর্বেদের বই-এর পাতা থেকে নেওয়া ছবি। অড়বড়ই বা হরবরোই যে একই ফলের অঞ্চল ভেদে ভিন্ন উচ্চারণ, বোঝাই যায়। পট্টনায়াকবাবুর পাঠানো তথ্য অনুযায়ী, ঐ ফলের অনেক খাদ্য গুন আছে। প্রোটিন, ভিটামিন, নানান রকমের মিনারেল ইত্যাদির তালিকা দেখলাম। ইংরেজী নামটাও জানা গেল , " Star Gooseberry"! অর্থাৎ এও একরকম আমলকী। dayalbm@gmail.com

খাদ্য গুন যাই থাক, মুখ রোচক টোপা কুলের মতোও যে এ ফল আমাদের দেশী ফলের তালিকায় নেই, তাতো দেখতেই পাচ্ছি। আমার বন্ধু তালিকা বিশাল। যতো জন এ ফলটা খেয়েছেন বা অন্তত নাম জানেন জানিয়েছেন, তার সমান বা বেশী লোক জানিয়েছেন, এটা কি ফল জানেন না কিংবা ভুল করে একে আমলকী ভেবেছেন। একটা অকিঞ্চিৎকর ফল নিয়ে আমার এত কিছু ভাবার কি হল? একটু বেশীতই মাতামাতি করছি না কি? আসলে এই ফলটা নিয়ে মাতামাতি করারও কিছুই নেই। আমি এই ফলটাকে দমদমে পাওয়ার পর আমার মনে কিছু ভাবনা এসেছে।

গতকালই বুঝেছি, এ ফলটা এ বাংলার গ্রামে খুব দুষ্প্রাপ্য নয়। অন্তত কয়েক বছর আগে পর্যন্ত তেমন দুষ্প্রাপ্য ছিল না। কিন্তু দেখুন, আমি প্রথম এ ফলটা দেখি বা মুখে দিই আমার পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। তাও আবার সুদূর মুম্বইয়ের এলিফ্যান্টা দ্বীপের মত জায়গায়। আমাদের গ্রামের ওদিকে অনেক গ্রাম্য বা বুনো ফল পাওয়া যায়; আমি খেয়েছি। এই শীলাকুল বাদ দিয়েও অন্তত পাঁচ- ছয় রকমের কুল আমাদের গ্রামের ওদিকে পাওয়া যায়। তাছাড়া 'কুরুক জাম', বড়ফল, পাকা গাব এমন খুব অপ্রচলিত ফলও আমি আমাদের গ্রামের ওদিকে পেয়েছি। মেদিনীপুরের গ্রামের আদারে বাদাড়ে যে সব ফল পাওয়া যায় সবই আমি চিনি আর খেয়েছি। এ বাংলার গ্রামে গঞ্জে এখনও অনেক ঘুরে বেড়াই। আমার ধারনা ছিল , গাছপালা আমি খুব ভালো চিনি। কিন্তু দমদমের এই গাছটার তলা দিয়ে কয়েকশ বার যাতায়াত করেও গত সাত বছর খেয়াল করিনি যে, ওটা আমার কাছে অচেনা একটা গাছ। গত সাত বছরও নিশ্চয়ই বৈশাখ মাসে ঐ গাছের তলায় এমনই হলুদ ফল পড়ে থেকেছে। এতদিন পরে আমার চোখে পড়ল! আমার ক্লাশে একটা চিনা বাকধারা আমি খুব বলি। " মন যা জানেনা, চোখ তা দেখে না।" এমন কত কি আছে, যা আমরা দেখেও দেখি না।

ডাক্তারী পড়ার সময় আমাদের কতগুলি সাধারণ জিনিস পড়ানো হয়। প্রথমে মানুষের শরীরের গঠন ও নানান অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ। তারপর নানান রোগের জন্য শরীরের বিভিন্ন অংশে কি কি পরিবর্তন হয় সেসব। নানান অসুখের উপসর্গ আর রোগ লক্ষন থেকে কি করে রোগ নির্ণয় করা যায়; এগুলি সকলকেই পড়ানো হয়। তবুও এক এক জন ডাক্তার এক এক রকম হয় কেন? প্রত্যেকটি মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আলাদা আলাদা। গোড়ার শিক্ষার সাথে এই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ব্যাবহার করে ডাক্তারী করতে হয়। আমার নিজের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা ছিল যে, আমার এই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা খুব ভাল। কিন্তু এই সামান্য একটা ফল আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, আমার চোখ কানও তেমন খোলা নয়।

21.4.2021 তারিকে লেখা।

এক ডাকাতির গল্প

আমার বন্ধু সেই ভোলাদার কথা বলতে গেলে একটা বই লেখা যায়। আগে সংক্ষেপে ওনার কথা কিছু লিখেছি। ওনার সেই পঞ্চায়েতির গল্প। সেই রকম এক মোষ তাড়ানোর কাজে গেছলাম, আমরা দু'জন;ওনার স্কুটার নিয়ে। বিকেলের দিকে ফিরছিলাম, কেশপুরের দিক থেকে মেদিনীপুর শহরে। মাঝে একটা বাজার মত আছে, জামতলা। ওখান থেকে গ্রামের ভেতরে একটা মোরাম রাস্তা চলে গেছে। মাইল খানেক ভেতরে আমার দিদির বাড়ী। কিছুটা আগে ওনাকে বললাম, এই গ্রামের ভেতরে আমার দিদির বাড়ী। শুনে কেমন যেন একটু অবাক হলেন। আসলে সেই গ্রামের একটা বদনাম আছে। আমি হালকা আগ্রহ প্রকাশ করতেই উনি সেই মোরাম রাস্তায় স্কুটার নিয়ে ঢুকে পড়লেন। সরাসরি স্কুটার নিয়ে দিদির বাড়ী যেতে হলে একটু ঘুরে যেতে হয়। আমরা খেলার মাঠে স্কুটার রেখে, মাঠের আল ধরে ঢুকলাম। আমার জামাইবাবু , দিদি,ভাগ্নে এখন আর কেউ নেই। ভাগ্নের স্ত্রী এখনও সেই বাড়ী আগলে পড়ে আছে। আজ থেকে তিরিশ বত্রিশ বছর আগে, তখন ওরা সবাই ছিল। জামাইবাবু হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হলেও একটু সোজা সোজা মানুষ ছিলেন। আমরা যখন পৌঁছলাম, জামাইবাবু উঠানে মাটি নিয়ে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমরা একেবারেই ধূমকেতুর মতো হাজির হওয়ায় , হত চকিত হয়ে গেলেন। হাতে পায়ে কাদা মাটি মাখা। বিস্ময়ে, খুশীতে হাউ মাউ করে কি যেন বলেছিলেন। দিদি বেরিয়ে এসে মেদিনীপুরের ভোলা রায়কে দেখে চমকে গেলেন। দুটি মোড়া বা ঐরকম কিছুতে বসতে বললেন। আমরা আধ ঘন্টা মতো থেকে বেরিয়ে এলাম। আসার পথে ভোলাদা বার দশেক বোধহয় বললেন, এমন বিপজ্জনক জায়গায়, মেয়েগুলোকে নিয়ে ওরা আছেন কি করে? শহরে ফিরে আমরা যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

আমার ভোলাদা

মাসখানেক পর একদিন সকালে আমি চেম্বারে বসে ছিলাম; বড় ভাগ্নী এসে ঢুকল। কোন রকমে বলল, কাল রাতে ডাকাত দল এসে বাবাকে প্রচণ্ড মারধোর করেছে। আমি কিছু সময় কোন কথা বলা তো দূরের ব্যাপার, কিছু ভাবতেই পারলাম না। ঐ হাড় জিরজিরে লোকটাকে ডাকাতে মারার পরও বেঁচে আছে, সেটাই ভাবতে পারছিলাম না। কোন রকমে বললাম, ভোলাদার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে দেখত আছেন কি না; আমি আসছি। পাঁচ মিনিট পর গিয়ে শুনলাম, দাদা নার্সিং হোমে গেছেন। গেলাম সেখানে। উনি বললেন, আমি তো এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। ভাগ্নীকে কোতোয়ালি থানায় পাঠিয়েছি, মেজ বাবুর সাথে কথা হয়েছে। উনি দেখছেন। একটু পরে

খবর পেলাম, পুলিশ গাড়ি নিয়ে দিদির বাড়ীর গ্রামে চলে গেছে। এসব কথা যে সময়ের , সে সময় মোবাইল ফোন ছিল না। পরে জেনেছি, মেজবাবু সাথে সাথেই ভাগ্নীকে থানার গাড়ীতে নিয়ে ওদের বাড়ী চলে যান। জামাইবাবুকে তুলে এনে হাসপতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মেজোবাবু ওদের বলেন, ঐ গ্রামের সব ডাকাতকে আমরা জানি, ভয় নেই। পরের দিন দুই, রাত্রে গিয় জন সাত আট ডাকাতকে ধরে আনেন। পরে দিদির কাছে শুনেছি , সবকটা ডাকাতকে মেরে হাতগুলি প্রায় অকেজো করে দিয়েছে। ডাকাতরা গ্রামে ফিরে বলছে, এদের কোন আত্মীয় একটা বড় নেতা। পুলিশ ওদের পেটানোর সময় বার বার বলেছে, তোরা ভোলাবাবুর জামাইবাবুকে মেরেছিস, তোদের সবকটার হাত ভেঙ্গে দেব। সেই ডাকাতি তো এভাবে সমাধান হল। কিন্তু তারপর যা হয়েছে, সেটা রূপকথার গল্পের মত।

সেই প্রথম দিন ভোলাদা  ওদের দেখেই যেমন ভয় পেয়েছিলেন, থানার মেজবাবুও মেয়েগুলিকে দেখে ওদের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। উনিই বড় ভাগ্নীকে একদিন বললেন, পুলিশে চাকরী করবি? ভাগ্নী মাধ্যমিক পাশ করেছিল। কিন্তু কোনোদিন খেলার মাঠে নেমেছে বলে শুনিনি। মেজবাবু ওকে বলেছিলেন, মাঠে নেমে দৌড় ঝাঁপ করে দেখাতে পারলে চাকরী পেয়ে যাবি। কদিন মাঠে নেমে দৌড় ঝাঁপ প্র্যাকটিস করা শুরু করলো। এ কিন্তু আজকের সিভিক পুলিশ নয়; একেবারে কনস্টেবল এর চাকরী। ঐ মেজবাবুই বড় কর্তাদের ধরে ওর চাকরিটা করে দিলেন। আল,ভোলা জামাইবাবু স্বপ্নেও ভাবেননি। ছোট ভাগ্নী খেলাধুলায় চৌকস ছিল। সেও একদিন চাকরী পেয়ে গেল। এই নিয়ে দুই বোন মাঝে মাঝেই ঝগড়া করে। বড় বলে আমি সাহেবদের ধরে তোর চাকরী করে দিয়েছি। ছোট বলে, আমি মাঠে নেমে সবার থেকে ভালো দৌড় ঝাঁপ করে চাকরী পেয়েছি। যেভাবেই হোক, দুই মেয়ের চাকরী দেখেই দিদি জামাইবাবু নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করেছেন। সব কিছুর জন্যে সেই ভোলামামা। এমন একটা মামা কজনের ভাগ্যে জোটে! ১১.১০.২৪.

জামাইবাবু

গীতার ২য় অধ্যায়, ৪৭ নং শ্লোক

এই একটি শ্লোকের কয়েক কোটি বার ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। এবং এটা করা হয়েছে মধ্য যুগের শোষণ এর হাতিয়ার হিসেবে। আপনি " মা ফলেসু কদাচন" এই টুকু বলে যে কোন শিক্ষিত (?) মানুষকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, এটা জানেন ...... এটুকু বলতে না বলতেই উত্তর পেয়ে যাবেন, " ঐ তো ফলের আশা করিয়ো না!"
কিন্তু ঐ শ্লোকটি পুরোটাই বলতে পারবেন এমন লোক লাখে একটাও পাওয়া যাবে না। @(দয়াল ) এমনকি শ্লোক টি র প্রথম শব্দটিও লাখে একজন জানেন না। " কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেসু কদাচন।" এই হল শ্লোকটির প্রথম লাইন। ঐ প্রথম যুক্ত শব্দটি ভাঙ্গলে হয়, কর্মনি + এব+ অধিকার+ স্তে। এখানে অধিকার এর কথা বলা হয়েছে। গোটা শ্লোকে কোন শব্দ নেই যার মানে হয় " আশা করা!"
তোমাকে কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, ফল দেওয়ার অধিকার নয়। একটা সামান্য উদাহরণ বলি। বোর্ডের বা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় যে ছেলে প্রথম হবে, বা ফার্স্ট ক্লাশ ফাস্ট হবে, সে যদি ভাবে, " আমার খাতা আবার কে মূল্যায়ন করবে, আমি নিজেই ১০০ বসিয়ে দিয়ে কাজটা সেরে রাখি!" কেমন হবে ব্যাপারটা? ওকে খাতায় উত্তর লেখার অধিকার দেওয়া হয়েছে, নম্বর দেবার নয়। নম্বর বসানোর অধিকার দেওয়া আছে কোন উচ্চতর যোগ্যতার মানুষকে।
যে পরীক্ষার খাতায় লিখে আসবে, সে তো ফলের আশা করবেই। ( ২৫.১২.২০২৩)

রাজ কর্মচারি

ঠিক দুই মাস হল সরকারী চাকরী থেকে অবসর নিয়েছি। এর মধ্যে বহু মানুষ জানতে চেয়েছেন, কেমন আছি বা কেমন লাগছে। কোন আশ্রমে বা মিশনে যোগ দিয়ে, দু'মাসেই কি বলা যায়, কেমন আছেন? দু'মাসেই কি আধ্যাত্মিক উপলদ্ধি হয়ে যায়? একটা দীর্ঘ দিনের অভ্যাস থেকে নতুন জীবন ধারায় পৌঁছে সেটা কেমন লাগছে, বুঝতে একটু সময় লাগবেই।

আজ সকাল থেকেই বেশ মেঘলা, বর্ষা বাদলার দিন। আমার জানালার বাইরে দেখতে পাচ্ছি, কতো লোক কাজে যাচ্ছেন। সবাই সরকারী চাকরী করতে যাচ্ছেন তা তো নয়। বেসরকারি চাকরী, মিস্ত্রী, কাজের মাসি, আয়া, দোকানদার, কতো কি পেশা। আমার কিন্তু মনে হল গোপাল ভাঁড়ের একটি গল্প। এক বর্ষা বাদলার রাতে গোপাল রাজবাড়ি থেকে বাড়ী ফিরছিল। রাস্তায় একটু জল জমেছে, জোরে বৃষ্টি নামার জন্য, গোপাল এক সাধারণ মানুষের কুটিরের চালের তলায় ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। গোপালের পায়ের ছপ ছপ শব্দ শুনে কুটিরের ভেতরের মহিলা বললেন, একটা কুকুর না শেয়াল আমাদের ছাঁচে এসে দাঁড়াল। ঘরের লোকটি বলল, আরে না, নিশ্চয়ই রাজ কর্মচারি; ওরা ছাড়া এই দুর্যোগে কুকুর শেয়াল কেউ বেরোয় না। সত্যিই কি আমাদের সেরকম দুরবস্থা ছিল? পিছন ফিয়ে তাকালে সেরকম কিছু দিনের কথা মনে পড়ে বৈকি। প্রথমে বর্ষার কথাই বলি।

কয়েক বছর আগে এক বর্ষার সকালে হাসপাতালে যাচ্ছিলাম। পার্ক সার্কাস স্টেশনে নেমে সাত আট মিনিট হাঁটলেই পৌঁছে যাই। ছাতা ছিল, তাই একটু একটু বৃষ্টি পড়লেও হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু মাঝ পথে প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নামল। আমি একটি বাড়ির শেডের নিচে দাঁড়িয়ে গেলাম। ক্রমশ বাড়ছে বৃষ্টি। সামনের রাস্তা দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি রাস্তা দিয়ে আমার সহকর্মী এক লেডি ডাক্তার হাসপাতালের দিকে চলেছেন। ছাতা আছে, কিন্তু একেবারে কাক ভেজা যাকে বলে। বুঝলাম, আমার পরের কোন ট্রেনে এসে নেমেছেন, ছাতা খোলার আগেই ভিজে গেছেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে না ভিজে সোজা হাঁটা দিয়েছেন, হাসপাতালে পৌঁছে, অপারেশন থিয়েটারের পোশাক পরে নিতে পারবেন। প্রায় তিরিশ বছর এর চাকরী জীবনে অসংখ্য বার এমন কাক ভেজা হয়ে কাজে যেতে হয়েছে, বা কাজ থেকে ফিরেছি। আর কুকুর শেয়াল বেরোতে পারেনি এমন দিনে দুবার, রাজ কর্মচারি হয়ে পথে নামতে হয়েছিল। আম্পানের দিন সকালে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। তখন কোভিডে লক ডাউন চলছে। নিজেই গাড়ী চালিয়ে গেছলাম। দুপুরে আমার পরে যে ভাইয়ের ডিউটি ছিল সে ঝড়ের ভয়ে আগেই এসে গেছে। খবর ছিল দুপুর আড়াইটার পর ঝড় বাড়বে। আমি দুটো নাগাদ গাড়ী চালিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম। শহরের ভেতর দিয়ে আসতে তখন মিনিট কুড়ি লাগে, রাস্তা ফাঁকা। সেদিন তো ঝড়ের জন্য আরও ফাঁকা। শিয়ালদা আসতে আসতেই বৃষ্টি প্রচণ্ড বেড়ে গেল। তখন দাঁড়িয়ে গেলে সেদিন আর বাড়ী ফেরা হত না। প্রবল বেগে wiper চালিয়ে ছোটালাম গাড়ী। শ্যামবাজার আসার আগেই ঝড়ের বেগও বেড়ে গেল। তখন আবার টালা ব্রীজের কাজ চলছে, লকগেট দিয়ে আসতে হবে। পাখীর হাটের রাস্তা দিয়ে লকগেটে এসে দেখি বন্ধ। পাশের রাস্তা ধরে কাশীপুর ঘুরে এলাম। বাড়ী পৌঁছে গ্যারেজে গাড়ী ঢুকিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়েই টের পেলাম ঝড়ের গতিতে সব লণ্ড ভন্ড হচ্ছে। আমার যে রাজকর্মচারি ভাই আমাকে দুপুর দুটোর আগে ছেড়ে ডিউটি ধরেছিল, সে পরদিন

দুপুর দুটোর আগে বাড়ী ফিরতে পারেনি। যাবে কি করে? গাছ পড়ে কলকাতার রাস্তা সব বন্ধ। পরের ডাক্তার হাসপাতালে না এলে ও তো আর বাড়ী যেতে পারে না।

লক ডাউনের প্রথম দিকে, এক রাত্রে গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে চলেছি। বেলগাছিয়া রোডে ওঠার আগে সিগন্যাল এ দাঁড়িয়েছি। এমন শুনশান কলকাতার রাস্তা আর কোনোদিন দেখিনি। সত্যিই রাস্তায় শেয়াল কুকুর নেই। হঠাৎ আমার পাশে একটি মোটর বাইক এসে দাঁড়াল। আরোহী ছেলেটি হিন্দিতে জানতে চাইল, শিয়ালদা কোন দিকে। বললাম, ডান দিকের রাস্তা ধরে যেতে। কিন্তু শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। এমন নির্জন রাতের রাস্তায় জীবনে আর কখনো বের হতে হবেনা। আমি তো আর রাজ কর্মচারি নই।

আজ সকাল থেকেই যে সকল রাজ কর্মচারি ভোটের ডিউটি করতে বেরোচ্ছেন তাঁদের কথা ভাবতে গিয়ে আমার মেজদার কথা মনে পড়ল। আমরা ঐদিন দুপুরে শিশু কন্যাকে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করেছি। রাত্রে হাসপাতালের পাশের দোকানে খেতে গিয়ে, ফট ফাট পটকার শব্দ শুনেছি। আমাদের খাওয়া হতেই দোকানদার বলল, আপনারা হাসপাতালে থাকবেন? তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকে যান, শব্দ শুনছেন তো! মেজদা পরদিনও হাসপাতালে এল না। কি ব্যাপার? ছোড়দা জানাল, গতকাল কলকাতায় ভোট ছিল, মেজদা ভোট নিতে গেছল। বাড়ী ফিরে অসুস্থ হয়ে গেছে। ওদের বুথের সহকর্মী এক ভোটারকে আই কার্ড দেখাতে বলেছিলেন। আনছি বলে লোকটি ফিরে গিয়ে পিস্তল হাতে ফিরে আসে। দাদার পাশেই তাঁর সহকর্মী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। যে সকল রাজ কর্মচারি আজ গণতন্ত্রের পবিত্র উৎসবে পুরোহিত হয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য আমার আজকের মত একটি নিশ্চিন্ত অবসরের প্রার্থনা করি।

লাফ

সবথেকে কম বয়সে আপনি যে লাফ দিয়ে ছিলেন সেটা কি আপনার মনে আছে? যেটা মনে আছে সেটা কোথায়, কেন লাফিয়ে ছিলেন? আমার যেটা মনে আছে সেটা একটা শিশুদের খেলা। দুজন মুখোমুখি বসে পায়ের পাতা চারটি লাগিয়ে রাখবে, আর একজন ছুটে এসে ঐ জোড়া পায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে পেরোবে। তারপর একটা পায়ের পাতার উপর আর একটা পাতা দিয়ে উচ্চতা বাড়ানো, তারপর হাতের আঙ্গুল ফাঁকা করে পায়ের পাতার উপর দিয়ে আর একটু উঁচু করে দেওয়া। এই ক্রমশ বাড়তে থাকা উচ্চতা লাফিয়ে লাফিয়ে পেরতে হবে। এর পরের খেলাটা ছিল পুকুরের জলে লাফিয়ে পড়া। পুকুরের বাঁধানো ঘাট থাকলে তার উপর থেকে লাফিয়ে পড়া; আর না হলে পুকুরের উচু পাড় থেকে লাফ। অনেক সময় পুকুরের জলের উপর ঝুলে থাকা গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়া। গ্রীষ্ম কালে এক একজন বাচ্চা হয়তো কুড়ি বাইশ বার করে লাফাতাম। এই জলে লাফাতে গিয়ে আমার একবার একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমদের গ্রামের সেই বারোয়ারী পাকা ঘাটের উপর থেকে লাফ দিয়ে জলে পড়লাম। জলের নিচে ছিল একটা ভাঙ্গা পিচের ড্রাম; আমার থাইয়ের মাঝে প্রায় তিন ইঞ্চি কেটে গেল। সেলাই -এর ভয়ে কাউকে না জানিয়ে চেপে গেলাম। সেই কাটার দাগ এখনও বোধ হয় খুজলে পাওয়া যাবে।

হাই স্কুলে পড়ার সময় বাৎসরিক প্রতিযোগিতার সময়ে পারি না পারি দৌড় ঝাঁপ সব বিভাগেই নাম দিতাম। মেয়েদের একটা খেলা ছিল স্কিপিং দৌড়। স্কিপিং বা লাফ দড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে দৌড়। আমাদের খেলার সাথী জয়ন্তী নামের একটি মেয়ে প্রতি বছর প্রথম হত। ছেলেদের লং জাম্প আর হাই জাম্প হত। লম্বা লাফ দেওয়ার জন্য মাঠের পাশে একটা চৌবাচ্চা মত কেটে বালি দিয়ে ভরানো হত। ঐ, বছরে দিন সাতেক ওখানে কয়েক জন লাফানো অনুশীলন করতে যেতাম। হাই জাম্প আমরা দড়ির ওপর দিয়ে লাফাতাম , উল্টো দিকে পড়বার জায়গায় সোজা মাটিতে পড়ার ব্যবস্থা। অনেক পরে জেনেছি যে আড়াআড়ি ছুটে এসে একটা ডান্ডার ওপর দিয়ে পেরিয়ে মোটা গদির ওপর পড়ে, বড় বড় লাফিয়েরা। আমরা কলেজে পড়ার সময় থেকে শুনতে পেতাম রাশিয়ার সেরগেই বুবকার নাম। পোল ভল্ট নামের এক রকম খেলায় রেকর্ড ভাঙ্গার রেকর্ড করেছিল। সে বোধ হয় লাফিয়ে দোতলা বাড়ির ছাদে উঠতে পারতো। এই লাঠির সাহায্যে লাফানো নিয়ে আমাদের গ্রামের ওদিকে তখন একটা প্রবাদ বাক্য খুব শুনতাম। “বাঘ লাফায় বার, হরিণ লাফায় তের আর সোনামুখীর বাগদি লাফায় পনের।” পনের হল পনের হাত দূরে লাফানো। আসলে আমাদের ওদিককার সোনামুখী গ্রামের লাঠিয়াল বাহিনীর ঐ রকম কিংবদন্তি সুনাম ছিল।

খেলার মাঠে লাফানোর আর একটা ব্যাপার আমদের ছোট বেলায় আমাকে মুগ্ধ করত। ভলি বল খেলায় নেটের কাছে দাঁড়ানো খেলোয়াড় লাফিয়ে উঠে বলে প্রচন্ড জোরে চাঁটি মেরে উল্টো দিকে নামাত, এটা আমার খুব ভাল লাগত। ফুটবল খেলার মাঠে

লাফিয়ে উঠে হেড করার থেকেও গোল কিপারের লাফিয়ে গোল বাঁচানো দেখতে আমার বেশী ভালো লাগে। পাশে লাফিয়ে পড়ে বল ধরা যাকে ইংরেজিতে 'ডাইভ' বলে তার হিন্দিটা বেশ মজার; "ছ্যালাং!

আমরা যখন হোস্টেলে থাকতাম , একবার কোন কাজে ,এক গাড়ী বালি এনে নিচে রাখা ছিল। দোতলায় দাঁড়িয়ে কয়েকজন কথা বলতে বলতে ওপর থেকে লাফিয়ে পড়া নিয়ে বোধ হয় বাজী রেখে কিছু হয়েছিল। আমদের খুব প্রিয় শ্যামাদা ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল বালির ওপর। কোমরে চোট পেল জোর। সবাই ভয় পেয়ে গেল। ভাগ্য ভাল যে খুব খারাপ কিছু হয়নি। এই শুনে আমদের এক ভাই বলেছিল একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা। ওদের গ্রামের বাড়িতে চোর এসেছিল। হৈ হৈ শুনে ওদের এক দাদা দোতলা থেকে নিচে খড়ের গাদায় লাফিয়ে পড়ে। তারপর থেকে আর কথা বলতে পারেনি। সেই দাদা আর কোনদিন কথা বলতে পারল কি না আমার জানা নেই।

সবথেকে লম্বা লাফ যার কথা আমরা সবাই জানি, সেটা হল রামায়ণে বীর হনুমানের লাফিয়ে সমুদ্র পেরনো। আজকের দিনে রূপকথার গল্পের মত মনে হয়। কিন্তু কোন এক গবেষক এই লাফের প্রসঙ্গে "লাঙ্গুলেন" কথাটা পেয়েছেন। লেজের সাহায্যে এত লম্বা লাফ? তাহলে কি তখন মিসাইলের মত কিছু ব্যবহার করে হনুমান সমুদ্র পেরিয়েছিলেন? বর্তমান যুগে সবথেকে উঁচু থেকে লাফ দেওয়া হয়, প্যারাসুট নিয়ে কয়েক হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া এরোপ্লেন থেকে লাফিয়ে পড়া। আমাদের সময়ের সবথেকে বিখ্যাত প্যারাশুট লাফ কোনটা মনে আছে? বীর যোদ্ধা অভিনন্দন বর্তমান পাকিস্থানের একটি যুদ্ধ বিমানকে ধ্বংশ করে নিজে লাফিয়ে নেমেছিলেন।

মাছেদের স্বভাব হল , উপর থেকে জল নামছে দেখলেই লাফিয়ে ওঠে। ওদের এই স্বভাবকে কাজে লাগিয়ে আমরা মাছ ধরার ফাঁদ পাততাম। মাছেরা কিসের নেশায় লাফিয়ে উঠে আত্মহত্যা করে জানার উপায় নেই। একটি মাছ লাফিয়ে ডাঙ্গায় উঠে বেঘোরে প্রাণ হারায়। ওর পিছনে থাকা অন্য মাছেরা জানতে পারে না এর করুন পরিনতি। ছাত্র যুবাদের একই ভাবে তাতিয়ে তোলে নেতারা। এরা ভালো মন্দ বিচার না করে বিপদের মুখে লাফিয়ে পড়ে। আমদের বীর স্বাধীনতা সংগ্রমিরা নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেশের সেবায় লাফিয়ে পড়েছিলেন।

ট্রেনে বাসে লাফিয়ে ওঠা বা নামা খুব দেখা যায়। কিছু চ্যাংড়া- ব্যাংড়া দেখবেন অকারনে লাফিয়ে নামছে বা উঠছে। জানবেন কোনটাই অকারণ নয় ;ওটা ওদের ট্রেনিং চলছে। আমার চোখের সামনে দু'বার দেখেছি, মহিলার গলা থেকে সোনার হার ছিঁড়ে নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামল একটা ছেলে। এই লাফও ওদের জীবিকার সাথে যুক্ত। আমাকে এক বিখ্যাত প্রফেসার বলেছিলেন, " তুমি তো সাপের কামড় নিয়ে কিছু করার জন্য খুব লাফালাফি করছ"! সত্যিই, বারো -তের বছর ধরে একটা গ্রামীন সমস্যা নিয়ে যা লাফালাফি করলাম , সবটা জুড়লে একটা সমুদ্র পেরোনো যায়; কিন্ত আমাদের শহুরে নেতাদের কানে কথাটা ঢোকাতে পারছি না।

প্রাণীদের মধ্যে বাঁদর আর ব্যাঙ এর লাফ বিখ্যাত। কুকুর বিড়ালও খুব ভাল লাফাতে পারে। ওদের ওই লাফ দেওয়ার স্বাভাবিক ক্ষমতা ওদের বেঁচে থাকার জন্য জরুরী। মানুষ কেন লাফায়? ছোট বেলায় লাফানোর যে খেলার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেখানে শিশু, মনের আনন্দে লাফায়। আবার আমেরিকায় সেই একশ তলার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে বাঁচার চেষ্টা! মৃত্যু ভয়ে মানুষ কেমন পাগল হয়ে যায়, ওটা তার উদাহরণ। মানুষ মরবার জন্যও লাফায়; দশ তলার উপর থেকে লাফ, ট্রেনের সামনে লাফ কিংবা গঙ্গায় লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা । কিংবা মধ্য যুগে বন্দিনী মহিলাদের জহর ব্রত পালন করে আগুনে ঝাঁপ!

সামান্য একটা ব্যাঙের লাফ একটা শান্ত পুকুরে যেমন তরঙ্গ তোলে, তেমনি চিন্তার তরঙ্গ তুলেছিল জাপানী সাধক কবি মাৎসুয়ো বাসোর মনেও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -এর জন্মের প্রায় দুশ বছর আগে ,অনু কবিতা বা হাইকু লিখেছেন বাসো।

" শান্ত পুকুর

নির্জন দুপুর

ব্যাঙের লাফ

ক্লপ"!

জাপানী সাধক কবি মাৎসুয়ো বাসো

লোপামুদ্রা

যা নেই ভারতে তা নেই ভূ ভারতে। আমাদের ছোট বেলায় শোনা ইল্বল আর বাতাপি রাক্ষসের গল্পও যে মহাভারতের গল্প তা তো জানতাম না। কত ছোট বেলায় সে গল্প শুনেছিলাম , বলতে পারছি না। তখন গল্পটা ছিল , দুই রাক্ষসের বামুন মেরে খাওয়ার গল্প। ইল্বল রাক্ষস বামুনদের নিমন্ত্রন করত। তার ভাই, মায়াবী রাক্ষস বাতাপি একটা ছাগল হয়ে যেত। বামুনদের সেই ছাগলের মাংস কেটে খাওয়ান হত। পেট ভরে খেয়ে বামুনরা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেই, বাতাপি তাদের পেট ফাটিয়ে বেরিয়ে আসত। এর পর দুই রাক্ষস সেই বামুনদের মাংস খেত। এই বদমাশ রাক্ষস দুটিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অগস্ত্য মুনি তাদের বাড়ী গিয়ে ছাগলের মাংস খেলেন। মহা তেজস্বী মুনি বাতাপি রাক্ষসকে একেবারে হজম করে ফেললেন। আগের মত ইল্বল রাক্ষস ভাইকে ডাকতে থকল; কিন্তু সে আর বেরল না। তখন ইল্বল রাক্ষস মুনির পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল।

এই মহা মুনী অগস্তের আরও গল্প আমরা শুনেছি। এই মুনীর শিষ্য বিন্ধ্য পর্বত মাথা তুলে সুর্যের যাতায়াত আটকে দিচ্ছিল। মুনি শিষ্যের কাছে গেলে শিষ্য বিন্ধ্য পর্বত মাথা নামিয়ে প্রণাম করল। মুনী তাকে না ফেরা পর্যন্ত ঐ ভাবে প্রণত হয়ে থাকতে বলে সেই যে দক্ষিনে চলে গেলেন, আর ফিরলেন না। পর্বত ঐভাবে মাথা নামিয়েই থেকে গেল। এই অগস্ত্য মুনীই রেগে গিয়ে এক চুমুকে সমুদ্রের সব জল খেয়ে নিয়েছিলেন। এই রকম তেজস্বী ব্রহ্ম জ্ঞানী মুনীর স্ত্রী ছিলেন তেজস্মিনী লোপামুদ্রা।

এই লোপামুদ্রার কথা পড়তে গিয়ে আমাদের " ধর্ম গ্রন্থ" সম্বন্ধে ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেল। বেদ- পুরান- মহাভারত আমাদের ধর্মগ্রন্থ। কিছু মানুষের এই ধর্ম বা ধর্মগ্রথ কথাগুলি সম্বন্ধে বিকট আপত্তি আছে। তাদের এই শব্দগুলি শুনলেই গায়ে ফোস্কা পড়ে। বেদ মন্ত্র বললেই আমরা জানি , " ওং, বোং , দেহী দেহী, স্বাহা স্বাহা" বলে আগুনে ঘি ঢালা। এই লোপামুদ্রা দেবী যে বেদ মন্ত্রের দ্রষ্টা , সেগুলি জানলে আর বেদ মানেই যাগ যজ্ঞ , দেবতার পূজা , এই ভুল ধারণা থাকবে না। এই লোপামুদ্রা ছিলেন , বিদর্ভ রাজার কন্যা। পরমা সুন্দরী এই রাজকন্যা দারুন বিদুষীও ছিলেন। তেজস্মিনী এই কন্যাকে বিয়ে করার সাহস কোন রাজার ছিল না। মহামুনী অগস্ত্য একদিন সেই বিদর্ভ রাজার অতিথি হয়ে এলেন। রাজা যথাযোগ্য চরণ বন্দনা ইত্যাদি করে মুনীকে আপ্যায়ণ করলেন I মুনী জানতেন রাজার বিদুষী কন্যার কথা। আসলে এই মুনীই যোগবলে নিজের ভবিষ্যতের স্ত্রী হিসেবে এই কন্যাকে সৃষ্টি করেছিলেন। এমন এক কাঠখোট্টা মুনীর সাথে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে বাবা মায়ের আপত্তি থাকবেই। কিন্তু মুনীর তেজের কথা মাথায় রেখে ওনারা সে কথা বলতেও পারছেন না। এদিকে এমন এক মহামুনী তাকে বিয়ে করতে চায় জেনে রাজকন্যা লোপামুদ্রা নিজেই রাজাকে তার সম্মতির কথা জানালেন। রাজকীয় আড়ম্বরে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু কৌপীনধারী মুনি সালঙ্কারা বধু নিয়ে আশ্রমে যাচ্ছেন, এ খুবই বেমানান। মুনি তাই স্ত্রীকেও বল্কল পরিধান নিয়ে যেতে বলললেন। লোপামুদ্রা তাই করলেন।

গঙ্গার ধারে মুনির আশ্রমে তাঁদের দিন কাটতে থাকল। বছরের পর বছর লোপামুদ্রা মহাতপস্বী মুনির কঠোর তপস্যায় সাহায্য , আর স্বামী সেবা করে গেলেন। তপস্বী মুনি তাঁর ঈশ্বর লাভের তপস্যার অঙ্গ হিসেবে ব্রহ্মচর্য পালন করে যাচ্ছেন। এভাবে নিজেও তপস্যা করতে করতে লোপামুদ্রার এক সময় মনে হতে থাকল , তাঁর বিবাহিত জীবন বৃথা। প্রতিদিন সকাল হলেই তাঁর মনে হতে লাগল, আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে। শেষে একদিন তিনি বেশ রেগেই গেলেন I তখন তিনি বিবাহিত পুরুষের স্ত্রীর প্রতি কি কর্তব্য হওয়া উচিত , তাই বললেন, মুনিকে। এই যে কথাগুলি তিনি ঋক মন্ত্রের মত উচ্চারণ করলেন, এগুলিই চিরন্তন সত্য। মুনি যদি আজীবন ব্রহ্মচর্যই পালন করবেন, তাহলে বিয়ে করলেন কেন ? এই যে তপস্বিনী লোপামুদ্রা কিছু চিরন্তণ সত্যকে বলে ফেললেন , একেই বলা হয় , যেন তিনি সত্যকে দর্শন করলেন। তাই তিনি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা, লেখিকা বা আবিস্কর্তা নন। তাঁর বলা কথাগুলি এতোই সত্য যে , ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্যও নিজের ভুল বুঝতে পারলেন I তিনিও উত্তরে বিবাহিত স্বামীর স্ত্রীর সাথে কেমন ব্যবহার করা

উচিত তাই বললেন , বেদ মন্ত্রের আকারে। এবার খেয়াল করুন, এই যে দুজন মহাতপস্বী কয়েকটি বেদ মন্ত্রের উচ্চারণ করলেন , এর সাথে যাগ যজ্ঞ, পূজা পাঠের কোন সম্পর্ক নেই। এগুলিই চির সত্য জীবন দর্শন। গোটা মহাভারত জুড়েই এরকম জীবন দর্শনের পাঠ দেওয়া হয়েছে। একেবারে দোষে গুনে একজন মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা। এগুলিকেই কিছু মানুষ ভুল ব্যাখ্যা করে আমাদের চিন্তা ভাবনাকে ঘুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। সমর্পনানন্দ মহারাজ একদিন মহাভারত পাঠের সময় মজা করে বলছিলেন, ঘরে মহাভারত রাখতে নেই I কেন? মহাভারত আসলে একটা আয়না। আমাদের মুখোশ খুলে দেয়।

মহিয়সী লোপামুদ্রা জানতেন , মহামুনি বংশ রক্ষার জন্যই বিয়ে করেছেন I কিন্তু নিজের তপস্যার কাজে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, সেকথা ভুলেই গেছলেন। স্ত্রীর, মন্ত্রের মত অমোঘ কথাগুলি শুনে মুনির বোধোদয় হল। তিনি এবার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনে আগ্রহী হলেন I লোপামুদ্রা জানালেন যে তাঁদের দুজনের পোশাক আসাক , শয্যা ইত্যাদি তপস্যার জন্য উপযুক্ত, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সঙ্গমের উপযুক্ত নয়। মুনির উচিত স্ত্রী সঙ্গমের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা। এসবের জন্য কিছু অর্থের দরকার; মুনি কোথায় পাবেন I তিনি চললেন রাজাদের কাছে অর্থ চাইতে।

পরপর তিনজন রাজার কাছে অর্থ ভিক্ষা করে দেখলেন , তাঁরা তিনজনই অত্যন্ত ধর্মপথে রাজ্য চালান। রাজ্যের আয় ব্যায় সমান। মুনিকে অর্থ সাহায্য করতে গেলে, প্রজাদের উন্নতির অর্থ থেকেই দিতে হবে। মুনি এই টাকা নিতে রাজী নন। বেদ পুরাণের আদর্শ রাজা কেমন হয় আমরা কি একটু আভাস পেলাম ? তিন রাজা এবার দৈত্য রাজা ইল্বলের কাছে মুনিকে নিয়ে চললেন। এই ইল্বলকে চিনতে পারছেন ? ইনিই আমাদের সেই বামুনের মাংস খাওয়া ইল্বল। এবার মুনি একাই বাতাপি ছাগলের মাংস খেয়ে হজম করে দিলেন I ইল্বল রাজা ভয় পেয়ে মুনির পায়ে পড়ল। তিন রাজা আর অগস্ত্য মুনিকে যথেষ্ট টাকা পয়সা দিয়ে বিদায় করল। এইবার মুনি যথা যোগ্য মর্যাদায় স্ত্রীর সাথে সন্তান উৎপাদনে মিলিত হলেন I এনাদের যে ছেলে হল , তিনি একজন কবি।

মহাভারতের কাহিনীগুলি পড়তে গিয়ে , আমার নিজের উপলব্ধির কথা বলছি। তাই পড়ে আমার এক সহৃদয় পাঠক বলেছেন, আপনার লেখার উদ্দেশ্য বিধেয় কিছুই বুঝলাম না। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোন ধর্মালোচনা বা প্রবন্ধ লিখতে বসিনি। আমার জীবনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতার সাথে মহাকাব্যের কোন ঘটনার যোগ পেয়ে হয়তো চমৎকৃত হয়েছি। এই নিবন্ধটি লেখার মূলে ঐ লোপামুদ্রা নামটি। আমরা খনা , লীলাবতি, অরুন্ধতির নাম পুরানাদিতে পেয়েছি। আমার এক আত্মীয়ার নামটি কোন পুরান বা মহাকাব্যে আছে খোঁজ করতে গিয়ে দেখি আমার সবথেকে প্রিয় বিশয় মহাভারতেই তিনি বিরাজমান। তাঁর কথা পড়তে গিয়ে প্রায় ষাট বছর আগে শোনা গল্পটির উৎস জেনে পুলকিত হয়েছি। আরও বেশী অভিভুত হয়েছি, তাঁর দেখা বেদ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা আচার্য নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী মশাই এর লেখায় পড়ে।

সব নাগ সাপ নয়

মহাভারতে সব কিছুই আছে। কথায় বলে, যা নেই মহাভারতে তা নেই ভু-ভারতে। তো, আমরা যারা সাপের কামড় নিয়ে কাজ করি তাদের জন্যও কি কিছু লেখা আছে মহাভারতে? মহাভারতের কাহিনী নিয়ে বিস্তৃত লেখা আমি পড়ে চলেছি বছর পনের হবে। এই করোনা মহামারীর বছর দেড়েক ধরে, ইউটিউব-এ মহারাজ সমর্পনানন্দের মহাভারত পাঠও নিয়মিত শুনছি। এই পাঠ শুনতে শুনতেই একদিন মহাসর্প নহুষের কাহিনী শুনলাম; মনে পড়ল ঐ বছর পনের আগেই একবার ভাদুড়ী মশাইয়ের "কথা অমৃত সমান" বইতে এ নিয়ে কিছু পড়েছিলাম। আবারও বই বের করে সেসব কাহিনী পড়তে হল।

সাপের প্রসঙ্গ মহাভারতে বেশ কিছু জায়গায়ই আছে। মহাভারতের কথা শুরুই হয়েছে মহারাজা জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞের কথা দিয়ে। এই মহারাজা জনমেজয় হলেন তৃতীয় পান্ডব অর্জুনের নাতি পরীক্ষিত -এর ছেলে। এ আবার কেমন হল? পাণ্ডবরা গোটা মহাভারত জুড়েই নানান কাণ্ড ঘটিয়েছেন; তাঁদের আগেও তাঁদের পিতামহ অতি বিখ্যাত ভীষ্মকে নিয়ে এত সব কান্ড, সেসব ছেড়ে তিন চার প্রজন্ম পরে মহাভারত শুরু হয়েছে? এ কেমন কথা! মজার কথা হল সাধারণ ভাবে মহাভারত নিয়ে যে সব বিচিত্র কাণ্ড কারখানার কথা আমরা জানি, তার কয়েকশ প্রজন্ম আগের কথাও লিখে গেছেন, মহাকবি ব্যাসদেব। এমন কি ব্যাসদেব নিজের জন্মের বিচিত্র বৃত্তান্তও বিস্তারে লিখেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের বীর পুত্র অভিমন্যুর চক্র ব্যুহে মৃত্যুর কথা আমরা জানি। সেই সময় অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত, মা উত্তরার গর্ভে। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন আবার সিংহাসনে বসেন সে সময় পরীক্ষিত জন্ম গ্রহণ করেন। ওনার যখন ছত্রিশ বছর বয়স তখন ওনাকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসিয়ে পঞ্চ পাণ্ডব আর দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানে চলে গেলেন। এই রাজা পরীক্ষিত একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে বনের প্রান্তে তপস্যারত এক মুনির গলায় একটি মরা সাপ জড়িয়ে দিয়ে আসেন। শমীক মুনি মৌনব্রত পালন করছিলেন তাই রাজার প্রশ্নের উত্তর দেন নি; এতেই রাজা বিরক্ত হয়ে ঐ মরা সাপ মুনির গলায় জড়ানোর বদ রসিকতাটি করেন। কিন্তু মুনির বালক পুত্র শৃঙ্গী এই ব্যাপারটি জানতে পেরে ,রাজাকে সাত দিনের মধ্যে সাপের আক্রমনে মরনের অভিশাপ দেন। সেই ঋষি বালকের অভিশাপে সপ্তম দিনেই তক্ষক নাগের আক্রমনে রাজা পরীক্ষিত মারা গেলেন। পরীক্ষিত-এর ছেলে জন্মেজয় রাজা হলেন। বেশ কিছু বছর পরে, বাবার মৃত্যু তক্ষক নাগের আক্রমনে হয়েছে জেনে , জন্মেজয় পিতৃহত্যার অভিযোগে সব সাপেদের পুড়িয়ে মারার জন্য বিশাল সর্প যজ্ঞের আয়োজন করেন। এই যজ্ঞ চলার সময় মহাকবি ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মুনি সেখানে আসেন এবং মহাভারতের কাহিনী শোনান।

মহাভারতের কাহিনীর শুরু কিন্তু আগে যেমন বলেছি, ধৃতরাষ্ট্র -পাণ্ডুদের প্রজন্মের প্রায় একশ প্রজন্ম আগের থেকে শুরু। এর মধ্যে তিনবার আমি সাপের বা নাগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি। এছাড়া মহাভারতে আরও বেশ কিছু জায়গায়ই সাপ বা নাগের

প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। সবথেকে পুরনো কাহিনী হল বিখ্যাত সমুদ্র মন্থনের কাহিনী। সেখানে মন্থন রজ্জু হিসেবে বিশাল বাসুকী নাগকে ব্যবহার করা হয়েছে। চন্দ্র দেবতার বংশধর বিখ্যাত রাজা নহুষ পৃথিবীর রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিশাল ব্যাক্তিত্ব, বীরত্ব ইত্যাদির জন্য একসময় তাঁকে স্বর্গ রাজ্যেরও রাজা করা হয়। কিন্তু স্বর্গের রাজা অর্থাৎ ইন্দ্রত্ব পেয়ে একসময় তাঁর মাথা ঘুরে গেল; তিনি আগের ইন্দ্র দেবতার স্ত্রী শচি দেবীকে বিয়ে করতে চাইলেন। এই করতে গিয়ে এমন উদ্ধত হয়ে উঠলেন যে , মহামুনি অগস্ত্য রেগে গিয়ে রাজা নহুষকে সাপ হয়ে জন্মানোর অভিশাপ দিলেন। সাথে সাথেই রাজা নহুষ এক বিরাট অজগর সাপের চেহারা নিয়ে মর্তে নেমে এলেন। এই অজগররূপী সাপ একদিন মহাবীর ভীমকে পেঁচিয়ে ধরে প্রায় খেয়েই নিচ্ছিলেন। অগস্ত্য মুনির কথা মত, নহুষের বহু পুরুষ পরের বংশধর মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁকে শাপ মুক্ত করেন।

ছোট বেলায় খেলার সময় দুর্যোধন ভীমকে খাওয়ার লোভে ফেলে, বিষ খাইয়ে নদীতে ফেলে দেয়। অজ্ঞান ভীম ভাসতে ভাসতে নাগ রাজার রাজ্যে পৌঁছলে, নাগেরা তাকে সুস্থ করে বাড়ী ফেরায়। খান্ডব বন দহনের সময় সেই বনে থাকা ভয়ংকর তক্ষক নাগকে অর্জুন মেরে তাড়িয়ে দেন। এই অর্জুনই আবার বারো বছর ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে গোটা ভারত ভ্রমণের সময় , নাগ কন্যা উলুপিকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের বাল্য আর বৃন্দাবন লীলার কথা সরাসরি মহাভারতে নেই। বাল্য লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগকে দমন করে, যমুনার জল বিষ মুক্ত করেন। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে কৌশলে হত্যা করার আগে, তাকে ভয় দেখানোর জন্য একটি বিষধর সাপ হাঁড়িতে ভরে কালযবনের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

এই যে এতগুলি জায়গায় সাপ বা নাগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলাম, এর মধ্যে সেই ধ্যানমগ্ন শমীক মুনীর গলায় জড়ানো মরা সাপ আর কালযবনকে পাঠানো সাপটি ছাড়া বাকিগুলি আদৌ কোন সাপ নয়। আচার্য নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী মশাই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন, তক্ষক, কালীয়, উলুপী বা নহুষ কেউই সাপ ছিলেন না। আসলে এঁরা সকলেই নাগ জনজাতীর মানুষ ছিলেন। নাগকন্যা উলুপি আর অর্জুনের বীর পুত্র ইরবান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বাবার পাশে থেকে যুদ্ধ করেছেন। এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, উলুপী সাপ নয়, মানবী ছিলেন। আবার দেখা যাচ্ছে, তক্ষক নাগের আক্রমণে পরীক্ষিত-এর মৃত্যর ক্ষেত্রে কোথাও বলা হয়নি , তক্ষক সপের কামড়ে রাজা মারা গেলেন।এমন কি শমীক মুনীর ঋষি পুত্র শৃঙ্গীও যখন অভিশাপ উচ্চারণ করেন, তিনি বলেছেন, “তক্ষক সেই পাপিষ্ঠ রাজাকে মারবে।“ এই সাতদিনে রাজার মৃত্যুর অভিশাপ ব্যাপারটি শান্ত মুনীবর শমীকের আদৌ ভালো লাগেনি; এটাকে তিনি পুত্রের বালকোচিত হঠকারিতা বলেই বুঝেছেন। কিন্তু বালক হলেও ব্রাহ্মণ ঋষির কথা মিথ্যা হতে পারে না। তবুও শমীক

মুনীর মনে হয়েছে, রাজাকে সাবধান করা তাঁর কর্তব্য; তিনি এক শিষ্যকে পাঠিয়ে রাজাকে সব খবর দিলেন। নিজের হঠকারিতা ও অন্যায় বুঝতে পারলেন রাজা পরীক্ষিত। তিনি জেনেই গেলেন, আর মাত্র সাতদিন আয়ু আছে। পৌরাণিক কাহিনীর স্বাভাবিক ধারায় , রাজার নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করা হল। এই শেষ সাতদিন রাজা শুধুই মুনি ঋষিদের কাছে ধর্ম আলোচনা শুনে কাটাবেন ঠিক করলেন। খবর পেয়ে নানা দিক থেকে মুনি ঋষির দল এসে রাজাকে ধর্ম কথা শোনাতে লাগলেন। এই সময়ই ব্রহ্মর্ষি শুকদেব এসে রাজাকে বৈষ্ণবদের পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ ভাগবত পুরাণ শোনান। এইখানেই ভাগবত পুরাণ রচনা হল।

মুনি ঋষি ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকে রাজার ধারে কাছেও যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। মহাভারতের কাহিনী বলছেন, মুনি ঋষিদের দেওয়া ফল মূল ছাড়া রাজা আর কিছু খাচ্ছিলেন না। তক্ষক নাগ একটি মিষ্টি ফলের মধ্যে ছোট্ট কৃমি কিট সেজে রাজার কাছে পৌঁছে যান, এবং সপ্তম দিন সন্ধ্যায় রাজাকে হত্যা করেন। বাস্তব ব্যাখ্যা হল, নাগ জনজাতীর রাজা তক্ষক, মুনি ঋষিদের দলে মিশে রাজার কাছে পৌঁছে যান, এবং রাজাকে হঠাৎ আক্রমণ করে হত্যা করেন।

মহাভারত পুরাণের কাহিনী আমাদের সব সময়ই কিছু না কিছু জীবন ধর্ম শিক্ষা দেয়। এই রাজা পরীক্ষিত-এর শেষ সাতদিন এর কাহিনী থেকে আমরা কি শিখলাম? ঐ যে মরা সাপ নিয়ে বদ রসিকতা, ওটাই রাজার কাল হল। আজকের দিনেও এই মরা সাপ নিয়ে বদ রসিকতা বা নাড়াচাড়া বিপজ্জনক। আমরা যারা সাপের কামড় নিয়ে কাজ করি, আমরা জানি , মরা সাপও বিপজ্জনক। বিষধর সাপ মরে যাওয়ার পরও তাদের বিষ থলিতে বিষ থাকে। কোন রকমে ঐ মরা সাপের বিষদাঁত হাতে পায়ে ফুটলে মারাত্মক হতে পারে। আর একটি দিক হল বন্য প্রাণ সংরক্ষণ আইন। আমরা দেখেছি, সাপ দেখলেই মেরে ফেলা লোকজনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। দেশের আইন অনুযায়ী কোন সাপকেই মারা যায় না। বাঘ, হাতি, কৃষ্ণসার হরিণ মারলে যেমন জেল জরিমানা হতে পারে; একটা হেলে সাপ মারলেও তাই হতে পারে। মরা সাপ নিয়ে রসিকতা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিলেও এই রকম আইনী ব্যবস্থার জালে জড়াতে পারেন। আমাদের পরিচিত একজন বিজ্ঞান কর্মী একবার এরকম একটি জটিলতায় জড়িয়েছিলেন।

আমরা আবার মূল মহাভারতে ফিরে যাই। পান্ডবদের বনবাস শেষ হয়ে আসছে। অর্জুন স্বর্গ থেকে নানান দীব্যাস্ত্র নিয়ে ফিরেছেন। পণ্ডবরা সবাই একটু চাপ মুক্ত, খুশী খুশী আছেন। বিশাখ-যুপ নামের একটি বনে তখন ওনারা থাকছেন। ভীম একদিন মনের আনন্দে বনের মধ্যে শিকার করতে করতে একটি গুহার মুখে এসে পড়েছেন। গুহার মুখের কাছেই একটি বিরাট অজগর সাপ শুয়ে ছিল। ভীম কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই অজগর সাপ তাকে পেঁচিয়ে

ধরলো। আগে অনেক বড় বড় রাক্ষস ইত্যাদি মারলেও, অজগরের কবলে পড়ে ভীমের নড়া চড়ার ক্ষমতা রইল না। ভীম অবাক হয়ে বললেন, এ তো সাধারণ সাপ নয়, এ নিশ্চয়ই কোন স্বর্গচ্যুত দেবতা হবেন। তখন সেই অজগর, মানুষের গলায় বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, আমি একসময় স্বর্গের রাজা ছিলাম, অগস্ত্য মুনির অভিশাপে আমি হাজার বছর ধরে সাপ হয়ে পড়ে আছি।" ভীম নিজের পরিচয় দিয়ে ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানান। কিন্তু সাপ জানান , "মুনির কথা মত, দিনের শেষে যে-ই আমার নাগালের মধ্যে আসবে তাকেই আমি শিকার করতে বাধ্য।" তবে তোমার দাদা, মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে তুমি ছাড়া পাবে। এদিকে যুধিষ্ঠির-এর হঠাৎ খেয়াল হল যে, অনেকক্ষণ বনের দিক থেকে ভীমের হুংকার শোনা যাচ্ছে না। ভীমের কিছু বিপদ ঘটেছে আন্দাজ করেই যুধিষ্ঠির বনের যেদিক থেকে ভীমের হুংকার শোনা যাচ্ছিল সেদিকে ছুটলেন।

সেই গুহার সামনে পৌঁছে যুধিষ্ঠির দেখলেন, ভীমের করুন অবস্থা। যুধিষ্ঠিরকে দেখেই সেই মহাসর্প মানুষের ভাষায় অভিবাদন জানালেন। যুধিষ্ঠিরও মহা সর্পকে অভিবাদন জানিয়ে ভাইকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। অজগর নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন যে, তিনি অগস্ত্য মুনির শাপে হাজার বছর ধরে এভাবে সাপ হয়ে পড়ে আছেন। মুনির কথা মত যুধিষ্ঠির তাঁকে শাপ মুক্ত করতে পারেন, যদি তাঁর প্রশ্নের উত্তর ঠিক দিতে পারেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে প্রশ্ন জানাতে অনুরোধ করলেন। আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ছে, বকরূপী যক্ষের সাথে যুধিষ্ঠিরের সেই বিখ্যাত প্রশ্নোত্তর পর্ব। এখানে অজগররূপী রাজা নহুষ একটিই প্রশ্নের উত্তর জানতে চান। তিনি বললেন, "ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ব্রাহ্মণ কে?" উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, "হে আমার শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষ মহারাজা , যাঁর মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় সংযম, অনৃশংসতা, তপস্যা এবং দয়া এই সকল গুণনগুলি থাকে তিনিই ব্রাহ্মণ।" প্রাক্তন স্বর্গাধিপতি নহুষও একসময় মহাজ্ঞানী ছিলেন; তিনি এত সহজে যুধিষ্ঠিরের কথা মানতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, তাহলে তো বৈশ্য, শূদ্র যে কেউ ব্রাহ্মণ হয়ে যেতে পারে! যুধিষ্ঠির জানালেন যে, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। জন্ম দিয়ে কারো বর্ণ নির্ধারণ হয় না। যার মধ্যে ঐ কটি গুণ থাকবে তিনিই ব্রাহ্মণ; আবার কোন ব্রাহ্মণ কখনো ঐ সকল চারিত্রিক গুণাবলী থেকে বিচ্যুত হলেই আর তিনি ব্রাহ্মণ থাকবেন না। আবার শূদ্র হয়ে জন্মেও কেউ যদি ঐ সকল গুণাবলি অর্জন করেন, তাঁকে ব্রাহ্মণই বলা হবে । এ কথা শুনেই অজগর সাপের মূর্তি ছেড়ে নহুষ দিব্য দেহ ধারণ করলেন; স্বর্গের দিব্য যান তাঁকে নিয়ে গেল।

মহাভারতের এই নহুষ কাহিনী আমাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করে। ব্রাহ্মণ বাড়িতে জন্মেও কোন ব্যানার্জী, চ্যাটার্জি বা ভট্টাচার্য্য যদি যুধিষ্ঠিরের বলা গুণগুলি থেকে দূরে সরে যায়, তাকে আর ব্রাহ্মণ বলা হবে না। একটা দেড় টাকার পৈতা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেই তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন না। মহাভারতে এরকম অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে ক্ষত্রিয় বা শূদ্রের বাড়িতে জন্মেও একজন মানুষ ব্রাহ্মণ হয়েছেন। আবার ব্রাহ্মণ সন্তান দ্রোণাচার্য ক্ষত্রিয় হয়ে গেলেন। স্বয়ং ব্যাসদেব জেলেনীর গর্ভে জন্ম নেন, কিন্তু তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন। প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম প্রথাকে যারা গালমন্দ করেন, তাঁদের একবার মহাভারতটা পড়ে নিতে অনুরোধ করছি।

অজগর, বিষ নেই, পেঁচিয়ে মারে।

## সর্ষের ফুল

সর্ষের ফুল নিয়ে দুটি খুবই প্রচলিত কথা চালু আছে। একটা হল চোখে সর্ষে ফুল দেখা। আর একটা হল , সর্ষে ফুল দূর থেকে ঘনই দেখায়। সর্ষে ফুল দেখা কথাটা খুবই চালু হলেও, কি করে এমন একটা ভুল কথা এভাবে চলে আসছে জানিনা। যে অর্থে ব্যবহার করা হয় কথাটা, সেদিক দিয়ে দেখলে , এটা ভুলই বলা হয়। লোকে বিপদে পড়লে বা খুব বিভ্রান্ত হলে বলা হয়, চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। সর্ষে ফুল উজ্জ্বল হলুদ রঙের। একজন লোক যখন খুব ঘাবড়ে যায় বা আমরা যাকে বলি মাথা ঘুরে পড়ে যায় , তখন সে চোখে অন্ধকার দেখে। ইংরেজীতে একে ব্লাক আউট বলে। একমাত্র যদি চোখে আঘাত লাগে তাতে কখন কখন চোখের সামনে আলোর ফুলকি দেখা যেতে পারে। সেটা সর্ষে ফুলের মত হলুদ হবে কেন ?

সর্ষে ফুল ঘণ দেখাটা কিন্তু আক্ষরিক অর্থেও ঠিক । আবার রুপকার্থেও ঠিক । মাঠে যখন সর্ষে ফুল ফুটে থাকে , একটু দূর থেকে দেখলে যতোটা ঘন দেখায় , কাছে গেলে ততোটা দেখায় না। এটা যখন রুপকার্থে বলা হয় তখন বোঝানো হয় যে , যে কোন মানুষ বা বিষয়কে বাইরে থেকে বা দূর থেকে দেখে অনেক সময়ই আমরা আসল লোকটির দোষ -গুন বা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারি না। লোকটিকে বুঝতে হলে তার সাথে মিশতে হবে। বিষয়টিকে বুঝতে হলে তার ভেতরে ঢুকতে হবে।

আমি কিন্তু আজ আক্ষরিক অর্থেই মাঠে ফুটে থাকা হলুদ সর্ষে ফুলের কথাই বলতে চাইছি। আজ থেকে বছর চল্লিশ আগে আমি যখন মেদিনীপুরের গ্রামে থাকতাম তখন এমন ব্যাপক সর্ষে চাষ দেখিনি। আলু চাষের সাথে সামান্য সর্ষে চাষ হত। তখন কিন্তু আজকের মত এমন মাঠের পর মাঠ হলুদ ফুলে ঢেকে আছে এমন দেখিনি। তার আগে দেখতাম, অগ্রহায়ণ মাসের শেষ বা পৌষ মাসের মধ্যে মাঠের আমন ধান কাটা হয়ে গেলে, মাঠে খেসারী কলাই হত। পরের দিকে, মাঠের পর মাঠ বোরো ধানের চাষ। শীত কালেও মাঠ সবুজ হয়ে থাকত। এমন মাঠের পর মাঠ হলুদ রং এর সর্ষে ফুল ফুটে আছে প্রথম দেখি উত্তর দিনাজপুর জেলায়। ১৯৯৫ সালের শীতকালে প্রথম পালস পোলিও টিকার অভিযান শুরু হয়। আমি তখন একটা বড় ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক। প্রথমবার; কারো কোন ধারণা ছিল না। জেলা আপিস থেকে জানানো হল, গ্রামে গ্রামে ব্যাপক প্রচার করে জনগণকে জানাতে হবে। আমার আটচল্লিশটি টিকা দেওয়ার সাব সেন্টার ছিল। সব মিলে একশ মত ফিল্ড স্টাফ। তাদের কিছু কিছু টাকা ধরিয়ে প্রচার করার ব্যবস্থা হল। আমার আপিসে একজন বেশ বয়স্ক আর দক্ষ কর্মচারী ছিলেন, হারাধন বাবু। গোটা ব্লকের সবকটা রাস্তা, মাঠের আল, গাছপালা ওনার নখ দর্পণে ছিল। আর চিনতেন প্রতিটি ফিল্ড স্টাফকে। আসলে উনি হাড়ে হাড় চিনতেন। সেই ঐতিহাসিক দিনটির, দিন দশেক আগে আমাকে বললেন, শুধু ফিল্ড স্টাফদের উপর নির্ভর করে হবে না, আপনাকেও প্রচারে বেরোতে হবে। জেলা আপিস থেকে একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করা হল। সাধারণত আমার সাথে হারাধন বাবু থাকতেন; মাঝে মাঝে আর এক- দু'জন। আমরা প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ব্যাপক প্রচার করে ঘুরতাম। তখনই দেখতাম, রাস্তার পাশের

মাঠে মাঠে হলুদ সর্ষে ফুল ফুটে আছে। হারাধনবাবু বা অন্য কেউ বলেছিলেন, সর্ষের ফুল আর শাক খেয়ে ঐ সময় বাচ্চাদের খুব পেটের অসুখ হয়। পেটের অসুখ অনেক হলেও সেটা সর্ষের ফুল খাওয়ার জন্য কিনা আমি জানিনা।

ধান ভাঙতে শীবের গীত কেন গাইছি? বলতে চাইছি সর্ষে ফুল -এর কথা, শুনিয়ে দিলাম পালস পোলিও টিকার অভিযান এর গল্প। আসলে ঐ অভিযানের সময় দিনাজপুর জেলার গ্রামের ভেতরে ভেতরে যেমন ঘুরেছি, আর কোন জেলায় তেমন ঘুরিনি। পালস পোলিও অভিযানের আর একটা ঘটনা বলি। ঐ প্রথম বারই , ঐ ঐতিহাসিক দিনে আমি আর হারাধন বাবু চলেছি একটা পাকা রাস্তা দিয়ে, সেই সরকারী জীপ গাড়ী করে। আজ মোবাইল ফোন এসে যাওয়ার পর , আমাদের সেই প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা ভাবলে হাসি পায়। একটা ব্লকে একশ দশটা পোলিও টিকার বুথ করা হয়েছে। দুটি মাত্র গাড়ী , আর জেলা হাসপাতালের টেলিফোনটি সম্বল। সকাল আটটা থেকে সব বুথে বিশেষ ঠান্ডা বাক্সে করে পৌঁছনো পোলিও টিকা বাচ্চাদের খাওয়ানো হবে। চলবে বিকাল চারটে পর্যন্ত। তারপর সবকটি বুথের বাক্স আর বাচ্চাদের নামের তালিকা ফেরত আনতে হবে। সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে জেলা দপ্তরে জানিয়ে দিতে হবে, কতগুলি বাচ্চাকে টিকা খাওয়ানো হয়েছে। আমার ফিল্ড স্টাফদের একটা জবাবদিহি করার সামান্য সুযোগ থাকলেও , অন্য যে সকল লোকের সাহায্য নিতে হয়েছিল, তারা ঐ শীতের সন্ধ্যায় আমার আপিসে আসতে চাইবে কেন? তাই যে যে বুথে আমার আপিসের ফিল্ড স্টাফ ছিল না, সেগুলি থেকে আমরাই বাক্স আর রিপোর্ট নিয়ে আসব, এমনই ঠিক ছিল। কথা হচ্ছিল পাকা রাস্তা দিয়ে গাড়ী করে যাওয়ার। শীতের সূর্য একটু আগেই ডুবেছে। দূরে দূরে মাঠে ফুটে থাকা হলুদ সর্ষে ফুল একটু একটু করে আবছা হয়ে আসছে। ঐ বর্ণহীন সর্ষে ক্ষেতের ওপাড়ে যে গ্রাম আছে সে আর বোঝা যাচ্ছে না। একটা মাঠের আলের মত গ্রামের রাস্তা যেখানে পাকা রাস্তায় মিশেছে সেখানে একটা ছোট্ট চালা ঘর। হারাধন বাবু বললেন, ঐ রাস্তার মুখে একজন বাক্স আর রিপোর্ট নিয়ে দাঁড়ানোর কথা। সোয়া পাঁচটা বেজে গেল, কেউ তো নেই। এবার আমাদের চোখে সর্ষে ফুল দেখার কথা। এমন সময় সেই চালা ঘরটা থেকে একজন লোক বেরিয়ে বলল, আপনারা কি "পলিয়া বাক্স" নিতে এসেছেন? দিদিমণি অনেকক্ষণ আগে আমার কাছে রেখে গেছেন। ধড়ে প্রাণ এল। সেই মহার্ঘ বাক্স আর রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এলাম।

এরপর আবার অন্য এক ব্লকে দায়িত্ব নিয়ে চলে গেলাম। নিজের চোখের ডাক্তারী ভোলানোর জন্য ওসব দায়িত্ব একেবারে আদর্শ। নিজের দায়ে খুঁজে খুঁজে চোখের ক্যাম্পে চলে যেতাম। একটা প্রত্যন্ত গ্রামে একটা ক্যাম্প হবে; একজন গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার মত লোক ডেকে গেছেন। ওনারই আসার কথা , আমাকে নিতে। দুপুরের আগে দেখি জেলার বড় কর্তা এসে হাজির। আমাকে বললেন, চলো আমার গাড়িতে, তোমার তো চোখের কাম্পে যাওয়ার কথা। এত অবাক হয়েছিলাম যে , কোন কথা জিজ্ঞেস করার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। উঠে বসলাম স্যারের গাড়িতে। মিনিট পাঁচেক

চলার পর, গাড়ী বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠের রাস্তা ধরল। গরুর গাড়ী চলার মত কাঁচা রাস্তা ধরে গাড়ী চলছে তো চলছেই। দূরে দূরে হলুদ সর্ষে ফুল ভরা মাঠ ছাড়া আর কিছুই দেখছি না।সেই হলুদ প্রান্তর পেরিয়ে এক সময় একটা ছোট্ট গ্রামে পৌঁছলাম। খুব বেশী রুগীও ছিল না। আমি যতক্ষণ রুগী দেখছিলাম, বড় সাহেব চুপ করে বসে থাকলেন। কেন যে গেছিলেন, আজও আমি জানি না। দুর্জনে অনেক কথা বলে; যে মানুষটা প্রয়াত হয়েছেন, তার সম্বন্ধে আর কিছু বলতে চাই না।

শেষ করি আর এক বড় সাহেবের গল্প বলে। কোলকাতা থেকে একটু দূরের এক জেলার বড় সাহেব আমার সেই বন্ধু। জেলাটি বেশ একটা বেড়ানোর জায়গা। এক শীতকালে বন্ধু বললেন, চলে এস বাড়ীর সকলকে নিয়ে। এক শীতের ভোরে উঠে বসলাম রেলগাড়িতে। ওরা আমাদের পুরনো পারিবারিক বন্ধু। দুপুরে পৌঁছে খাওয়া দাওয়া সেরে বেরলাম দর্শনীয় স্থানের কিছু দেখে নিতে।

প্রায় শহরের ভেতরে ভেতরেই কয়েকটা দর্শনীয় স্থানে ঘুরে নিলাম। পরদিন একটু সকাল সকাল বেরনো হল , একটু দূরের কয়েকটা জায়গা দেখার জন্য। গাড়িতে শহর ছাড়িয়ে বেরতেই দেখি সেই হলুদ সর্ষে ফুল ভরা মাঠের পর মাঠ। একটা জায়গায় গাড়ী থেকে নেমে মাঠে চলে গেলাম এখানে কিন্তু কাছে গিয়েও দেখলাম, বেশ ঘন সর্ষে ফুল। এত সুন্দর ফুলের কাছে গেলে ছবি তুলতে ইচ্ছে করেই। কয়েকটা ছবি তোলাও হল। তারপর চললাম আমাদের গন্তব্যে।

বেশ কিছু ঐতিহাসিক সৌধ দেখার পর মনে পড়ল, এদিকেই আছে আমাদের কুলদেবতার একটা বড় আশ্রম। ড্রাইভারকে বলতেই নিয়ে গেলেন। রাস্তার উপরেই বড় সিংহ দরজা। ভেতরে অনেক জায়গা নিয়ে মন্দির আর আশ্রম। মন্দিরের পাশে বেশ বড় মাঠে ফুটে আছে হলুদ সর্ষে ফুল।

চাকরী করতে উত্তর দিনাজপুর জেলায় গিয়ে ভালো করে জানলাম যে দক্ষিন দিনাজপুর বলে আর একটা জেলা থাকলেও পশ্চিম দিনাজপুর বলে আর কোন জেলা নেই। আরও জানলাম দক্ষিন দিনাজপুরের একটা বড় জায়গার নাম গঙ্গারামপুর। সেখানকার দই খুব বিখ্যাত শুনলেও খেয়ে দেখা হয়নি। অবশ্য অনেকবারই গিয়েছি গঙ্গারামপুর। একবার ওই গঙ্গারামপুর থেকে বাসে ফেরার সময় দেখি একটা হলুদ সর্ষে ফুলে ভরা প্রান্তরের মাঝে অনেক মৌমাছি পালনের বাক্স রাখা আছে। এই ব্যাপারটা জানা ছিল না। আমাদের মেদিনীপুরের গ্রামের বাড়ীতে এক সময় এরকম একটা মৌমাছি পালনের বাক্স ছিল । আমের মুকুলের সময় আর জাম গাছে ফুলের সময় খুব মধু হত। কিন্তু সর্ষে ফুলের মধুর কথা জানতাম না। জানলাম এই বাক্সগুলি ট্রাকে নিয়ে এরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেরায়। আমের সময় আম বাগানে, লিচুর সময় লিচু বাগানে বাক্সগুলি নামিয়ে রেখে ,মৌমাছিদের মধু সংগ্রহ করতে কাজে লাগায়।

অশোকনগরের গ্রাম, ৮.১.২৫.

বাঁকুড়া আমার খুব প্রিয় জেলা। জীবনের খুব সুন্দর একটা অধ্যায় ওখানে কেটেছে। আজও সময় সুযোগ হলে চলে যাই বাঁকুড়ায়। সেরকম সর্ষে ফুল ভরা মাঠ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কদিন আগেই আমার কলেজের এক দাদার বাঁকুড়া ভ্রমণের গল্প আর কিছু ছবি দেখছিলাম। তাই দেখেই মনে হল আমার সর্ষে ফুল দেখার অভিজ্ঞতা লিখেই রাখি। সামান্য কিছু ঘোরা ঘুরি করেছি আমরাও। তাই বলে একেবারে পায়ের তলায় সর্ষে বলার মত ঘোরা হয়নি। কিন্তু চোখে সর্ষে ফুল দেখার মত ঘটনা তেমন না ঘটলেও, আজও চোখ বন্ধ করে অনেক সর্ষে ফুল ভরা মাঠের ছবি দেখতে পারি। ৮.১.২১.

সস্তা

সস্তা বললেই আমাদের মনে একটা কেমন অবজ্ঞার ভাব আসে। আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব প্রায় সবাই দেখেছি, এই একটি ব্যাপারে একমত। সস্তা জিনিস ভালো হতেই পারে না। আর কদিন পরই হুগলী , মেদিনীপুর আর বর্ধমানে আলু এত সস্তা হয়ে যাবে যে, মাঠেই পড়ে থাকবে। কোন ফড়ে যদি দয়া করে তুলে নিয়ে যায়, চাষি বেঁচে যায়। মাঠে যে আলু তিন টাকা দামে বিক্রি হবে, সেটাই মাস ছয়েক পর আমরা পঞ্চাশ টাকায় কিনব। এমন একশ একটা উদাহরণ আছে। বাঁকুড়ার গ্রামের চাষি বাদামী বা কালো চাল চাষ করে বাজার পায় না। ঐ কালো চাল , কলকাতার মলে তিনশ টাকা কেজি দরেও পাওয়া যাবে না। ডুয়ার্সের চা সস্তা বলে দার্জিলিং চায়ের কাছে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু এই ডুয়ার্সের চা ভারত বিখ্যাত কোম্পানির মোড়কে বাজারে এলে আমরা খুশি মনে কিনি।

আমার এক ডাক্তার ভাই কোলকাতার বাড়িতে একটা নেড়ি কুকুর পুষেছে দেখে খুব ভালো লাগে। বিদেশী কুকুরের ছানা তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে না কিনলে মান থাকে না। অথচ এই একটা নেড়ি কুকুর চটকেল আমাদের গ্রামের বাড়িতে চন্দ্রবোড়া সাপ আটকে হিরো হয়ে গেছে। এই নেড়ীরা যে কত অভাগার মত থাকে ভাবা যায় না। বাড়ীর এটোকাঁটা খেয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়।

ছোটকেল

পাড়ার যুগলের সেলুনে তিরিশ টাকা দিয়ে চুল কাটালে মান থাকে না; ভারতজোড়া ছড়িয়ে থাকা হেয়ার স্টাইল ডিজাইনার- এর কাছে তিনশ টাকায় চুল কেটেছি বললে বন্ধু মহলে বেশ মান বাড়ে। এসব দেখেই যুগলরাও এখন নতুন নতুন ছক বের করছে, চুল কাটতে গেলে ম্যাসাজ, মুখে সাবান, চুলে রং এসব করে একটু পয়সা করছে। বাড়িতে একটা দাড়ি কাটার সরঞ্জাম রাখলেই সবদিন নিজেই দাড়ি কামানো যায়; তবু দেখি সব সেলুনেই দাড়ি কামানোর লোকের লাইন। সেলুনে দাড়ি কামাতে গিয়ে কতো মারাত্মক রোগ ছড়াতে পারে, এসব কি লোকে জানে না?

বাজার থেকে সবথেকে ভালো কাপড় কিনে, ভালো দর্জি দিয়ে প্যান্ট বানিয়ে দেখেছি, ভারত বিখ্যাত কোম্পানির ঝাঁ চকচকে দোকানের প্যান্টের চার ভাগের এক ভাগ দাম পড়ছে। কিন্তু ঐ চারগুণ দামের দোকানের প্যান্টটি না পরলে মান থাকে না।

আমি তিরিশ বছর আগে মেদিনীপুর শহরে কুড়ি টাকা ফি নিয়ে রুগী দেখতাম। একজনকে একটা চোখের ড্রপ লিখে দিলাম। পাঁচ মিনিট পর ফিরে এসে বলল, মাত্র সাড়ে তিন টাকার ওষুধে কাজ হবে? বুঝিয়ে পারলাম না। আমার কাছেই একজন পুরনো ডাক্তারবাবুর চেম্বারে গিয়ে ঢুকল দেখলাম। আমার কিছু শিক্ষা হল। সেই শিক্ষা কদিন পরেই চশমার ব্যবসায়ীকে শেখালাম। বেচারা বি কম পাশ করে বেকার বসে ছিল; আমার চেম্বারের সামনে গোটা তিরিশেক চশমার ফ্রেম নিয়ে বসে থাকত। একদিন জানতে চাইলাম, তোমার এসব ফ্রেমের দাম কত? বলল, কুড়ি -বাইশ টাকা। শুনে অবাক হয়ে গেলাম। মেদিনীপুর শহরে তখন ওসব ফ্রেম ষাট সত্তর টাকায় বিকোয়। ওকে বললাম, এত সস্তা দাম বললে লোকে ভরসা পাবে না, ভাববে কোন নকল জিনিস। তুমি অন্তত একান্ন টাকা দাম বলবে, লোকে দরাদরি করলে এক টাকা দাম কমিয়ে দেবে। তিরিশ বছর পর আমার সেই বন্ধুর দোকানে এখন পাঁচ জন কর্মচারী।

লোককে আর কি বলব; আমার নিজের একটা চোখের ছানি অপারেশন হল। ভারত বিখ্যাত হাসপাতালে ওদের সবথেকে দামী অপারেশন করালাম। চশমা না পরলে তিন লাইনের বেশী দেখি না। আমি নিজেই এক মহিলার চোখের ছানী অপারেশন করেছিলাম, হাসপাতালে, আমার অপারেশন এর মাস দেড়েক আগে। সাধারনত অপারেশন এর মাস খানেক পর এদের চশমা নিতে ডাকা থাকে। এই মহিলা আসেননি। আমার নিজের অপারেশন -এর মাস দুই পরে একদিন এলেন। বললাম, এত দেরী করে এলেন কেন? চশমা নিতে ডেকেছিলাম না? মহিলা বেশ জোর দিয়ে বলেন, চশমা কেন নেব? আমি তো সবই দেখতে পাচ্ছি! নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। পড়তে বললাম; একেবারে শেষ লাইন পর্যন্ত পড়ে দিলেন। অথচ ওনার চোখে সরকারী হাসপাতালের সস্তা লেন্স লাগিয়েছি।

আমার বন্ধু ডা গুন, ডা ভট্টাচার্য, আমাদের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় ডা পি কে সরকার স্যর খুব সস্তা ওষুধ দিয়ে, সব রকম রুগীর চিকিৎসা করেন। এই ওষুধগুলো জেনেরিক ওষুধ বলে পরিচিত। বাজারে নামী কোম্পানির একই ওষুধ দশগুণ বেশী দামে বিক্রি হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এত সস্তা ওষুধে কাজ হবে কি না, এমন সন্দেহ থেকেই যায়। কিন্তু যে তিনজন ডাক্তার বাবুর কথা বললাম, ওনারা তো তিরিশ বছর বা তারও বেশিদিন ধরে এই সস্তা ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। রুগীর রোগ না সারলে ওনাদের কাছে যাচ্ছে কেন?

সস্তা,আসলে বিনা পয়সার সরকারী হাসপাতাল সম্বন্ধে বাঙালী মধ্যবিত্তের সাংঘাতিক উন্নাসিকতা I এই করোনা অতিমারীতেই দেখলাম, আমাদের শ্রদ্ধেয় স্বাস্থ্য অধীকর্তা নিজে সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সুস্থ হলেন ; তবুও লোকে পাঁচতারা বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে উনিশ লাখ টাকা খরচ করলেন I একজন বিদুষী মহিলার সাথে আমার তর্কাতর্কি হয়ে গেল I তাঁর মতে ,“ভদ্রলোকেরা সরকারী হাসপাতালে যায় না” ! তাহলে যে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন সরকারী হাসপাতালে গিয়ে লাইন দিচ্ছেন , তাঁরা সবাই কি “ ছোট লোক “ ? এ কথা বলায় চটে গেলেন I আসলে মধ্যবিত্তের এই মানসিক বাধাটি কোনদিনই যাবে না।

এই সস্তা যে কোন জিনিস সম্বন্ধে আমাদের যে মানসিক বাধা বা মেন্টাল ব্লক, এটা প্রায় সর্বজনিন। আমি আমার খুব পরিচিত দোকানে কয়েকটা জিনিস কেনার পর জানতে চাইলাম , বিরীয়ানিতে দেওয়ার গোলাপ জল আছে কি না ;তাক থেকে একটা মাঝারী সাইজের বোতল বের করে বলল ,দশ টাকা। চমকে গেলাম ; এত সস্তা? দোকানদার বলল, একই জিনিস অন্য দোকানে কুড়ি টাকা। কিনে তো আনলাম; ও জিনিস খাওয়ার সাহস হল না। এই বস্তু তো হাজার হাজার লোক খাচ্ছে। আমার মেয়ে একটা কালো রঙের সেলাই-এর সুতো কিনতে বলেছিল। দোকানে যাওয়ার সময় একটা দু'শো টাকার নোট আর দু'টি দশ টাকার নোট নিয়ে বেরোলাম। দোকানে একটা কালো সুতো দিতে বললাম; দোকানদার বললেন, চার টাকা। বুঝলাম , দশ টাকার নোট দিলেও বিরক্ত হবে। দু টো দিতে বললাম । এত কম দামে কি করে এ জিনিস দিচ্ছে ভেবে পেলাম না। ঐ সুতোর সস্তা দাম থেকেই এই

“ সস্তা” লেখাটা মাথায় এল । সত্যিই কি সস্তার তিন অবস্থা ? আসলে আমাদের এই মানসিক বাধাই অসাধু ব্যবসায়ীদের মূলধন।

সাদা চামড়ার লোক

দু হাজার সাত সাল থেকে সাপের কামড় নিয়ে কাজ করছি। সম্ভবত দু'হাজার নয় কি দশ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাপের কামড় বিশেষজ্ঞ , অক্সফোর্ড এর অধ্যাপক, ডেভিড ওয়ারেল সাহেবের সাথে ই -মেলে যোগাযোগ শুরু। তারপর থেকেই আমাদের এই সাপের কামড় নিয়ে কাজের সূত্রে যোগাযোগটা থেকেই গেছে। ঐ রকম বিশাল পন্ডিত, ঐ রকম ব্যস্ত মানুষ যে আমার মত সামান্য একজন মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখছেন, এটাই আশ্চর্য হাওয়ার মত ব্যাপার। আগে একটা নিবন্ধে লিখেছিলাম, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, আমাদের মেদিনীপুরের গ্রামের বাড়িতে দু'জন আমেরিকান সাহেব এসেছিলেন। তখন একটা কথা খুব চালু ছিল, "সি আই এর চর"! আমরা অবশ্য সেই প্রাইমারী স্কুলে পড়ার বয়সে, ঐ চর জিনিসটা ঠিক খায় না মাথায় দেয় , কিছুই জানতাম না। আবার এটাও ঠিক যে, ঐ দুই সাহেব কি জন্য এদেশে এসেছিল, বা কি জন্য মেদিনীপুরের ঐ প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়েছিল, আমরা আজও কিছুই জানতে পারিনি। পঞ্চাশ বছর আগের পৃথিবী আর আজকের পৃথিবী এক নয়।

এখন একজন বিদেশী যে কোন দেশে ঢুকলেই তার কোষ্ঠী ঠিকুজি নতুন দেশের প্রশাসনের কাছে চলে আসে। আর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে কোন বিশেষজ্ঞের কোষ্ঠী ঠিকুজি ইন্টারনেট থেকে বের করতে মিনিট তিনেক বা তারও কম সময় লাগে। অবশ্যই জানার সদিচ্ছাটা থাকে যদি। আর যদি এঁড়ে তর্ক করার জন্য নিজের গোঁ ধরে রাখতে চাই, তাহলে বলতে পারি, নিজের বাবা -দাদাকে কি আমরা ভালো করে চিনি সবাই?

আমার এক বিশ্ব বিখ্যাত পন্ডিত শুভানুধ্যায়ী আমাকে একটু কটু ভাবেই বলেছিলেন, " এসব সাদা চামড়ার লোকেদের সাথে মুখ শোকাশুকি ভালো নয়!" সেই শুভানুধ্যায়ী দাদা নিজে অবশ্য সাদা চামড়ার দেশেই পড়ে আছেন, অন্তত বছর তিরিশ। হতে পারে , উনি আমার থেকে হাজার গুণ বেশী সাদা চামড়ার লোকেদের দেখেছেন, তাদের কাছে ঠকেছেন, তাই আজ এসব কথা বলতে পারছেন। কিন্তু ওনার সাথে সাহেবদের সম্পর্ক আর আমার সাথে ওয়ারেল সাহেবের সম্পর্ক একেবারেই আলাদা। আমার সেই শুভানুধ্যায়ী দাদা, সাহেবদের দেশে গিয়ে, তাদের সাথে পেশাগত প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। আর আমার সাথে এই সাহেবের সম্পর্ক ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক।

এই প্রোফেসর ওয়ারেল সাহেবের কাজটা কি একটু জানা দরকার। উনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক। ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিভাগ যে সকল রোগ নিয়ে কাজ করে, সেগুলি মূলত আমাদের দেশের মত গ্রীষ্ম প্রধান দেশের অসুখ। ইংল্যান্ড আমেরিকার মত শীতের দেশে সে সকল রোগ হয়না বললেই চলে। তবুও ঐ শীতের দেশের একটা পৃথিবী বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও এসব অসুখ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা আর চর্চা কেন হয়? এর অনেকগুলি কারণ আছে বা থাকতে পারে। নিন্দুকেরা বলবেন, এক সময় আমাদের দেশের মত বহু গরমের দেশ, ঐ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল, তাই তারা এসব রোগ নিয়ে চর্চা করতেন। আর আজকের পৃথিবী

শাসন করে অর্থনীতি' এটা বোধহয় যে কোন মাধ্যমিক পাশ ছাত্রও জানে। ওষুধ ব্যবসা এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের একটা বড় অস্ত্র, এটাও আজ আর গোপন রাখার মত ব্যাপার নয়। হতে পারে, আমাদের পুরনো প্রভুরা সুক্ষ কৌশলে, এখনও আমাদের উপর অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্যই আমাদের দেশের রোগ জ্বালা নিয়ে এখনও চর্চা করে যাচ্ছেন। আমরা যারা এখনও ,"সব থেকে অবহেলিত গ্রীষ্মের দেশের অসুখ" , সাপের কামড় নিয়ে বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছি, তারা জানি, এই ট্রপিক্যাল ডিজিজের মধ্যে," মোষ্ট নেগলেক্ট " অসুখ নিয়ে কাজ করা, গবেষণা করা তো দূরের কথা; সভা সমিতিতে এ নিয়ে একটু আলোচনা করাও কতো কঠিন।

এই দেশে সরকারী হিসেবেই বছরে আটান্ন হাজার মানুষ সাপের কামড়ে মারা যান, গত প্রায় কুড়ি বছর ধরেই এটা চলছে। আর ,আমরা যারা এই নিয়ে কিছু খবর রাখি, আমরা জানি, এই মৃত্যুর সংখ্যাটা দু- তিন লাখ হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমরা এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি, আমাদের দেশের বাদামী সাহেবদেরই ভীষন উন্নাসিক ভাব। বাদামী সাহেব বলতে কাদের কথা বলতে চাইছি, নিশ্চয়ই বিশদে বলার দরকার নেই। আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকদের হাজারে একজনও এই সাপের কামড় নিয়ে ভেবে "বাজে সময় নষ্ট" করতে চাননা। তারা গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঁচ হাজার টাকা দামের সাপে কাটার অ্যান্টি ভেনম দেওয়ার থেকেও বেশী জরুরী মনে করেন, সব হাসপাতালে কোটি টাকার এম আর আই মেশিন থাকা।

এই বাদামী সাহেবরাই আজ দেশ চালাচ্ছে। আমি যেহেতু জন্মেছি, সাদা চামড়ার সাহেবরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় বেশ কয়েক বছর পরে, তাই তারা কেমন ছিল, আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু বই পত্র পড়ে যা বুঝেছি, সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। বহু বহু উদাহরণ আছে। আমি শুধু আমার চেনা এই অধ্যাপক সাহেবের কথাই বলছি। একটা কনফারেন্স -এ এই সাহেবকে আনতে হলে, বছর দেড়েক আগে থেকে দিন ক্ষণ ঠিক করে জানাতে হয়, এতোই ব্যস্ত মানুষ। সারা বছরই গোটা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বছর পাঁচেক আগে , এ দেশে গোটা তিনেক জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রন নিয়ে এসেছিলেন।

কলকাতায় আসার আগে দিল্লিতে গেছিলেন। ওখানে আমাদের দেশের এক বাদামী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে, 'সাপের কামড়' -এর সমস্যা নিয়ে কিছু বলতে গিয়েছিলেন। বেশ কটু কথা শুনে এসেছেন। গোটা পৃথিবীর কাছে মান সম্মান পাওয়া একজন বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ মানুষ, তার ছেলের বয়সী আমার কাছে যেটুকু বলা সম্ভব, সেটুকুই বলেছেন। আমি যা বুঝেছি সেটা হল, আমাদের দিল্লির বাদামী সাহেব ওনাকে বলেছেন, " সাপের কামড় আমাদের দেশে কোন সমস্যাই নয়, আপনারা বিদেশী লোকের এটা নিয়ে বেশী মাতামাতি করছেন!" ঐ বিশাল পন্ডিত মানুষটির কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। আর আমাদের বাদামী সাহেবরা যে এভাবেই কথা বলতে অভ্যস্ত সেটা আমাদের জানা আছে। সেই ঘটনার বছর দুই- আড়াই পরে, আমাদের মুম্বই- এর এক সহযোদ্ধা মহিলা, দিল্লির ঐ রকম এক বাদামী সাহেবের সাথে দেখা করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলেন। একেও প্রায় একই রকম কড়া কথা শুনে আসতে হয়েছে। সচিব স্তরের সেই মহিলা বলেছিলেন, "দেশের সব জেলা হাসপাতালে সাপের কামড়ের চিকিৎসা হয়, আপনারা আর কি চান?" আমাদের পশ্চিম বাংলার সবকটা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই সাপের কামড়ের চিকিৎসা হয়, এখানকার মানুষ ভাবতেই পারবে না যে, বিহার, উত্তর প্রদেশে, মধ্য প্রদেশে এক একটা জেলা হাসপাতাল থেকে দুশো আড়াইশ কিমি দূরের গ্রামের মানুষকে সাপে কামড়ালে তাদের কি দুর্দশা হয়। শুনতে হতাশাজনক লাগলেও এটাই গ্রামীণ ভারতের বাস্তব চিত্র। আমার কেরালার বন্ধু ডা জীবন কুরুভিল্লা ছত্রিশগড়ের এক প্রত্যন্ত

গ্রামে, একটি মিশনারী হাসপাতালে কাজ করছেন। ওদের হাসপতালের দু'শো কিলোমিটারের মধ্যে কোন শহর নেই। এই মিশনারী হাসপতালের কথা বলতে গিয়েই মনে এল এক খৃষ্টান মিশনারী সাহেবের কথা।

বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের দ্বিতীয় প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, রেভারেন্ড এ ই ব্রাউন সাহেব। এদের আমরা এখনও খৃষ্টান পাদ্রী বললেই ভালো চিনি। এই পাদ্রীদের ইতিহাস যেটুকু জানি, তাতে মনে হয় , এনাদের এদেশে আসার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার। ধর্ম প্রচার যে কোন শাসকই করতে পারেন; বা বলা ভাল করেছেন। আমাদের দেশের মহান সম্রাট অশোকও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছ্যেন। তারপর মুঘল সম্রারাও ধর্ম প্রচার করেছেন। এক এক জন শাসকের কাজের ধারা এক এক রকম। আজ কয়েকশ বছর পর, নিরাপদ দূরত্বে বসে তাদের কাজ কর্মের সমালোচনা, পর্যালোচনা খুব সহজ। আমি ঐ ব্যাপক তর্ক বিতর্ক যোগ্য ব্যাপারের মধ্যে আর যেতে চাই না। ইংরেজ সরকার কি উদ্দেশ্যে বাঁকুড়ার মত প্রত্যন্ত জেলায় ওরকম বড় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তার খবরে আজ আর আমাদের কিছুই আসে যায় না।

কিন্তু এই কলেজটি যে বাঁকুড়া সহ আশপাশের কয়েকটি জেলার মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে বিশাল ভূমিকা পালন করে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার নিজের গ্রাম মেদিনীপুর জেলার ( সংযুক্ত) এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। আমাদের গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত বাজে ছিল, উনিশশো পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত। আমার বাবা আঠারো কিলো মিটার রাস্তা হেঁটে পাঁশকুড়া স্টেশনে এসে রেল গাড়িতে উঠতেন। আমি নিজেই ঐ পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত ,পাঁচ মাইল রাস্তা হেঁটে এসে, লোয়াদা বাজার থেকে বাস ধরে শহরের দিকে গিয়েছি।সেই প্রত্যন্ত গ্রামের থেকে , অধুনা প্রয়াত শ্রদ্ধেয় কিশোরী মোহন মন্ডল মশাই বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন। সে আজ থেকে একশ বছর আগে । আমি শুনেছি, আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কিশোরী বাবু , আমাদের ডেবরা থানার প্রথম স্নাতক ছিলেন। আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, পোষ্ট আপিস সবই ঐ কিশোরীবাবুর উদ্দোগে তৈরী। আমার গ্রামে শিক্ষার প্রসারের উৎস যে বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ , এটা আমার গ্রামের নিরানব্বই শতাংশ মানুষই জানেন না।

একই ভাবে, আমার কলেজ, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনেও যে ঐ রেভারেন্ড ব্রাউন সাহেবের বেশ কিছু অবদান আছে, সেকথা আমি জানলাম, কলেজ থেকে পাশ করে আসার আটত্রিশ বছর পর। আমি বাঁকুড়ায় থাকার সময় ঐ বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ বাইরে থেকে দেখেছি। আমরা ওখানে যাওয়ার আগে , ঐ খ্রীষ্টান কলেজ –এ প্রিমেডিক্যাল এক বছর পড়ানো হত। ঐ কলেজের একটি ছাত্রাবাসের নাম " ব্রাউন হোষ্টেল" , এটুকুই জানতাম তখন । কে ব্রাউন সাহেব, বা কোনটা তাঁর নামাঙ্কিত ছাত্রাবাস কিছুই জানা ছিল না। মাত্রই বছর দুই আগে (২০১৯ সালে) একবার বাঁকুড়ায় গিয়ে , বাইরে থেকে ঐ ছাত্রাবাসটি দেখে এসেছি।

এই ছাত্রাবাসটি দেখতে যাওয়ার পিছনেও একটি সুন্দর ইতিহাস আছে। আমি জানিনা, আজও বাঁকুড়া জেলার কজন জানেন , ওখানকার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনেও যে ঐ রেভারেন্ড ব্রাউন সাহেবের বেশ কিছু অবদান আছে। তার থেকেও চিত্তাকর্শক একটি ইতিহাস আছে , ঐ সাহেব আর তাঁর সন্তানদের নিয়ে। রেভারেন্ড ব্রাউন সাহেবের কন্যা এবং পুত্র বাঁকুড়াতেই জন্মেছিলেন। সে আজ থেকে একশ পাঁচ বছর কি তারও বেশী পুরনো খবর।এখন নেটে খুঁজলেই দেখা যায় , ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে সোনার পদক জয়ী গডফ্রে ব্রাউন আর রূপোর পদক জয়ী অড্রে ব্রাউনের জন্মস্থান লেখা আছে , ভারতের বাঁকুড়া। সেই ১৯১১ সাল ,যে

বছর দেশীয় দল মোহনবাগান, সাহেবদের দলকে ফুটবল খেলায় হারিয়ে দিয়ে ইতিহাস গড়েছিল, সে বছরই রেভারেন্ড ব্রাউন সাহেবের বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজে প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আসা। উনি বাঁকুড়ায় ছিলেন ১৯২৭ সাল পর্যন্ত।

বাঁকুড়ায় সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় চল্লিশ বছর আগে ১৯১২-১৩ সালে বাঁকুড়ায় সম্মিলনী নামে একটি সংস্থা তৈরী হয়। বাঁকুড়ার বেশ কিছু মহান ব্যক্তির সাথে এই ব্রাউন সাহেবও ছিলেন ঐ সংস্থার সাথে। প্রবাসী সম্পাদক ও বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামও দেখছি প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে। ১৯২২ সালে তৈরী হল বাঁকুড়ায় সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল। অর্থাৎ ,সামনের বছর তার শতবার্ষিকী। এখনকার মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছের মালিয়াড়া গ্রাম তখন ছিল বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ঐ গ্রামের মানুষ , দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় তখন কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারক হয়েছেন। উনিও সম্মিলনী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। মালিয়াড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী ভবতোষ বটব্যাল মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ডা উত্তম কুমার বটব্যাল আমার কলেজের দাদা। বাড়ীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের মূল্যবান ঐতিহ্যকে , উত্তমদা নিজের বলিষ্ঠ লেখনিতে ধরে রাখছেন। ওনার লেখা থেকেই জানতে পারি,বাঁকুড়ায় সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে ব্রাউন সাহেবও ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়। এমন কি মেডিক্যাল স্কুলের প্রথম শব ব্যবচ্ছেদের সাথেও ব্রাউন সাহেবের নাম জড়িয়ে আছে।

এই সাদা চামড়ার ব্রাউন সাহেবের অবদানের সাথে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেব , ভগিনী নিবেদিতার অবদানের তুলনা করেছেন,স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রনম্য ভবতোষ বটব্যাল মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র। হেয়ার-নিবেদিতা-ব্রাউন সাহেবরা ইতিহাসে চলে গেছেন। আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় ওয়ারেল সাহেবকে দেখছি। এনার অবদান আজ আমার দুর্ভাগা দেশ বুঝতে পারছে না। আগামী প্রজন্ম এনাদের কথা মনে করবে, এইটুকুই আশা করতে পারি। অবশ্যই সে ইতিহাস পড়ার জন্য এই অধমও তখন এ জগতে থাকবে না।( ৫.৬.২০২১)

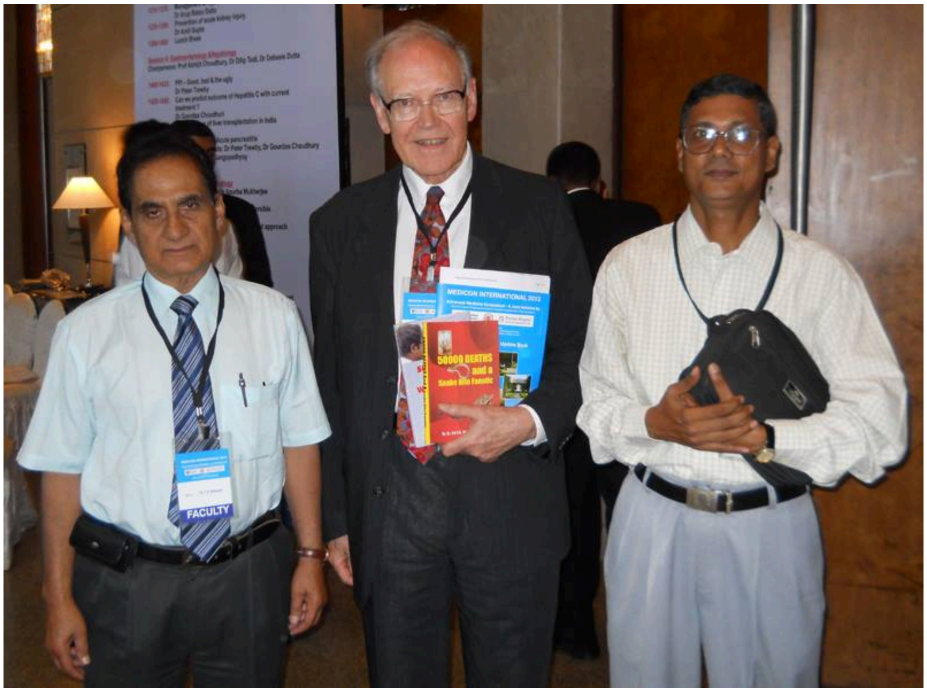

ওয়ারেল স্যারের সাথে, কোলকাতায়

## সাপের কামড় - কি করনীয়        ডা দয়াল বন্ধু মজুমদার

সাপের কামড় নিয়ে গত এগারো বছরে অসংখ্য আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণের ক্লাশে বলা, জনসচেতনতা ইত্যাদি করতে গিয়ে দেখেছি, এই বিষয়টি প্রায় সর্বস্তরের মানুষজনের কাছে এখনও পরিস্কার নয়। এই স্বচ্ছ ধারণার অভাবটা কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক, নতুন পাশকরা ডাক্তারবাবু, উচ্চ পদাধিকারী কর্মচারি, শিক্ষক, ছাত্র, আপামর জনগন সবার ভেতরেই দেখেছি। এমনকি বিজ্ঞান আন্দোলন করা লোকজনও এর মধ্যে পড়েন।

ক'মাস আগেই একটা ক্লাশে স্কুলের শিক্ষক আর কয়েকজন বিদ্যালয় পরিদর্শককে এই সাপের কামড় নিয়ে বলছিলাম। একজন শিক্ষক বলছিলেন যে, ওনারা অনেক বছর ধরে বিজ্ঞান আন্দোলন করছেন, সাপের কামড়ের বিষয়ে সচেতনতার কাজও তার মধ্যে আছে। উনি এক ঘন্টার ঐ ক্লাশের শেষে নিজেই বললেন যে, এতদিন অনেক ভ্রান্ত ধারনা ছিল। আমরাও গত বেশ কয়েক বছর এই সাপের কামড়ের চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখেছি, সাধারন তো বটেই, শিক্ষিত লোকজনের বহুযুগ ধরে জেনে আসা ভ্রান্ত ধারনা কাটিয়ে, চিকিৎসা করাটাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এজন্যই সাপে কামড়ালে কি করব আর কি করব না, এ নিয়ে বলতে হলে, প্রথমেই বলি যে, যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ধারনাগুলি নিয়ে বসে থাকবেন না। যেটা করতে হবে, তার প্রথম পদক্ষেপটিই হল, হাসপাতালের ডাক্তারবাবু যে চিকিৎসাটা করতে চাইছেন, সেটা করতে দিন।   আপনার রুগীকে সুস্থ করে তোলাটাই যে কোন চিকিৎসকের প্রথম লক্ষ্য। আপনার রুগীর ক্ষতি করার জন্য কোন ডাক্তারবাবু কোন পুরস্কারও পাবেন না।

এবার এক এক করে বলি কাউকে সাপে কামড়ালে কি করবেন, আর কি করা যাবেনা। কাউকে বা আপনাকে নিজেকেই যদি সাপ বা অজানা কিছু কামড়েছে মনে হয়; আশেপাশের কাউকে ডেকে ব্যাপারটা জানান। অন্ধকারে থাকলে, তাড়াতাড়ি একটা টর্চ আনতে বলুন। যাকে কামড়েছে, উনি স্থির হয়ে বসে থাকবেন। অন্যরা এক দু মিনিট আশেপাশের জায়গায় কোন সাপ আছে কিনা দেখার চেষ্টা করবেন। সাপ খোঁজা বা মেরে ধরে আনার জন্য সময় নষ্ট করবেন না।

এখানে বলে রাখি, এখনকার চিকিৎসাটা পদ্ধতিতে, সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্য সাপ চেনার কোন দরকার নেই। যে সাপেই কামড়াক, চিকিৎসা হয়, রোগ লক্ষণ দেখে। এজন্য সাপটিকে খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট না করাই ভালো। সাপ যদি দেখতে পান, যদি কোন সর্পবিদ উপস্থিত থাকেন, তাঁর কাছে জেনেনিন সাপটির সঠিক পরিচয়। সাপ মেরে বা ধরে, কখনই হাসপাতালে আনবেন না। অনেক সময়ই তাতে হিতে বিপরীত হয়েছে।

যুগ যুগ ধরে চলে আসা, "বাঁধন দেওয়ার" কোন দরকার নেই। বাঁধনে বিষ আটকায় না। এতেও হিতে বিপরীত হয়েছে অনেক সময়।

কামড়ের জায়গায় কোন রকম ধোওয়া বা ওষুধপত্র দিয়ে পরিস্কার করার দরকার নেই। কুকুরের কামড়ে জায়গাটা ভালোকরে সাবান দিয়ে ধুতে বলা হয়। তার থেকেই ভ্রান্ত ধারনা তৈরী হয়েছে যে, সাপ কামড়েও বোধহয় ধুয়ে দিতে হয়; এটা একেবারে ভুল ধারণা। ধোওয়া বা ঘসাঘসি করলে বিষ আরও দ্রুত ছড়িয়ে যায়। হাতে কামড় হলে, তাড়াতাড়ি ঐ হাতের আংটি, চুড়ি, বালা ইত্যাদিকে খুলে ফেলুন। একটু পরেই হাত বা আঙুল ফুলে উঠলে ঐ সব গয়না কেটে বসতে পারে। যদি সম্ভব হয়; (আমরা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে উচ্চতর হাসপাতালে পাঠানোর সময় এটা করে ভালো ফল পেয়েছি), হাসপাতালের কাউকে ফোনে জানিয়ে রাখুন যে, একজন সাপকামড়ের রুগী ওখানে যাচ্ছে।

যদি খুব কাছাকাছি আম্বুলেন্স থাকে, ডেকে নিন। বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে আম্বুলেন্সের জন্য দেরী না করে, মোটর বাইকে আহতকে বসিয়ে নিকটবর্তী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকে রওনা দিন।

এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যাপারটি সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষের ধারনা পরিস্কার নয়। প্রথম কথা হল, ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চব্বিশ ঘন্টা ডাক্তার থাকতে হবে। ওখানে রুগী ভর্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোন প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, যেখানে ঐ দুটি ব্যাপারে নিশ্চয়তা আছে, সাপের কামড়ের চিকিৎসা সেখানে হবেই। অন্য যে কোন রোগের ক্ষেত্রে, শহরের বড় হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা ভালো থাকতে পারে। কিন্তু এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসাই সব সময় ভালো। কারন, সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে প্রতিটা মিনিট গুরুত্বপূর্ণ। শহরের বড় হাসপাতালে যেতে যদি পনের মিনিট বেশী লাগে, সেটাই প্রাণঘাতী হতেপারে। অবশ্য যদি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বা বর্ধমানের মত গ্রামীণ মেডিক্যাল কলেজের দু চার কিমির মধ্যে সাপে কামড়ায়, সেক্ষেত্রে ঐসব হাসপাতালেই তাড়াতাড়ি পৌছন সম্ভব।

আর একটা বিষয় নিয়ে সাবধান করা খুব জরুরী। কোন অবস্থায়ই আহত ব্যক্তি নিজে সাইকেল বা মোটর বাইকে রওনা দেবেন না। প্রথম অবস্থায় শরীর বশে থাকলেও, কোন কোন সাপের কামড়ের পর , পনের কুড়ি মিনিটেই হাত পা অবশ হয়ে আসবে। সেক্ষেত্রে বাজে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সাইকেল চালানোর মত শরীর চালনার কাজে শরীরে রক্ত চলাচল দ্রুত হয়, তাতে বিষও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

আমাকে প্রায়শঃই একটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সাপের কামড়ের প্রাথমিক চিকিৎসা কি? উত্তরটা হল, প্রচলিত অর্থে, সাপের কামড়ের কোন প্রাথমিক চিকিৎসা নেই। কামড়ের পর, আহতকে আতঙ্কগ্রস্ত না করে, দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই একমাত্র কাজ।

কি কি করবেন না, সেই তালিকায় আর দুই একটা জিনিস জানিয়ে রাখি। কেটে চিরে বা বিষপাথর ইত্যাদি দিয়ে বিষ বেরকরার কোন চেষ্টাই করবেন না। কামড়ের জায়গায় কোন রকম ছোপ বা গাছগাছড়ার প্রয়োগ করবেন না। কোনরকম অনুপান বা টোটকা ওষুধ খাওয়াবেন না। কোন ওঝা গুণীন জাতীয় লোকের কাছে নিয়ে গিয়ে এক মিনিট সময়ও নষ্ট করবেন না। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু ছাড়া আর কারও কোন পরামর্শে কান দেবেন না। এমনকি হাসপাতালের অ-ডাক্তার কর্মচারিও আপনাকে বিপথে চালিয়ে বিপদ বাড়াতে পারে।

প্রাথমিক আন্টিভেনম ইত্যাদির প্রয়োগের পর ডাক্তারবাবুদের যদি মনে হয় কোন উচ্চতর হাসপাতালের বিশেষ চিকিৎসার জন্য রুগীকে শহরে নিয়ে যেতে হবে, তাহলে তাঁর লিখিত রেফার লেটার নিয়েই রওনা দেবেন। ওটি না নিয়ে গেলে, পরের হাসপাতালে চিকিৎসা বিভ্রাট হতেপারে। সাপেকাটা রুগী নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার সময়, বাড়ীর বা সাথের লোকের নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজ আছে। খেয়াল রাখবেন, রুগী যেন বেশী নড়াচড়া না করে। হাঁটা বা দৌড়ান একেবারেই চলবে না।

কামড়ের জায়গায় কি কি পরিবর্তন ঘটেছে, ভালোকরে লক্ষ করে চলুন; চিকিৎসার জন্য ডাক্তারবাবু ঐ জিনিষগুলি জানতে চাইবেন। যেমন, কামড়ের জায়গা থেকে রক্ত বেরচ্ছিল কি না, জায়গাটা ক্রমশ ফুলে যাচ্ছে কি না, কামড়ের জায়গার আশপাশের চামড়ার রং পাল্টে গেল কি না।

এছাড়া রাস্তায় যাওয়ার সময় রুগীর মনোবল বাড়ানোর জন্য তাকে আশ্বস্ত করে কথা বলতে বলতে চলুন। রুগী কি কি কষ্টের কথা বলছিল, বা কতক্ষণ আগে পর্যন্ত কথা বলছিল, এগুলিও সঠিক চিকিৎসার জন্য জরুরী। অনেক সময়ই হাসপাতালে পৌছনোর আগেই রুগী কথা বলার ক্ষমতা হারায়; সেক্ষেত্রে সঙ্গের লোকজনের বলা কথা শুনেই চিকিৎসা করতে হয়।

সাপে কামড়ালে কি করবেন? এক কথায় উত্তর, যতো দ্রুত সম্ভব রুগীকে সবথেকে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে চলুন। আর কি করবেন না? ওঝা গুণীনের বাড়ী যাবেন না, একথা সবাই বলবে। আমি বলি, শহরের বড় হাসপাতালে যাওয়ার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করবেন না।

আমাদের গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কালাচ বা কালাচিতি সাপের চিকিৎসা করার ক্ষেত্রেই সমস্যা হয় সবথেকে বেশী। এই সাপটি অত্যন্ত রহস্যময়। সাধারনত রাত্রে , খোলা বিছানায় এসে এই সাপে কামড়ায়। সূক্ষ্ম মশার কামড়ের মত , প্রায় ব্যথাবিহীন কামড় , অধিকাংশ আক্রান্ত ব্যক্তিই বুঝতে পারেন না। সকাল বা ভোর রাতে পেটে ব্যথা , গলায় ব্যথা , গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা এরকম নানান বিচিত্র উপসর্গ নিয়ে এসব রুগী হাসপাতালে আসে।

হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা তাঁদের শিক্ষিত চোখে , সাপে কামড়ের রোগ লক্ষণ বুঝতে পারেন। কিন্তু যুগ যুগ ধরে চলে আসা ভ্রান্ত ধারণার জন্য , প্রায়ই রুগী বা তার বাড়ীর লোক , এটাকে সাপের কামড় বলে মানতে চায়না। ওই যে , " বিষধর সাপের কামড় মানেই দুটি দাগ থাকবে" , এই বিভ্রান্তিকর ধারনাটা মারাত্মক। কালাচ সাপ কামড়ের সুক্ষ্ম দাগ খুঁজেই পাওয়া যায় না। কামড়ের দাগ খোঁজা , ইত্যাদি করতে গিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট হয় । এই সময় নষ্টের কারনেই বেশ কিছু কালাচ সাপ কামড়ের রুগীকে, পর্যাপ্ত সাপের ওষুধ , এ ভি এস দিয়েও বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারবাবুর উপর ভরসা রাখুন। সাপের কামড়ের রুগী নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার থেকে , দ্রুত কাছাকাছি কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে, রুগীকে ভর্তি রাখাটাই সবথেকে নিরাপদ ।

কয়েকটি কালাচ সাপের কামড় এর রুগীর ইতিহাস

২০১১ সালের ১৪ ই আগস্ট, সকালে একজন ৩২ বছর বয়সের রুগী নীলরতন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, পেটে ব্যাথা নিয়ে। সকাল থেকে ঘন্টা পাঁচেক চিকিৎসার পর রুগীকে ছুটি করে দেওয়া হয়। শরীরে কিছু অসুবিধা থাকায় দুপুর বারোটা দশ মিনিটে নস্করবাবু ন্যাশনাল মেডিক্যালে এসে ভর্তি হন। জুনিয়ার ডাক্তার শ্রীজীতা বলেছিল, রুগীর বিছানার নম্বর ছিল, আর এফ ওয়ান - ১২৭। দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আবার পেটব্যথার চিকিৎসাই চলে। বড়রা বিকেল তিনটে পর্যন্ত দেখে যান। সন্ধ্যে সাতটার পর শ্রীজীতা ঐ রুগীর কাছে গেলে সাপের কামড়ের নির্দিষ্ট রোগ লক্ষন দেখে নিশ্চিত হয়ে যায়, রুগীটি কালাচ সাপ কামড়ের রুগী। ও সঙ্গে সঙ্গে দশটি আন্টি ভেনম চালিয়ে দেয়।

পরদিন সকালে রুগী সুস্থ হয়ে যান। বড়রা এসে এসব দেখে অবাক হয়ে যায়। যে প্রশ্নটা আমি ডাক্তারবাবুদের প্রশিক্ষণের সময় সব জায়গায় জিজ্ঞাসা করি; এমন একটা সহজ রুগী, যেটা কিনা মাত্র চারমাসের হাউসস্টাফশিপের অভিজ্ঞতায় শ্রীজীতা ধরে ফেলল, সেটা দুটি মেডিক্যাল কলেজের এতজন সিনিয়র ডক্টর কি করে ভুল করলেন?

কালাচ সাপ

কিংবা যদি উল্টোদিক থেকে বলি। দুটি মেডিক্যাল কলেজের এতজন সিনিয়ার ডাক্তারবাবু যা বুঝলেনই না, একটা জুনিয়ার ডাক্তার মেয়ে কি করে নিশ্চিত ভাবে সে রোগটা ধরে ফেলল? কোন ভাসা ভাসা ব্যাপার নয়; নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে রুগীটিকে বাঁচিয়েও ফেলল! অনেকে অনেক রকম উত্তর দিয়েছেন। যেমন, মেয়েটি গ্রামের মেয়ে, এমন অনেক রুগী আগেও দেখেছে। একেবারে একশো শতাংশ ভুল উত্তর। শ্রীজীতা একেবারে মধ্য কলকাতার মেয়ে, রেলগাড়ীর জানালা দিয়ে কয়েকবার গ্রাম দেখে থাকবে। আর একটা উত্তর খুব শুনি। সিনিয়র ডাক্তারবাবুরা সবাই ভীষণ ব্যস্ত থাকেন,মন দিয়ে রুগীর কথা শোনেননি। ব্যস্ত তো নিশ্চয়ই থাকেন। কিন্তু তাঁদের কাজে সাহায্য করার জন্য এই শ্রীজীতার মত অনেক জুনিয়ার ডাক্তার থাকে।

একটা খুব সুন্দর চিনা বাকধারা আছে। "মন যা জানে না, চোখ তা দেখে না। " এই যে কালাচ বলে একটা রহস্যময় সাপ আছে, যেটা সাধারনত গভীর রাত্রে খোলা বিছানায় কামড়ায়। তাছাড়াও ঘুমের মধ্যে কামড়ায় বলে প্রায় নিরানব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে রুগী

জানতেই পারে না যে তাকে কিছুতে কামড়েছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই রুগী সকাল বেলা পেটে ব্যাথা নিয়ে আসে।এসব খবর ট্রেনিং না থাকলে জানাও সম্ভব নয়। শ্রীজীতা কমাস আগে একটা ক্লাশে এসব কথা শুনেছিল .

তার থেকেও বড় কথাটা কিন্তু হল," টাইমিং"। সময়, সময়ই হল আমাদের জীবনে সবথেকে মুল্যবান জিনিস। শ্রীজিতা যথা সময়ে ঐ ১২৭ নম্বরের রুগীটিকে দেখতে গিয়েছিল। কালাচ সাপ কামড়ের একেবারে নিশ্চিত রোগ লক্ষন হল, শিবনেত্র বা টোসিশ। দুই চোখের পাতা পড়ে আসা। সাপটি কামড়ের কতক্ষন পর চোখের পাতা পড়ে আসবে, কোন ঠিক নেই। এটা দু ঘন্টা পর হতে পারে, আবার চব্বিশ ঘন্টা পরও হতে পারে। আমরা ৩৬ ঘন্টা, এমন কি ৪২ ঘন্টা পরও পেয়েছি। আসলে কালাচ সাপটি রাত্রে কখন কামড়ে গেছে আমরা কেউ জানিনা। এছাড়াও একই রোগ, বিভিন্ন জনের মধ্যে আলাদা আলাদা রোগ লক্ষন নিয়ে আসে। হয়তো এক ঘন্টা আগে শ্রীজীতা ঐ রুগীকে দেখে গেলে এই শিবনেত্র পেতোই না।

শ্রীজীতা কোন ইউনিটে কাজ করে, কতোদিন আগের ঘটনা এসব কথা ক্যান্টিনেই জেনে নিলাম। পরদিনই ওয়ার্ডে গিয়ে সিস্টারদের থেকে খাতা নিয়ে ঐ ১২৭ নম্বরের নাম ধাম জেনে নিলাম। কিন্তু ফোন নম্বর না থাকায়, নস্করবাবুকে আর ধরতে পারিনি। জানলাম বাড়ীটা বানতলার ওদিকে।

এই যে বললাম, পরদিনই রুগী সুস্থ হয়েগেল, কথাটা পুরোটা ঠিক নয়। কালাচ বা কালোচিতি সাপের কামড়ের রুগী বেশীরভাগ সময় পেটে ব্যাথা নিয়ে আসে। এছাড়াও গলা ব্যাথা, ঢোক গিলতে অসুবিধা, গাঁঠে গাঁঠে ব্যাথা , এমনকি মৃগি রুগীর মত খিঁচুনি নিয়েও এসেছে। ছোট বাচ্চারা শ্বাস কষ্ট নিয়েও এসেছে। এই যে সব উপসর্গ নিয়ে রুগীরা আসে, ডাক্তারী ভাষায় এদের বলে প্রেজেন্টিং সিম্পটম। আর ঐ যে চোখের পাতা পড়ে আসছে,অর্থাৎ শিবনেত্র, এদের বলাহয় ফাইন্ডিং। অর্থাৎ ডাক্তাররা পরীক্ষা করে ওটা পেলেন।

কালাচ সাপ কামড়ের চিকিৎসার সময় এই দুটি জিনিস ভালো করে বোঝা দরকার। এই যে প্রথম দশটি এ এস ভি দেওয়ার পর রুগী সুস্থ হয়ে যাচ্ছে বলছি, সব ক্ষেত্রেই রুগীর ঐ সব প্রেজেন্টিং সিমটম কয়েক ঘন্টায় চলে যায়। অর্থাৎ যে কষ্টের জন্য রুগী এসেছিল,সেগুলি চলে যায়। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই, শিবনেত্রটা থেকে যায়। এইটি নিয়ে অনেক সময়ই চিকিৎসকরা বিভ্রান্ত হন। শিবনেত্র তিন চার দিনও থেকে যায়। আমি দেখেছি হাসপাতালে ভর্তি রুগী এ এস ভি পাওয়ার পর বসে বিস্কুট খাচ্ছে। কিন্তু শিবনেত্র আছে বলে, ডাক্তারবাবু আরও এ এস ভি দিতে বলছেন।

শ্রীজীতার এই ঐতিহাসিক কাজটাকে আমি একান্ত নিষ্ঠায় প্রচার করে যাচ্ছি গত নয় বছর ধরে। পরে মৌমিতা , আলম , শুভেন্দু বা রাজীবের মত অনেকেই ছোট ছোট গ্রামীন হাস্পাতালে এমন অনবদ্য সব সাফল্য দেখিয়েছে। কিন্তু আমাদের মেডিকেল কলেজগুলিতে আজ ও নিয়মিত পড়ানোর মধ্যে সাপের কামড়কে আনা যায়নি।

বেশ কয়েক বছর হল, আমার ক্লাশে পড়ানোর জন্য, কালাচ সাপের ভিডিয়োটা প্রথমেই দেখাই। তারপর শ্রীজীতার গল্প। ২০১৪ সালের পর থেকে, নতুন সংযোজন হল, আলিপুরদুয়ারের নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ডা মুখার্জীর কথা। আলিপুরদুয়ার হাসপাতালের স্পেশালিষ্ট ফিজিসিয়ান, ডা যুধিষ্টির দাসের সাথে ঐ দিনই আলাপ। নিজের নামের প্রতি এমন সুবিচার সহসা দেখা যায় না। ধীর স্থির অমায়িক ভদ্রলোক, এমন মানুষ দুর্লভ। উনিও খুবই ব্যস্ত ডাক্তার। কিন্তু সাপ কামড়ের মত অবহেলিত বিষয় সম্বন্ধে ওনার কোন ছুৎমার্গ নেই। সুপারের ঘরে বসে কুড়ি বাইশ জন ডাক্তারবাবুকে নিয়ে সাপের আলোচনা শুরু করলাম। পরে

আরও দু একজন এলেন। সন্ধ্যেয় ক্লাশের একটা সুবিধা হল, হাসপাতালের কাজ সেরে সবাই আসতে পারেন। শ্রীজীতার পেট ব্যথা রুগীর ইতিহাস বলতে বলতে চলে গেলাম চব্বিশ ঘন্টায়।চোখের পাতা পড়ে আসতে পারে দুই থেকে চব্বিশ ঘন্টা পর।

এবার একেবারে পিছনের বেঞ্চে বসে থাকা ঐ হাসপাতালের নাক কান গলার সার্জেন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে, ওনার রুগীর চোখের পাতা পড়েছিল ৪২ ঘন্টা পর। অ্যা, বিয়াল্লিশ ঘন্টা? আগে আমি কোনদিন শুনিনি। সেই শ্রীজীতার রুগীর মত, এই পর্যন্ত বলেই আমি আমার ক্লাশে জিজ্ঞেস করি, ই এন টি সার্জেন কি করছিল সাপেকাটা রুগী নিয়ে? আজকাল অনেকেই ঠিক উত্তরটা বলতে পারেন। ঐ বছর চল্লিশের মহিলা গলাব্যথা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। টনসিলের ব্যাথা বলেই চিকিৎসা চলছিল ।ডা মুখার্জী আগে বার চারেক দেখেছেন। পঞ্চমবার দেখতে গিয়ে দেখেন, শিবনেত্র বা টোশিস। সঙ্গে সঙ্গে ডা যুধিষ্টির দাসকে ডেকে পাঠান। ওনারা দুজনে সাপ কামড়ের চিকিৎসা করে রুগীটিকে বাঁচান।

এই যে কালাচ সাপ কামড়ের রুগী টনসিলের ব্যথা বলে চিকিৎসা পাচ্ছিল, এটা আমাদের কাছে খুব একটা নতুন কিছু খবর নয়। মেচেদার তপনও প্রথমে গলাব্যথাই বলেছিল। তপনের খবর আমাদের রাজ্যের সরকারি প্রশিক্ষণ পুস্তিকায় বিস্তৃত আছে।

এছাড়াও গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা নিয়েও কালাচ কামড়ের রুগী আসতে পারে। বাচ্চা রুগী শুধু শ্বাস কষ্ট নিয়েও এসেছে। হঠাৎ শিবনেত্র হলে সবসময় মাথায় রাখতে হবে, ওটা কালাচের কামড় হতে পারে।

গতবছরই ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে একজন সাঁইত্রিশ বছর বয়সের জোয়ান লোক পিঠে ব্যথা নিয়ে ভর্তির ঘন্টা তিনেক পরে মারাযান। পিঠে ব্যথার চিকিৎসা চলতে চলতেই রুগী পেটে ব্যথা বলেন। পেটব্যথা কমানোর ওষুধপত্রের পর বলেন গলাব্যথা হচ্ছে। নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ দেখে কোন গন্ডগোল পাননি। একটু পরে রুগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। অক্সিজেন দেওয়ার আধঘন্টা পর রুগী মারাযান। আমরা নিশিত, আগের রাতেই ওনাকে কালাচ সাপে কামড়েছিল।

এত লোকের এমন ভ্রান্ত ধারনার কারন কি? কারন অর্ধ সত্য জানা। তাহলে বাকী সত্যটা কি? সাধারন ভাবে একটা খুব প্রচলিত ধারণা আছে যে, বিষধর সাপ কামড়ালে দুটি কামড়ের দাগ থাকবে। এটাই সবথেকে গন্ডগোল করছে। ফনা যুক্ত সাপের কামড়ে সাধারণত দুটি দাগ থাকে। আমাদের রাজ্যে মূলত দুই ধরনের ফনাযুক্ত সাপ আছে। গোখরো আর কেউ টে সাপ। এদের কামড়েও যে দুটি দাগ হবেই এমন কোন কথা নেই। একটি দাগ হতে পারে। একটা চেরা মত দাগ হতে পারে।

এছাড়া চন্দ্রবড়া সাপের কামড়ের ক্ষেত্রেও দুটি বা একটি দাগ হয়। ফণা যুক্ত সাপের কামড় সাধারনত ভুল হয় না। এদের কামড়ের সাথে সাথেই কামড়ের জায়গায় প্রচন্ড জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়। অন্ধকারে বা ঝোপে ঝাড়ে হয়তো একটা কাঁটা ফোটার মত মনে হল। কিন্তু ফণা যুক্ত সাপের কামড় হলে ঐ সামান্য কাঁটার দাগের সাথে এমন ভয়ঙ্কর জ্বালা ব্যথা অনুভব হবে যে, ওটা সাধারন কাঁটা ফোটা নয় বোঝাই যায়। বোলতার হুল বা কাঁকড়া বিছের হুলেও প্রচন্ড জ্বালা যন্ত্রণা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জায়গাটা প্রায় ফোলেই না। কিন্তু গোখরো বা কেউটে সাপের কামড় হলে, জায়গাটা দ্রুত ফুলে উঠতে থাকে। ফোলা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই ক্রমশ বাড়তে থাকা ফোলা আর প্রচন্ড জ্বালা যন্ত্রণার জন্যই আক্রান্ত ব্যক্তি খুব তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চলে আসে। এই যে একটা সাপে কামড়ের পর একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরী হয়, এটা প্রায় সবাই জানে বা দেখেছে। এবার কলাচ সাপ কামড়ের মতো নিঃশব্দ ঘাতকের ক্ষেত্রে যখন কোন ডাক্তারবাবু চোখের পাতা পড়ে আসার মত বিচিত্র কোন লক্ষণ দেখে , সাপে কামড়েছে বলেন, তখন মেনে নেওয়া খুব সমস্যা হয়।

চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়েও মাঝে মাঝে তেমন জ্বালা যন্ত্রনা থাকে না। কাঁটা ফুটেছে বা কোন পোকা মাকড়ে কামড়েছে মনে করে রুগী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে দেরী করে। চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়েও জায়গাটা আস্ত আস্তে ফুলতে থাকে। কিন্তু ফণাযুক্ত সাপের কামড়ের মত দ্রুত না ফোলার জন্য রুগী প্রথম দিকে অবহেলা করে। চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে রুগীর দেহে রক্ত তঞ্চনের গন্ডগোল দেখা দেয়। এই রক্ত তঞ্চনের গন্ডগোল কামড়ের আধ ঘন্টা পর থেকে শুরু করে চার ঘন্টা পরেও শুরু হয়েছে আমরা দেখেছি। রক্ত তঞ্চনের গন্ডগোল হলে রুগীর শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত বেরতে থাকে। সাপাএর কামড়ের জায়গা থেকে বা কোন ইঞ্জেকসন দেওয়ার জায়গা থেকে রক্ত দেরতে থাকে। এছাড়া দাঁতের গোড়া থেকে, নাক থেকে , পুরনো কোন ঘা থেকে , কফ থুতুর সাথেও রক্ত বেরতে থাকে। পাকস্থলীতে রক্ত ক্ষরণ হলে রক্ত বমি হয়। চিকিৎসায় দেরী হলে আস্তে আস্তে রুগীর কিডনী বিকল হতে শুরু করে। মূত্রে রক্ত এসে যাওয়া কিডনী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রথম লক্ষণ। ক্রমশ প্রস্রাব কমতে কমতে এক সময় একেবারে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। তখন রুগীকে বাঁচানোর জন্য ডায়ালিসিস লাগে। চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের পর চিকিৎসায় দেরী হলে কিডনী যদি খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় , তখন ডায়ালিসিস করেও রুগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় না।

কালাচ বা ফণাযুক্ত গোখরো-কেউটে সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসায় দেরী হলে রুগীর শ্বাসকার্য বন্ধ হয়ে রুগী মারা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালু রাখার জন্য ভেন্টিলেটার মেশিন দরকার হয়। রুগীর শ্বাসকার্য বন্ধ হওয়ার আগেই দশটি , কোন কোন ক্ষেত্রে কুড়িটি এ এস ভি ( সাপের বিষের আন্টিভেনাম সিরাম) রুগীর শরীরে ঢোকাতে পারলে আর ভেন্টিলেটার লাগে না। ফণাযুক্ত গোখরো-কেউটে সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে আট্রোপিন আর নিওস্টিগমিন নামের খুব সামান্য দামের দুটি ওষুধ খুব জরুরী। এই দুটি ইঞ্জেকসন না দিয়ে শুধু এ এস ভি দিলে রুগী নাও বাঁচতে পারে।

চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের ক্ষেত্রেও খুব তাড়াতাড়ি এ এস ভি চালাতে হবে; দেরী হলেই কিডনী বিকল। গত বছর তিনেক ধরে পশ্চিমবাংলায় চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে যথেষ্ট এ এস ভি দিয়েও ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এর পিছনে এ এস ভি উৎপাদনের একটি সমস্যা বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন। সেটা একটু বিস্তৃত আলোচনার বিষয়। আমাদের ফেসবুক পেজ " পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব এ ভি এস চাই" দেখলে , চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের সমস্যাটা বুঝবেন।

সবার শেষে আবারও বলছি, সাপে বা সন্দেহজনক কিছু কামড়েছে মনে হলে যত দ্রুত সম্ভব বাড়ীর কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। ওখানকার ডাক্তারবাবুর কথা মত চলুন।

পুনশ্চ ঃ সাপের কামড়ের রুগীকে মোটরবাইকে করে নিয়ে যাওয়ার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। অবশ্যই একজন রুগীর পিছনে বসে , রুগীকে ধরে নিয়ে চলবেন। ছবি দেখলে ভালো বুঝবেন।

Dry Bite

সিঁড়ি

সিঁড়ি একটা খুবই সাধারন জিনিস। আমরা সকলেই, প্রতিদিনই সিঁড়ি ব্যবহার করছি। সবসময় পায়ের তলায় থাকলেও সিঁড়ির অবদান মাথায় তুলে রাখার মতই। জীবনে যেখানেই হোক আর যখনই হোক, উপরে উঠতে গেলে সিঁড়ি লাগবেই। সিঁড়ির বিকল্প লিফ্ট হলেও, সিঁড়ি কিন্তু রাখতেই হবে। আচ্ছা, এমন বাড়ী কি কেউ দেখেছেন, শুধুই লিফ্ট আছে, সিঁড়ি নেই? আসলে ঐ লিফ্টকেও আগে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়েছে।

বাড়ী ছাড়াও অনেক জায়গায় সিঁড়ি থাকে। সাধারণত বাড়ীর বারান্দা বা নিচের তলাটাও উঠান বা রাস্তা থেকে একটু উঁচু থাকে; দু এক ধাপ সিঁড়ি বেয়েই উঠতে হয়। আমাদের গ্রামের ওদিকে মাঝে মাঝেই বন্যা হয়েযায়। এজন্য বাড়ীগুলি রাস্তা থেকে বেশ উঁচু। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে অন্তত দশ বারো ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। ভেতরের উঠানে ওঠার জন্যও কয়েক ধাপ সিঁড়ি। এখন অনেক বিরল হলেও গ্রামের মাটির বাড়ীও দোতলা এমনকি তিন তলাও হয়। মাটিরই সিঁড়ি হয়। অনেক বাড়ীতেই কাঠের সিঁড়িও হয়। কাঠের সিঁড়ি বেশী দেখা যায় পাহাড় অঞ্চলে। এছাড়া জংগলের বাংলো বা রিসোর্টের সিঁড়িগুলিও কাঠের হয়।

পুকুর ঘাটের সিঁড়িও গ্রামে বহুল ব্যবহার হয়। এই সিঁড়ি পাকা বাঁধানো হতে পারে; কিন্তু বেশীরভাগই কাঠের গুঁড়ি বা বড় বড় পাথরের তৈরী। বর্ষায় যখন পুকুর জলে টৈ টুম্বুর হয়ে যায় এসব কাঠের বা পাথরের সিঁড়ি ডুবে থাকে।

আবার যখন একটু একটু করে জল নামতে থাকে, ঘাটের সিঁড়িও একটা করে জেগে ওঠে। এই সিঁড়ির ধাপে বসে, ছিপ দিয়ে পুঁটিমাছ ধরা, আমাদের ছোটবেলায় একটা ভালো খেলা ছিল। এখনও গ্রামের বাড়ী গেলে, একটু সময় পেলেই পুকুরের ঘাটে ছিপ ফেলতে চলে যাই। কৈশোরের স্মৃতি ফিরিয়ে আনার এক মরিয়া প্রচেষ্টা। এক একবার স্বপ্নের মত দেখতে পাই, একটা ছেলে ঘাটের সিঁড়িতে বসে ছিপ ফেলছে, চল্লিশ বছর বা তারও আগে।

ঘাটের সিঁড়িতে খেলার দারুন সব সুখ স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমাদের গ্রামের পাকা ঘাটের সাথে। হাসপাতাল অর্থাৎ গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঠই ছিল আমাদের খেলার মাঠ। মাঠের পাশেই সিমেন্ট বাঁধানো ঘাট। খুব ছোটবেলায় যখন মাঠের খেলায় জায়গা পেতাম না, ঐ পাকা ঘাটের সিঁড়িতে খেলতাম।

লাল সিমেন্ট বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি একটা একটা করে নেমে গেছে জলে। জল যতোই নামুক, শেষ সিঁড়িটা কখনওই বেরত না। ঐ সিঁড়িতে অনেকে সাবান দিয়ে কাপড় জামা কাচত। আমরা ওখানে ছিপ ফেলে মাছও ধরেছি। পরে অনেক জায়গায় পুরনো রাজবাড়ি বা মন্দিরের ঘাটের সিঁড়ি বড় দিঘী বা নদীতে নেমে গেছে দেখেছি। আমাদের পাকা ঘাটের সিঁড়ি বোধহয় বারো কি চোদ্দটা ছিল। দিনাজপুরের বাহীন রাজবাড়ির পিছনের ঘাটের গোটা পঞ্চাশ সিঁড়ি নদীতে নেমে গেছে।

ঘাটের সিঁড়ি বললেই মনে আসে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট। ঐ ঘাটের সিঁড়িও এক একটা সিনেমা বা উপন্যাসের চরিত্র। মনে আছে, জয়বাবা ফেলুনাথ? আর এক জায়গায় কয়েকশ সিঁড়ি নর্মদা নদীতে নেমেছে, ওংকারেশ্বরে। ঐ সিঁড়িতে বসেই প্রলয় দাসজী কত উপদেশ দিয়েছেন শৈলেনবাবুকে। হরিদ্বারের গঙ্গা আরতি দেখলাম সিঁড়িতে বসে। হৃষীকেশের ত্রিবেণী ঘাটের কাছেও সুন্দর সিঁড়ি নেমেছে গঙ্গায়।

যে কোন তীর্থ বা মন্দিরেই সিঁড়ি ভেঙেই উঠতে হয়। কয়েকমাস আগে ঘুরে এলাম রুদ্রপ্রয়াগ। সঙ্গমের জলের কাছে চলে গেলাম, কয়েকশ সিঁড়ি ভেঙেই। এই সিঁড়ি ভাঙার ভয়েই নামাহল না পাঁচমারীর বিখ্যাত বী ফলসে। আগেরদিন অবশ্য শ খানেক সিঁড়ি ভেঙেই উঠেছিলাম পান্ডব গুহায়। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে বলে জব্বলপুরে চৌষট্টি যোগিনী মন্দির দেখলাম না। উড়িষ্যার উদয়গীরি খন্ডগীরিও ওঠা হয়নি ঐ সিঁড়ির জন্যই। তবে অজন্তা আর ইলোরায় কয়েকশো সিঁড়ি ভাঙতেও কোন অসুবিধা হয়নি। বেড়াতে গিয়ে সবথেকে খাড়া সিঁড়ি ভাঙলাম দৌলতাবাদ দূর্গে। অবশ্য পাহাড়ের মাথায় একেবারে ফাঁকা একটা বাড়ী ছাড়া আর কিছুই নেই।

পুরীর মন্দিরেও অনেক সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। ওপরে যাওয়ার পর আবার বেশ সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে পাতালেশ্বর শিব দেখতে হয়।

কলকাতার পাতাল রেলে তো শুধুই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর নামা। কয়েকটা জায়গায় চলমান সিঁড়ি আছে বটে, তবে বেশীর ভাগই সিমেন্টের সিঁড়ি। দিল্লি আর হায়দরাবাদের মেট্রোতে চড়তে হলে সিঁড়ি দিয়ে অনেক উপরে উঠতে হয়।

গাড়ীর সিঁড়ির কথা যখন এসেই গেল, কোন কোন গাড়ীতে সিঁড়ি ছাড়া চলেনা, দেখা যাক। বাসে ট্রামে দরজায় দু তিন ধাপ সিঁড়ি। আগে যখন দোতলা বাস ছিল তখন দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। এক এক সময় ঐ সিঁড়িতে এমন ভীড় হত যে দম বন্ধ করে দিত। এক্সপ্রেস ট্রেনে ওঠার জন্য দরজায় সিঁড়ি আটকানো থাকে। লোকাল ট্রেনে সব দরজায় সিঁড়ি না থাকলেও আজকাল অনেক দরজার নিচে সিঁড়ি থাকছে। বাসের ছাদে ওঠার জন্য পিছনে সিঁড়ি থাকে। কিছু কিছু লোক প্রচন্ড ভারী বোঝা মাথায় করে ঐ সিঁড়ি দিয়ে বাসের ছাদে উঠে যায়।

লরীর পেছনে একটা শক্ত কাঠের সিঁড়ি লাগিয়ে মালপত্র তুলতে দেখেছি। নৌকা বা লঞ্চে ওঠার জন্যও ঐ রকম একটা পাটাতন সিঁড়ি খুব ব্যবহার হয়। চুচুড়ার লঞ্চে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেযেতে হয়। বড় বড় লঞ্চ বা জাহাজের বিভিন্ন তলায় ওঠা নামার জন্য সাধারণত কাঠের সিঁড়ি। জাহাজের মাস্তুল আর কারখানার চিমনির গায়ে লোহার সিঁড়ি তৈরী করা থাকে।

এরোপ্লেনে ওঠার জন্যও সিঁড়ি ব্যবহার করা হয়। তবে কোলকাতার মত বড় বিমান বন্দরে এখন সিঁড়ি ছাড়াও ওঠার ব্যবস্থা আছে। রেল ষ্টেষনে সিঁড়ি থাকেই। মাথার ওপর দিয়ে লাইন পেরনোর জন্য ফ্লাইওভারের সিঁড়ি। আগে সবই কাঠের ছিল; এখন নতুন সব সিমেন্টের হচ্ছে। ছোটবেলায় কাঠের ফ্লাইওভারে উঠতে খুব ভয় পেতাম। সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে নিচে তাকালে মাথা ঘুরে যেত। এখন অনেক ষ্টেশনেই সাবওয়ে হচ্ছে। আমি দেখেছি ওভারব্রীজের থেকে সাবওয়ে বেশী সুবিধাজনক লাগে।

গাড়ী তো হল ; ঘোড়ায় চড়ার জন্যও কি সিঁড়ি লাগে? দেখিনি কোথাও। তবে হাতির পিঠে চড়ার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে জলদাপাড়া অভয়ারন্যে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা প্লাটফর্মে পৌছে হাতির পিঠে উঠেছিলাম। কুলিক পক্ষী নিবাসে সিঁড়ি দিয়ে অনেক উপরে উঠে সিমেন্টের টাওয়ার থেকে পাখি দেখা যায়।

সিঁড়ির রকমফের নিয়ে কটা কথা বলি। সাধারনভাবে পাকা বাড়ীর একতলা থেকে আরেক তলায় যাওয়ার জন্য যে সিমেন্টের সিঁড়ি হয়, সেগুলির অর্ধেক একমুখি নেমে একটু চওড়া জায়গা বা ল্যান্ডিং; তারপর আরেক মুখে বাকিটা ওঠার। অনেক বাড়ীতে একটু গোলকরে ঘুরিয়েও সিমেন্টের সিঁড়ি হয়। নিজের বাড়ী বেশ খরচ করে ডিজাইনার দিয়ে প্লান করে যারা বানায়, তাদের সিঁড়িই বাহারি হয়। ঐ সিনেমা বা সিরিয়ালে যেমন হয়। প্যাচানো লোহার সিঁড়ি দু একটা এখনও দেখা যায়। কলকাতার শহিদ মিনার আর দিল্লির কুতব মিনারের ভেতরে সিমেন্টের প্যাঁচানো সিঁড়ি আছে শুনেছি, ঢোকা হয়নি কোনদিন।

সিঁড়ি বললে কোন জায়গায় নির্দিষ্টভাবে আটকানো ওঠা নামার ব্যবস্থাই বোঝায়। আর সিঁড়ি যদি সরিয়ে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করার মত হয় তখন তাকে মই বলে। মই আমরা ছোটবেলায় বাঁশের তৈরীই দেখতাম। এখন কাঠের, লোহার, আলুমিনিয়ামেরও দেখা যায়।

বাস্তবের সিঁড়ি ছাড়াও কয়েকরকম সিঁড়ির কথা শোনাযায়। রাবন রাজা নাকি স্বর্গের সিঁড়ি বানাতে শুরু করেছিলেন। কবিরাতো স্বপনের সিঁড়ির কথা লিখেই গেছেন। স্কুলের অংকের ক্লাশে সিঁড়িভাঙা অংক আমরা করেছি। আমি অনেকদিন আগে একটি মুষ্টিযোগ শিখেছিলাম ; বিছানায় শুয়ে ঘুম না এলে, চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকুন, একটা লম্বা সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নামছেন। একটা একটা সিঁড়িতে পা দিয়ে দিয়ে নামছেন, সিঁড়ি শেষ হচ্ছে না। এক সময় ঘুমিয়ে পড়বেন।

একটা তলা থেকে আরেক তলায় যাওয়ার সোজা একটা সিঁড়িতে উঠতে কষ্ট বেশী হয়। মাঝে একটা ল্যান্ডিং থাকলে কষ্ট যেন একটু কম হয়।

চলমান সিঁড়ির মত আর একটা যান্ত্রিক সিঁড়ি হয়, দমকল দপ্তরের হাইড্রোলিক সিঁড়ি। অনেক উঁচুতে দ্রুত ওঠাযায়।

লোহার প্যাচানো সিঁড়ি ছাড়াও সোজা লোহার সিঁড়িও অনেক জায়গায় দেখেছি। আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ছাদে ওঠার লোহার সিঁড়ি হয়েছে অনেক পরে। আমাদের ছোটবেলায় কয়েকজন জানালা ইত্যাদিতে পা দিয়ে ঐ ছাদে উঠতে পারতো,তখন ওদের বীর ভাবতাম। অমর কন্টকের দুধধারায় পৌছতে শেষে এক জায়গায় লোহার সিঁড়ি হয়েছে এখন; আগে লোকে কি করে পৌছত জানিনা। দমদমে আমার ফ্লাটের লাগোয়া লোহার সিঁড়ি বিখ্যাত। পাড়া থেকে রেল লাইনে ওঠার পঁচিশ তিরিশ ধাপ সিঁড়ির মাঝের আট ধাপ লোহার,তাতেই নাম, লোহার সিঁড়ি।

সিঁড়িই হোক আর মই হোক, ওঠাটাই সহজ, আর সবাই উঠতেই চায়। যে কোন সিঁড়িতে নামার সময়ই বিপদগুলি হয় ; একটু অসাবধান হলেই পড়ে হাড় ভাঙ্গার সম্ভাবনা। লুডো খেলায় মই আর সাপ দুইই থাকে, তবু কেন সাপ লুডোই বলে জানিনা। বেচারা সাপগুলোর সম্বন্ধে শিশু বয়েস থেকেই বাজে ধারনা তৈরী হয়। আসলে টেনে নামানোর জন্য সাপেদের কোন অবদানই নেই। মানুষই মানুষকে টেনে নামায়। আর গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া, সে তো মানুষের একচেটিয়া অধিকার।

https://www.amazon.in/dp/8188036501/_encoding=UTF8?coliid=IC3KGMXZ3T9OM&colid=35GN1EMW6HCU7&psc=0

হাতখান ধইরে দ্যাখ ক্যানে

নদীয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে সুশান্ত। কোলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করার পর আরও বছর তিনেক জুনিয়ার ডাক্তার হয়ে কাজ করেছে। তারপর একদিন সরকারী চাকরী নিয়ে চলল উত্তর বঙ্গে। নতুন জেলা সদর থেকে আরও চল্লিশ মাইল দূরের একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার। মনটা একটু খারাপ ছিল; সেই চাকরীর চিঠিটা হাতে আসার পর থেকেই। স্নেহশীল বড় দাদার মত মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রত্যেকের মনের অবস্থা বুঝে, একেকজনকে একেক ভাবে সাহস জুগিয়েছেন। সুশান্তকেও বলেছেন, " তোমার সবথেকে ভাল পোষ্টিং হয়েছে। আমাদের ট্রেন ধরতে মালদা যেতে হয়; তোমার ওখানে দার্জিলিং মেল সহ বেশ কয়েকটা ট্রেন থামে। এক ট্রেনে কোলকাতা যেতে পারবে।

বিকেলের দিকে নিজের সামান্য বাক্স বিছানা নিয়ে বাস থেকে নেমেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোয়ার্টার পেয়ে মনটা ভালো হয়ে গেল। অনেক জায়গায় শুনেছে, বাস থেকে নেমে আবার চার পাঁচ কি মি রাস্তা ভ্যানে বা হেঁটেও যেতে হয়। পাশের কোয়ার্টারেই থাকে প্রায় সমবয়সি ফার্মাসিষ্ট। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ফার্মাসিষ্ট ছেলেটির সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সেও খুব উৎসাহ দিল। প্রথম রাতেই ঠিক হয়ে গেল , দুজনের রান্না একই জায়গায় হবে, একজন মাসিই সব কাজ করবে।

এত বছর মেডিক্যাল কলেজে কাজ করার অভিজ্ঞতা এক রকম ; আর একেবারে একা একা একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করা আর এক রকম। ফার্মাসিষ্ট একা একাই চালিয়েছে বছর খানেক। ওর কাছেই কাজের হালচাল জেনেছে , রাতের মধ্যে যেটুকু জানা যায়। সকালে নটার মধ্যে তৈরী হয়ে আউটডোরে বসে গেল সুশান্ত। ছোটখাট একটা লাইন। আসলে লাইন না বলে জটলা বলাই ভালো। গ্রামের লোকেরা অত শত লাইন টাইন বোঝে না। নতুন ডাক্তার আসার খবরটা "কুম্পান্ডার বাবুই" ওদের দিলেন। ফার্মাসিষ্টই হৈ হৈ করে বললেন, সবাই লাইন করে দাঁড়াও, নতুন ডাক্তাবাবু এসেছেন। একটা লাইন মত হলও। কিন্তু সবাই একটু উকি দিয়ে দেখতে চায়, নতুন ডাক্তারটি কেমন দেখতে। একেবারেই গ্রামের গরীবগুর্বো লোকজন। এক এক করে রুগী দেখতে শুরু করল সুশান্ত। সবারই কথায় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী টান। প্রথম দিকে লাইনটা দরজার বাইরে থাকলেও একটু পরেই ঘরের ভিতর জনা পাঁচেক রুগী ঢুকে গেল। এক দুবার ফার্মাসিষ্ট এসে দরজার বাইরে লাইন করে দাঁড়াও বললেও, পাঁচ মিনিটেই আবার ঘরের ভিতরে চার পাঁচ জন হয়ে গেল।

এখানে এটাই দস্তুর। তার উপর নতুন ডাক্তার। ভালো করে দেখে নিতে হবে তো। পাড়ায় গিয়ে বলতে হবে না; ডাক্তারটা "হ্যান্টা" কিনা।

গ্রামের লোকেরা কোলকাতার মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরে আসেনা এমন নয়। তাই ওদের দেখতে বা ওদের কথা বুঝতে খুব একটা অসুবিধাও হচ্ছিল না। ঘন্টা দেড়েক রুগী দেখার পর এল প্রথম চমকটা। একটা কম বয়সের বৌ এসেছে দেখাতে। টুলে বসার পর সুশান্ত জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে? অসুবিধা কি? রুগী

চুপচাপ। লজ্জায় মুখ নিচু করে বসে থাকল। সাথে এসেছে একটু বয়স্কা মহিলা। রুগীর মা কিংবা শাশুড়ী হবেন। বার তিনেক জিজ্ঞেস করে কোন উত্তর না পেয়ে, সুশান্ত সাথের মহিলাকেই বলতে বলল। এবার যেন বয়স্কা মহিলা একটু বিরক্ত হয়েই বলল, " হাতখান ধইরে দেখ কেনে"! চমকে উঠল সুশান্ত। মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় বা জুনিয়র ডাক্তার থাকার সময়ও কেউ কোনদিন ওকে তুই করে কথা বলে নি। সে তো গেল একটা দিক। এমন এক গ্রাম্য মহিলা তুই করে বলায় খুব একটা অপমানও মনে হয়নি সুশান্তর। কিন্তু হাত ধরে, মানে নাড়ি ধরে কি বুঝতে বলছে ওকে? এতো মহা ফ্যাসাদ। আপাত সুস্থ , কম বয়সি বধূটির তেমন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। নিজের বিব্রত ভাবটা গোপন রাখার জন্যই সুশান্ত রোগিণীর পালস্ দেখতে শুরু করল। কোন গন্ডগোল নেই। ভালো করে দেখার জন্য অনেকক্ষন ধরে দেখল পালস্। ডাক্তারের মুখ দেখে বয়স্ক মহিলা বুঝল যে ডাক্তার " ধরতে পারছে না"! এবার যতোটা সম্ভব আস্তে করে বলল, " প্যাটে বাচ্চা আছে কি?" এবার সুশান্ত বুঝে গেছে। বৌ এর পেটে বাচ্চা আছে কিনা সেটা মুখে বলতে চাইছে না। বৌ তো লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকবেই। এতগুলি বাইরের লোকের কাছে , শাশুড়ীমাও বা কি করে বলে? এবার ডাক্তারকে একটু "হ্যান্টা" হতে হল। ঘরের ভিতর ঢুকে আসা বাকী লোকগুলোকে বের করতে হল। নাড়ি টিপে পেটে বাচ্চা আছে কিনা বলার শিক্ষা সুশান্ত পায়নি। সুশান্ত কেন, ওর কোন শিক্ষক ও কোনদিন এমন কথা শোনেননি। সে যাই হোক, কটা মাসিক বন্ধ আছে ইত্যাদি জেনে , ডাক্তারের রায়টা জানাতে পেরেছিল সুশান্ত।

এ গল্প আমি সুশান্তর কাছে শুনেছি অনেক পরে। কিন্তু শোনার সাথে সাথেই আমার এক শিক্ষকের বহু পুরনো শিক্ষা মনে পড়ল। তখন আমরা সবে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। মেডিক্যাল ওয়ার্ড এ ক্লিনিক্যাল ক্লাশ শুরু করেছি। ঐ একজন স্যারই বলেছিলেন, পালস্ দেখে অনেক কিছুই বোঝা যায়। এ কথা অনেক স্যারই বলেছেন, শিখেওছি। কিন্তু ঐ একজনই বলেছিলেন, সব রুগীর পালসে আগে হাতটা রাখবে। কিছুই হয়তো পাবে না , কিন্তু পালস্ এ হাত রেখে রুগীর সাথে কথা বলার অনেক সুফল পাবে। রুগী তোমার ওপর আস্থা রাখবে, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে দ্বিধা বোধ করবে না।

একেবারে একশ ভাগ চোখের ডাক্তার হয়ে যাওয়ার আগে , স্যার এর ঐ শিক্ষা বেদবাক্য -এর মত মেনেছি। চোখের ডাক্তার এর পালস্ দেখার দরকার হয় না সব সময়। তবুও অভ্যাসটা থেকে গেছে। এখন আবার উল্টোও ভাবে কেউ কেউ। এখন তো মেশিনের যুগ। গায়ে চুলকানি নিয়ে এসেও কেউ কেউ জানতে চায় , স্ক্যান করার দরকার আছে কি না! পালস্ দেখে " ব্রাডি অ্যারিথমিয়া" পেয়ে , রুগীকে হার্টের ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়েছি। সেই রুগীর ইসিজি করে আমার রোগ নির্ণয় কে মান্যতা দিয়েছেন , হার্টের ডাক্তার বাবু। এখন আর লোকে পালস্ দেখে " সময় নষ্ট করে না"! বৈদ্যি নাকি?

আমার সামনে কোন রুগীকে হাঁপাতে দেখলেই আমার হাতটা রুগীর পালস এ চলে যায়। কে যেন অলক্ষে বলে, " হাতখান ধইরে দ্যাখ কেনে"!

# হাতি

হাতি আমাদের খুব পরিচিত প্রাণী। বিশাল চেহারা আর তার সাথে ঐ অদ্বিতীয় শুঁড়, প্রাণীটিকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। তার সাথে যোগ হয়েছে গণেশ ঠাকুরের মাথাটি। সব মিলিয়ে হাতি একটি পূজনীয় প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। ছোট বেলায় অ আ ক খ শেখার সময় ঐরাবত হাতীর ছবি দেখেছি। কিন্তু তারও আগে আমরা জ্যান্ত হাতিও দেখেছি। না' বুনো হাতি নয়, পোষা হাতি। তাহলে কি আমাদের বাড়ীর কাছে কোন রাজ বাড়ী বা জমিদার বাড়ী ছিল? না, তা নয়।

দু –এক বছর পর পর এক –দুটি হাতি নিয়ে পশ্চিম দেশের কয়েকজন লোক আমাদের গ্রামের দিকে আসত। তখন হিন্দি ভাষা কি জানতাম না। কিন্তু ঐ হাতীর সাথের লোকগুলি যে আমাদের ভাষায় কথা বলত না, সেটা বুঝটাম। হাতিও যেন ওদের অনেক কথা বুঝতে পারত। ওরা হাতি নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে ধান, টাকা পয়সা সংগ্রহ করত। সে সব দিনে সাপ খেলা, বাঁদর নাচ দেখানো, এমনকি একবার একটি ভালুক নিয়েও ভিক্ষা করতে এসেছিল একজন। হাতি যেহেতু প্রায় দেবতার মর্যাদা পেত, এদের ঠিক ভিক্ষা করতে এসেছে ভাবা হত না। হাতির কপালে অনেকটা সিঁদুর লেপা থাকত। মাহুত খুশী হলে, বা কেউ চাইলে , ঐ হাতীর কপালের সিঁদুর নিয়ে একটু বাচ্চাদের কপালে টিপ দিয়ে দেওয়া হত। সার্কাসের হাতিও আমরা ছোটবেলায় খুব দেখেছি। হাতিদের নানান রকমের কসরত আমাদের মুগ্ধ করত। কয়েক বছর আগে এক সার্কাসের পোষা হস্তিনীকে এক জংলী দাঁতাল হাতি, বেড়া ভেঙ্গে নিয়ে যায়।

এই গ্রামে নিয়ে আসা হাতীদের রং কালো হত। বাঁকুড়ায় কলেজে পড়তে গিয়ে, বাঁকুড়ার বন্ধুদের কাছে শুনলাম , ওদের ওদিকে যে সব জংলী হাতি আসে তাদের রং লাল। বন্ধুরা ফসলের মাঠে নেমে আসা হাতিদের তাড়ায় শুনে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। ওদের গ্রামে লাল হাতি দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল অনেকদিন। একদিন রানিবাঁধে বন্ধুর বাড়ী যাওয়া ঠিক হল। খবর শুনে আট দশ জনের একটা দল হয়ে গেল। রানীবাঁধে গিয়ে পিকনিক করে ফিরলাম। হাতি রাত্রে ছাড়া মাঠে আসেনা। আমি কয়েক বার রাত্রে বন্ধুর বাড়িতে থেকেও হাতি দেখতে পাই নি। ঐ রানী বাঁধে একবার দাদা বৌদির সাথে বেড়াতে গিয়ে রাত্রে ছিলাম। সাইকেল নিয়ে বিকেলে জঙ্গলের দিকে গেলাম। স্থানীয় লোকজন সন্ধের মুখে ফিরে আসছিল, আমাদের সাবধান করে ফিরে যেতে বলল; হাতি বেরোতে পারে বলল।

জঙ্গলের হাতি বাঁকুড়ায় দেখা হয়নি। কিন্তু মেদিনীপুরে দেখলাম একবার , গোটা দশেক জংলী হাতি। তখন সপ্তাহে দুদিন করে মেদিনীপুরে থেকে চন্দ্রকোনা রোড যেতাম। শালবনির পরে আরাবারি জঙ্গল নামে কিছুটা জায়গা জঙ্গল ভেদ করে রাস্তা ।নামেই জঙ্গল, কোনদিন একটা শেয়ালও দেখিনি। সেদিন বাসে না গিয়ে, বন্ধু ডাক্তার সিনহার স্কুটারে যাচ্ছিলাম। দূর থেকে দেখলাম, রাস্তায় বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়েছে। সাধারণত গাড়ী দুর্ঘটনা হলে এরকম লোক জমে যায়। কাছে গিয়ে দেখি , কয়েকজন লোক গাছেও উঠেছে। সবার মুখেই শুধু হাতি আর হাতি। আমরাও দাঁড়ালাম। রাস্তা থেকে তিরিশ গজ দূরে , ঝোপ ঝাড় এর মধ্যে গোটা দশেক হাতি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এই হাতিগুলির শুধু পিঠ দেখা যাচ্ছিল। পিঠের রং লাল। আসলে ওরা সব লাল মাটি মেখে ছিল। এই হাতীর দলটা কিন্তু

শান্ত ভাবে দাড়িয়ে ছিল। পরে শুনেছি, একজন মানুষ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময়ে দাঁতাল হাতীর সামনে পড়েযায়, হাতি তাকে পায়ে পিষে মেরে ফেলে।

উত্তর বঙ্গে চাকরী করার সময় একবার সপরিবারে জলদাপাড়া জঙ্গল বেড়াতে গেলাম। মাদারিহাটের সরকারী ট্যুরিষ্ট লজে ছিলাম। ওখানে গিয়ে জানলাম, ভোর রাত থেকে হাতীর পিঠে চেপে জঙ্গলে ঘোরা যায়। কিন্তু রাত নটা পর্যন্ত উৎকন্ঠায় থাকতে হল। শীতের দিনে বৃষ্টি হওয়ায় আদৌ সকালে সাফারী হবে কিনা সেটাই বোঝা যাচ্ছিল না। ভোরে উঠে গাড়ী করে হলং বাংলোয় পৌঁছে গেলাম। গোটা তিনেক দল ঘুরে আসার পর আমাদের পালা। ঐ সময় আমরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। একটা জায়গায় দেখি বড় ছোট কয়েকটা হাতি বাঁধা আছে। ছোট বাচ্চারা বাচ্চা হাতি দেখে খুব মজা পেয়েছিল। মনে পড়ল তারও বছর কুড়ি আগে দিল্লিতে এশিয়ান গেমস হয়েছিল। সেই গেমসের ম্যাসকট ছিল, আপ্পু নামের একটা ছোট হাতি।

জলদাপাড়ার পোষা হাতি

তারপর অনেক বছর আমরা হাতীর বাচ্চা দেখলেই তাকে আপ্পু বলতাম। এই হাতীর বাচ্চা নিয়ে খুব ছোট বেলা থেকেই আমরা একটা রূপকথার মত শুনেছি। ভগবান বুদ্ধের জন্মের আগে তাঁর মা মায়া দেবী স্বপ্নে দেখেছিলেন একটা সাদা হাতীর বাচ্চা আকাশ থেকে তাঁর কোলে নেমে আসছে। বৌদ্ধ ধর্মে হাতীর অনেক কথা আছে। অজন্তার গুহায় আঁকা ছদন্ত জাতকের ছবি এখনও বোঝা যায়। সেবার জলদাপাড়ায় আমরা শেষ পর্যন্ত হাতীর পিঠে চেপে জঙ্গলে ঢুকেছিলাম। ওখানে হাতিতে চাপার জন্য সিমেন্টের উচু প্লাটফর্ম করা আছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে হাতিতে চাপতে হয়। সেদিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় আমরা আধ ঘন্টা মত জঙ্গলে ছিলাম।

জলদাপাড়ায় লোকে গন্ডার দেখতে যায়, আমরা গন্ডার দেখতে পাইনি। খুব সামান্য কয়েকটা জঙ্গলের প্রাণী দেখেছিলাম। তবুও প্রথম জঙ্গল সাফারির স্মৃতি হিসেবে ওটাই আমার মনে থেকে গেছে। পরে বেশ কিছু জাতীয় অভয়ারণ্যে সাফারী করেছি, আর কোথাও হাতিতে চাপার ব্যবস্থা দেখিনি। বান্ধবগড়ে জীপে ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গায় কিছুক্ষন নেমেছিলাম, সেখানে একটা পোষা হাতি ছিল। করবেট জাতীয় অরণ্যেও একটা হাতিশালে গোটা চারেক পোষা হাতি ছিল। ওখানে জংলী হাতি অনেক আছে শুনেছি, কিন্তু আমরা দেখিনি। উত্তর বঙ্গের জঙ্গলগুলিতেও জংলী হাতি আছে শুনেছি, কিন্তু আমরা কোনদিন দেখিনি।  গয়েরকাটায় মধুবনী বাংলোয় আমরা একরাত ছিলাম; তার কদিন আগেই জংগলের হাতিরা এসে বাংলোর বেড়া ভেঙ্গে গেছে শুনেছি।

আগের দিনে পোষা হাতিদের অনেক কাজে লাগানো হত। মধ্য যুগে রাজাদের সেনা বাহিনীতে হাতি থাকত। জমিদার বাড়িতে হাতি বাঁধা থাকলে সে জমিদারের মর্যাদা বাড়ত। আমার অতিশ্রদ্ধেয় মানুষ, মালদার কিংবদন্তি চোখের ডাক্তারবাবু, প্রয়াত পিনাকী রঞ্জন রায় মহাশয়ের সাথে আমার যখন আলাপ হয় তখন উনি ধর্ম প্রাণ বৈষ্ণব। কথায় কথায় বলেছিলেন, ওনাদের হরিশচন্দ্রপুরের জমিদার বাড়িতে হাতি বাঁধা থাকত।

অতীনবাবু নীলকন্ঠ পাখীর খোঁজে উপন্যাসে লক্ষ্মী নামের একটি পোষা হাতীর কথা লিখেছেন। পুরনো দিনের গল্প -উপন্যাস -সিনেমায় হাতীর পিঠে চেপে শিকারের অনেক কথা আছে। কদিন আগেই দেখছিলাম, আসামের বন দপ্তরের আধিকারিক হাতীর পিঠে চেপে একটি বাঘকে ঘুম পাড়ানি গুলি মারতে গিয়ে ব্যর্থ হন। সেই বাঘিনী হঠাৎ লাফিয়ে বারো ফুট ওপরে, হাতীর পিঠে বসা মহুতকে ঘায়েল করে। তার আগে কিন্তু ঐ হাতি' ওদিকে বিপদের সংকেত জানিয়ে দিচ্ছিল।

গত কয়েক বছর ধরেই খবর পাওয়া যায় দলমা পাহাড়ের হাতীর দল বাঁকুড়া মেদিনীপুরের গ্রামে চলে আসছে ; কিছু কিছু হাতি এদিকে থেকেই যাচ্ছে। জঙ্গলে খাওয়ারের অভাবেই ওরা লোকালয়ে চলে আসে। জঙ্গলের হাতি লোকালয়ে চলে এলে একটা উত্তেজনা ছড়ায়। ওরা বাধ্য হয়েই চলে আসে। বিরাট কিছু বিরক্ত না করলে মানুষকে আক্রমণ করে না। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় লোকে অকারণে ওদের উত্যক্ত করে, তখনই ওরা পাল্টা আক্রমণ করে।

গণেশ ঠাকুরের মাথাটি হাতীর; এ নিয়ে বেশ অলৌকিক কাহিনী আছে। এছাড়াও হাতি বিশ্বকর্মা ঠাকুরের বাহন। সাধারণত লক্ষ্মী প্রতিমার বাহন হিসেবে পেঁচা দেখা গেলেও গজলক্ষ্মীও দেখা যায়। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত হাতি, কিন্তু ইন্দ্র দেবতার মূর্তি আমি কোনদিন দেখিনি।

অনেক মন্দির আর আশ্রমে হাতীর মূর্তি আছে। উনিশ শতকের আশির দশকে আমরা দিল্লিতে পরীক্ষা দিতে গেলে শ্রীনিবাসপুরীর ভারত সেবাশ্রম সংঘে থাকতাম। ঐ আশ্রমের বড় গেটের দুপাশে দুটি বড় হাতীর মূর্তি ছিল। অটো রিক্সার চালকরা

বলত হাতিওয়ালা মন্দির। অমরকন্টকের নর্মদা মন্দিরের সামনে একটি ছোট পাথরের হাতি আছে। লোকেরা ঐ হাতির পেটের তলা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পেরনোর চেষ্টা করে। পেরোতে পারলে তার ভাগে একটু বেশী পূণ্য জমা হয়।

হাতি মেরে সাথী সিনেমার হাতি সে সময় খুব বিখ্যাত হয়েছিল। বিভিন্ন সিনেমা উপন্যাসের হাতিদের এক একটা নাম খুব বিখ্যাত হয়ছে। ঐরাবত হাতির নামটা খুবই বিখ্যাত। কিন্তু মহাভারতের সেই হাতিটি ভীমের গদার আঘাতে মরেও অমর হয়ে যায়। কি নাম সে হাতীর? মনে পড়ছে না তো? কিন্তু আমি নিশ্চিত, আপনাদের সবার মনে আছে। সেই যে, “অশ্বত্থমা হত , ইতি গজ।“

হাদু মাছ

ভূত চতুর্দশীর দিন , ভূত নিয়ে আলোচনায় ভূতেদের পছন্দের জিনিস হিসেবে , হাদু মাছ দিতে চাইলাম। এই হাদু মাছ কি ? সেটা জানতে হলে আমার একটু পুরনো গল্প বলতে হয়। না , ভূতের গল্প নয়। বাৎসল্য রসের গল্প। আমার ছেলের তখন বছর তিনেক বয়স। বাসায় খুব নেংটি ইঁদুরের উৎপাত। একটা ইঁদুর ধরা কল কিনে আনলাম। যদিও রসিকজনে বলে " ইঁদুর ধরা কল রয়েছে জগৎ মাঝারে" ; এ কল সে কল নয়। এ একেবারেই একটা লোহার তারের খাঁচা। ভেতরে খাওয়ার দিয়ে রাখলে , ইঁদুর ঐ খাওয়ার খেতে ঢুকে আটকা পড়ে।

আমি আর আমার ড্রাইভার ছেলেটি , সন্ধ্যে বেলা, ঐ কলে টোপ আটকানোর চেষ্টা করছিলাম। আমার ছেলের বিপুল আগ্রহ। ও এসে আমার গা ঘেঁসে বসে দেখছে। টোপ হিসেবে কিনে এনেছিলাম, ছোট শুঁটকী মাছ। ড্রাইভার ছেলেটা একটু ফাজিল ছিল। আমার ছেলে , এটা কি , ওটা কি এরকম নানা প্রশ্ন করছিল। ড্রাইভার হঠাৎ করেই একটা শুঁটকী মাছ আমার ছেলের নাকের কাছে তুলে ধরে। বিকট দুর্গন্ধটাকে আমার ছেলে বলেছিল " হাদু মাছ" ! অর্থাৎ হাগু মাছ।

শুঁটকী মাছের গন্ধকে হাগুর গন্ধের সাথে তুলনা করলে, যারা শুঁটকী পছন্দ করে তাদের আপত্তি হবেই। কিন্তু ঐ তিন বছর বয়সের বাচ্চাকে তো আমরা কেউ শেখাইনি; ও নিজেই বলেছে , হাদু মাছ।

আমার একমাত্র মামীমা শুঁটকীর খুব ভক্ত। কম বয়সে মাঝে মাঝে মামা বাড়ী গিয়ে দেখতাম, মামীমা শুঁটকী মাছ রান্না করে , পরম তৃপ্তির সাথে খাচ্ছেন। আমার তো গন্ধে প্রাণ বেরিরে যেত। বারাকপুরে ভাড়া বাড়ীতে থাকার সময় , আমাদের বাসার জানালার বাইরেই পাশের বাড়ীর রান্না ঘর ছিল। মাঝে মধ্যে ওরা যখন শুঁটকী রান্না করত, আমাদের প্রায় বাড়ী ছেড়ে দৌড়ে পালানোর অবস্থা হত।

ন্যাশনাল হাইওয়েতে বাসে যাওয়ার সময় কয়েকবার বিকট দুর্গন্ধবাহী ট্রাকের পিছনে পড়তে হয়েছে। বাসের যাত্রীরা "শুঁটকীর ট্রাক" বলে চিৎকার করত, আর বাসের ড্রাইভারকে বলত, তাড়াতাড়ি চালিয়ে পেরিয়ে যেতে।

শুঁটকির আর একটা মারাত্মক দিক দেখেছিলাম , উত্তর বঙ্গের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করার সময়। বন্যা হল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রথম দিন থেকেই সাজ সাজ রব। ফিল্ডের স্টাফরা খুব ছোটা ছুটি করে , হ্যালোজেন ট্যাবলেট, ও আর এস ইত্যাদি বিতরণ করল। বিপদটা শুরু হল জল নামতে শুরুকরার সময়। বন্যার মত রুগী আসতে শুরু করল। সব চালধোয়া জলের মত পায়খানা আর বমি। দশ বারো দিনে হাজার বারোশ রুগী ভর্তি হয়েছিল। জেলার ষ্টোরেও স্যালাইনের ঘাটতি হয়ে গেল। ভালোর মধ্যে খবর হল , মাত্র তিন জন রুগী মারা গিয়েছিল।

এত রুগীর কারণ কি ? খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল ভয়ংকর খবর। বন্যার জল নামার সময় মাঠে প্রচুর চুনা মাছ ধরা পড়ছিল। এত মাছ ভেজে খাওয়ার মত তেল কেনার পয়সা ছিল না। মাছগুলিকে পিচ রাস্তায় ফেলে শুকানো হয়েছে। তারপর মাটির খোলায় ভাজা করে , হামানদিস্তায় গুড়ো করে , কচু সেদ্ধর সাথে মেখে খাওয়া হয়েছে। হাগু মাছ যে হাগুকে একেবারে চালধোয়া জলের মত করে দেবে, এটা আমদের কারোরই জানা ছিল না। আর দুর্গন্ধের কথা যখন লিখেইছি , এই চালধোয়া জলের মত হাগুর বিশেষ গন্ধের কথাই বা বাদ দিই কেন। গোটা হাসপাতাল চত্তর একটা আঁসটে গন্ধে ভরে গেল। এমনকি আমাদের গায়েও সে গন্ধ লেগে থাকত।

যে ছবিটা সঙ্গে দিয়েছি , ওটা বছর দুই আগে ফ্রেজারগঞ্জে তোলা। সমুদ্রের বালুকাবেলায় প্রায় মাইল খানেক জায়গা জুড়ে মাছ শুকাচ্ছে দেখেছি। ভয়ে ওর সামনে যাইনি।

শুঁটকির ভক্তদের বিরাগভাজন হই কেন ; একটু ভালো খবর দিয়েই শেষ করি। আমার কলেজের একবছরে বড় দাদা ছিলেন , মণিপুরের ডা শ্যাম কুমার সিং। এখন পি জি আই চন্ডিগড়ের হার্টের সার্জারী বিভাগের প্রধান। বেশ কয়েকটা হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করেছেন। শ্যামদা একবার মণিপুর থেকে শুঁটকী মাছ ভাজা এনেছিলেন। আঙুলের মত সরু সরু , শুকনো লংকা ভাজার মত মুড়মুড়ে। আমরা কয়েক মিনিটেই একটা দুটো করে খেয়ে শেষ করেছিলাম। এমন অপূর্ব স্বাদের মাছভাজা আর কোনদিন পাইনি।

Fish Drying - Frezergunj

হোস্টেল

উনিশশ’ আটাত্তর সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর সকালে কলকাতার ধর্মতলা থেকে সরকারী বাসে রওনা দিলাম বাঁকুড়া। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে চললাম। সাথে একটা মাঝারি সাইজের টিনের বাক্স। ওখানে গিয়ে হোষ্টেলে থাকতে হবে। জীবনে প্রথম কোন হোষ্টেলে থাকতে যাচ্ছি। আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন বাঁকুড়ার নারায়ণ দাদা। বিষ্ণুপুরে বাস পাল্টে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ কলেজে পৌঁছলাম। আপিসে গিয়ে শুনি ঐ দিন প্রিন্সিপাল স্যার নেই, ভর্তির জন্য পরদিন যেতে হবে। একটা রিক্স নিয়ে দাদার পরিচিত একজন পুরনো ছাত্রের সাথে দেখা করতে রবীন হল হোস্টেলে গেলাম। দেখা হল তার সাথে। কিন্তু জানলাম ওটা পাশ করে ইন্টার্ন থাকার সময়ে থাকার হোস্টেল। আমাদের নতুনদের পুরনো মেইন হোস্টেলে থাকতে হবে। আবার রিক্সা নিয়ে চললাম, এক মাইল দূরের সেই মেইন হোস্টেল। প্রায় বিকেল হয়ে গেল। (৩৯ বছর পরে আমার ছেলে এই রবীন হলে থেকেছে; তিন বছর।)

রবীন হল

রবীন হল একটা চার তলা বাড়ী, আর এই মেন হোস্টেল একতলা ব্যারাকের মত টানা , টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ী। খোঁজ করে হোস্টেলের মনিটর -এর সাথে দেখা করলাম। উনি একজন পুরোনো ছাত্র। পরে জেনেছি আমার থেকে দু’বছরের বড়। আমরা শ্যামাদা বলতাম। শ্যামাদা জানালেন, হোস্টেলে ঘর খালি আছে, কিন্তু ভর্তির আগে তো থাকা যাবে না। আমার দাদা যখন শ্যামাদার সাথে কথা বলছিল, আমি পাশেই দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছিলাম। একজন লোক বারান্দার ধারে বসে গুড়াকু দিয়ে দাঁত মাজছিল। তার দিকে তাকাতেই ঘুশি বাগিয়ে দেখাল। তখনকার দিনে কলেজের হোস্টেলে রাগিং হত , আগেই শুনেছি। বিশেষ করে আই আই টি হোস্টেল গুলিতে মারাত্মক রাগিং হয় জানতাম। ঐ ঘুষি দেখানোর কায়দায় বুঝলাম এখানেও রাগিং হয়। মজার কথা হল, পরে হোস্টেলে থাকার সময় মাস দুই খুব রাগিং হলেও, ঐ গুড়াকু দাদা কোনদিন রাগিং করেনি।পরদিনই কলেজে ভর্তি হওয়ার পর

আবার সেই মেইন হোস্টেলে গিয়ে বাক্স রেখে এলাম। বোধ হয় দিন দশেক পর থেকে শুরু হল আমার হোষ্টেল জীবন। প্রায় নয় বছর ছিলাম বাঁকুড়ায়। সব মিলে তিনটি হোস্টেলে। সেই সব দিন যেন স্বপ্নের মত মনে হয় এখন।

আমি স্কুলে পড়ার সময় কখনও হোষ্টেলে থাকিনি। আমার কলেজের বন্ধুদের কেউ কেউ স্কুলে পড়ার সময় হোস্টেলে থেকেছে। ওদের কাছে গল্প শুনেছি। আমাদের গ্রামের স্কুলের হোস্টেল বলে যেটা ছিল, আমরা তাকে বোর্ডিং বলতাম। চার –পাঁচ জন শিক্ষক আর মাত্রই জন তিনেক ছাত্র থাকত তখন। দূরের থেকে প্রতিদিন আসা যাওয়া করে স্কুলের কাজ করার সুযোগ যে শিক্ষকদের ছিল না তাঁরাই বোর্ডিং –এ থাকতেন। ঐ শিক্ষকদের কারো ভাগ্নে বা ভাইপো এরকম কয়েকজনই বোর্ডিং এ থাকত। ওরা আমদের গ্রামেরই ছেলে হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সাথেই বিকেলে খেলত। সে বোর্ডিং উঠে গেছে বোধহয় বছর কুড়ি। পরে স্কুল লাগোয়া একটা হোস্টেল হয়েছে, অনেক ছাত্র থাকে শুনেছি।

আমদের গ্রামের থেকে তিন মাইল দূরে একটা বড় স্কুল বহু বছর ধরে আছে। ঐ স্কুলের হোষ্টেলও বহু পুরনো। একবার রাত্রে সেই হোস্টেলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বাঁকুড়ার হোস্টেলে থাকতে ,একটা চিঠিতে বাড়ি থেকে একটা খারাপ খবর পেয়ে দুপুরের পর রওনা দিলাম। বাস পাল্টে আমদের গঞ্জের নদীর পাড়ে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। অন্ধকার রাস্তায় পাঁচ মাইল দূরে আমাদের বাড়ি; হাঁটতে শুরু করলাম। অন্ধকারে তবু হাঁটা যায়, কিন্তু বর্ষার বৃষ্টি মাথায় তো আর এগোতে পারছি না। কি মনে করে ঐ স্কুলের হোস্টেলে ঢুকলাম, যদি চেনা কোন ছাত্র থাকে, একটা ছাতা পেতে পারি। একজন চেনা ছেলেকে পেয়েও গেলাম। আমার স্কুলের বন্ধুর ভাই। ছাতা হয়তো ও একটা জোগাড় করে দিতে পারে, কিন্তু ঐ রাত্রে সে আমাকে ছাড়তে চাইল না। ওদের হোষ্টেলের স্যারকে বলে আমাকে রেখে দিল। একটা বড় হল ঘরে দশ বারো জনের আলাদা আলাদা মাদুর পাতা, মেঝেতে। ঐ ভাইয়ের সাথে থেকে গেলাম। রাত্রে আলুর ডাল আর ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরে উঠে বাড়ী গেলাম। পরে আর একবার বাঁকুড়ার গ্রামের এক স্কুলের হোষ্টেল স্নান করতে ঢুকেছিলাম, এক শীতের দুপুরে, চক্ষু পরীক্ষা শিবির করতে গিয়ে।

আমাদের রাজ্যেই কয়েকটি স্কুলের হোষ্টেল খুবই বিখ্যাত। একটি ধর্মীয় সংস্থার পরিচালিত স্কুলের হোষ্টেল এতই নামকরা ,যে বাবা মায়েরা স্বপ্ন দেখে তার ছেলে ঐ হোস্টেলে থাকবে। কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিততে পারলে জীবন তৈরী হয়ে গেল। আমার মনে হয়েছে, এত কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে জিততে পারে সে এমনিতেই উচ্চ মেধার ছাত্র। অসৎ সঙ্গে উচ্ছন্নে না গেলে তাকে আটকে রাখা যায় না। আমার কলেজের বন্ধুদের মধ্যে যারা ঐ রকম বিশেষ স্কুলের হোষ্টেল –এ থেকে এসেছে, তাদের কোনভাবেই আলাদা মনে হয়নি। ওদের কাছেই ওদের হোষ্টেলের গেরুয়া পোষাক পরা শিক্ষকদের নানান দূর্নীতির কথা শুনে খারাপ লাগত। ঐ সব হোস্টেলে থাকলে ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র উন্নত হবে, তারা অন্যদের থেকে বেশী শৃঙ্খলা পরায়ণ হবে,

এটাই প্রচার। আমার কপাল পোড়া, তেমন একজনকেও দেখিনি। যারা সারা জীবন বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়ার পর আমাদের সাথে কলেজের হস্টেলে থেকেছে, তারা সব বেয়াড়া হয়েছে? আমি তো তেমন দেখিনি।

স্কুলে পড়ার সময় বাচ্চাগুলোকে হস্টেলে রাখার পিছনে কয়েকটি কারন থাকে। এক যেমন বলেছি , ধর্মীয় সংস্থার হোস্টেলে থাকলে নৈতিক চরিত্র উন্নত হবে , এমন একটা ধারনাই প্রধান। অনেক বিত্তবান মানুষ বাচ্চাদের হোস্টেলে রাখেন, কারন তারা নিজেদের উপরই ভরসা রাখতে পারে না। পারিবারিক সমস্যা থাকলেও ছোট বাচ্চার মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে, এই আশঙ্কা করে অনেক বাচ্চাকে হোস্টেলে রাখা হয়। অনেকের ধারণা হোস্টেলে থাকলে বাচ্চা অনেক বেশি স্বনির্ভর হবে। আমাদের বাচ্চারা স্কুল কলেজ জীবনে হোস্টেলে থাকেনি, তারা নিজেদের কাজ নিজেরাই করছে। বাবা মা কেমন করে বাচ্চাকে মানুষ করছে তার উপরই এসব নির্ভর করে। স্কুলের হস্টেলের সাথে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের অনেক তফাৎ আছে। স্কুলের ছেলেদের যেমন সব সময় “পড় পড়” বলতে হয় , কলেজে তার দরকার হয় না। বলার মত কেউ থাকেও না। পড়াটা যে নিজের তাগিদেই করতে হয় এটা কলেজের পড়ুয়ারা যেমন বোঝে , স্কুলের ছাত্রদের কাছে সেটা আশা করা যায় না। আবার কলেজের ছাত্র –ছাত্রীদের রাজনৈতিক বা অন্য নানান বিপজ্জনক বদ সংসর্গে পড়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। আমি কয়েকজনকেই কলেজের হোস্টেলে বাজে নেশার কবলে পড়তে দেখেছি। আর আমাদের সময়কালে যে কটা বড় বড় রাজনৈতিক আন্দোলন হতে দেখলাম , সব কটাতেই দেখেছি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা অগ্রনী ভুমিকা নিয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের বন্যার জল মেডিক্যাল কলেজগুলির হস্টেলেও সমানভাবে ঢুকেছে। এই বাবদে আমাদের রাজ্যের আর দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল বেশ বিখ্যাত হয়েছে। কলকাতার এক একটা মেডিক্যাল কলেজের চার পাঁচটি করে হোস্টেল। এগুলির এক একটি আবার এক এক রাজনৈতিক দলের আখড়ায় পরিনত করা হয়েছে।

গত বছর সাত আটেকে প্রায় সবকটা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংখ্যা অনেক বেড়েছে; ফলে হোস্টেলে থাকার জায়গার অভাব। কোলকাতার আশেপাশে যাদের বাড়ি তাদের হোস্টেলে জায়গা দেওয়া হয় না। অনেক বাবা মা আবার ঐ রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে ছেলে মেয়েকে দূরে রাখতে চান বলে নিজেদের সন্তানকে হোস্টেলে পাঠাচ্ছেন না। আমরা বাঁকুড়ায় থাকার সময় যাদের বাড়ি বাঁকুড়া শহরে তারাও হোস্টেলে থাকত; হোস্টেলে থাকলে বন্ধুদের সাথে পড়াশুনা ভালো হত। আমরা তখন হোস্টেলের যে ঘরে একা একা থেকেছি এখন সে সব ঘরে দুজন , এমনকি তিনজনকেও থাকতে হচ্ছে। আমার ছেলে এম ডি পড়তে গিয়ে প্রথমে হোস্টেল পায়নি; কদিন বাইরে লজে থাকতে হয়েছে। ওরা যাওয়ার আগেই এ খবরটা জেনে গিয়েছিল; তাই পৌছে ঝামেলায় পড়েনি।

Dr B C Roy Hall in 2018.

বাঁকুড়ায় আমার দ্বিতীয় হোষ্টেল

আমার মেয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু দিল্লি এন আই টি বিপজ্জনক ভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখিয়েছে। এম টেকে ভর্তি হওয়ার সময় হোস্টেলের ফি কত জানতে চাইলে বলেছে, ক্লাশ শুরু হলে তখন হোস্টেল পাবে, ফি তখনই দিতে হবে। এত বড় একটা কলেজে যে মেয়েদেরও হোস্টেল নেই এটা আমরা ভাবতে পারিনি। নেই যে সে কথাটা প্রথমেই বলে দিতে পারত। একমাস পর দু হাতে দুটি বড় ব্যাগ নিয়ে কলেজে পৌঁছেই শুনল , কোন হোস্টেল নেই। কলেজের কাছের বাজারটি কলেজ থেকে দু কিলোমিটার দূরে। আপিস থেকে নির্বিকার ভাবে বলে দিল, পেয়িং গেস্ট খুঁজে নাও। যেন মুদি দোকান থেকে সাবান কিনতে বলছে। মেয়ে কেঁদে ফেলেছে। তখন দয়া করে একটা হোস্টেলের গেষ্ট রুম দুদিন থাকতে দিয়েছে। এই মেয়ে কিন্তু স্কুল কলেজ কোথাও হোস্টেলে থাকেনি। নিজে নিজেই পেয়িং গেস্ট খুঁজেও নিয়েছে। কিন্তু সেই যে কলেজ সম্বন্ধে একটা অনাস্থা ওর তৈরী হল সেটা ওর আজীবন থেকেই যাবে।

বাঁকুড়া শহরে বহুদিন থাকলেও বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজের কোন হোস্টেলে কোনদিন ঢুকিনি। বছর দুই আগে , বিখ্যাত প্রিন্সিপাল রেভারেন্ড এ ই ব্রাউন সাহেব আর তাঁর অলিম্পিক পদক বিজয়ী ছেলে মেয়ের কথা জানতে পারি। ( তুমি বিদেশীনি নিবন্ধে লিখেছি) আগেই শুনেছি ব্রাউন হোস্টেল আর মিচেল বা মাইকেল হোস্টেলের কথা। এক বন্ধুর সাথে গেলাম সেই ব্রাউন হোস্টেল দেখতে। হোস্টেলের সামনের সেই দীঘি এখনও আছে, যদিও বাঁধানো ঘাটের অবস্থা কাহিল। এত বিখ্যাত সব মানুষদের স্মৃতিধন্য হোস্টেল দেখলাম। অবশ্যই তাঁরা এ দেশ ছেড়ে যাওয়ায় পরই তৈরী হয়েছে ঐ হোস্টেল। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে মনে পড়ল আমাদের কলেজ জীবনে ঐ হস্টেলগুলিতে ঘটে যাওয়া একটা মর্মান্তিক ঘটনার কথা। দুই হোস্টেলের মধ্যে মারামারিতে খুন হয়ে যায় খ্রীষ্টান কলেজের ছাত্র নেতা সুদেব ঘটক। তাকে কোনদিন দেখিনি। কলকাতার বিখ্যাত সব হোস্টেল, বেকার- কারমাইকেল- হিন্দু দেখেছি। পিজি হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তারদের হোস্টেলে কিছুদিন থাকার অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তবুও কলেজের হোস্টেল বললেই চল্লিশ বছর আগে ঘটা, সুদেব ঘটকের হত্যার কথাই কেন মনে পড়ল জানিনা।

বাঁকুড়ায় আমার শেষ হোস্টেল

লক্ষ্মী দিদি

আমাদের গ্রামের বাড়ির পাশের বাড়ীতে থাকতেন আমাদের লক্ষ্মীদিদি। থাকতেন বলাটা ঠিক হলনা; ওনারাই আমাদের প্রতিবেশী। মাঝে আর একটা বাড়ী থাকলেও, এই দিদিদের সাথেই আমাদের বাড়ীর যোগাযোগ বেশী ছিল। এই দিদি যে কোন সুবাদে আমাদের দিদি হয়েছিলেন, আমার জানা নেই। আমি জন্মে থেকেই জানি, লক্ষ্মীদিদি আমাদের আপনজন। একেবারেই চাষি পরিবারের গৃহিণী। ওনার নিজের ছয় ছেলে, আর ভাসুরের তিন ছেলে মিলে বিরাট পরিবার। নিজেদের চাষের জমি ছিল, তাতে ছেলেরা প্রচুর পরিশ্রম করত। দিদির বড় আর মেজ ছেলে আমার থেকে বয়সে বড় ছিল। আমরা ওদের দাদাই বলতাম। তবে, পরের দিকে আমি ডাক্তার হওয়ার পর , ঐ দুজনও আমাকে মামা বলত। এই মামা বলা নিয়ে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। আমি তখন মেদিনীপুর শহরে থাকি। দিদির মেজ ছেলে আর গ্রামের আর এক প্রতিবেশী আমার বাসায় এসেছেন। আমার কিছুদিন আগেই বিয়ে হয়েছে , আমার স্ত্রী আমাদের গ্রামের লোকজনকে চেনার কথাও নয়। ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে , চা খাওয়াতে বললাম। দুজন বয়স্ক মানুষ , " মামী" বলে পায়ের ধুলো নিতে চাইলে আমার স্ত্রী দারুন বিব্রত হয়েছিল।

গ্রামে যতদিন ছিলাম দিদিদের বাড়িতে প্রায় সবদিনই কোন কাজে বা খেলতে যেতাম। ওনার সেজ ছেলে আর তার পরের দুই ভাই, ওদের জেঠার দুই ছেলে , সব আমাদের খেলার সঙ্গি ছিল। একমাত্র ঐ বাড়িতেই আমরা রান্না ঘরেও ঢুকে যেতাম। ওদের অনেক আম গাছ আর গোটা দুই বিশাল কতবেল গাছ ছিল। ফল পাকার সময় সারাদিন ঐ সব গাছের তলায় ঘুরে বেড়াতাম।ওদের পুকুরটাও বেশ বড় আর গভীর ছিল, গ্রীষ্মকালে অনেক জল থাকত। আমরা বেশ কিছু ছেলে দুপুরে পুকুরে নেমে জল তোলপাড় করতাম। পুকুরের পাড়ের উপর ছিল একটা বিরাট ঝাঁকড়া আম গাছ। তিন ভাগ আম জলেই পড়ত, আমরা ডুব দিয়ে জলের তলা থেকে আম তুলতাম।

আর ছিল একটা তেঁতুল বাগান। গোটা দশেক বিরাট বিরাট তেঁতুল গাছের এমন বাগান আমি আর কোথাও দেখিনি। গ্রীষ্মের দুপুরে ঐ বাগানে আমাদের আড্ডা বসত। ঐ আড্ডাতেই লক্ষ্মী দিদির বাছাই করা গালাগালি সব শিখেছিলাম। পাড়ার কোন মেয়ে বৌ কুঁড়ে হলে তার উদ্দেশে দিদি বলতেন, “ওর গতরে লাথ মার! " অর মুয়ে ঝাঁটা মার" ছিল দিদির সবথেকে কড়া গালাগালি। তখনকার গ্রামের সব মহিলার মত দিদিও প্রায় অশিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু আমরা জানতাম উনি খুব বিচ্ক্ষণ মহিলা ছিলেন। আমার মাকে দেখেছি, কোন সমস্যায় পড়লে , দিদিকে ডেকে পরামর্শ নিচ্ছে। আমার নিজের বড়দি মাঝে মাঝে গ্রামের আর দুই মহিলার সাথে গরুর গাড়ী করে সিনেমা দেখতে যেত। তখন লক্ষ্মী দিদি সিনেমায় গেছেন, এমন শুনিনি। কিন্তু মাইল দুই দূরের হাটে নিয়মিত যেতেন। খুব সামান্য কিছু সব্জি বা ফল নিয়ে গিয়ে বিক্রী করতেন। কিন্তু হাটে যাওয়াটা ওনার নেশার মত ছিল।

দিদিকে নিয়ে প্রথম যে স্মৃতি আমার আছে সেটা হল একটা দশ কেজি ওজনের কাতলা মাছ কাটা।অনেক দিন

পর বন্যা হয়ে মাঠ ঘাট পুকুর সব ভেসে গেল। ধানের মাঠে বড় বড় রুই কাতলা মাছ এসে গেল। বড়দা আর তার বন্ধুরা বন্যার জলে জাল ফেলে অনেক মাছ ধরল। বড়দার ধরা বিরাট কাতলা মাছ কাটবে কে। লক্ষ্মী দিদির ডাক পড়ল। দিদি তার

ভারী চেহারা নিয়ে উঠানে বসে মাছটাকে কাটলেন। আর শেষ দিদিকে দেখেছি চোখের ডাক্তার হিসেবে।তখন দিদির বেশ বয়স হয়েছে। কোথাও একটা ছানি অপারেশনের করিয়েছেন, কিন্তু তারপর থেকে চোখে একটা অস্বস্তি । আমি তখন মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়ি যেতাম। একবার গ্রামের বাড়িতেই দিদিকে দেখলাম। অপারেশন-এর একটা জটিলতা হয়েছিল, ওখানে বসে খালি হাতে আমার কিছুই করার ছিলনা।

ছোট বেলা থেকেই দিদিকে প্রায় বাড়ীর লোকের মতই দেখে এসেছি। দুই বাড়ীর উৎসব অনুষ্ঠানে, বিপদে আপদে সবাই নিজের মতো পাশে থাকতাম। লক্ষ্মীদিদি আর মা আমাদের বাড়ির দাওয়ায় বসে, মুখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, এই দৃশ্যটাই আমার মনে জেগে আছে পরিষ্কার ভাবে। ওদের কান্নার কারণটাও ছিল অদ্ভুত। সকালের দিকে আমাদের একটা গাই গরু হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল। দাদা কি করে যেন বুঝেছিল, সাপে কামড়েছে। তাড়াতাড়ি গরুর বাঁধন খুলে দেওয়া হলো। আমাদের চোখের সামনে মরে গেল গরুটা।

গ্রামের এই সব লক্ষ্মীদিদি, মিত্রা মাসি, বড় বৌদি এদের স্নেহে শাসনে বড় হয়েছি। ওদের বাড়ীর  আমগাছ পেয়ারা গাছ গ্রামের সব বাচ্চাদেরই নিজের মনে হত। পরের প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা অনেকে আমাকে দেখেইনি কোনদিন। গত পঁচিশ  বছর বোধহয় লক্ষ্মিদিদির বাড়ীর দিকে যাই নি। এখন যেতে গেলেও মনে একটা আশংকা থেকে যায়। ওদের পুকুরের ঈশান কোনের  সেই বড় কতবেল গাছটা কি আর এখনও আছে? যদি না থাকে? শৈশবের হারিয়ে যাওয়া অনেক কিছুর মত আর একটা শুন্যতা মনটাকে খারাপ করবে।

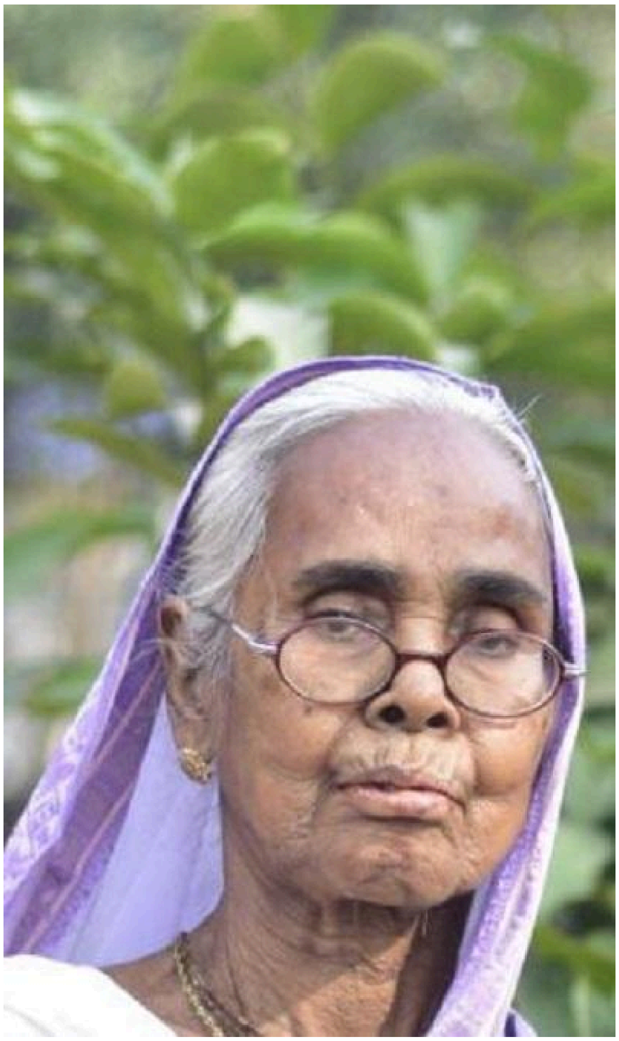
বড় বৌদি

১৭.১.২০২৫। যে ভয়টা মনে ছিল, সেটাই সত্যি হল; দেখে এলাম, আমাদের কৈশোরের স্মৃতিমাখা সেই কতবেল গাছ, তেঁতুল গাছগুলি, আম গাছগুলি কেউ নেই। মানুষের জন্য তারা সবাই জায়গা ছেড়ে দিয়েছে।

নাম করণের সার্থকতা।

আমার এক নিকট আত্মীয়ার নাম, লোপামুদ্রা। ঐ নাম তথা আত্মীয়ার সাথে আলাপ হওয়ার প্রায় পঁচিশ বছর পর জানতে পারি যে, এই লোপামুদ্রা নামের এক বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির কাহিনী মহাভারতে আছে। একই রকম ভাবে বছর আঠারো আগে, এক আত্মীয়ের ছেলের নাম শৌনক, জানার পর , এই শৌনক মানে কি, বা এ নাম কোথা থেকে এল ভাবতে ভাবতেই , সম্ভবত পরের দিনই একটা লেখায় চোখে পড়ে শৌনক নামটা। আচার্য নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী মশাইয়ের "কথা অমৃত সমান"- এ দেখলাম ঐ শৌনক মুনির নাম। মহাভারতে কি নেই , তাই ভবি।

আমরা স্কুলে বাংলা পড়ার সময় যে সব গল্প বা কবিতা পড়তাম, তাদের 'নাম করণের সার্থকতা' বলে একটা জিনিস আমাদের জানতে হত। অমুক লেখকের তমুক গল্পের নাম করণের সার্থকতা লিখ; এরকম একটা প্রশ্ন আসত পরীক্ষায়। আমরা বুঝি না বুঝি, একটা দশ লাইনের মত উত্তর মুখস্ত করতে হত। আর নাম নিয়ে ছিল দু' একটা প্রচলিত বাকধারা। নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না। আর একটা ছিল, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। তাল পুকুর আমি বেশ কয়েকটা দেখেছি, কিন্তু ঘটি না ডোবার মত দুরবস্থা কোনটার দেখিনি। আর চোখের ডাক্তার হওয়ার সুবাদে অনেক কানা লোক দেখলেও তাদের কারো নাম পদ্মলোচন পাইনি।

আবার কদিন আগে মহাভারতের এই শৌনক মুনির প্রসঙ্গ বিস্তৃত শুনলাম। তখন আমার ঐ আত্মীয়কে জিজ্ঞেস করলাম, ছেলের শৌনক নাম কে রেখেছে? ওরা এই শৌনক মুনির কথা জানে কি না? ছেলের নাম তার বাবাই রেখেছে, জানাল। এই নামে একজন মুনি ছিলেন, এটুকুই জানে, আর কিছুই জানা ছিল না। ওকে মহারাজ সমর্পনানন্দর মহাভারত পাঠের ইউ টিউব লিঙ্ক পাঠিয়ে দিলাম।

মহাভারতের ঐ গল্পটা একটু বলি। পাণ্ডবরা বনবাসে যাওয়ার সময় অনেক ব্রাহ্মণ তাঁদের সাথে সাথেই বনে চলে গেলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই ব্রাহ্মণদের কাছে ধর্মালোচনা শুনে সময় কাটাতেন। স্বনামধন্য ধার্মিক হাওয়ার সুবাদে , মাঝে মাঝেই নতুন নতুন ব্রাহ্মণ, মুনি- ঋষি এসে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাথে শাস্ত্র আলোচনা করে যেতেন। এ ভাবেই একদিন বিখ্যাত শৌনক মুনি যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। তখনও বনবাসের বেশী দিন হয়নি। রাজা থাকার সময়ে যেমন করেছেন, তেমনি ভাবেই যুধিষ্ঠির, সাথে আসা ব্রাহ্মণদের সেবা যত্ন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বনবাসের সময় এত মানুষের ভরণ পোষণের ক্ষমতা পান্ডবদের ছিল না। এদিকে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ দের অযত্ন হচ্ছে বুঝে মনে

মনে বেশ কষ্টও পাচ্ছিলেন। সেই রকম একটা দিনই মহাত্মা শৌনক মুনি সেখানে আসেন। এই শৌনক মুনির উল্লেখ ' প্রশ্নোপনিষদে ' আছে। কয়েকজন মুনি- ঋষি এই শৌনক মুনির কাছে কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হলে , শৌনক মুনি তাঁদের বলেন যে, অন্তত একটি বছর আমার আশ্রমে থাকুন, তপস্যা করুন; তারপর আপনাদের প্রশ্ন করার অধিকার আছে কি না বুঝে, আপনাদের প্রশ্ন শুনব। এই প্রশ্ন করার অধিকার নিয়ে , সমর্পনানন্দ মহারাজ বেশ কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলেছেন। আমার মত অনধিকারির কাছে সেসব কথা না শুনে , সরাসরি মহারাজের পাঠ থেকেই শুনুন।

যাই হোক, রাজ চক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরকে বনবাসের দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, সেই নিয়েই শৌনক মুনি বিস্তৃত আলোচনা করলেন। মুনি বলেছিলেন, " শোক স্থান সহস্রানি, ভয় স্থান শতানী চ।" অর্থাৎ মানুষের শোক দুঃখের হাজার কারণ হয়, আর ভয় পাওয়ার মত একশোটা জিনিস আছে।এই শৌনক মুনি কর্ম যোগ আর সাংখ্য যোগ এর বিশেষজ্ঞ ছিলেন। রাজ্য হারানো, বনবাসী যুধিষ্ঠিরের শোকের কারণ তো খুবই প্রকট। তারপরও তিনি তখনও নিজের বনবাস জীবনের সীমাবদ্ধতাকে ঠিক মেনে নিতে পারেননি; আগের মতোই শত শত ব্রাহ্মণের সেবা যত্ন করে যেতে চাইছেন। সেটা ঠিক মত করতে না পারাটাও তাঁর শোকের আর একটা কারণ। স্পষ্টবাদী শৌনক মুনি যুধিষ্ঠিরকে বাস্তব অবস্থাটা বোঝানোর চেষ্টা করে দেখলেন যে, রাজার সেই রাজসিক মানসিকতা তখনো থেকে গিয়েছে। এখানে যেন ব্যতিক্রম হিসেব দেখা যাচ্ছে, যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ মুনির কথা মানতে পারছেন না। শৌনক মুনি একটু হতাশ হয়েই যুধিষ্ঠিরের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

আমার আত্মীয় এই শৌনক ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমি হলফ করে বলতে পারি, ওর বাবা মা কোনদিনই ভাবেনি যে তাদের ছেলে একজন দার্শনিক হোক। একই ভাবে এ দেশের লাখ লাখ ডাক্তারের মধ্যে কারো নাম চরক বা সুশ্রুত কোনদিন শুনিনি। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এমনকি দশরথ নামও প্রচুর শোনা যায়। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা নাম বাঙালিদের মধ্যে বিরল হলেও উত্তর ভারতে বেশ প্রচলিত। পঞ্চ পাণ্ডবদের মধ্যে ভীম, অর্জুন, নকুল নাম আমাদের আশেপাশে অনেক দেখা যায়। সহদেব নামটি খুব প্রচলিত না হলেও আমার পুরনো স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক মশাই এর নাম সহদেব। যুধিষ্ঠির নামের একজন ডাক্তারবাবু আছেন আলিপুদুয়ারে; আমার সাথে ভালো পরিচয় আছে। এছাড়া আর কোন যুধিষ্ঠির

নামের কারো কথা মনে পড়ছে না। সেদিন ভাষাবিদ ডা পাত্র বলছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র কারো নাম দেখা যায় না। অবশ্য দুর্যোধন নাম আমি শুনেছি।দ্রৌপদী আর কুন্তী নামও উত্তর ভারতে বেশ প্রচলিত। আরও প্রাচীন মুনি ঋষি দের নামও কয়েকটি এখনও বেশ আধুনিক নাম হিসেবেই প্রচলিত। উপমন্যু, উদ্দালক, প্রচেতা , অরুন্ধতী এসব তো বেশ আধুনিক নাম। এমনকি একলব্য নামও শুনলাম। কিন্তূ আমার আত্মীয় ঐ শৌনক এর মতই, শুধুমাত্র সুন্দর ছন্দোময় একটা নাম হিসেবেই সম্ভবত এসব নাম রাখা। ঐ সব বেদ উপনিষদের মুনি -ঋষি, তপস্বিনীদের মত নাম রাখার সময় কজন মনে রাখে ঐরকম নাম করণের সার্থকতা?

সামান্য ফলের বিপুল সম্ভাবনা

সকালে উঠে পাড়ার মধ্যেই হেঁটে ঘুরে আসি , মাইল দুই হবে। সে প্রায় বছর পাঁচ ছয় হবে। বছরে যদি মোটামুটি সাড়ে তিন'শ দিন হাঁটা হয় , পাঁচ বছরে সাড়ে সতেরশত বার এই গাছটার নিচে দিয়ে আমরা হেঁটেছি। এতদিন খেয়াল করিনি, এর তলায় এত ফল পড়ে থাকে। এর থেকে পঁচিশ তিরিশ গজ এগোলেই একটা বিরাট ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছ আছে; সেটার তলায় প্রায় সারা বছরই কিছু ফল পড়ে থাকতে দেখি। আর এই অশ্বত্থ গাছের ঠিক পশ্চিমে, পঞ্চাশ গজ দূরে, আমাদের সেই খুব চেনা হরবড়ই গাছটি। এই হর্বড়ই গাছ, আর এর ফল নিয়ে আগে লিখেছি। এই সবকটি ফলের মধ্যে এই বট গাছের ফল সবথেকে সুন্দর। কিন্তু গাছ থেকে পড়ে থাকা অবস্থায় অক্ষত বটের ফল প্রায় দেখাই যায় না। কদিন ধরে দেখছি, এই পুকুর পাড়ের বট গাছের নিচের রাস্তায় অসংখ্য ফল পড়ে থেঁতলে আছে। পড়ার সময় হয়তো সবকটা ফল ফেটে যায় না, কিন্তু রাস্তাটা বেশ ব্যস্ত। গোটা ফল পড়লেও মানুষের পায়ের চাপে, গাড়ী আর রিক্সার চাকায় থেঁতলে যায়। আজই, দ্বিতীয় বার ওখান দিয়ে হাঁটার সময় দেখলাম, রাস্তার পাশের দিকে , দুই একটা গোটা ফল পড়ে আছে। আসলে বটের ফল কেউ খায় না ( ? ), বা এই ফল নিয়ে কোন কাজে লাগানো যায়, এমন খবর আমার জানা নেই। সে জন্যেই, যতো সুন্দর দেখতেই হোক , কেউ বটের ফল কুড়িয়ে নিয়ে যায় না। সুন্দর দেখতে বলেই একটা লাল টুকটুকে ফল কুড়িয়ে নিলাম। হাতে নিয়ে দেখলাম, বেশ নরম, একটু চাপ পড়লেই ফেটে যেতে পারে। একটু সাবধানেই বাড়ীতে আনতে হল। সাবধানে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেখি, এটা আরও সুন্দর লাগছে।

বট ফল

গাছের তলায় অত্যন্ত অবহেলায়, মানুষের পায়ের চাপে থেঁতলে পড়ে থাকতে দেখে, মনে কতগুলি ভাবনা এসে জড়ো হয়েছে। এই একটি লাল ফলের মধ্যে প্রায় শ খানেক হলুদ বীজ। সাধারণ সর্ষে দানার থেকেও ছোট এক একটি বীজের মধ্যে কী বিশাল বিপুল একটি মহীরুহের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। ব্যতিক্রমী, ইতিহাস হয়ে যাওয়া গাছগুলির কথা ছেড়েই দিলাম, এদিক ওদিক হেলায় দাঁড়িয়ে থাকা এক একটি বট গাছের কী বিশাল চেহারা। কোন একটা দিন এই সকল বট গাছের ইতিহাসও শুরু হয়েছে এই রকম একটি সর্ষে দানার মত ক্ষুদ্র বীজের থেকেই। কিন্তু এত এত হাজার লক্ষ বীজ তো প্রতিটা বট গাছের ছায়ায় হেলায় পরে থাকে; তাহলে হাজার হাজার

বট গাছ আমরা দেখতে পাই না কেন? বটের বীজ শুনলেই কেমন যেন একটা " ধ্বংসের" বীজ মনে হয় আমার। কেন এমন ধারণা? পুরোনো বাড়ী, মন্দির বা ধ্বসে পড়ার মত কোন সৌধ লক্ষ্য করে দেখবেন, দেওয়াল ফাটিয়ে মোটা মোটা বট বা অশ্বত্থ গাছের শিকড় উপর থেকে নিচে নেমে, মাটির গভীরে ঢুকে গেছে। এরকম দৃশ্য আপনারা সকলেই দেখেছেন। একবার একটু পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখুন; ঐ ধ্বংসাত্মক শিকরগুলির শুরু কিভাবে হয়েছে? একটি সামান্য সর্ষে দানার মত একটি বীজ; কোন সুদূর অতীত কালে, ঐ মন্দির বা সৌধের উপর এসে পড়েছিল। আজও সেই কালের নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। আজও আমরা প্রায়ই দেখি, বাড়ীর ছাদে, দেওয়ালের গায়ে, জলের নলের পাশে, কবে যেন গজিয়ে উঠেছে একটি ছোট্ট বটের চারা। ছোট্ট চারা অবস্থায়ই একেবারে শিকড় সমেত উপড়ে না ফেললে, কয়েক বছরে ওই ছোট্ট চারা শিকড় নামিয়ে দেবে , তিন চার তলার উপর থেকে একেবারে মাটি পর্যন্ত। তখন তাকে সমূলে উৎপাটন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বেড়াতে গিয়ে রস দ্বীপে গেছলাম; সকল যাত্রীই যায় একবার। একসময় ঐ রস দ্বীপেই ছিল আন্দামানের প্রধান শহর। এই তো সেদিন, জাপানের সহায়তায়, নেতাজী ঐ দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটিশ সরকার এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন, স্বরাজ দ্বীপ। তার কয়েক বছর পরই ঐ স্বরাজ দ্বীপ বা রস আইল্যান্ড একেবারেই পরিত্যক্ত হয়ে গেল। এখন যাত্রীরা বড় লঞ্চে করে ওখানে যান, ঘন্টা দুই এর জন্য ইতিহাসকে দেখে আসার জন্য। পুরনো দিনের প্রায় প্রতিটা বাড়িই ধ্বংসের মুখে। বট অশ্বত্থের শিকড় এক একটি বাড়ির দেওয়ালকে মাকড়সার জালের মতো আঁকড়ে ধরেছে। তাই ভাবছিলাম, একটা ক্ষুদ্র বীজের ধ্বংস করার ক্ষমতা বোধহয় এটম বোমার থেকেও বেশি।

কিন্তু এই বীজের যদি এতই প্রাণশক্তি , চার পাঁচ তলা বাড়ির ছাদ থেকে মাটি পর্যন্ত শিকড় নামিয়ে রসদ সংগ্রহ করে ফেলে; তাহলে আমরা সেই বিপুল সংখ্যায় বট গাছ তো দেখি না! এত এত বীজ গাছের তলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, কিন্তু প্রতিটা বট গাছের আশেপাশে তো অনেক চারা গাছ দেখা যায় না। আমি নিশ্চিত নই, খুব সম্ভবত কোন কোন পাখী ফল খাওয়ার পর, মল ত্যাগ করে ঐ বীজের অঙ্কুরোদগম এ সহায়তা করে। পাখীর শরীরের ভেতরে ঢুকে পরিপাক না হলে, ঐ বীজ থেকে চারা তৈরি হয় না। এই ভাবনার পিছনে একটি প্রাণীর এই রকম একটি ভূমিকার কথা শুনেছি। ভাম বিড়াল বা পাম সিভেট এই রকম একটি বিশেষ গাছের বংশ বিস্তার করতে জরুরী। এই মুহূর্তে ঐ গাছটির নাম মনে পড়ছে না। ঐ গাছের বীজ সরাসরি মাটিতে পুঁতে দেখা গেছে, চারা বেরোচ্ছে না। একমাত্র ভামের মলের থেকে পাওয়া বীজেই চারা গাছ করা যায়।

আচ্ছা, ঐ যে এক জায়গায় কেউ এই ফল খায় কি না , তাই নিয়ে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে রেখেছি, খেয়াল করেছেন? সাধারণভাবে এই বটের ফল মানুষ খায়, এমন খবর আমার জানা ছিল না। কিন্তু একটি অত্যন্ত তথ্য বহুল একটি বই পড়ে জেনেছি, ভগবানজী নামের এক রহস্যময় সাধু প্রচণ্ড দুর্দিনে, বটের ফল সেদ্ধ করে একটু নুন দিয়ে খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছেন। সাধু সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করে, গাছের পাতা খেয়ে, দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে পারেন; আমরা ভারতীয়রা সেটাকে ঐ মহাত্মাদের বিশেষ বা প্রায় অলৌকিক ক্ষমতা বলে মেনে নিয়েছি। কিন্তু যদি জানতে পারি, পূর্বাশ্রমে এই মানুষটিই দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য জীবন পণ করেছিলেন? যদি এত বছর পরও প্রমাণিত হয় ঐ সাধুর বেশধারী মানুষটিকে আজও আপামর ভারতবাসী দেবতার মত শ্রদ্ধা করে?

তখন কি নিজেকে অপরাধী মনে হয় না ? ঐ বইতে কিন্তু কয়েকশ তথ্য প্রমাণ হাজির করা হয়েছে ; প্রমাণ করা হয়েছে, পরবর্তী কালে কিছুদিন বটের ফল সিদ্ধ করে খেয়ে প্রাণ ধারণ করা মানুষটিই আমার প্রাণের দেবতা। শুধু চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছুই করার নেই এখন। আজও সেই মানুষটির শেষ জীবনের কথা ভাবলে বুক ভার হয়ে যায়, গলার কাছে একটা দীর্ঘশ্বাস আটকে পড়ে কন্ঠ রুদ্ধ করে আনে। না; একটি সামান্য বট ফলের কথা বলতে বলতে এমন হৃদয়ে মোচড় দেওয়া স্মৃতি এসে পড়বে, লেখা শুরুর সময় ভাবিনি। ১৭.১১.২৪.

ঘাট

ঘাট বললে আমরা খুব ছোট বেলা থেকেই জানি পুকুরের ঘাট। ঘাট এমন একটা জায়গা ছিল যেখানে বাড়ীর বাসন মাজা থেকে স্নান করতে নামা, কলসী ভরে জল আনা , কাপড় কাচা ধোওয়া এসব প্রাত্যহিক কাজই করা হত। অন্য দিকে নদীর ঘাট বললে বুঝতাম যেখান থেকে নদী পারাপারের জন্য নৌকায় ওঠা যায়। অনেক পরে জেনেছি , ঘাট বললে শ্মশান ঘাটও বোঝায়।

আমাদের গ্রামের বাড়ির পুকুর ঘাটের সাথে আমার ছোট বেলার এত স্মৃতি জড়িয়ে আছে যে লিখে শেষ করা যাবে না। আমাদের দুটি পুকুর। বড় পুকুরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ঘাট। আর ছোট পুকুরের দক্ষিণ পুর্ব দিকে। আসলে দুটি ঘাটই পাশা পাশি। ছোট পুকুরটা একেবারেই ডোবা, সারা বছর জল থাকে না। তাই এই ঘাটটা তেমন ব্যবহার করা হয় না। বড় পুকুরের ঘাটই সারা বছর ব্যবহার করা হয়। আমাদের মত সাধারণ মানুষের পুকুর ঘাট প্রায় সব একই রকম। বর্ষায় একেবারে টইটম্বুর হয়ে যায়। তখন একেবারে পাড়ের ওপর রাখা পাথরটাতে বসেই জলের নাগাল পাওয়া যায়। এর পর সাধারণ পাথর বা শক্ত গাছের গুঁড়ি ধাপে ধাপে নিচে নেমে গেছে। চৈত্র বৈশাখ মাসে পুকুরের জল যখন একেবারে নিচে নেমে যায় , তখনও একটা কাঠের বা পাথরের ওপর বসে জলে হাত দেওয়া যায়।

এই পুকুর ঘাট গুলি ছিল গ্রামের মহিলাদের কিছুটা সময় কাটানোর বা আড্ডা দেবার জায়গা। আর আমাদের মত বাচ্চাদের ছিপ ফেলে পুঁটি মাছ ধরার জন্য নির্দিষ্ট। তখনকার দিনে পুকুরের পাড়ে পাড়ে নানান ঝোপ ঝাড় গাছপালা থাকত, তাই ঘাটে ছাড়া ছোটদের ছিপ ফেলার সুযোগ হত না। বছর দশেক আগেও আমি গ্রামের বাড়িতে একদিন থাকলেও একবার একটু আটার গুলি নিয়ে মাছ ধরতে চলে যেতাম ঘাটে। আমার ছেলে মেয়ে শহরে জন্মেছে, শহরেই বড় হয়েছে; ওরাও বাড়ী গেলে ছিপ ফেলতে চাইত। এই ঘাটের কাছেই একটা কোন বাঁশের খুঁটি ধরে সাঁতার কাটতে শিখেছি; কোন ছোট বেলায় মনেই নেই। তখন সাঁতার কাটার উৎসাহে ঘাটের কাছের জল ঘোলা করে দিতাম।

একটু বড় হয়েই আমাদের গ্রামের মাঝের পাকা ঘাট হয়ে গেল আমাদের বিকেলে খেলার কেন্দ্র। গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাঠ ছিল একটু বড়দের খেলার মাঠ। আর বাচ্চারা সিমেন্ট বাঁধানো সুন্দর ঘাটের চাথালে, সিমেন্টের বেঞ্চে খেলতাম। কোন দখল করা, কুমীর ডাঙ্গা এই সব ছিল আমাদের খেলা। মাধ্যমিক পাশ করে কলকাতায় চলে এলাম । সব রকমের খেলা বন্ধ হল। কলকাতা থেকে সোজা বাঁকুড়ায় চলে গেলাম কলেজে পড়তে। এক দেড় বছর পর এক ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে বিকেলে পাকা ঘাটে গেলাম। মাঠে একদল ছেলে ফুটবল খেলছে। আমি ঘাটের ওপরের বেঞ্চে বসে মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমাকে দেখে দু একজন ছেলে এসে আমার সাথে কথা বলছিল। মেডিক্যাল কলেজের গল্প ওদের কাছে রূপকথার মতো। একবার মনে হল , অন্য একটি ছেলে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমাদের কথায় কান রাখছে, কিন্তু কোন কথা বলছে না। কিছু পরে এক দাদা আমাকে রীতিমত জেরা শুরু করল। আমার রাজনৈতিক মতামত কি জানতে চায়। আমার কলেজে কোন রাজনৈতিক দলের ইউনিয়ন নেই , মানতেই চায় না। কয়েক মিনিটেই আমাদের কৈশোরের খেলার পাকা ঘাট দুঃস্বপ্নের মরুভূমি হয়ে গেল। আর কোনদিন সেই ঘাটে যাই নি।এই পাকা ঘাট আমাদের প্রজন্মের প্রায় পনের কুড়ি বছরের সব ছেলে মেয়ের কৈশোরের খেলার স্বপ্নের ভেতর থেকে যাবে। শুধু ডাঙ্গায় খেলা নয়, একটু বড় হয়ে ঐ ঘাটের জলে নেমেও কতোদিন খেলেছি। এখন সেই ঘাটটাও অনেক ভেঙ্গে গেছে। বাচ্চারা আর সেই পাকা ঘাটে খেলে না।

পাকা ঘাট , দূরে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার ২০১৫ সালে।

আমাদের গ্রামের বামুন পাড়ায় ভট্টাচার্য্যদের একটা বড় পুকুর আছে। আমাদের স্কুলে যাওয়ার রাস্তার পাশে, কিন্তু ওদের বাড়িটা পুকুরের উল্টো পাড়ে। ঘাটও ওদিকে। তাই ওদের ঘাটটা রাস্তা থেকে দেখতে পেতাম না। একদিন ঐ বাড়ী থেকে গামছায় বেঁধে বলীর পাঁঠার মাংস দিয়েছিল। গামছা ফিরিয়ে দিতে গেলে ওদের বড়মা বললেন, গামছাটা কেচে দিয়ে যা। সেই প্রথম ওদের পুকুর ঘাটে গেলাম। গ্রামের বারোয়ারী পাকা ঘাটের মত না হলেও প্রায় ওরকম বাঁধানো ঘাট। গ্রামে যে আর একটা ওরকম ঘাট আছে, জানতাম না। ওদের পাশের চক্রবর্তি বাড়ী আমাদের কুল পুরোহিত। তাদের বাড়ীর ঘাট বাড়ীর পিছন দিকে, বাড়ীর ভেতর দিয়ে রাস্তা। তাই ঘাটে কোনদিন যাইনি। আমরা গল্প শুনতাম যে ঐ চক্রবর্তি বাড়ীর পুকুরে পোষ মানানো ঘেটো রুই মাছ আছে। ঠাকুর মশাই নিজের হাতে ওদের খাইয়ে দেন। এমনকি পোষা মাছের নাকে সোনার নথও আছে। ছোট বেলার গল্প তো গল্পই , কে আর মিলিয়ে দেখতে যাচ্ছে! আমার বাড়ীর একুয়ারিয়ামে দুটি কৈ মাছ আছে। ওরা লাফিয়ে উঠে আমার হাত থেকে ভাত খায়।

আমাদের গ্রামের বাড়ির থেকে শহরের দিকে আসতে হলে লোয়াদায় নদীর ঘাট পেরোতে হয়। বছরের মধ্যে সাড়ে দশ মাস নদী শুকনো থাকে, গাড়ী নিয়ে চলে যাওয়া যায়। বর্ষার দু' মাস নৌকায় পেরোতে হয়। কলকাতায় এসে জানলাম, গঙ্গা নদীর পাড়ে পাড়ে অনেক ঘাট। এই ঘাট দুই রকম। লঞ্চে পারাপারের জন্য ফেরি ঘাট। আর নিমতলার মত শ্মশান ঘাট। ফেরি ঘাট কয়েকটিতেই গিয়েছি, পারাপার করেছি ; কিন্তু শ্মশান ঘাটে একবারই যেতে হয়েছে এখন পর্যন্ত। নিমতার সোনা কাকিমা মারা যাওয়ার পর গেছলাম , রতন বাবুর ঘাটে।

ঘাটের কথা বলতে হলে কাশী অর্থাৎ বেনারসের ঘাটের কথা বলতেই হয়। বিশ্বনাথের মন্দির ছাড়া বেনারসের বাকী সব শুধু ঘাট আর ঘাট। ওরা বলে ওখানে চৌষট্টি ঘাট আছে। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট জগৎ বিখ্যাত। বাংলা সাহিত্যে সিনেমায় এই কাশী আর দশাশ্বমেধ ঘাটের কথা বহুবার পাওয়া যায়। এই ঘাটগুলি কিন্তু মূলত স্নানের ঘাট। মনিকর্নিকা আর হরিশচন্দ্র ঘাটে সব সময়ই চিতা জ্বলছে। দশাশ্বমেধ ঘাটের যা পৌরাণিক আর সাহিত্যে প্রচার সে তুলনায় বাকী সব ঘাট শত হস্ত পিছিয়ে আছে। এই দশাশ্বমেধ বা তার আসে পাশের ঘাটে সব সময়ই কিছু লোক স্নান করছে। বাঁধানো ঘাটের এদিক ওদিক অনেক পান্ডা পুরোহিত বসে গেছেন। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত একটা মেলা মেলা পরিবেশ। ঘাটের ওপরে , পান্ডার পাশেই নাঙ্গা সাধু গায়ে ছাই ভস্ম মেখে বসে আছে। জপ তপ কখন করে জানিনা, সবার কাছেই হাত পেতে পয়সা চাইছে। আমরা ভোর রাতে গিয়েও দেখেছি, পুণ্যার্থী র ভিড়। কেউ স্নান সেরে পূজা করছে। কেউ শাল পাতার ছোট্ট ঠোঙায় ফুল আর প্রদীপ জলে ভাসাচ্ছে। বিদেশী ট্যুরিস্টরা এসব রঙ্গ দেখে পটাপট ছবি তুলছে। বিকেলে দাঁড় টানা নৌকা ভাড়া নিয়ে আধ মাইল মত গঙ্গা নদীর ওপর ঘুরে বেড়ালাম। সন্ধ্যায় ওখানের আরতী নাকি জগৎ বিখ্যাত। ঘাটে কয়েকশ নৌকায় হাজার খানেক লোক বসে গঙ্গা আরতি দেখা হল। এখন আবার দু দলে ভাগাভাগি করে দু পাশে আরতি করে। প্রচুর ঘন্টা ধ্বনি আর মাইকে মন্ত্র পাঠ এসব মিলে একটা জমজমাট

ব্যাপার। এর থেকে অনেক সুন্দর দেখতে ঋষিকেশ এর ত্রিবেণী ঘাটের আরতি। আমি হরিদ্বার এর হর কি পৌড়ি ঘাটেও গঙ্গা আরতি দেখেছি। সবই যেন আড়ম্বর প্রদর্শন।

দশাশ্বমেহ ঘাট

রীষিকেশী ত্রিবেনী ঘাট

প্রায় সব জেলাতেই বেশ কয়েকটা করে বিখ্যাত ঘাট আছে। এক সময় নদীর নৌকা পারাপারের ঘাট ছিল হয়তো, কিন্তু এখন অনেক জায়গাই আর নৌকা চলে না।অনেক জায়গায় নদীর ওপর পাকা সেতু হয়ে গেছে, বাস চলাচল করে। আমি কয়েকটা অদ্ভুত নামের ঘাটে পারাপার করেছি। সব থেকে অদ্ভুত নাম, আট নম্বর লটের ঘাট। কাকদ্বীপ বা নামখানা থেকে গঙ্গা সাগর দ্বীপে যাওয়ার জন্য এই ঘাটে বিশাল বিশাল ভেসেল চলে। উত্তর দিনাজপুরের পাস্তোলিয়া ঘাট, মহানন্দা পেরিয়ে ওপারে মালদা জেলা। বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছে মনিহারির ঘাট আর গোয়ালন্দের ঘাট। ফারাক্কার ব্যারাজ হয়ে গিয়ে মনিহারীর ঘাট ইতিহাসে চলে গেছে। কবি গুরুর লেখনী গোয়ালন্দ ঘাটকে অমর করেছে,; কিন্তু সে ঘাট আজ বিদেশে। মেদিনীপুরের গান্ধীঘাট আর বাঁকুড়ার সতীঘাট বিখ্যাত। মায়াপুরের হুলোরঘাটও এখন

বিখ্যাত। ব্যারাকপুর থেকে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত গঙ্গার উপর অনেক ঘাট। ধোবি ঘাট, দু'পয়সার ঘাট। নিমাইতীর্থ ঘাটের জল নিয়ে তারকেশ্বর যাত্রা শুরু হয়।

ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাট কিন্তু একেবারেই অন্য কারণে বিখ্যাত। এটা কোন নদী পারাপারের ঘাট নয়। বলা যায় একটা সুন্দর করে বাঁধানো স্নানের ঘাট। তবে এই ঘাট বিখ্যাত মহাত্মা গান্ধীর একটি স্মৃতি স্তম্ভের জন্য। গান্ধী জয়ন্তীর দিন এখানে মাননীয় রাজ্যপাল আসেন। সূত্র যজ্ঞ , সর্ব ধর্মের প্রার্থনা হয়। এটি দেশের মধ্যে প্রথম মহাত্মার স্মৃতি মন্দির। হিন্দু, মুসলিম আর খ্রীষ্টান তিন ধর্মের চিনহ আছে এই স্তম্ভে।

এদেশের নদী আর তার ঘাট গুলির সাথে নানা রকম পৌরাণিক আর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য জড়িয়ে আছে। শৈলেন্দ্র নারায়ন ঘোষাল শাস্ত্রী মশাই তাঁর তপোভূমি নর্মদা গ্রন্থে এমন অনেক কিছুই লিখেছেন। ওংকারেশ্বরের অহল্যাবাই ঘাটে বসে, শাস্ত্রী মশাই প্রলয় দাসজীর কথা শুনছেন; এই দৃশ্য যেন চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। শাস্ত্রী মশাই পুর্ব পুরুষের তর্পণ না করাকে পাপীর কাজ বলেছেন। আমি ওনাদের বলা গভীর আধ্যাত্মবাদের ব্যাখ্যা বলতে পারব না। হিন্দু ধর্মের অনেক ক্রিয়াকান্ড মধ্য যুগের ব্রাহ্মণ্যবাদের কুফল, এ বলার অপেক্ষা রাখেনা। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে তর্পণ এর জন্য যে লাখ লাখ লোক জমায়েত হয়, তার একটা মহান তাৎপর্য আমার কাছে প্রকাশ পায়। অন্য সকল বৈদিক ক্রিয়াকান্ড লোকে করে পুণ্যের লোভে। তর্পণ কেন করে? শুধুই আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর এই যে অনুষ্ঠান , একে অবজ্ঞা করার মত ধৃষ্টতা আমার নেই।

মহেশ্বরের নর্মদা ঘাটে( ২০.১২.২৪)

সাপুড়ে

বাপুরাম সাপুড়েকে জানার আগেই আমরা গ্রামে সাপুড়ে দেখেছি। সাপুড়েরা গোল গোল ঝাঁপিতে ভরে সাপ নিয়ে আসত, গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাপের খেলা দেখিয়ে চাল –পয়সা সংগ্রহ করত। যদিও এরাও এক রকম ভিখারীই ছিল, এদের আমরা ভিখারীদের থেকে একটু আলাদা ভাবতাম। এই সাপুড়ে বা বাঁদর নাচ দেখানো লোকগুলি ভিখারীর মতন বাড়ী বাড়ী ঘুরত ঠিকই, তবুও এদের , বিশেষ করে সাপুড়েদের আলাদা একটা মর্যাদা ছিল। অবশ্য আমাদের গ্রামের ওদিকে যে সব সাপুড়ে আসত তাদের আমরা কখনো ওঝাগিরী করতে শুনিনি। ওদের আমরা গুনিনও বলতাম। একটা ধারণা ছিল যে ওদের কিছু মন্ত্র বা তুকতাক জানা আছে, যা দিয়ে ওরা সাপকে বশ মানায়।

আমাদের পাশের গ্রামে বছরে একদিন ঝাঁপান মেলা বসত। নির্দিষ্ট তিথি কিছু একটা ছিল নিশ্চয়ই, আজ আর মনে নেই। একবার কি দুবার ঐ মেলায় সাপুড়েদের সাপ খেলা দেখতে গিয়েছি। কুড়ি তিরিশ জন সাপুড়ে এসে হাজির হত। তাদের মধ্যে পাশের গ্রামের যুগলদাকেও খেলা দেখাতে দেখেছি। ওদের সাপের খেলা আমাদের কাছে নতুন কিছু ছিল না। কিন্তু যুগলদা কিছু কিছু ছড়া কেটে মন্ত্র জাতীয় কিছু বলছিল, আজও তা মনে আছে। " কোন গুরুর নাম জানি, কোন গুরুর নাম নাহি জানি, সকল গুরু তুলে নিলাম মাথে; কাল সাপ দিলেন গুরু হাতে"। বহু বছর পর ক্যানিং যুক্তিবাদী সমিতির অনুষ্ঠানে গিয়ে , হারানবাবুর কাছে এরকম লম্বা লম্বা ছড়া শুনেছি। সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র বলে ঐ সব ছড়া বলা হত। কিন্তু ওতে যে কোন কাজ হয় না, চল্লিশ বছর ওঝাগিরি করে হারানবাবু সেটা বুঝেছেন।

এই যুগলদা কিন্তু কোনদিন সাপের ঝাঁপি নিয়ে খেলা দেখাতে আসেনি। লোকের বাড়িতে ক্ষেত মজুরের কাজ করতে দেখেছি যুগলদাকে। আমি গ্রাম ছেড়ে চলে আসার অনেক পরে যুগলদা সাপের কামড় খেয়েই মারা গেছেন। আমাদের ঐ ছোট বেলায় ধারণা ছিল, সাপুড়েরা মন্ত্র বলে সাপেদের বশ করে। নিদেন পক্ষে ওদের কাছে কোন জড়িবুটি, শেকড় বাকর থাকে, যায় জন্য সাপ ওদের কামড়ায় না। এসব যে একেবারেই বাজে কথা তার প্রমাণ আমরা বহুবার পেয়েছি।

সিনেমায় সাপুড়েদের বীণ বাজিয়ে সাপ খেলাতে দেখা যায়; কিন্তু আমি কোনদিন কোন সাপুড়েকে বিণ বা বাঁশী বাজাতে দেখিনি। অনেকের ধারণা, সাপ ঐ বিনের শব্দে আকৃষ্ট হয়। এটাও একেবারেই ভুল ধারণা। সাপের কানই নেই, ওরা শব্দ শুনতে পায় না। সাপ বা সাপুড়ে নিয়ে বহু ভ্রান্ত ধারণার এটাও একটা। বছর তিনেক আগে আমার সিনিয়ার এক ডাক্তারবাবু আমাকে ফোন করে বললেন, আমাদের একটা দোকানে সাপ ঢুকতে দেখা গেছে, কোন সাপুড়ের সন্ধান দিতে পারেন? বীণ বাজিয়ে সাপকে বের করে আনবে! সাপ ধরাটা যে একেবারেই একটা হাতের কৌশল আর সাহসের ব্যাপার, এটা শুধু আজকাল আমরা বলছি তা নয়; বিখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস শ্রীকান্ততে সে কথা লিখে গেছেন, প্রায় একশ বছর আগে। তবুও মানুষের মধ্যে এই ধারণা আজও বদ্ধ মূল।

সাপ ধরা আর সাপের খেলা দেখানো এক দল লোকের জীবিকা ছিল। দেশের আইনে এসব কাজ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করার জন্য এদের পেশা পাল্টাতে হয়েছে। তবুও এখনও অনেক জায়গায়ই সাপুড়েদের দেখা যায়।

এরা রোজগারের পথ বা কায়দা পাল্টেছে। আগেও এরা ওদের এই সাপ ধরার হাতের কায়দাকে কিছুটা অলৌকিক ক্ষমতা বলে দেখিয়ে তাবিজ- কবচ , জড়ি -বুটি বিক্রী করত। এসব জিনিসে বিশ্বাস করার লোকের অভাব এখনও নেই। হাবড়া রেল ষ্টেশনের প্লাটফর্মে এরকম সাপুড়েদের দুটি গুমটি দোকান আছে। ওরা প্রথমে সাপের খেলা দেখিয়ে লোক জমা করে; তারপর ঐ সব জড়ি- বুটি বিক্রী করে। এঁদের একজনকে একবার কেউটে সাপে কামড় দেয়, সাপ ধরতে গিয়ে। আমি তখন হাবড়া হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে ডিউটি করছিলাম। লোকটি ঝিমিয়ে পড়েছে দেখে সাথে সাথেই ভর্তি করে অ্যান্টি ভেনম চালাই। ওর সাথে যে বয়স্ক লোকটি এসেছিল, সে আমাকে বলছিল, এরা কিন্তু সাপুড়ে নয়, বিজ্ঞান কর্মী। এই যে সাপে কামড়ালে হাসপাতালেই চিকিৎসা করতে হবে, এই ব্যাপারটা যে ওরা বুঝেছে, এটাই বিজ্ঞান মানসিকতা।

এই সাপুড়েদের খুব ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে তামিনাড়ুতে মহাবলীপুরম ইরুলা কোপারেটিভ সোসাইটি তৈরী করা হয়েছে চল্লিশ বছরের বেশী হল। এখন সরকারী ভাবে এই একটি জায়গায়ই সাপের বিষ সংগ্রহ করা হয়। ( পরে মহারাষ্ট্রের জন্য মুম্বইতে , আর গুজরাটের জন্যও আলাদা বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র হয়েছে)। এই সাপের বিষ থেকেই দেশের সবকটি ল্যাবরেটরিতে সাপের বিষের অ্যান্টি ভেনম তৈরি হয়। এই ইরুলা বা সাপুড়েরাই আজ গোটা দেশের মানুষের জন্য সাপের বিষ সহগ্রহের কাজটি করে যাচ্ছেন। আমাদের দেশে এদের মত বংশ পরম্পরায় সাপুড়ে এখনও অনেক আছে। এদের ঠিক মত কাজ দেওয়া হয় না, এরা অন্য কাজও তেমন পারে না। বাধ্য হয়েই বেআইনি কাজ করছে। বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকেই বলছেন, ভারতে চার প্রান্তে চারটি বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র থাকা উচিত। বর্ধমান জেলার পাল্লা রোডে সাপুড়েদের একটি বড় পাড়া আছে। এই মালপাড়ার সাপুড়েদের কাজে লাগিয়ে এরাজ্যেও ইরুলা সোসাইটির মত বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র করা যায়। এতে এ রাজ্যের সাপে কাটা রুগীদের জন্য উন্নত অ্যান্টি ভেনম তৈরি করা যাবে। ( ২০২২ সালে এ রাজ্যেও একটি বিষ সংগ্রহ কেন্দ্র হয়েছে, বেসরকারী উদ্যোগে। কিন্তু সেই বিষ থেকে ২০২৪ সালের শেষেও অ্যান্টি ভেনম তৈরি হচ্ছে, এমন খবর আমাদের জানা নেই।

সাপুড়েদের সমন্ধে আমার নিজের ধারণা একেবারে পাল্টে দিয়েছেন ক্যানিং যুক্তিবাদির তিন সৈনিক। হারান প্রামাণিক, দ্বিজপদ হাজারী আর কাবিল জমাদার। এরা তিনজনই এক সময় পেশাগত ভাবেই সাপুড়ে ছিলেন। হারাণবাবু চল্লিশ বছর সাপুড়ে আর ওঝাগিরি করার পর, যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য হয়ে যান। এখন ওনারা সমিতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে মানুষকে বোঝান যে, মন্ত্র তন্ত্র বা জরিবুটিতে কোন কাজ হয় না। সাপে কাটার একমাত্র ওষুধ অ্যান্টি ভেনম। কাবিল জমাদার ভাই গত কয়েক বছর ধরেই সাপে কাটা রুগীদের নিজের মোটর বাইকে চাপিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিচ্ছে। সাপুড়েদের বিশেষ ক্ষমতাকে এরকম নানান কাজে লাগানো যায়। আমরা এসব নিয়ে ভাবছি কি?

পুনশ্চ: পুরনো লেখাগুলি আবার এক জায়গায় এনে , E -Book করার কাজ শুরু করেছি, ২০২৪ এর ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে। এর মধ্যে অনেক নতুন নতুন খবর এসে গিয়েছে। সেগুলিই , পুনশ্চ বলে আবার যোগ করছি।

মেদিনীপুরের বালিচক স্টেশনের কাছে, দীপক সর্দার নামে পরিচিত একজন বেশ বিখ্যাত সাপুড়ে ছিলেন। আমার সাথে ওনার যখন আলাপ হয় তখন আর উনি ‘ সাপের খেলা ‘ দেখান না। উনি একটি স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে,সেখানে সর্প প্রদর্শনী করেছিলেন। ২০২৪ সালের নভেম্বরে, নিজের কাছে রাখা সাপের কামড় খেয়েই ওনার প্রাণ যায়। তখন ওনার বয়স আশির আশেপাশে। আমার প্রিয় ভ্রাতৃপ্রতীম ডাক্তার শুভেন্দু শেষ জীবনে ওনার প্রাণ ধারণ এর অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। শুভেন্দু ওনার শেষ কয়েক বছর এর করুন কাহিনী আমাকে জানিয়েছে। সে আর এক দীর্ঘ কাহিনী। শুধু এটুকু বলতে পারি, ওনার ঐ সাপ ধরার বিশেষ ক্ষমতাকে কোন গঠনমূলক কাজে লাগাতে না পারার জন্য ওনার শেষ জীবন দুঃখের চূড়ান্ত অবস্থায় কেটেছে।

# সাপের ছোবলে মৃত্যু সর্পবন্ধুর

**এই সময়, মেদিনীপুর:** আজীবন সাপ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেছেন তিনি। প্রচার করেছেন সাপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বুজরুকি, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। তবে বেআইনি হলেও নিজের বাড়িতে সাপ পুষতেন। নিয়মিত খাওয়াতেন পোষা সাপেদের। রোজের কাজটা করতে গিয়েই কোবরার ছোবল খান মঙ্গলবার দুপুরে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও মৃত্যু হয় দীপক সর্দার (৭৫) নামে ওই সর্প বিশারদের। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানার বালিচকে।

আদতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর এলাকার বাসিন্দা হলেও দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানার বালিচকে থাকতেন দীপক সর্দার। পেশায় সাপুড়ে ছিলেন। তবে 'সাপের খেলা' নয়, প্রদর্শনী করে মানুষকে বোঝাতেন জীববৈচিত্র রক্ষা করতে কেন সাপের প্রয়োজন, কেন সাপ মারা উচিত নয়, কোন সাপের কী উপকার ইত্যাদি। এক সময়ে বাড়িতে ৬৫টি সাপ ছিল তাঁর। এই মুহূর্তে ১২টি সাপ রয়ে গিয়েছে। সাপের ছোবল খাওয়ার পর মঙ্গলবার প্রথমে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে ভোররাতে মারা যান তিনি। ময়নাতদন্তের জন্য বুধবার মৃতদেহ ডেবরা থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। মেদিনীপুরে এ দিন ময়নাতদন্ত হয়।

সন্ধ্যায় বিজ্ঞানমনস্ক সর্পবন্ধু দীপক সর্দারকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে। মঞ্চের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার সম্পাদক বাবুলাল শাসমল বলেন, 'বুজরুকির আশ্রয় নেননি কোনও দিন। বরং সাপ সম্পর্কে সবাইকে বোঝাতেন। বিজ্ঞান মঞ্চের সঙ্গে তিনশোটির বেশি সচেতনতা শিবির করেছেন। ৬৫টা সাপ নিয়ে খাঁচার মধ্যে থেকেছেন। প্রদর্শনী করেছেন মানুষকে সচেতন করতে। এর আগে ওঁকে সাত বার সাপে ছোবল মেরেছে। এটা অষ্টম বার। এ বার আর নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। তবে সাপ পোষা তো বেআইনি। আশা করি, বন দপ্তর সাপগুলি উদ্ধার করবে।'

ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি প্রদীপ কর বলেন, 'অন্যান্য সাপুড়েদের থেকে দীপক সর্দার সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। জীবনে অনেক সচেতনতা শিবির করেছেন। এর আগে একাধিক বার সাপের ছোবল খেয়েছেন। হাসপাতালে গিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। এ বার আর ফিরলেন না।'

তবে বাড়িতে যেহেতু সাপ পোষা বেআইনি, তাই সে প্রসঙ্গও এ দিন বার বার উঠেছে। খড়্গপুরের ডিএফও মণীশ যাদব বলেন, 'বালিচকে ওই ব্যক্তির বাড়ি থেকে ৬টি সাপ উদ্ধার হয়েছে। আমরা সাপগুলিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেবো। উনি কেন বাড়িতে সাপ রাখতেন, কী করতেন ইত্যাদি বিষয় তদন্ত করে দেখা হবে।'

প্রয়াত দীপক সর্দার

সুধা সাগরের তীরে

জানিনা কোন সুকৃতির জন্য, মহাভারতের সুধা সাগরের তীরে এসে পৌঁছেছিলাম একদিন। মূল মহাভারত পড়ার মত সংস্কৃত ভাষার দখল আমার নেই। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ মহাভারত ভাষ্যকার ,আচার্য নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী মশাই-এর লেখাগুলি পড়তে শুরু করেছি বছর পনের হল। ভাদুড়ী মশাই -এর "কথা অমৃত সমান" না পড়লে মহাভারতের সুধা সাগরের ওপর দিয়ে বয়ে আসা বাতাসের প্রাণারাম প্রবাহ থেকে বঞ্চিতই থেকে যেতাম। আর এক যোগাযোগ হল করোনা অতিমারীর সময়। বেলুড়ের মহারাজ সমর্পনানন্দের ইউটিউব কথকতাগুলি শুনতে শুরু করলাম এই সময়।

মহাভারতের সাধারণ গল্প প্রায় সবারই জানা আছে। কিন্তু ঐ বড় বড় ঘটনার মধ্যে মধ্যেই অসংখ্য ছোট ছোট কাহিনী আছে, যেগুলি আচার্যদের কাছে না শুনলে কিছুই বুঝতাম না। মহাভারতে বড় বড় চরিত্র অনেক আছেন। ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, মহামতি বিদুর, ভীম, অর্জুন, কুন্তী, দ্রৌপদী, এদের কথা সবাই জানেন। এমনকি আমাদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের লেখা , মণিপুরনৃপদুহিতা চিত্রাঙ্গদাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু এইসব বিখ্যাত সব নায়ক নায়িকা ছাড়াও আরও অনেক ছোট ছোট চরিত্র আছেন গোটা মহাকাব্য জুড়েই। বড় বড় চরিত্ররা আমাদের সামনে বড় বড় আদর্শ খাড়া করেছেন। আমরা নগন্য আমজনতা তাঁদের দূর থেকে দেখতেই অভ্যাস করেছি। মহাকাব্যের মধ্যের ছোট ছোট চরিত্রগুলি আমাদের অনেক কাছের মনে হয়। মহাভারতে মহিলাদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক ছিল, কুন্তীর সাথে দ্রৌপদীর বা দ্রৌপদী থাকা সত্বেও অর্জুনের আরও কয়েকটি বিবাহ , দ্রৌপদীর সাথে সুভদ্রার সম্পর্ক এসব বেশ প্রচারিত। আজ আমি মহাভারতের দুজন প্রায় অজানা মহিলার কথা বলতে চাইছি।

এনারা দুজন হলেন, মন্দপাল ঋষীর দুই সহধর্মিনী , জরীতা আর লপিটা। এই কাহিনীতে একটি অলৌকিকতা আছে। ভাদুড়ী মশাই বলবেন, এইসবের মধ্যে একটা " মহাকাব্যিক অভিসন্ধি" আছে। মহাকাব্য বুঝতে হলে, এই মহাকাব্যিক অভিসন্ধি মাথায় রাখতে হবে।

এনাদের প্রসঙ্গ এসেছে , বিখ্যাত খান্ডব বন দহনের সময়। দাবানলে পুড়ে যাচ্ছে গোটা একটা বন। পরে এখানেই তৈরী হবে পান্ডবদের বিশাল মায়া প্রাসাদ। বনের সব পশু পাখী আগুনে পুড়ে মারা যাচ্ছে। একটি গাছে পক্ষী মাতা জরীতা তাঁর চার শিশুকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন। বাচ্চাদের তখনও পালক গজানোর সময় হয়নি। মা জরীতা ওদের চার জনকে নিয়ে উড়ে যেতেও পারবেন না। আগুন ধেয়ে আসছে। মা আর চার শিশু নিজেদেরকে কি করে বাঁচাবেন তাই নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। এই পাঁচ জনই যতেষ্ট তত্ত্বজ্ঞানী। আসলে মন্দপাল ঋষি বিশেষ কারণে পক্ষী অবতার নিয়ে এসে বিদুষী জরিতাকে বিয়ে করে , চারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এই বাচ্চারাও সব একেকজন তত্ত্জ্ঞানী। মাঝখান থেকে দাবানল এসে সব গণ্ডগোল করে দিয়েছে। মন্দপাল ঋষি যোগবলে দাবানলের খবর পেয়ে , অগ্নি দেবতাকে অনুরোধ করেছেন, তাঁর চার শিশুকে না মারতে। চার সন্তানের ধর্ম যুক্তি মেনে নিয়ে, মা জরীতা সময় মত উড়ে গিয়ে দাবানল থেকে বেঁচেছেন। বাচ্চাদের কাছে পৌঁছনোর পর , তাদের মুখে ধর্মের গভীর তত্ত্ব শুনেই অগ্নি দেবতা ওদের চিনতে পারেন। সব ঝামেলা মিটে যেতেই মা জরীতা বাচ্চাদের কাছে ফিরে আসেন।

ওদিকে মনুষ্য শরীরে ঋষি মন্দপাল তাঁর বাচ্চাদের নিয়ে উৎকন্ঠায় থাকতে না পেরে, আবার পক্ষী রূপ নিয়ে বাচ্চাদের কাছে আসতে চাইলেন। এবার মানবী স্ত্রী লপিটা রেগে গেলেন। তার মনে হচ্ছে, এই ঋষি আসলে , বাচ্চাদের দেখার ছলে, জরিতার কাছে যেতে চাইছেন। ঋষি আর ঋষি পত্নী হলেও , স্বামী অন্য সতীনের কাছে যাবেন এটা লপিটা মানতে পারছেন না। ঋষির ইচ্ছা শুনেই তাঁকে গঞ্জনা দিতে শুরু করেছেন। আমরা অধম কলির জীব, কি বুঝলাম? তপস্বীনি হোক আর ঋষি পত্নীই হোক , সতীনের সাথে সতীনের সম্পর্ক সব যুগেই সমান।

প্রধান শিক্ষক

বেলঘরিয়ার ছাত্র মঙ্গল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসের ধাক্কায় মারা যান। ওনার মুখ থেকে শেষ কথাটি ছিল, " ছাত্র মঙ্গল"। প্রায় পঁচিশ বছর আগে আমার শাশুড়ি মায়ের কাছে এ কথা শুনেছিলাম। ছাত্র মঙ্গল স্কুলের সেই প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক মশাই এর নাম আমার শাশুড়ি মা সেদিন বলেছিলেন কি না , আজ আর আমার মনে নেই। প্রধান শিক্ষক মশাই এর নামটা আমি লিখতে পারলাম না। তার আগে পরে অসংখ্যবার বেলঘরিয়ায় গেলেও, ছাত্র মঙ্গল স্কুলটি আমি দেখিনি। কিন্তু সেই ছাত্র দরদী, স্কুল অন্ত প্রাণ , হেড মাষ্টারের কথা আমি ভুলতে পারিনি।

আমার নিজের সরাসরি শিক্ষক, দু'জন প্রধান শিক্ষক মশাইকে সামনে থেকে দেখেছি। আমার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, প্রয়াত নীলরতন মণ্ডল মশাই সম্বন্ধে আগেও লিখেছি। কাজ করতে গেলে সমালোচনা হবেই। বিশেষ করে আমাদের দেশের যা কর্ম সংস্কৃতি, এখানে কাজ করাটাই প্রায় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। আমার গ্রামের একটা ছন্নছাড়া হাইস্কুলের যে উন্নতি আমার প্রণম্য হেড স্যার করে দেখিয়েছেন, তা নিয়ে লিখলেই একটা বই হয়ে যাবে। অনেক পরে হিসেব করে দেখেছি, মাত্র ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সে উনি আমাদের কুসুম কুমারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন। আমি তখন ক্লাশ সিক্সে পড়ি। ঐ বয়সে কি অদ্ভুত এক গাম্ভীর্য ছিল হেড স্যারের চলনে বলনে। ডিসিপ্লিন কথাটাকে আমরা যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছি। শিক্ষক কেমন করে জাতি গঠন করেন , ওনাকে না দেখলে কোনদিন জানা হত না । বছর তিরিশ ধরে , আমাদের আসে পাশের পাঁচ- সাতটা গ্রামের কয়েক হাজার ছাত্র ছাত্রীর জীবনের মূল্যবোধ তৈরী করেছেন, হেড স্যার। যে কোন শিক্ষিত মানুষ এর মতই ওনার নিজের রাজনৈতিক পছন্দ ছিল। আমরা যখন স্কুলে পড়েছি, তখন এ রাজ্যে একটিই রাজনৈতিক দল ছিল, তাদের সাথে গান্ধীজীর আদর্শ ছিল। শিক্ষিত লোকেরা হয় ঐ দল করতেন, নয়তো কিছুই করতেন না। আমাদের হেড স্যার ছিলেন অসম্ভব ভালো বাগ্মী। আমরা স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওনার বক্তৃতা, মন্ত্র মুগ্ধের মত শুনতাম। ওনার এই ব্যতিক্রমী ক্ষমতাকে রাজনৈতিক দলের লোকেরা কাজে লাগাতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। এই রাজনৈতিক দলের মিটিং -এ বক্তৃতা দিতে যাওয়া ওনার একটা দুর্বলতা ছিল। ১৯৭৭ সালে এ রাজ্যে বেনো জলের মত রাজনীতির বন্যা এল। মানীর মান, শিক্ষকের মূল্যবোধ, ছাত্রের বিনয়, পারলে মাতৃস্নেহকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ঐ রকম হেড স্যারও নিজের চার বার ফেল করা ছাত্রের হাতে হেনস্থার শিকার হয়েছেন। তবুও চাকরীর নিয়ম মেনে ঐ স্কুল থেকেই হেড স্যার অবসর নিয়েছিলেন।

নীলরতনবাবু

আমার দ্বিতীয় স্কুল, কলকাতার এক সময়ের নামী স্কুল। আমি গ্রামের স্কুল থেকে নতুন মাধ্যমিক পাশ করে , এগারো ক্লাশে পড়ার জন্য এসে ভর্তি হলাম। জীবনে সেই প্রথম শুনলাম, রেক্টার বলে একটি পদ হয়। স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, পূজ্যপাদ জ্যোতির্বিকাশ মিত্র মহাশয় অবসর নেওয়ার পর , রেক্টার পদেই রেখে দেওয়া হয়েছে। আমি যখন এখানে আসি তার বোধ হয় বছর কুড়ি আগে উনি অবসর নিয়েছেন। অকৃতদার বৃদ্ধ মানুষটি স্কুলেরই একটি ঘরে থাকতেন। আমাদের এগারো ক্লাশে আমরা চার- পাঁচ জন বাইরে থেকে এসেছিলাম; বাকী সবই ঐ

স্কুলেই পড়েছে। সবাই প্রায় প্রাথমিক স্তর থেকেই। ওদের দেখতাম, রেক্টার দাদুকে দেবতার মত ভক্তি করতে। রেক্টার আমাদের ইংরেজী পড়াতেন।এখানেও সেই রাজনীতির বেনো জলে সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। মাস ছয়েকও বোধ হয় ঠিক মত ক্লাশ হয়নি; স্কুলে কি একটা গন্ডগোল শুরু হল। আমাদের এগারো বারো ক্লাশের ব্যবস্থা মূল ভবনের পিছনের একটা ছোট বাড়ীতে। আমাদের ক্লাশ শুরু হত এক ঘন্টা আগে। বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকেরা আংশিক সময়ের জন্য আমাদের স্কুলে এসে পড়িয়ে যেতেন। তাঁদের অনেকেই ঐ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র , কিংবা শুধুই রেক্টারের অনুরোধে আমাদের পড়াতে আসতেন।

গণ্ডগোল শুরুর প্রথম দিকে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাশ শুরুর পর, বড় বাড়ীর দিক থেকে একটা হৈ হৈ শব্দ শুনতে পেতাম। আমাদের দ্বিতীয় ক্লাশটা শেষ হলেই , আমাদের সহপাঠি, ঐ স্কুলের পুরনো ছাত্ররা বড় বাড়ীর দিকে দৌড়ে যেত। আমরা যারা বাইরে থেকে এসে ওখানে ভর্তি হয়েছি, তারা ওদের পিছন পিছন যেতাম, ব্যাপারটা কি বোঝার জন্য। প্রথম দিকে দেখতাম, শিক্ষকদের বসার ঘরে শিক্ষকরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করছেন। ক্রমশ বুঝলাম, ওনারা দুই দলে ভাগ হয়ে প্রায় হাতাহাতি করছেন। আমাদের সহপাঠীরাও সেই ঝগড়াঝাটির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে শুরু করল। কয়েকজন টিচারস রুমের বাইরে থেকে ," রেক্টার জিন্দাবাদ" বলে শ্লোগান দিত। মাঝে মাঝে তৃতীয় পিরিয়ডে কোন অধ্যাপকের ক্লাশ শুরু হলে আমরা ফিরে এসে আমাদের ক্লাশে বসে যেতাম। কোন কোন দিন দেখেছি , অন্য স্কুল বা কলেজের মস্তান মত ছেলেরা এসে আমাদের স্কুলের বড় গেটের বাইরে থেকে শ্লোগান দিচ্ছে, বা লোহার রড দিয়ে স্কুলের বন্ধ কলাপসিবল গেটের উপর বাড়ী মারছে। আমরা যারা গ্রামের থেকে এসেছিলাম, ভয় পেয়ে পিছনের বাড়ীর ছোট গেট দিয়ে বেরিয়ে , পিছনের গলি দিয়ে সরে পড়তাম। স্কুলের পড়াশোনা লাটে উঠল। ঐ স্কুলের পুরনো ছেলেদের কাছে গন্ডগোলের কারণ একটু একটু করে জেনেছিলাম। শাসক দলের অনুগত শিক্ষকদের সাথে রেক্টারের সমর্থক শিক্ষকদের গন্ডগোল। শাসক দলের অনুগত এক শিক্ষক আমাদের ইংরেজী পড়াতেন। মূলত উনিই রেক্টারকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে নিজে হেড মাষ্টার হওয়ার জন্য ঘোট পাকিয়ে ছিলেন।

আমি বারো ক্লাসের পরীক্ষার পর হয়তো এক কি দু'বার রেজাল্ট নিতে স্কুলে গিয়েছিলাম। তখনো রেক্টার স্কুলে ছিলেন জানতাম। অনেক পরে শুনেছি, সেই ইংরেজীর শিক্ষকই প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। আমরা স্কুল ছাড়ার বছর দশেক পর খবরের কাগজে রেক্টারের মৃত্যু সংবাদ দেখেছিলাম।

আমার নিজের স্কুলের প্রধান শিক্ষক দু'জনকেই রাজনৈতিক পালা বদলের শিকার হতে দেখেছি। এই পালা বদলের ফলে শিক্ষকদের যেমন খোলাখুলিই রাজনীতি করতে দেখেছি, তেমনি স্কুলশিক্ষক আর স্কুলগুলোর বাড়ী ঘরের প্রভূত উন্নতি দেখেছি। শিক্ষকদের উন্নতি বলতে আমি তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বলছি। আমার দুই প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের নৈতিক উন্নয়নের দিকে যেভাবে নজর দিতেন, আজকাল আর কেউ তেমন করেন কি না আমার জানা নেই। আমাদের প্রজন্মের ছাত্ররা সবাই এখন অভিভাবক হয়ে গিয়েছি। এমনকি আমাদের পরের প্রজন্মেরও অনেকের ছেলে মেয়ে এখন হাইস্কুলে পড়ছে। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সবাই এখন রাজনৈতিক দলের হাতের পুতুল।

পেশা জীবনে ঢুকে যাওয়ায় পর অনেক স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, পেশার কারণেই। সামান্য সময়ের জন্য গেলেও বুঝতে পারি , চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে ছাত্র শিক্ষক যে সম্পর্ক দেখেছি, তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে।এই দুঃসময়ে দাঁড়িয়েও আমার পরিচিত একজন অন্তত প্রধান শিক্ষক পুরনো মূল্যবোধ ধরে রাখার চেষ্টা করছেন দেখেছি।

মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুল, গোমকপোতা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। সেখানকার প্রধান শিক্ষক, সুব্রত কুমার বুড়াই মশাই -এর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে বছর দশেক আগে। আমার ভ্রাতৃ প্রতিম এই বুড়াইবাবু  স্কুলের পড়াশোনার পাশাপাশি নানান সামাজিক কাজে ব্যস্ত আছেন। আমাকে ওনার গ্রামে সাপের কামড় নিয়ে বলার জন্য নিয়ে যান, বছর দশেক আগে প্রথমবার। তারপর থেকে অনেকবারই ওদিকে গিয়েছি ওনার ডাকে। এলাকার মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা তৈরী করতে নানান রকম অনুষ্ঠান ওনারা করে চলেছেন, গত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে। বুড়াইবাবুর অনেক প্রাক্তন ছাত্র এখন উচ্চ শিক্ষিত হয়ে দেশে

বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অনেক দুস্থ ছাত্রকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা করে, পড়াশোনা করার ব্যবস্থা করে চলেছেন। শুধু আমাদের সাপের কামড়ের সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই এই প্রধান শিক্ষক যে কাজ করে যাচ্ছেন তাতে ওনাকে অন্তত পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়াই যায়। অবসরের বছর চারেক আগে উনি শিক্ষারত্ন হয়েছেন। আর একটা ব্যাপার আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই রাজনীতির সুনামীর মধ্যে থেকেও এই প্রধান শিক্ষক মশাই নিজেকে রাজনীতির কলুষ মুক্ত রাখতে পেরেছেন, এটা একটা বিশাল কৃতিত্ব। আমার প্রিয় বুড়াই বাবুকে আরও অনেক দিন শিক্ষকতা করতে হবে; উনি সসম্মানে বাকী বছরগুলিতেও এভাবেই কাজ করতে পারবেন, এই কামনা করি।

সাপের কামড়ে মৃত দুই ছাত্র-ছাত্রীর সাথে বুড়াইবাবু

পুনশ্চ: এই কদিন আগে, ৩০ শে নভেম্বর, এই বুড়াই বাবু শিক্ষকতার চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। করোনা অতিমারীর সমইয় বুড়াইবাবু নিয়মিত অন লাইন ক্লাস নিয়েছেন, ঐ প্রত্যন্ত গ্রামে বসেও।

নিতাই দাদা ১

আমার আপাতত চারজন নিতাই দাদার কথা মনে পড়ল। কার কথা আগে লেখা যায় তাই নিয়ে সমস্যায় পড়েছি। এই চার নিতাইদা আমাদের বাড়ীর সাথে এতই ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এবং আছেন যে, আমার নিজের দাদাদের থেকেও যেন এনাদের স্মৃতিই আমার বেশী। ছিলেন লেখার কারণ এই চারজনের একজন ইতিমধ্যে পরলোক গমন করেছেন। তাহলে ঐ প্রয়াত নিতাই দাদার কথাই আগে বলি। অবশ্য এই গতকাল সন্ধ্যায় যে নিতাই দাদা আমার কুশল সংবাদ নিলেন, একেই আমার পরিবার, মানে, আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা সবথেকে বেশী দেখেছে। আমি নিতাই দাদা বললে, এরা এই ভক্ত মানুষ, কীর্তন এর মূল গায়ক দাদাটিকেই বোঝে। যে দাদা বছর দশেক আগে প্রয়াত হয়েছেন, তাঁর পদবি ছিল দে। আমার জ্ঞান হওয়ার থেকেই এনাকে , হাসপাতালে চাকরী করতে দেখেছি। তখন অবশ্য আমি ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে বসব, এমন সুদূর কোন সম্ভাবনাও ছিল না। এই প্রায় ডাক্তার নিতাইদা আমার বড়দার বন্ধু। আমাদের গ্রামেরই ছেলে। একেবারে শেষ বয়সে বছর দশেক বাদে প্রায় বছর চল্লিশ হবে, হাসপাতালের কোয়ার্টারে থাকতে দেখেছি। হাসপাতাল মানে একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। কিন্তু আমরা আজন্ম ওটাকে হাসপাতালই বলেছি। আমাদের ছোট বেলার, যখন গ্রামে প্রায় কোন পাকা বাড়ী ছিল না, সেই সময় ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাড়ী আর কোয়ার্টারগুলিই আমাদের বন্যার সময় আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়াতো। আর ঐ হাসপাতালের মাঠই গ্রামের খেলার মাঠ। ঐ মাঠে আমরা খেলেছি। এখন আমাদের নাতির মত বাচ্চারা খেলে। আমার বড়দাকে ঐ মাঠে ভলি বল খেলতে দেখেছি; কিন্তু এই নিতাইদাদাকে কখনো মাঠে খেলতে দেখেছি এরকম মনে পড়ে না। মাঠের পাশেই গ্রামের ক্লাব। এক সময় নাম ছিল , উমেশ স্মৃতি পাঠাগার। খুব আবছা মনে পড়ে, ঐ পাঠাগারে একটি কাঁচের জানালা দেওয়া কাঠের আলমারি ছিল। সেই আলমারিতে কিছু বইও দেখেছি। কিন্তু সেই সব বই পত্র বহু যুগ আগেই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। ঐ পাঠাগার বা ক্লাবে আমিও কিছুদিন ক্যারাম বোর্ড খেলেছি। বড়দা, নিতাইদা আর ওদের কয়েকজন বন্ধু সন্ধ্যায় ক্যারাম বোর্ড বা তাস খেলতে যেত। দিনের বেলায়, বা বিকেলে ওদের কাউকে কাউকে গান বাজনা করতেও দেখেছি। কল্যানবাবু নামে এক জন শিক্ষক গান গাইছেন, আর নিতাইদা তবলায় ঠেকা দিচ্ছেন; এই ছবিটা আজও পরিষ্কার মনে আছে। নিতাইদা যে হেল্থ সেন্টারের খুবই সামান্য একটি পদে চাকরী করতেন, সেটা অনেক পরে জেনেছি। জামা প্যান্ট পরে, বেশ স্মার্ট যুবক, নিতাইদা ওষুধ দিচ্ছে, ইনজেকশন দিচ্ছে এসবই দেখতাম। ডাক্তারবাবু না থাকলে বয়স্ক কম্পাউন্ডার বাবু রুগী দেখতেন। কিন্তু নিতাইদা কখনো ঐ ডাক্তারবাবুর চেয়ারে বসে রুগী দেখতেন না। আমাদের কিন্তু যা কিছু বলার, আগে গিয়ে নিতাইদাকেই বলতাম। যেমন, নিতাইদা, মায়ের জ্বর বা নিতাইদা, সেজদার দাঁতে ব্যথা করছে। তেমন বুঝলে নিতাইদা নিজেই কটা ট্যাবলেট ( আমরা বলতাম, বড়ি) দিয়ে দিতেন। নয়তো বলতেন, ঐ ঘরে ডাক্তারবাবু আছেন, দেখিয়ে আয়। মাকে দেখতে আমাদের বাড়ীতেও চলে আসতেন। আমাদের গ্রামের কেউ কিন্তু ওকে কোনোদিন, " ডাক্তর" ( ক্ত এ আকার হবেই) বলত না। বহু বছর পরে আমি উত্তর বঙ্গের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চাকরী করার সময় দেখেছি, ঐ রকম স্মার্ট যে কোন কর্মচারীকে গ্রামের লোকে , " ডাক্তর" বলে। আর আমরা যারা আসলেই ডাক্তার, তাঁদের বলত, " সার্জন।" নিতাই দা আমাকে ইনজেকশন দিচ্ছেন, বা সাবান জলের "ডুস" দিয়ে আমার কষা পায়খানা বের করছেন, এরকম চিত্র ছবির মত মনে আছে। ওর সাথে অনেক স্মৃতিই আছে, কিন্তু যেটার কথা বললেই আমার পরিচিত প্রায় সবাই বলবেন, " ও এই জন্যই!" না, এই জন্য নয়। আগেই বলেছি, স্কুলে পড়ার সময় পর্যন্ত আমি যে সুদূর ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার মত একটা দূর্ঘটনা ঘটাব, সেই রকম জ্যোতিষ কেউ ছিল না। জ্যোতিষ একজন এসেছিলেন বটে একবার। তাঁর সাথে এই নিতাইদার বেশ ঝামেলাও হয়েছিল; কিন্তু তিনিও আমার সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যত বাণী করে যাননি। যে কথা বলছিলাম; আমি তখন বোধহয় ক্লাশ সেভেন বা সিক্স এ পড়ি। সেটা ছিল এক কালী পূজার সন্ধ্যা। কোথায়, কি করে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল, সেটাই এক গল্প। আমাকে তো সাপে কামড় দিল। আমি আর শান্তি দাদা

মিনিট খানেক টর্চ নিয়ে খুঁজলাম ; সাপের দেখা গেলাম না। শান্তিদাদা সাইকেল ঠেলে, আর আমি তার পাশে পাশে হেঁটে, একশ মিটার মত ফিরে এলাম। আজকাল হলে তো আমি সাইকেলের পিছনে উঠেই বসতাম। তখন এসব, " নড়াচড়া বন্ধ, কোন বাঁধন নয়, আশ্বস্ত কর, ডাক্তার বাবুকে সবকিছু বল" , ( Do it RIGHT) আমাদের জানা ছিল না। এসব কথা জেনেছি এই সেদিন, মাত্রই ২০০৭ সালের পরে। এসব " বাজে কথা" এখন শুরু করলে আর কেউ পড়বেই না। আমরা ঠিক মিনিট তিন চার আগেই দেখে গেছলাম, ' বুলার দোকানে ' , ডাক্তারবাবু, নিতাইদা, দিবাকরবাবু, এইসব বন্ধুরা বাজী কিনছেন। আমি ধীরে ধীরে এসে, নিতাইদাকে বললাম," নিতাইদা, আমাকে সাপে কামড়েছে!" ঐ দেওয়ালিতে বাজী পোড়ানোর উচ্ছ্বাসের মধ্যে এরকম একটা বেরসিক খবর ওদের আনন্দে যেন জল ঢেলে দিল। নিতাইদা চমকে উঠে শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন, " কি বললি, কাকে সাপে মাকড়েছে ?" আমি একবার," আমাকে " বলবার সাথে সাথে সে এক হৈ হৈ কাণ্ড। কোথায়? কখন? কি সাপ? দড়ি আন, দড়ি আন, প্রানবন্ধুকে খবর দে! কোথা থেকে একটা দড়ি এনে, দিবাকরদা আমার পায়ে বেঁধে দিলেন। বাজী রেখে সবাই আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যতদূর মনে পড়ে, হেঁটেই বুলার দোকান থেকে হাসপতালে ঢুকেছিলাম। আর যেটা পরিষ্কার মনে আছে , আমার এতটুকু ভয় করেনি। প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল, ওটা একটা জলঢোড়া সাপ ছিল। যদিও সাপটি শুকনো রাস্তা পেরিয়ে একদিক থেকে অন্য দিকে যাচ্ছিল। শান্তিদা ওর লেজের উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যান; ঠিক পেছনেই আমাকে পেয়ে কামড়ে দেয় সাপটা । হাসপাতালে একটা উঁচু ট্রলিতে আমাকে শুইয়ে, উজ্জ্বল আলোর নিচে পরীক্ষা করলেন। তারপর ঘোষণা করলেন, বিষহীন সাপের কামড়। কী একটা ইনজেকশন দিয়েছিলেন। জীবনে সেই প্রথম ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন। আমার বেশ গরম লাগছিলো। আর একটা কথা বেশ মনে আছে; আমি ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, উল্টে ডাক্তারবাবুকে এমন দুই একটা কথা বলেছিলাম যে, উনি চমকে উঠে বলেছিলেন, " কে রে, ও, তুই তো মজুমদার বাড়ীর ছেলে!" অর্থাৎ ঐ বিশেষ বাড়ীর ছেলেকে কামড় দিলেও, সাপও ভেবে চিন্তে বিষ ঢালবে! এখন বেশ ভালো করেই জানি, সেদিন ওটা বিষধর সাপ হলে, আজ আর এই গল্প বলার জন্য এই " মজুমদার বাড়ীর ছেলে" বেঁচেই থাকত না। সেই আদিম যুগে ঐ সব গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাপের কামড় এর চিকিৎসার কোন প্রশ্নই ছিল না। আর তখন গ্রামের থেকে ষোল সতের কিমি দূরে ডেবরা হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছনোর জন্য যা সময় লাগত, তাতে বাঁচার সম্ভাবনা ছিলই না। বাস্তবে, এই ২০২৪ সালে, আমার গ্রাম থেকে ডেবরা হাসপাতালে যেতে আধ ঘন্টা কি চল্লিশ মিনিট মত লাগে। কিন্তু, গ্রামের প্রায় সব বাড়িই পাকা বাড়ী হয়ে গেলেও, হাসপতালের সব কোয়ার্টার ফাঁকা, ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর হাস্পাতাল চত্বরে শেয়াল ডাকলেও লোকে অবাক হবে না। নিতাইদা, মিত্রা মাসী, জামাইবাবু কবেই ইতিহাসে চলে গেছেন। এখনও হাসপাতালের পাশে বাড়ী করে আছেন, বেলা দিদি। হাসপতালের সাথে যুক্ত যে কজনের নাম এখানে করলাম; সবাই আমার অভিভাবক ছিলেন। সকলেই জেনে গেছেন, তাঁদের গ্রামের ছেলে দুলাল, ডাক্তার হয়েছে। সেই দুলাল গোটা দেশ ঘুরে ঘুরে নতুন ডাক্তারদের সাপের কামড় এর চিকিৎসা শেখায়। কিন্তু নিজের গ্রামের নীরদদাদা সময় মত হাসপাতালে পৌছে, সাপের কামড় এর এন্টি ভেনম পেলেও, বেঁচে ফেরেন নি। আসলে তো ঐ ওষুধটাই কাজ করেনি। চাকরী জীবন শেষ করে ফেললাম। এ রাজ্যের নিজস্ব এন্টি ভেনম তৈরীর কাজ "লাল ফিতার ফাঁস" এ যে আটকে পড়ে আছে, এ জীবনে হয়তো আর সেই ফাঁস খুলেছে, এমনটি দেখে যেতে পারবো না। এক নিতাই দাদার কথা বলতেই দু' দিন চলে গেল। বাকী তিনজনের কথা একে একে বলার ইচ্ছা রইল। ১৫.১২.২৪.

নিতাই দাদা 2

চারজন নিতাই দাদার কথা বলতে শুরু করেছি। প্রয়াত নিতাইদার কথা লিখে শেষ করতে দু' দিন লেগেছে। এবার এখনও বর্তমান তিনজনের মধ্যে সবথেকে বয়সে বড় , ধানখালের নিতাই দাদার কথা বলি। এখন অবশ্য এই নিতাইদা বোঝাতে আমরা " শাকালু নিতাইদা " বললেই ভালো বুঝি। ইনিও আমার বড়দার বন্ধু। এঁদের বাড়ী আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে তিন চার মাইল উত্তরে, ধানখাল গ্রামে। বড়দা বা তার বন্ধুদের আমি স্কুলে পড়ার সময় দেখিনি; ওরা আমার জ্ঞান হওয়ার আগেই স্কুলের পাট ( পাঠও) শেষ করেছেন। আমি জ্ঞান হওয়ার থেকেই এই ধানখালের নিতাইদাকে দেখছি। আমাদের বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠান থাকলে নিতাইদা হাজির থাকতেনই। বিশেষ করে বাড়ীতে অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন হলে, নিতাইদার বাড়ী থেকে "ভারি" আসতো। একজন জোয়ান লোক, বাঁকের দুই দিকে দুটি বড় ঝুড়িতে ভর্তি করে আনাজ পত্র নিয়ে হাজির হত। বেশ ছোটবেলা থেকেই, মানে যখন আমরা রাস্তা চিনে নিজেরা হেঁটে যেতে পারতাম, তখন থেকেই আমি আর আমার ছোট ভাই কুচুন চার ছয় মাস বাদে বাদে একবার ধানখালে নিতাইদাদের বাড়ী চলে যেতাম। সকালে গিয়ে বিকেলে ফেরা। প্রতিবারই নিতাইদার মা, আমাদের কিছু একটা সব্জি দিয়ে বলতেন, এটা মায়ের জন্য নিয়ে যা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওটা একটা পাকা মিষ্টি কুমড়া, যাকে ওদিকের লোকে বলত, " বইতাল।" ওরা বেশ বড় চাষী ছিলেন, এটা ঐ ছোটবেলাতেও বুঝতাম। একবার ওদের মাটির বাড়ীর পিছনের দিকের টানা বারান্দায় এক দর্শনীয় জিনিস দেখেছিলাম। বারান্দাটা একটা লম্বা ঘরের মত; বোধহয় দেড়শ ফুট মত লম্বা। গোটা ঘরটা বইতালে ঠাসা; হয়তো বা দুই- চার ট্রাকের মত হবে। পরে অনেক হাটে বা গ্রামের রাস্তার মোড়ে কুমড়োর ছোটখাট পাহাড় দেখেছি। কিন্তু সেই একসাথে, চার ট্রাক কুমোড়ো; তেমন দৃশ্য আর কোথাও দেখিনি। এখানে আর একটা কথা বলি। এই মেদিনীপুরের বৈতাল বাঁকুড়ায় গিয়ে " ডিংলা" হয়ে যায়। নিতাইদা কতো বড় চাষী সেটা বুঝতে বুঝতে আমি স্কুল,কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে, মেদিনীপুরের চোখের হাসপাতালের ডাক্তার হয়ে গেলাম। মাঝে বেশ কিছু বছর নিতাইদা বা তাঁর মায়ের সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। মেদিনীপুরের এক নার্সিং হোমে একদিন হঠাৎ দেখা নিতাইদার সাথে। বললেন, মায়ের চোখের জন্য এখানে এসেছি। মেদিনীপুরের সে সময়ের সবথেকে বিখ্যাত চোখের ডাক্তারবাবুর চিকিৎসায় আছেন ওনার মা। কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম, ওনার মায়ের চোখ বহু বছর ধরেই অন্ধ হয়ে আছে। এবার কিছু একটা ইমারজেন্সি হওয়ায় শহরে ছুটে এসেছেন। আর, উনি একটু অপ্রস্তুত হলেও, আমার বুঝতে কোন অসুবিধা হয় নি যে, উনি আমার খবর সবই জানতেন; কিন্তু নতুন ডাক্তারের ওপর ভরসা না করে শহরের সবথেকে বিখ্যাত ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকেছেন। ওনার সাথে আমাদের বাড়ীর এতটাই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে, আমার তখনকার বাসায় ওনাকে যেতে বলতেই হল। পরদিন সকালে উনি আমার সেই দাতব্য প্রতিষ্ঠান এর ভেতরের কোয়ার্টারে এলেন। আমাদের সেই, সবে শুরু করা নতুন সংসারে, অতিথি আপ্যায়ন এর বিশেষ কোন ব্যাবস্থা ছিলনা। আমার স্ত্রী ওনাকে চা বিস্কুট দেওয়ার পর, মুড়ি খাবেন কি না জানতে চাইলে উনি জানালেন, মুড়ি খেয়েই এসেছেন। আমার স্ত্রী ওকে সেই প্রথম দেখলেও, উনি বড়দার বন্ধু সেই সম্পর্কে আমার বেশ মান্য ব্যক্তি, এটা বুঝেছিল। আমাদের বাসায় তখন বিশেষ কোন খাদ্য বস্তু ছিল না। আমাদের কাছে একটু স্পেশাল একটি জিনিসই ছিল। শাকালু। আমার স্ত্রী

সেই মহার্ঘ বস্তু ( অবশ্য আমাদের কাছে) কেটে, বেশ গুছিয়ে , প্লেটে সাজিয়ে ওনাকে পরিবেশন করল। আর তাই দেখে দাদাতো হো হো করে হেঁসে উঠলেন। আমার স্ত্রীকে বললেন, আরে তুমি আমাকে শাকালু খেতে দিয়েছ? আমার দু বিঘা জমিতে শাকালু চাষ করা হয়েছে। ওনার মা নার্সিং হোমে ভর্তি থাকার সময়, উনি আর একদিন আমাদের বাসায় এসেছিলেন। দুটি বিশাল সাইজের ফুলকপি এনেছিলেন। ঐ রকম বড় ফুলকপি সহসা দেখা যায় না। আমার স্ত্রীর কৌতহল মেটাতে বললেন, আমার এবার দশ হাজার ফুলকপি লাগানো আছে। ভাতৃ দ্বিতীয়ার আগে থেকে বাজারে বিক্রী করতে পাঠাচ্ছি। ওনার মায়ের সাথে একদিন কথা হল। আমি ঐ নার্সিং হোমের ওটিতে কোন অপারেশন করতে ঢুকতে চাইছিলাম; শুনলাম সেই বড় ডাক্তারবাবুর কোন রুগীর চোখের ব্যাণ্ডেজ পাল্টানো চলছে, সেই ওটিতে। দরজায় উকি দিলাম। ডাক্তারবাবুর দুই সহযোগী, নিতাইদার মায়ের চোখেই ব্যাণ্ডেজ পাল্টানোর চেষ্টা করছিলেন। ওদের কথায় বুঝলাম, নতুন ডাক্তরটি ঐ মহিলার কেমন যেন আত্মীয় হয়, এই খবরটি ওরা আগেই পেয়েছেন। আমাকে দরজায় দেখে, রোগিনীকে ওরা জানালেন, আপনাদের আত্মীয় ডাক্তারবাবু এসেছেন। আমাদের সেই সময়ের ভদ্রতার খাতিরে আমি ভেতরে ঢুকে, অন্য ডাক্তারবাবুর রুগীর চোখ দেখতে পারি না। কিংবা, বড় ডাক্তারবাবু কিছু মনে করবেন, এরকম ভেবে, ভেতর ঢুকলাম না। দরজায় দাঁড়িয়েই বললাম, মাসিমা, আমাকে চিনতে পারলেন? আমি প্রানবন্ধুর ভাই। এর মধ্যে নিতাইদা নিশ্চয়ই ওনাকে আমার কথা জানিয়েছেন। মাসীমা ওটি টেবিলে শুয়েই বললেন, " কে? কালু?" কালু আমার উপরের দাদার ডাক নাম। আমি জানালাম, " আমি দুলাল।" আমাদের পোশাকী নাম ওনার জানার কথা নয়। বয়স্ক মানুষের স্বভাব মত, নিজের কষ্টের কথা,  আমাকে চিৎকার করে জানালেন। এর থেকে বেশী সময়, ঐ বড় ডাক্তার বাবুর রুগীর সাথে কথা বলতে ভরসা পেলাম না। দুই তিনদিন পর কবে ওনাকে নিয়ে, নিতাইদাদা বাড়ী ফিরে গেছেন, আমার জানা হয়নি। এবার বছর দশেক পর, আমাদের বাড়ীতে নিতাইদাদার সাথে দেখা হয়েছিল। আমাদের মা মারা যাওয়ার খবর পেয়ে উনি এসেছিলেন। সে তো এই সেদিনের কথা মনে হচ্ছে। কিন্তু হিসেব করে দেখছি, একুশ বছর পেরিয়ে গেল। আমরা মাকে, বাবার পাশেই সমাধিস্থ করে, পুকুর ঘাটে গেলাম স্নান করতে। স্নান করার পর , সব ভাইয়েরা একে একে নিতাইদার কাছ থেকে, শুরু দশার কাছা ইত্যাদী নিলাম। সেই প্রথম, আর সেই শেষ, আমি গলায় একটা সাদা থানের ফিতা দিয়ে লোহার চাবি কাঠি ঝুলিয়েছিলাম। নিতাইদা দিয়েছেন; ওটাই লোকাচার, তাই ওটা গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছিলাম। ঐ সময়ই কোন একদিন দাদা বলেছিলেন, ওনার মা মেদিনীপুর থেকে ফিরে বেশীদিন বাঁচেননি। মায়ের কাজের পর থেকেই আমারও গ্রামের বাড়িতে যাওয়া কমে গেছে। পরে বোধহয় আর কখনও নিতাইদার সাথে আমার দেখা হয়নি। সেই সময় দাদা একটি মজার কথা আমাকে বলেছিলেন। ওনার ছেলেরা কি করে? পড়াশুনা কি করেছে? এসব জানতে চেয়েছিলাম। উনি বললেন, " ছেলে, এস -ঠায় -পায়!" আমরা যারা একেবারেই হদ্দ গ্রামের থেকে বেরিয়েছি, তারা জানি ওটার মানে কি! সবার এটা জানার কথা নয়। এখন তো এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় উঠেই যাচ্ছে। আমরা গ্রামে দেখেছি; লাঙ্গল করার সময় চাষীরা এই রকম বিচিত্র ভাষায়, হালের বলদের সাথে কথা বলেন। বেশ কয়েক বছর পর, এই এস - ঠায় - পায় পাশ করা ছেলেটি মূলত যে কাজ করে, জেনে বেশ কৌতুক বোধ করি। গ্রামের বাড়িতে যে ভাইপো থাকে, তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, নিতাইদা কেমন আছেন?

ভাইপো জানাল, তাঁর অবস্থাও ভালো না, প্রায় শয্যা নিয়েছেন। ফোন নম্বর পেয়ে ফোন করলাম। খুশী হলেন। জানালেন যে, এখন আর বাইরে যেতে পারেন না। ছেলেরা “ দালান” বাড়ী করেছে। একবার যেতে বললেন। ছেলে এখন করে কি? দাদা কিন্তু বেশ স্মার্ট। বললেন, “ ছেলে এখন ভেলোরের দালাল হইছে, মাসে দুবার করে লোক লিয়ে ভেলোর যায়। সম্পন্ন চাষী নিতাইদার ছেলে; বেশ একটা নতুন পেশার সন্ধান পেয়েছে। ওদের ঐ বিঘার পর বিঘা জমিতে সবজি চাষের কি ভবিষ্যত? জিজ্ঞেশ করতে সাহস পেলাম না।১৬.১২.২৪.

ধানখালের নিতাইদা

নিতাই দাদা ৩

দুই বয়োজ্যেষ্ঠ নিতাই দাদার পরে এবার যে দুজনের কথা বলব এরা দুজনই আমার সেজদার মত হবেন, বয়সে। যে গল্পটা "শাকালু নিতাইদার" কথায় বলতে ভুলে গেছলাম; এই ধানখালের নিতাইদার দাদা ছিলেন, গৌরদাদা। শুনেছিলাম, ধানখালে এইরকম চার বা পাঁচ জোড়া নিতাই - গৌর ছিলেন। ধানখালের এই গৌরদা প্রায় বছর পঁচিশ আগে প্রয়াত হয়েছেন। এই দাদার কাছে " নেংটি ভূতের গল্প" শুনেছিলাম। না, একবার ভূতের গল্প শুরু করলে আর সব কথা কাহিনী মার খেয়ে যাবে; এজন্য এখানে আর ঐ গল্প করলাম না।

এবার যে নিতাইদাদার কথা বলব তার দাদাও একজন গৌরদাদা। এখানে কিন্তু এই গৌরদা আমাদের বাড়ীর ছেলের মত ছিলেন। গৌরদা আমার মেজদার বন্ধু। অবশ্য অনেক বছর পর, এঁদের সাথে আমাদের পরিবারের একটা কুটুম্বিতা হয়েছে। আমার ছোট বোনের বিয়ে হয়েছে, গৌরদাদার শ্বশুর বাড়িতে। নিতাইদাদাদের মত আমার বেশ কাছের কয়েকজন গৌর বা গৌরাঙ্গও আছে। আগে নিতাইদাদার গল্প শেষ করি। আগে কয়েকবারই বলেছি; আমি প্রথম কলকাতায় এসে এক বিচিত্র জায়গায় থেকেছি। সাধারণ ভাবে বুঝতে সুবিধা হবে বলেই আমি বলি, " মেসে থাকতাম।" আসলে ওটা ছিল আমার বাবার এক বন্ধুর কোম্পানির আপিস ঘর। দোতলায় একটা দুই ঘরের ফ্ল্যাট ওদের আপিস। আর নিচে সামনের বাড়ীতে কারখানা। মেজদা কলেজে পড়ার জন্য কলকাতায় এসে, ঐ আপিস ঘরে আশ্রয় পায়। বাবার বন্ধু, সেই সেন কাকুর এটুকু মহানুভবতা না হলে মেজদা হয়তো কলকাতার কলেজে পড়ার সুযোগ পেতো না। আর মেজদা কলকাতায় এসে ঐ আশ্রয় না পেলে আমারও কলকাতার স্কুলে পড়ার কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। আবার আমারও ঐ ডেরায় আশ্রয় জুটে যাওয়ায়, গৌরদা তাঁর ভাইকে প্রাথমিক আশ্রয়টা ওখানে নিতে বলতে পারেন। এই সেই আমার রাতের ডেরার সহযাত্রী নিতাইদা। এর জীবনের উত্থান পতনের গল্পও " হিন্দি সিনেমার মত!" অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এই নিতাইদাদা ক্লাশ সেভেন বা এইট এ পড়ার সময় ওদের এক পারিবারিক বিপর্যয়ে, ওদের সবার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। তিন চার ভাই অমানুষিক পরিশ্রম করে বছর পাঁচ - ছয় পরে একটু পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পান। সেই সময় বড় ভাই গৌরদার ইচ্ছায়, কিংবা ( এবং) পুরনো স্কুলের হেড স্যারের আগ্রহে, নিতাইদা আবার পড়াশুনা শুরু করেন। মাঝের ঐ বন্ধের সময়টা আট - নয় বছরও হতে পারে। এতদিন পরে শুরু করলেও, নিতাইদা খুব ভালো রেজাল্ট করে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেন। এই সময় মেজদার সেই রাতের আশ্রয়ে প্রাথমিক মাথা গোঁজার সুযোগ পেয়ে, নিতাইদা কলকাতার একটি কলেজে, ভূগোলে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়ে যান। আমরা দুজন ছাত্র। সকালে উঠে স্নান করেই মেজদা বেরিয়ে যেতেন টিউশন করতে। সন্ধ্যায় দুই একটা টিউশন সেরে ফিরত। সেন কাকুর আপিসের লোকজন আসার আগেই আমরা দুই ছাত্র স্কুল কলেজে বেরিয়ে যেতাম। আমরাও ফিরতাম, আপিস ছুটির পরে। সকালে আমরা দুই ছাত্র একসাথে টিফিন খেতাম। সেই ব্রেকফাষ্ট ঠিক আমাদের আশ্রয় স্থানের সাথে মিল রেখেই হত। দুপুরে রাত্রে আমার আর মেজদার খাওয়ার একটা আলাদা জায়গা ছিল। পাড়ার ভেতর দিয়ে, মিনিট দশ বারো হেঁটে সেই, "মৃত্যুঞ্জয় জানার" হোটেলে আমরা খেতে যেতাম। আমি অবশ্য সকালে দশটা নাগাদ, সেই হোটেলে খেয়ে, মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে বাস ধরে, শ্যামবাজার এর কাছে স্কুলে চলে যেতাম। রাত্রে যেতাম মেজদার সাথে। আমাদের ঐ খাওয়ার হোটেলের খরচ ছিল, মাসে নব্বই টাকা, মাথা পিছু। নিতাইদার কিন্তু ঐ নব্বই টাকা মাসে মাসে খরচ করার সামর্থ ছিল না। খুব অল্প দিনেই , মেধাবী আর পরিশ্রমী ছাত্র হিসেবে , নিতাইদা কলেজের প্রফেসরদের চোখে পড়ে যায়। কিন্তু মানুষের জীবন কোন পথে চলবে, কে বলতে পারে? এরকম বেশ কিছু মানুষকে খুব সামনে থেকে দেখেছি। তাই " ভবিতব্য" কথাটাকে অস্বীকার করার সাহস আমার নেই। নিতাইদা উত্তর কলকাতার কোন পুরনো রাজবাড়ী বা জমিদার বাড়ির, দরিদ্রনারায়ণসেবার লঙ্গরে দুই বেলা খেতে যেতেন। কলকাতায় থাকা আর পড়াশুনার জন্য ওকে বোধহয় প্রতি মাসে, চল্লিশ পঞ্চাশ টাকাও বাড়ী থেকে পাঠাতে পারতেন না। সেই টাকাও একদিন বন্ধ হয়ে গেল। মেরেকেটে মাস চারেক বোধহয় উনি কলকাতায় ছিলেন। তারপর হঠাৎ করে একদিন বাড়ী ফিরে গেলেন, আর এলেন না। সে সময় আমারও গ্রামের বাড়িতে খুব একটা আসা হতো না। উনি সম্ভবত বাড়ী ফিরে আবারও চাষের কাজে লেগে যান। আমি কলকাতা থেকে বাঁকুড়ায় চলে গেলাম, মেডিক্যাল কলেজে পড়তে। প্রায় বছর আট দশ পরে,

বড়দার কাছে শুনেছিলাম, নিতাইদা প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকের চাকরী পেয়েছেন। এই " চাকরী পেয়েছেন" কথাটা যতো সহজে লিখে দিলাম, কাজটা ততোটাই কঠিন ছিল। চাকরিটা পাওয়ার জন্য ওনাকে প্রায় ভিটামাটি বিক্রী করতে হবে, এমন অবস্থা হয়েছিল। সেই সময় উনি পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। এমনকি আমার বড়দার মত সামান্য বেতনের চাকরি করা মানুষের কাছেও সাহায্য চেয়েছিলেন; এইটুকুই আমি এখন লিখতে পারলাম। বিস্তৃত লেখাটা এখন "পলিটিক্যালি ইনকরেক্ট " হবে। কিছু লোক বলবে, ঐ তো, "সব পাখী মাছ খায়, দোষ হয় শুধু মাছরাঙার!" নিতাইদা বেশ কয়েক বছর আগে চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। প্রায় চল্লিশ বছর পর একবার ওনার সাথে দেখা হল। ওনার বাবা ঠাকুর্দার ভিটায় তৈরী দালান বাড়ীর দোতলায় উঠে পিছনের দূর মাঠের দিকে চেয়ে মনেপড়েছিল কি, বছর পঞ্চাশ আগে ঐ মাঠ পেরিয়ে আমরা গৌরদার বাড়ী যেতাম? নিতাইদার ছেলেই সে সময় MSc পাশ করে গিয়েছে? ওরা প্রায় জ্ঞান হওয়ার থেকেই জানে, ওদের কুটুম্ব যোগেশ আর তার শ্যালক ডাক্তার। ওদের বাড়ী গেছলাম, যোগেশের গাড়ী চেপে। ওর বাবাকে একটা ভদ্রস্থ চাকরী করতে দেখেছে। ওকে এখন সেই ১৯৭৭ সালের গল্প বললে কেমন লাগবে ওদের? ওরা কি আদৌ বিশ্বাস করবে, এই গাড়ী চড়ে আসা ডাক্তার আর ওর বাবা একদিন পঁচিশ পয়সার একটা স্লাইস রুটি ভাগ করে খেয়েছে? হ্যাঁ, শুধুই পাঁউরুটি; সেঁকে নেওয়ার সুযোগও ছিল না। কোনদিন সাথে একটা দশ পয়সার সিঙ্গাপুরী কলা পেয়ে গেলে তো সেটা প্রায় উৎযাপন করার মত ব্যাপার হত। আমাদের দু'জনের আর্থ সামাজিক অবস্থান বিপুল ভাবে পাল্টে গেছে। আর বাকী রইল একজনই নিতাইদা। তাঁর যে উন্নতি হয়েছে, আমার মত বৈষ্ণব বাড়ীর ছেলের কাছে সেটা সাধনার ফল। কৃষ্ণের কৃপা না হলে এটা পাওয়া যাবে না। ১৭.১২.২৪.

নিতাই দাদা 4

জয় নিতাই। জয় জগদ্বন্ধু। এই একটু আগেই, আবার একটি সমাপতন হল। মোবাইলটা চার্জে বসিয়ে ভাবছিলাম, ভক্ত নিতাইদার কথা। মোবাইল চার্জে বসানোর আগেই দেখলাম, আমার স্কুলের সহপাঠী বন্ধু, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক, ডক্টর সেন লিখেছেন, আমার আগের পর্ব পড়ে জেনেছেন, আমি বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে। "বৈষ্ণব পরিবারের" মানুষ বললেই আমার এখন মনে পড়ে, প্রখ্যাত মহাভারত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী মশাই এর কথা। ওনার লেখায়, ইউটিউব ভাষণে কয়েকবার বলেছেন, উনি বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে। ওনার লেখায় বা কথকতা শুনতে শুনতে যখনই আমাদের পরম গুরু, বাবা মায়ের গুরুদেব বৈষ্ণবাচার্য ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের নাম শুনি, মনে হয় দিনটি পবিত্র হল। প্রায় চব্বিশ ঘন্টা হল হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে রওনা দিয়েছি। সাথে দুটি বাল গোপাল চলেছে। এরা কেউ সফর সঙ্গী হলে, ট্রেনের দীর্ঘ ভ্রমণ আনন্দময় হয়ে যায়। সেও এক রকম, বাল গোপাল এর কৃপা। এদের একজনের "বালভাসিতম অমৃতম্" শুনতে শুনতে চলেছি। ওর সাথে পাশের একটি কিশোরী কন্যা বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে। সেই দিদির কোলে বসে, এই শিশুটি হঠাৎ বলল, আমি হাত দিয়ে বাঁশী বাজাতে পারি। ওর ঐ কথাগুলি এতই অস্পষ্ট যে, মেয়েটি বা তার মা বুঝতে পারছিল না। দুই তিন বার কি করতে পারিস, জিজ্ঞেস করায় ও বলল, " কিন্নোর মটো বাচি বাজাই।" ঐ বাঁশী আর কিন্নো মিলিয়েই বুঝলাম , এ সেই পরম করুণাময় শ্রী কৃষ্ণের বাঁশীর কথা বলছে। সে বাঁশী তো কোন সুদূর অতীত থেকেই বেজে চলেছে; শুনতে পায় কজন? যে শুনতে পায়, সে তো কৃপা ধন্য।

আমার এই নিতাইদাদা আমার প্রাইমারী স্কুলের গ্রামে থাকেন। উনি কিন্তু আমার সেই প্রাইমারী স্কুলের বন্ধু, নিত্য রুদ্রের দাদা। সেই বছর তিনেক নিত্যই আমার প্রাণের বন্ধু ছিল। তারপর কিন্তু নিত্যর সাথে প্রায় দেখাই হয় না। বছর চল্লিশ আগে একবার ওর সাথে দেখা হয়েছিল, এক অদ্ভুত অনভিপ্রেত পরিবেশে। তখন নিত্য শাসক দলের ছোটখাট নেতা। কিন্তু আমি যতোদিন গ্রামে ছিলাম এই নিতাইদাদাকে আমি প্রায় চিনতামই না। গ্রামের বাড়িতে কীর্ত্তন হলে মূলত প্রফুল্লদাদা তাঁর দল নিয়ে আসতেন। সে সময় ঐ দলে অন্য আরও পাঁচ সাত জনের সাথে এই নিতাইদাদা আসতেন, এটা পরে জেনেছি। প্রফুল্লদাদা বেশ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মূল গায়েন ছিলেন। তারপর সেই দল দুই ভাগ হয়েছে। একটি দলের মূল গায়েন এই নিতাইদাদা; অন্য দলের মূল গায়েন মদন দে। আমাদের বাড়ীতে অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন হলে, এঁদের দুটি দলই আসত। কিন্তু ছোটখাট সান্ধ্য আসরে নিতাইদাদাই গান গাইতেন; তাও বোধহয় বছর চল্লিশ হবে। এই গত সপ্তাহেও ওনারা আমার ছোট ভাই তন্ময় এর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে, কলকাতায় এসেছিলেন।

নিতাইদার বাবা মারা গেছেন আমরা যখন ক্লাশ টুতে পড়ি। আসলে নিত্যর বাবা মারা গেছেন, সেই খবরটা জানতাম। ওনারা গ্রামের সামান্য চাষী ছিলেন। তখন তো ওসব মহা দুর্ঘটনার তাৎপর্য বুঝতামই না। যতদূর মনে পড়ে, স্কুল থেকে একদিন বা দু 'দিন আমি ওদের বাড়ী গেছলাম। একদিন নিত্যর মা আমাকে শ্যামা চালের পায়েস খেতে দিয়েছিলেন। ওদের বাড়ী নিয়ে আর কিছু মনেই পড়ছে না। নিতাইদার কীর্ত্তন আমি গ্রামের বাড়িতে বেশ কয়েকবার শুনেছি। প্রায় বাইশ বছর আগে, আমি ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাটটি কেনার পর, নিতাইদাদার সম্প্রদায়কে আমার বাড়ীতে কীর্ত্তন করার জন্য ডেকে এনেছিলাম। ওরা বোধহয় সেইবারই প্রথম, কলকাতায় আসেন। তাই ওদের নিয়ে বড়দাও এসেছিলেন। আমার ছোট্ট ফ্ল্যাটে এত লোকের রাত্রে থাকার অসুবিধা হবে, তাই আমি পাড়ার মধ্যেই একটি ছোট লজে ওদের জন্য দুটি রুম এর ব্যবস্থা করেছিলাম। রাত্রে কীর্তন শেষে, থাওয়া দাওয়ার পর ওনাদের ঐ লজে গিয়ে ঘুমানোর ব্যবস্থা। এটা জেনে, নিতাইদা আমাকে বলেছিলেন, " ভাই, তুমি আমাকে নিজের লোক ভাবতে পারোনি।" তারপর থেকে ওনারা বেশ কয়েকবার আমার কলকাতার বাসায়, আর ভাই দাদাদের বাসায় কীর্ত্তন করার জন্য এসেছেন। আমরা আমাদের বাসাতেই ওদের জন্য ঢালা বিছানার ব্যবস্থা করেছি। আমার বাসায় বার দুই কীর্ত্তন করে যাওয়ার পর, একদিন বেশ সকালে আমি আমার গ্রামের

বাড়ির উঠানে ঘুরছিলাম। সেটা একটা শরৎ কালের সকাল। আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে একশ মিটার দূর দিয়ে চলে গেছে বাস রাস্তা। বেশ দূর থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম, করতালের শব্দ আর অস্পষ্ট কীর্ত্তন। কিছুটা কাছে আসার পর বুঝলাম , নিতাইদা নগর সংকীর্তন করে আসছেন। উনি বাসরাস্তা ছেড়ে আমাদের বাড়ীর দিকে নেমে এলেন। আমাদের বাড়ীতে ঢোকার আগেই, ডান হাতে বাবা মায়ের সমাধী মন্দির। নিতাইদা ঐ দুই ভক্ত বৈষ্ণবকে কীর্ত্তন শোনাতেই এসেছিলেন। পরে শুনেছি, উনি আমাদের গ্রামের অন্য প্রান্তের, বৈষ্ণব গঙ্গাধরবাবুর বাড়ীর হরিমন্দির পরিক্রমা করে ফিরছিলেন। আমাকে দেখে, কীর্ত্তন না থামিয়ে, একবার "হরিবোল" বলে আমাকে উইশ করেছিলেন।
এই যে নিতাইদা , আমার বাবা মায়ের সমাধিতেও কীর্ত্তন শোনাতে আসছেন এটাই আমাদের পরিবারের ঐতিহ্য। আশেপাশের পাঁচ সাত গ্রামে আমার বাবা একজন পরম বৈষ্ণব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেই আদিম যুগে স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। সে সময় স্কুলের শিক্ষকের আর্থিক অবস্থা, ভিখারীর ঠিক উপরের স্থানে ছিল। সেইরকম একজন শিক্ষক কতোটা পেনশন পেতে পারেন, সহজেই অনুমান করা যায়। সেই সময়ও বাবা মায়ের একটাই সখ বা ইচ্ছা ছিল ; মাঝে মাঝে "প্রভুর কীর্ত্তন" করানো। তাই নিয়ে মাঝে মাঝে একটু সমস্যাও দেখা গেছে। মা একবার প্রফুল্ল দাদাকে ডেকে বললেই, সব হয়ে যেত। কত কম সামর্থ নিয়েও, শুধুই "প্রভুর ইচ্ছায়" মা বাবা সেই সব দিনে ওরকম একটা কীর্তনের আসর বসিয়ে দিতেন, এখনও ভাবলে অবাক হয়ে যাই। মা বাবা চলে যাওয়ার পর গত বছর পঁচিশে আর সেরকম, অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন করানোর সাহস হয়নি আমাদের। নিতাইদার সম্প্রদায় অনেক বছর পর্যন্ত বিভিন্ন তিথিতে, আমাদের গ্রামের বাড়ীতে কীর্ত্তন করে গিয়েছেন। আমি তো বেশ কম বয়সের থেকেই, প্রফুল্লদাদা, বসনবাবু, ধ্রুববাবুর কীর্ত্তন শুনে এসেছি। আমাদের বাড়ীতে, প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের মহানাম সংকীর্তন হয়। নিতাইদাদার গুরুস্থানীয় যাঁদের নাম করলাম, তাঁরা সবাই ওদিকের বিখ্যাত কীর্ত্তন গায়ক ছিলেন। কিন্তু যে কোন কারনেই হোক, নিতাইদাদার কীর্ত্তন আমাদের মুগ্ধ করে। ঐ যে একবার ওনাকে গ্রামের রাস্তায় নগর সংকীর্তন করতে দেখেছিলাম, তার পরের বছর থেকেই সম্ভবত উনি প্রতিবছর ঐ সময়, এক মাসের জন্য বৃন্দাবনের গোবর্ধন পরিক্রমায় চলে যান। ঐ মাসটি বোধহয়, অদ্বৈত মাস বা ঐ রকম কিছু একটি নামে পরিচিত। এই বছরই ঐ বিশেষ মাসের মধ্যে একবার কলকাতায়, আমার ছোড়দার বাসায় প্রভুর কীর্ত্তন হল। নিতাইদা আসতে পারেননি। কীর্ত্তন হল; কিন্তু যেন কেমন একটা লবণ বিহীন তরকারীর মত। বেশ বুঝতে পারি, কেন আমার ছেলে মেয়ে অন্য কারো কীর্ত্তন শুনতে চায় না। ওদের কিন্তু খুব একটা রবীন্দ্র সঙ্গীতও শুনতে দেখিনা। মেয়ে তো কখনও বাংলা গানই শোনে না। আমার নিজের ক্ষেত্রে দেখেছি, আমার বাসায় নিতাইদা কীর্ত্তন শুরু করলে আমি মায়ের উপস্থিতি অনুভব করি। যুক্তিবাদী বিচারে এসব একেবারেই বাজে আবেগের কান্ড। আমি অমৃত্যু এই আবেগ নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। আমরা অনেক আগেই জেনেছি, নিতাইদা দীক্ষিত, অনেক নিয়ম নিষ্ঠা মেনে চলেন। অনেক সাধু মহাত্মা ,"শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে" খেতে নিষেধ করেছেন। তার স্মৃতি শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাও আছে। সব জেনেও, আমি এখনও ওটা মানতে পারিনি। এবারই দেখলাম, নিতাইদাদা ওটা খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেন। এই কয়েক মাস আগেই তো উনি আসতে পারলেন না। ভাই এর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে উনি না এলে আমরা কিছুই মনে করতাম না। উনি কিন্তু এলেন। কীর্ত্তন করলেন। ভাইয়ের বাড়ীতে ঐ শোকের পরিবেশে বসেও, আমার মনে হয়েছে, মা এসে সেই কীর্ত্তন শুনে গেলেন। নিতাইদার কীর্ত্তন শোনার জন্য আরও অনেক বছর বেঁচে থাকার ইচ্ছা আছে। প্রভুর ইচ্ছা থাকলে তাই হবে। ভক্ত কবি জয়দেবের কলমে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হয়ে লিখে দিয়েছিলেন, " দেহী পদপল্লবমুদারম !" কীর্তনের আসরে বসলে, নিতাইদার কন্ঠেও যেন কেউ উপস্থিত হয়ে যান। ধন্য তোমার সহজ সাধনা। নিতাইদা, তুমি ধন্য। আবার তোমাকে প্রণাম করবার জন্য অপেক্ষা করছি। ১৭.১২.২০২৪.

নিতাই দাদা

নিধিরাম সর্দারের আমলাগিরি

ছাব্বিশ বছর হয়ে গেল সরকারী চাকরী। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কতো বিচিত্র মানুষের সাথে দেখা হয়েছে, কতো বিচিত্র সহকর্মীর সাথে কাজ করেছি। আজও , প্রতিদিন কত নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে যাচ্ছে। মানুষের সৌভাগ্য যে, সব কথা , সব ঘটনা মনে থাকে না । তা না হলে এত লক্ষ কোটি তথ্যের ভারে সবাই পাগল হয়ে যেত। তবুও মাঝে মাঝে এক একটা পুরাতন ঘটনা মনে এসে যায়। ঘটনার খুঁটিনাটি সব স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। কিন্তু ঐ ঘটনার কুশীলবদের কারও কারও নামটা আর কিছুতেই মনে করা যায় না।

আমরা যখন সরকারী চাকরীতে যোগ দিই তখন অনিয়মগুলিই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি ব্লকের সবথেকে সিনিয়ার ডাক্তারেরই ব্লক মেডিক্যাল অফিসার হওয়ার কথা, নিয়ম মত। কিন্তু , অন্তত আমার ঐ জেলায় গিয়ে দেখি সিনিয়াররা সব দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। নতুন একটা কাউকে ধরে সবথেকে দায়িত্বপূর্ন পদটিতে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে স্বাভাবিক ভাবেই যে সব সমস্যা হওয়ার কথা তাই হত। যে সব সিনিয়ার কৌশল করে দায়িত্ব এড়িয়ে যেত , তারাই একটা নতুন ছেলের "খবরদারি" মানতে চাইত না। এছাড়া ডাক্তারী করা আর আমলাগিরি করা এক কাজ নয়। মেডিক্যাল কলেজ থেকে আমরা রুগী দেখে চিকিৎসা করা শিখে বেরোতাম ; আমলাগিরি তো কোথাও শেখানো হত না। ভুল করতে করতে যতোদিনে একটু আমলাগিরি শিখে নিতাম , ততোদিনে ঐ পদ ছেড়ে সরে পড়ার কায়দাটাও শেখা হয়ে যেত।

প্রথম যে জায়গায় আমলার পদে যোগ দিলাম সেখানে মাস ছয়েক টিঁকতে পেরেছিলাম । একটা কথা খুব তাড়াতাড়িই শিখে গেছলাম ; কাউকে কাজ করতে বলা যাবে না। উপরোয়ালারা চাইবেন সব কাজ যেন গুছিয়ে হয়ে যায় । আর সহকর্মী আর অধস্তনরা চাইবে , কাজের কথা যেন না বলি। এভাবেই চলতো দিনগত পাপক্ষয়। কিন্তু সবদিন তো আর সমান যায় না। এক একটা ঘটনা বেশ ঝামেলায় ফেলে দিত। নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় যতোটা পারা যায় মেটানোর চেষ্টা করতাম। নামে আমলা হলে কি হয়; আসলে যে নিধিরাম সর্দার,সেটা আমরা খুব তাড়াতাড়িই বুঝে গেছলাম।

প্রথম জায়গায় আমলাগিরি করতে গিয়ে বোকার মত অনেক বেশী দায়িত্ব সামলে নিয়েছিলাম। সেই বদনামটা কপালে লেখা হয়েই থেকে গেল। তাই যতোই পিছলে বেরোনোর চেষ্টা করি , আবার একটা জায়গায় জরুরী দরকার পড়তেই আবার আমার গলায় 'ছাগলের দড়িটা' পরিয়ে দেওয়া হল। ততোদিনে অবশ্য পদটার আঁতঘোত অনেক জেনেও ফেলেছি।

একদিন দুপুরে একসাথে চারজন দিদিমনি আমার কাছে কাজে যোগ দিতে এলেন। চার জনই বেশ কম বয়সি। সবে পাশ করেছেন; প্রথম পোষ্টিং। চার জনই দক্ষিন বঙ্গের। বাড়ী থেকে চারশ কি মি দূরে চাকরী করতে এসেছেন। যার যা কপালে লেখা আছে , কে খন্ডাবে। এই চার জনের

মধ্যে একজন বেশ মুখরা, আর একজন স্মার্ট। এদের দুজনের কাজের জায়গা আমার সাথেই, ব্লক হাসপাতালে। আর যে দুজন একটু গোবেচারা তাদের কাজের জায়গা নির্দিষ্ট হয়েছে আরও পনের কি মি দূরের একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ব্লক হাসপাতালে একটা দেওয়াল ফাটা ডাক্তারের কোয়ার্টার ছিল। প্রথম দুজনকে বললাম , ওখানে থাকতে পারেন ; আর কোন কোয়ার্টার খালি নেই। তখন ওদের আর কিছু ভাবার মত অবস্থাও ছিল না। কদিন পরেই বুঝেছিলাম , ওদের ঐ দেওয়াল ফাটা কোয়ার্টারই প্রাসাদ মনে হতে পারে কারো কাছে। বেচারা দু'জনকে যেতে হল আরও প্রত্যন্ত গ্রামের ভেতরের কোয়ার্টারে।

ইটাহারে আমার তৈরী বাগান

বোধহয় দু'সপ্তাহও হয়নি। এক দুপুরে ঐ দুই গোবেচারা দিদিমনি এসে প্রায় কেঁদে পড়লেন। ওনারা আর ঐ গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোয়ার্টারে থাকতে সাহস পাচ্ছেন না। আগের রাত্রে ওদের কোয়ার্টারের জানালার উপরের খড়খড়ি তুলে , কেউ টর্চের আলো ফেলেছে। এবার কি করি? এই হল আমলাগিরির এক একটা চ্যালেঞ্জ। ঐ মাঠের মধ্যে কোয়ার্টার, এরকম হলে তো যে কোন মহিলাই ভয় পাবে। ওদের নিরাপত্তার জন্য কি বা করতে পারি! অগত্যা ওদের দুজনকে থানার বড়বাবুর কাছে পাঠালাম। ওদের সাথে আগের সেই স্মার্ট দিদিমনিকে যেতে বললাম। থানার বড়বাবু আমাদের খুবই কাছের মানুষ। দিদিমনিদের বললাম, যান বড়বাবুর কাছে। ওনাকে সবই বলবেন । দেখি উনি কি বলেন।

মিনিট পনের পরেই থানা থেকে বড়বাবুর ফোন । "আরে ডাক্তার সাহেব , আপনার লক্ষ্মী তো ঘরে থাকতেই চাইছে না , আমি আর কি করব!" এটা বুঝলাম, দিদিমনিরা আর ঐ গ্রামের কোয়ার্টারে যেতে চাইছেন না। আমি জোর করে পাঠাতে সাহস পেলাম না। একটা দুর্ঘটনা ঘটলে কি জবাব দেব। কিন্তু ওরা থাকবেন কোথায় ? ওদের দুই ভাগ্যবতি সহকর্মি রাজী আছেন , একই কোয়ার্টারে চারজন থাকতে। এতে আমার আপত্তির কিছু নেই। ঐদিন থেকেই চারজন একসাথে থাকতে শুরু করলেন। পরদিন সকালের একমাত্র বাসে এরা দুজন কাজে গেলেন । বিকেলে নিজেদের সামান্য বাক্স বিছানা নিয়ে ফিরে এলেন। এই চার জনের বন্ধুত্ব আমাকে মুগ্ধ করল।

যে জিনিস আমাকে মুগ্ধ করে সেটাই আপনাকেও মুগ্ধ করবে এমন তো কোন নিয়ম নেই। ওদের দুজনের কোয়ার্টার ছেড়ে চলে আসাতে ওই গ্রামে যে তোলপাড় শুরু হয়েছে , সে খবর আমরা পাইনি। পরের দিন কাজে যেতেই কয়েকশ লোক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘেরাও করে ফেলল।

এখানে ওই ছোট্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজের ধারাটা একটু বলা দরকার। একজন ডাক্তারবাবু সকালে মোটরবাইক চালিয়ে ওখানে যান । ঘন্টা তিনচার আউটডোরে রুগী দেখে দুপুরেই ফিরে আসেন। আমাদের ব্লক হাসপাতালের কাছেই ওনার বাড়ী। মাঝে মাঝে ব্লক হাসপাতালে একজনও ডাক্তার না থাকলে উনি এসে কোন জরুরী রুগী থাকলে দেখে দেন। ওনার চাকরীটা স্থায়ী নয় । কন্ট্রাক্ট এর চাকরী। আমি ওখানে যাওয়ার আগের থেকেই ওনার ঐ গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চাকরী। আমার থেকে বয়সেও বড়। দু একবারই দেখা হয়েছে। উনি নিজের কাজের জায়গায় কখন যান বা কদিন যান ,আমার জানা ছিল না। গন্ডগোলটা হওয়ার পর জানলাম ; উনি আগে সপ্তাহে ছদিন গেলেও , সেটা কমতে কমতে এখন সপ্তাহে দু'দিনে দাঁড়িয়েছিল। বাকী দিনগুলি ফার্মাসিষ্টই চালাতেন। ফার্মাসিষ্টই ওখানকার " ডাক্তর" , সে অনেক বছর থেকেই। আমি নিজে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র একা একাই চালিয়েছি মাসের পর মাস। সকালে একজন 'সি এইচ এস ও' আসতেন ঘন্টা তিন চার আউট ডোর করতে। জেলা আপিসে মিটিং থাকলে আমাকে যেতেই হত। তখন ঐ দাদাকে ফোনে বলে যেতাম । ওনাকে প্রায় ডাকাই হত না । আমার না থাকার সময়ে , আমাদের ফার্মাসিষ্টই হাসপাতাল সামলাতেন। আমাদের এই দুই নতুন দিদিমনি যাওয়ার পর ঐ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিষ্ট দুজন প্রতিবেশী পেলেন । আর , ঐ অভাগা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডেলিভারী রুগীদের দেখা শুরু হয়েছিল।

এই যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘেরাও হয়ে গেল , এই ব্যপারটাকে তখন অত্যন্ত জটিল এক স্থানীয় মারপ্যাঁচ মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখেছি , এ ছাড়া ওদের আর করার কিছু ছিল না। তো , ঐদিন দুপুরের পরে ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একজন কর্মচারী একটি চিঠি নিয়ে এসে খবর দিল যে , ঘেরাও হয়েছে। আজ ডাক্তারবাবু যাননি, ফার্মাসিষ্টই চিঠি লিখে জানিয়েছেন। ঐ কর্মচারীকেই পাঠালাম , ওনাদের ডাক্তারবাবুর বাড়ী। ডাক্তারবাবুকে ফোনে জানালে উনি বললেন , "আমার কন্ট্রাক্টের চাকরী, আমি আর করব না। আমি আর ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোন ব্যাপারে নেই।" বুঝে গেলাম , ম্যাওটা আমাকেই সামলাতে হবে। থানার বড়বাবুকে খবর পাঠালাম। বড়বাবু আবার বিডিও সাহেবকে সব জানালেন।

বড়বাবু আমাকে বললেন , ডাক্তারই যদি না যায় তো দুটি বাচ্চা মেয়ে ওখানে থেকে কি করবে? আমি ফোর্স নিয়ে যাচ্ছি, মেয়ে দুটিকে তুলে আনছি। এরপর হাসপাতালে ডাক্তার কোথা থেকে পাঠাবে সে তো মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তার ব্যাপার ; আমি আপনি কি করব! বিডিও সাহেব বেশ ঠান্ডা মাথার লোক । তিনি বললেন , চলুন , আমরা তিন জনেই যাই; লোকগুলিকে বোঝাতে হবে। জনা পনের কুড়ি কন্সটেবল একটা ট্রাকে , আর আমরা বিডিও সাহেবের গাড়ীতে চললাম। গাড়িতে যেতে

যেতেই বিডিও সাহেব সমস্যাটা বুঝে গেলেন। রাত প্রায় ন'টায় পৌছে দেখি , স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চত্তর লোকে লোকারন্য। বিডিও সাহেব এসেছেন শুনে লোকজন বেশ আস্বস্থ হয়েছে মনে হল।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভেতরে সিমেন্টের বাঁধানো বেঞ্চেই বসলাম সবাই। আলোচনা যা হল প্রায় সবটাই বিডিও সাহেবের সাথে। আমাকে ডাক্তার আসার ব্যাপারে জানতে চাইলে এটুকুই বলতে পারলাম যে , ওদের ডাক্তারবাবু আর চাকরী করবেন না বলেছেন; আমি ডাক্তার আনার লোক না । ওদের ঐ জমায়েতের নেতা লোকটি দেখলাম নাটুকে। এমনিতে ওখানকার পঞ্চায়েতের বিরোধী পক্ষের লোক । নাটকীয় ভাবে একবার আমার পায়ে ধরছেন , একবার বিডিও সাহেবের পায়ে ধরছেন। যখন বুঝে গেলেন যে , এদের এখানে পিটিয়ে মারলেও , ডাক্তার আনার ক্ষমতা এদের নেই, তখন পড়লেন দিদিমনি দুজনের থাকা নিয়ে। মেয়েদের কোয়ার্টারে রাত্রে টর্চ মারা নিয়ে বলাতে প্রথমে বেশ কড়া আপত্তি জানাল। এটা ওদের গ্রামের বদনাম করা হচ্ছে। এমনকি দিদিমনিরা চলে যাওয়ার জন্য মিথ্যা বলছে , এমনও বলতে থাকল। দিদিমনিদের কোয়ার্টারের সব থেকে কাছে থাকেন একজন মাষ্টার মশাই। তিনি বললেন, ডাকলেই আমি চলে আসতাম।
নেতা ছেলেটি যে কথা বার্তায় বেশ চালাক চতুর সেটা ওর একটা " উকিলের যুক্তি" শুনলেই বুঝবেন । শেষ পর্যন্ত যখন দিদিমনিদের কোয়ার্টারে থাকা নিয়েই ঝোলাঝুলি শুরু হল, তখন ওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে জানতে চাইলাম। উত্তরে নেতা ছেলেটি বলল, কারও নিরাপত্তার দায়িত্ব কি কেউ নিতে পারে? " ইন্দিরা গান্ধীর কি নিরাপত্তা কম ছিল ? তাঁকেও তো গুলি খেয়ে মরতে হল"। শেষ পর্যন্ত ঐ মাষ্টার মশাই এর ভরসায় দিদিমনিদের দুজনকে ওখানের কোয়ার্টারে থাকতে হবে, সাব্যস্ত হল। রাত বারোটার পরে যখন দিদিমনি দুজন বিডিও সাহেবের গাড়ীতে ওই রাতের মত ফেরার অনুমতি পেলেন , তখন আর তাঁদের কাঁদারও শক্তি ছিল না। পরদিন আবার ওদের বাক্স বিছানা নিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে যেতে হল।

গাড়িতে ফেরার সময় বড়বাবু বিডিও সাহেবকে বলছিলেন, ওনার ঐ তিন ঘন্টা নাটক শোনার ইচ্ছা ছিল না ; এক সময় ভেবেছিলেন, ঐ নেতাকে পিটিয়ে গাড়িতে তুলে আনবেন। অবশ্যই সেটা ভালো কাজ হত না। পরে কিন্তু ঐ নেতা বা ঐ গ্রামের লোকগুলির কাজকে আমার প্রসংশনীয়ই মনে হয়েছে। নিজেদের গ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অব্যবস্থা নিয়ে ওরা সেদিন যা করেছিল , ঠিকই করেছিল। আমার নিজের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র আজ বছর পনের হল ভুতের বাড়ী হয়ে পড়ে আছে। আমার গ্রামের লোকগুলির উদ্দমের অভাবই এর জন্য দায়ী। একটা কথা আমি প্রায়ই বলি, "বাচ্চা না কাঁদলে মাও দুধ দেয় না।" আমি চাষবাস , ব্যবসা নিয়ে মেতে থাকবো আর আমার গ্রামের সমস্যা শহর থেকে লোক গিয়ে মিটিয়ে আসবে , এটা না ভাবাই ভালো।

সিজগেড়িয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারবাবুর আবাস, ২০০৫ সালে

বাইশ তেইশ বছর পর লিখতে গিয়ে এখন দেখছি সেই দুই দিদিমনির নামও ভুলে গেছি। সেই স্মার্ট দিদিমনি এখনও যোগাযোগ রাখেন, তাই তার মেয়েই এখন সেই দুই দিদিমনির মত বড় হয়ে গেছে দেখেছি। ওদের দুজনেরও মেয়েরা হয়তো এখন নার্শিং ট্রেনিং নিচ্ছে। ওদের মায়েরা নিশ্চয়ই ছেলে মেয়ের কাছে গল্প করে সেই সব দুর্দিনের কথা বলেছেন। জানা হয়নি , ওদের তখনকার নিধিরাম সর্দার, বি এম ও এইচ স্যারের সম্বন্ধে ওরা কি ভেবেছিলেন তখন । আর এখনও বা কি ভাবছেন ? এতোগুলি লোকের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে, হাত গুটিয়ে বসে থাকা উপরওয়ালা আর কোন দপ্তরে আছে কিনা জানিনা। আজ আমার কন্যা একটা দপ্তরে ঐ রকমের কিছুটা দায়িত্বের পদে যোগ দিয়েছে। প্রথম মাস দেড়েক প্রশিক্ষন চলবে। কি শিখছে জানতে গিয়ে ওর কাছে যা জানছি, তাতে নিজের সে সময়কার অসহায়তার কথাই মনে পড়ছে। এদের সিনিয়ররা কিন্তু নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে, কোথায় কি কি সমস্যায় পড়তে পারে, কি করে সামলাবে , এসবই শেখাচ্ছেন। আজকের নিধিরাম সর্দাররা অন্তত কাজে যোগ দিয়ে ,কি করতে হবে সেটুকু শিখে কাজে নামবে, এটা আশা রাখছি। তাতে নতুন আমলার বিড়ম্বনা যেমন কমবে , দপ্তরের কাজও অনেক ভালো ভাবে চলবে।

পুনশ্চ: ১২.১২.২০২৪.

মারনাই ইটাহার নিয়ে যে সকল কথা লিখলাম, ওগুলি পঁচিশ বছর আগের কথা। আজকের খবর, সেই মারনাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দু'জন ডাক্তারবাবুর মধ্যে একজন, আর চারজন নার্স দিদিমনি এখন মারনাইতে থাকেন। ইটাহার ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাঁচজন ডাক্তারের মধ্যে তিনজন এখন ইটাহারের কোয়ার্টারে থাকেন। আমি বছর দুই আগে একবার ওদিকে কাজে গিয়ে, ঘন্টা দেড়েকের জন্য ইটাহার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার এক্কার সাথে দেখা করে গল্প করে এসেছি। অনেক নতুন বাড়ী ঘর হয়েছে। ডাক্তারদের নতুন কোয়ার্টার হয়েছে। বর্তমানে ঐ জেলার CMOH ডা শর্মা আমার অনেকদিনের পরিচিত। কাজের মানুষ বলে সুনাম আছে। আমি তিরিশ বছর আগে যখন ঐ জেলায় প্রথম সরকারী চাকরী করতে যাই তখন যিনি CMOH ছিলেন, তিনি বেশ মজার কায়দায় ঝামেলার কাজ

এড়িয়ে যেতেন। উনি বছর দশেক আগে প্রয়াত হয়েছেন। ওনাকে নিয়েই একদিন লেখার ইচ্ছা আছে।

## বেচারাম ডিম বেচে , কেনারাম কেনে

" বেচারাম ডিম বেচে , কেনারাম কেনে। সেই ডিম রাখে কেনা , হাঁড়ি ভরে এনে। "

ছোটবেলায় " হাসি খুশি" বইতে পড়েছিলাম। প্রায় পঞ্চান্ন বছর পরেও সুন্দর মনে আছে। আমার এক বৃদ্ধ বন্ধু, অধুনা প্রয়াত, চন্দবাবুর কথা আর এক জায়গায় লিখেছি। বছর তিরিশ আগে, মেদিনীপুর শহরে থাকার সময়, এই চন্দবাবুর সাথে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমার থেকে বয়সে বছর তিরিশ –এর বড় , স্পষ্ট বক্তা মানুষটি আমার খুব প্রিয়জন ছিলেন। মাঝে মাঝেই বেশ অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলতেন। আমি বছর বত্রিশ –তেত্রিশ বয়সে , মেদিনীপুর শহরে একটা পুরনো বাড়ী কেনা যায় কিনা ভাবছিলাম। ওখানকার রবীন্দ্র নগর ছিল ডাক্তার পাড়া। শহরের অন্য যে কোন পাড়ার থেকে এই রবীন্দ্র নগরে জায়গা জমির দাম অনেকটাই বেশি ছিল। তার থেকে বড় কথা, ফাঁকা জমি প্রায় ছিলই না। পুরনো বাড়ী এক দুটি যা বিক্রী হত , দাম ছিল অন্য কোনো পড়ার প্রায় দ্বিগুণ। আমি একটা পুরনো বাড়ীর খবর পেয়ে দেখতে গেলাম। বাড়ীর কোন ছিরি ছাদ নেই, দামও আমার ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ। এসব কথা শুনে , চন্দবাবু বলেছিলেন,” আপনার বয়স কত? এখনই কেন বাড়ী কেনার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন?” বললাম, এ পাড়ার যা অবস্থা, দু’ তিন বছর পর আর কেনার মত বাড়ী বা জায়গা থাকবে না। উনি সাথে সাথেই বললেন, " আরে না, কেনারাম বেচারাম চলতেই থাকবে" ! আমার জীবনে এমন বাস্তব সত্য কথা আর খুব একটা শুনিনি। একেবারে সত্য দ্রষ্টা মুনি ঋষিদের মত কথা। সেদিন আরও কিছু কথা উনি আমাকে বলেছিলেন। চন্দবাবু বলেছিলেন, “অপনার এমন কিছু বয়স হয়নি যে এখনই একটা বাড়ী কিনে নিয়ে বসে যেতে হবে। শেষে সেই বাড়ীই বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। বয়স হোক, তখন যেখানে ইচ্ছা করবে, বাড়ী করে থাকবেন। “

চন্দবাবু বেঁচে থাকতে জেনে গেছলেন, আমি ব্যারাকপুরে ফ্ল্যাট কিনেছি। আমার বর্তমান ঠিকানা, দমদম জংশন স্টেশন –এর পাশে; এটা চন্দবাবুর জেনে যাওয়া হয় নি। তার আগেই উনি মরে শান্তি পেয়েছেন। আমার আগের লেখায় লিখেছি; একজন প্রিয় মানুষের মৃত্যু সংবাদ আমাকে গভীর প্রশান্তি দিয়েছিল। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। চন্দবাবু সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে দেখে গেছেন, সেই রবীন্দ্র নগরেই, আমাকে সেই প্রায় বেদ বাক্য বলার দশ বছর পর, আমার এক বন্ধু বাড়ী কিনেছে। চন্দ বাবুর বাড়ীর কাছেই। আমি জানি, বোধহয় আজ আমার বয়সটা চন্দবাবুর সেদিনের বয়সের মত হয়েছে বলেই, আমি আজই খুঁজলে, রবীন্দ্রনগরেই দু– একটা বাড়ী পেয়েও যাব।

মেদিনীপুর জেলা আমার জন্ম স্থান; বেশ গর্বের সাথেই কথাটা সব সময় বলি। কিন্তু মেদিনীপুর শহরে বছর সাতেক থাকার পর , আরও কয়েকটা জেলায় কয়েক বছর করে থেকেছি। মূলত সরকারী চাকরী করার জন্য জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছি। এখন এটুকু বলতে পারি, পেশার কারনে থেকে যেতে না হলে, মেদিনীপুর শহরে আজীবন আটকে থাকার মত কোন আহামরি জায়গা ওটা নয়। ঐ যে চন্দবাবু বলেছিলেন, সেই বাড়ীই একসময় বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, কথাটা কী সাংঘাতিক ভাবে সত্যি , আমার চোখের সামনে প্রতিদিন দেখছি।

এক, দুই ,চার, ছয় করে গোটা দশেক উদাহরণ আছে, আমার আত্মীয়, বন্ধু, সহকর্মীদের মধ্যেই। অবশ্য শুধু স্থাবর সম্পত্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে , একজন মানুষ চারটি শহরে চারটি বাড়ী বা ফ্ল্যাট কিনে রেখেছে, এমন উদাহরণও কম নেই। আমি আমার নিজের কথাই বলি। মেদিনীপুর শহরে পুরনো বাড়ী আর জায়গার খোঁজ খবর করতে

করতেই চলে গেলাম, উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চাকরী করতে। বছর চারেক ওদিকে থাকার পর , আবার একটা বাড়ী কেনার চেষ্টা করতে লাগলাম। মাত্র মাস খানেকের মধ্যেই এমন একটি পারিবারিক সংকট দেখা দিল যে, উত্তর বঙ্গের থেকে একেবারে উত্তর ২৪ পরগনায় চলে আসতে হল।

আজও মেদিনীপুর শহরে গিয়ে চারজন লোকের সাথে কথা বলে দেখুন; তিনজনই বলবে, মেদিনীপুরে 'ডাক্তারী ব্যবসা' এত ভালো চলে যে, এখানে এলে ডাক্তাররা আর যায় না। আমি এ রাজ্যের সবকটা জেলা শহর ঘুরেছি। প্রতিটা জেলা শহরে ডজন ডজন ডাক্তারের সাথে কথা বলে দেখেছি; সব জেলা শহরেই অন্য জেলা থেকে আসা অনেক ডাক্তার ঘর বাড়ি করে থেকে গেছেন। কলকাতায় বাড়ী,উত্তরবঙ্গের জেলা শহরে বাড়ী কিনে থেকে গিয়েছেন, এমন ডাক্তারের অভাব নেই। আমাদের মেদিনীপুরের ছেলে, রায়গঞ্জ শহরেই থেকে গেল।

ব্যারাকপুরে চাকরী করতে এলাম একটা ব্যতিক্রমী জরুরী পরিস্থিতিতে। জানতাম , খুব বেশীদিন ওখানে কাজ করতে হবে না। কিন্তু ছেলে মেয়ে দুজনকেই ব্যারাকপুরের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করা হল। যখন প্রায় ব্যারাকপুর ছেড়ে অন্য হাসপাতালে যাওয়া ঠিক হয়ে গেল, আমার কলেজের এক দাদা আমাকে পেড়ে ফেলল। ওরা ব্যারাকপুরে একটা ফ্ল্যাট কিনছে, ঐ বাড়িতেই দু' একটা ফ্ল্যাট এখনও বিক্রী হয়নি; আমি একটা কিনি, এমনটা ঐ দাদার ইচ্ছা। 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা' , এই প্রবাদ বাক্যটা নিজের ক্ষেত্রে ফলতে কজন দেখেছে? আমার অবস্থা তখন তার থেকেও খারাপ। আমার পরিবারের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ের খবর, ঐ দাদা সব জানেন। দাদা নিজেও আমার ছেলের জন্য রক্ত দিয়েছেন। তবুও একটা লাখ পাঁচেক টাকার ফ্ল্যাট কেনার জন্য ব্যাঙ্কের লোন পাওয়া যায়, এবং ইত্যাদি হিসেব করে দেখালেন। ওনার চাপাচাপিতে গেলাম প্রোমোটার -এর বাড়ী। সবথেকে ছোট যে ফ্ল্যাটটি তখনও খালি ছিল , সেটাই কেনা যেতে পারে , বুঝলাম। আজও ভাবলে অবাক লাগে, কি করে তখন ঐ দুঃসাহস দেখিয়েছিলাম। মনে আছে, ঐ সময় এক দালাল, ঐ পাড়ার আরও ভেতরে একটা পুরনো ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে যায়। সে যা দর বলেছিল তাতে পরের পাঁচ বছরেও একটা ফ্ল্যাট কেনার কথা ভাবতে পারিনি। সে দালাল বলেছিল, "ব্যারাকপুর গাঁজা গলিতে ফ্ল্যাটের দাম বালিগঞ্জের মত।" পরে বুঝেছিলাম, দালালরা ওভাবেই বলে।

সেই গোয়েন্দা গল্পের মত , "কোথা হইতে কি হইয়া গেল, আক্রমণকারির হাত হইতে আগ্নেয়াস্ত্র গোয়েন্দার হাতে আসিয়া গেল!" হাতে একটি টাকা না থাকলেও , ঐ ছোট ফ্ল্যাটটি কেনা হল। এক্ষেত্রে কেনারামের জয় হইল। কিন্তু বেচারাম যদি প্রোমোটার হয়, একটি টাকাও ছাড় পাওয়ার আশায় না থাকাই ভালো। ব্যাংকের মূল্য নির্ধারক ভদ্র লোকের একটি কথাও ,আজ বছর কুড়ি পরেও ,ভীষন আধুনিক মনে হচ্ছে। উনি বলেছিলেন, " প্রোমোটারের সাথে পাঁচ লাখে কথা হয়েছে? তাহলে ফ্ল্যাটে ঢোকার আগে আরও এক লাখ আপনার খরচ হবেই!" বাস্তবে আমি ঐ ছোট

ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় পর্যন্ত ,রেজিস্ট্রির খরচ নিয়ে সাত লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। এই সাত লাখ টাকা কিন্তু দু'হাজার তিন সালের খবর। দশ বছরে ঐ সাত লাখের বাজারদর হয়ে গেল বাইশ লাখ। এবার আমি বেচারাম।

এই দশ বছরে আমার ছেলে মেয়ে দুজনেই কলেজে পড়তে শুরু করেছে, কলকাতায়। আমি তো এই এই ফ্ল্যাটে ঢোকার আগেই হাবড়া হাসপাতালে চলে গিয়েছি। সব থেকে বড় কথা, আগেই বলেছি,সবথেকে ছোট ফ্ল্যাটটি কিনতে পেরেছিলাম। এদিকে ব্যাংকের লোনও শেষ করতে পেরেছি। ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাটে সুখে শান্তিতে দিন কেটে যাচ্ছিল। একটাই সমস্যা; গ্রীষ্মের মাস দুই- তিন গরমে বেশ কষ্ট। আশপাশের প্রায় সব বাড়িতেই 'এ সি' লেগে গেল; এবার আমার ফ্ল্যাটেও 'এ সি' না লাগালেই নয়। এক সকালে ছেলেকে নিয়ে খবরের কাগজে কেনারাম বেচারাম -এর পাতাটা দেখতে বসলাম। উত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত পাড়ায় কয়েক ডজন ফ্ল্যাট বিক্রী আছে। গোটা চারেক -এর ঠিকানা দেখে ফোন করে আরও কিছু তথ্য জেনে নেওয়া গেল। ওগুলি দেখতে গিয়ে, বিশেষ করে দালালদের বদান্যতায় আরও তিনগুণ ফ্ল্যাট এমনকি নতুন তৈরী বাড়ীরও সন্ধান পেলাম। সপ্তাহে তিন- চারটি ফ্ল্যাট ইত্যাদি দেখতে যেতাম। দশ বছর আগে , চার লাখ টাকা লোন পাওয়া যাবে কি না তাই নিয়ে সন্দেহ ছিল; এবার ব্যাংকের ম্যানেজার তিরিশ- চল্লিশ লাখ টাকা দিতে পারেন জানালেন। ধার নিলেই তো হবে না, শোধ করতে হবে। আমার ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাট বিক্রি করে লাখ পনের পেতে পারি,এমন ভেবেই নিজের ক্রয় ক্ষমতা ঠিক করে নিলাম। ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাটের এক প্রতিবেশীও তার একটা ফ্ল্যাট বিক্রি করতে চেষ্টা করছেন, খোঁজ পেয়ে তার সাথে একদিন দেখা করলাম। উনি ঝানু বেচারাম। বললেন, অপনার ফ্ল্যাট পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে দাম পাবেন। আমার হিসেবের পনেরলাখটা কুড়িতে পৌঁছতে পারে , এটা বুঝলাম। সেই মত একটা বাজেট করে এগোতে শুরু করলাম। অন্তত দুটি পুরনো ফ্ল্যাটের কাগজ পত্র নিয়ে উকিল বাবুকে দেখতেও দিলাম। এক বৃদ্ধের ফ্ল্যাট কেনার জন্য কয়েক লাখ টাকা দিয়ে চুক্তি পত্র তৈরী করার জন্য টাকা জোগাড় করলাম। আগের দিন রাতে তার কন্যা ফোন করে জানালেন, "এখন দিতে পারছি না। বাবা ঐ ফ্ল্যাট বিক্রি করে আমার পাশে একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনে চলে আসার কথা ছিল; কিন্তু এর মধ্যে এটা বিক্রী হয়ে গেল। " আবার অন্য কোনোটা নেওয়া যায় ভাবতে শুরু করলাম। এক মার্কামারা দালাল প্রতিষ্ঠান মারফত আর একটা বেশ পছন্দের পুরনো ফ্ল্যাট কেনার জন্য এগোলাম। এটাতে কেণারাম বেচারাম এর খেলা বেশ উপভোগ্য ছিল।

কেষ্টপুরের এই দোতলার তিন রুমের ফ্ল্যাটটি আমাদের খুব পছন্দ হল। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে লোকজন ভদ্র মনে হল। কিন্তু দালালের এক কর্মচারী নিচের যে গ্যারেজ দেখিয়েছিল, সেটি আদৌ ঐ ফ্ল্যাটের সাথে বিক্রী হচ্ছে না জানলাম। দালালকে ফোন করলে বলল, ওটা কয়েক মাস পর বিক্রী হবে। প্রথমেই কথার খেলাপ হল, কেনারাম বিগড়ে গেল। জানলাম ফ্ল্যাটের মালিকের ওষুধের ব্যবসা ঐ নিচের গ্যারেজে। ব্যবসার জন্য অনেক টাকা

দরকার তাই ব্যবসায়ী ভাইপোকে ফ্ল্যাট বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। ভাইপো ভিন রাজ্যে থাকে, পাকা বেচারাম। দালালের কাছ থেকে আমার ফোন নম্বর নিয়ে , আমাকে খুব বোঝানোর চেষ্টা করে, তার চালিয়াতি যুক্তি চালিয়ে গেল। আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকা, একটি কথা আমি প্রায়ই বলি; "একজন এম বি বি এস পাশ ডাক্তারকে যে বোকা ভাবে, সেই হদ্দ বোকা"! আমরা ভদ্রতার খাতিরে অনেক সময়ই মুখের উপর কথাটা বলিনা। কিন্তু সামনের গাধাটা আমাকে বোকা ভাবছে, এটা বোঝার মত বুদ্ধি না থাকলে, কেউ জয়েন্টে Rank করে ডাক্তারী পড়ার সুযোগ পাবে না।

গেল ঐ কেষ্টপুরের ফ্ল্যাট। এমনকি ঐ বাড়ীর সেক্রেটারী ভদ্রলোক পরে আমাকে ফোন করে জানালেন যে, ঐ বাড়িতেই আর একজনের গ্যারাজ বিক্রী আছে, আমি ওটা আলাদা করে কিনে নিতে পারি। কিন্তু ঐ যে বেচারামকে চালিয়াত মনে হল, আর ওদিকে গেলাম না। এর পর দমদমের বর্তমান ফ্ল্যাটের একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম। গিয়ে দেখি, আমি যেটা নিতে পারি ,মানে একেবারে প্রথম পছন্দের না হলেও , দ্বিতীয় বা তৃতীয় পছন্দের অবস্থান, দক্ষিণ খোলা, কিছুটা ওপরে, সেই ফ্ল্যাটের ছাদ সবে ঢালাই হয়েছে। প্রোমোটার জানালেন, ঠিক এক বছরের মধ্যে ঢুকে পড়ার মত করে দেবেন। আমারও ব্যাংকের লোন, ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাট বিক্রি এসব করতে এক বছরের বেশিই লাগবে, ওদের জানালাম। এটা বুক করেই,ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাট বিক্রি করতে চাই, লোকজনকে বলতে শুরু করলাম।

সে সময় একটা কথা বন্ধুরা খুব বলত। "মানুষ কিনতে পাগল, বিকতে ছাগল"! ঠিকই ,আগেও গোটা দুই তিন পুরনো ফ্ল্যাট কিনতে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। ভাগ্য ভাল, ওসব ক্ষেত্রে বেচারামরাই বিগড়ে যায়। এবার এই নতুন ফ্ল্যাট কেনার জন্য পাগলের মত ব্যস্ত না হলেও, আমার ক্রয় ক্ষমতার অনেক বেশি দামেই কিনব ঠিক করে নিলাম। জানতাম,ব্যাঙ্ক এবার অনেক বেশি লোন দেবে।

ওদিকে মুখে মুখে শুনেই , ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাট কেনার লোক আসতে শুরু করেছে। একজন ভদ্রলোক তো পারলে এক সপ্তাহের মধ্যেই কেনেন। ইছাপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ভদ্রলোক ;পঁচিশ লাখ টাকা দাম দিতে তৈরী। কিন্তু আমার পুরনো প্রতিবেশীদের কেউ কেউ এমন অশ্লীল ভাবে আপত্তি জানালেন যে, উনি আমার সাথে এসে দেখা করতেই পারলেন না। আমি জানি বেচারাম কেনারমের গল্পে , এই " আপত্তি" ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ন। কিন্তু ব্যাপারটা এতোই, "পলিটিক্যালি ইনক্যারেক্ট" যে, আমি লিখতে পারছি না। কারো জানার আগ্রহ থাকলে আমার কাছে ব্যক্তিগভাবে জেনে নিতে পারেন।

এবার আমি হলাম বেচারাম। চন্দবাবুর সেই অমোঘ বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। বেচারাম থাকলে কেনারামও থাকে। দিন সাতের মধ্যে আমার এক ভ্রাতৃপ্রতীম ডাক্তার এসে বলল, অপনার ফ্ল্যাট আমাকে দিতেই হবে। আমি পঁচিশ লাখ দাম পেয়েছি জানালাম। ও বলল,ওর একটা ফ্ল্যাট অন্য জায়গায় আছে, সেটা বিক্রী করে আমারটা কিনবে, একটু দাম কমাতে হবে। ঠিক আছে, আমি তো কুড়ি লাখ পাবো ধরে এগোচ্ছিলাম; ওকে চব্বিশ বললাম। ও দু' লাখ টাকা অগ্রিম দিয়ে বায়না করল। আমিও বেচারাম হয়ে যা পাচ্ছি, বাকিটা হিসেব করে ব্যাংকে লোনের জন্য দরখাস্ত জমা দিলাম। আমার প্রোমোটার বেশ ভালো ভাবেই কাজ এগোচ্ছে দেখলাম। নিজের জমা আর অন্যান্য দিক থেকে টাকা তুলে প্রোমোটারের কিস্তি দিতে থাকলাম। কিন্তু সমস্যা দু' দিকেই দেখা গেল।

একদিকে প্রোমোটার একটা জরুরী কাগজ দিতে না পারায় , ব্যাংকের লোন আটকে আছে। প্রোমোটার বলছেন, সরকারী আপিসে সব টাকা পয়সা জমা করা হয়েছে, কিন্তু অপিসের ঢিলেমিতে কাগজটা পেতে দেরী হচ্ছে। ওদিকে আমার ভাইটিও যে কোন কারনে হোক তার ফ্ল্যাটটি বিক্রী করতে পারছে না। অর্থাৎ কেনারম আর বেচারাম দু'জনেই ঝুলে আছে। এভাবে একবছর প্রায় পেরিয়ে গেছে। আমার ব্যারাকপুরের ফ্ল্যাট কেনার জন্য আরও কেনারামের খবর পাচ্ছি। কেউ কেউ বলছে, ওটা এখন তিরিশ লাখ পাবেন। ভাইটিকে বলতেই হল যে আর সময় দেওয়া যাবে না। ভাইটি প্রায় কেঁদে জানাল, পারিবারিক সমস্যার কারণে বিক্রী করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত ব্যাংকের লোন নিয়ে আমার নতুন ফ্ল্যাটটি কেনা হল। এক বছরের জায়গায় চোদ্দ মাসেই , প্রোমোটার আমাকে ফ্ল্যাটের চাবি দিয়ে দিলেন। ওদিকে ভাইটি যে সত্যিই বেকায়দায় পড়েছে জানতে পারলাম। শেষ পর্যন্ত বাইশ লাখেই ওকে ফ্ল্যাটটি দিয়ে দিলাম। সাত লাখের কেনারাম, দশ বছরে, বাইশ লাখের বেচারাম হয়ে গেল।

বছর খানেকের মধ্যেই জানলাম, আমাদের ব্যারাকপুরের সেই বাড়ীর চব্বিশটি ফ্ল্যাটের মধ্যে আরও গোটা তিনেক বিক্রী করে, পুরনো বাসিন্দারা চলে গেছে। তারা কে কি কারণে বিক্রী করেছে আমার জানা নেই। আমি তো কলকাতার আরও কাছে আসতে চেয়েছিলাম। তার থেকে বড় কথা, ছেলে মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ায় একটু বড় ফ্ল্যাটের দরকার হয়েছিল। আমার সেই ভাই আবার, বছর চার- পাঁচ থেকে, সেই ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়েছে।

ওদিকে আমার সেই দাদাও, আমি আসার পর পরই অন্য জেলায় বদলী হয়ে গেছেন। মেয়ে কোলকাতার একটা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ায় ওনারা ওর কলেজের কাছে একটি ফ্ল্যাট কিনে নেন। মায়ের চাকরী ব্যারাকপুরে থাকলেও, মেয়ের জন্যই মা মেয়ে কলকাতায় থাকতে শুরু করে। ওদের ছেলেও উচ্চ শিক্ষার জন্য ভিন রাজ্যে চলে

গেল। মেয়েও উচ্চ শিক্ষার জন্য অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ায় পর, ওদের মাও ট্রান্সফার নিয়ে স্বামীর কাছে চলে গেছে। অর্থাৎ , আপাতত দুটি ফ্ল্যাট তালা বন্ধ হয়ে থাকে। ওনারা অবশ্য , চন্দবাবুর কথা মত, এই ফ্ল্যাট বা বাড়ী গুলিকে, "বোঝা" ভাবেন কি না আমি জানিনা। আমার পরিচিত ডজন খানেক মানুষ আছেন, যারা বিদেশে বা ভিন রাজ্যে চাকরী করার জন্য গিয়ে স্থায়ী ভাবে থেকে গেছেন। তাদের কারো বৃদ্ধা মা একা একা একটা বাড়ী আগলে পড়ে আছেন। কারো বা তাও নেই। আমি ব্যারাকপুরে এসে প্রথম যে বাড়িতে ভাড়া ছিলাম, সেই বাড়ীর আসল মালিক মহিলাকে আমরা এসে দেখিনি। আমরা আসার আগেই তিনি গত হয়েছেন। তাঁর মেয়ে জামাই দু'জনেই দূরের জেলায় ভালো চাকরী করেন। আমার আগে যে ভদ্রলোক ভাড়ায় ছিলেন, তিনিই বছর দশেক বাড়িটি দেখভাল করেছেন। পরে আমি যে বছর তিনেক ছিলাম, সেই বাড়িওলা জামাইবাবু বোধহয় তিনবার এসেছিলেন। আর আসল বর্তমান মালিক, দিদি এসেছিলেন মাত্র এক বারই। আমি চলে আসার পর কে এসেছে, আর জানা হয়নি।

আমার ভাগ্য ভাল, যে দুটি নতুন ফ্ল্যাট কিনেছি, প্রোমোটার দাম একটু বেশি নিলেও ঠিক সময়েই ফ্ল্যাট তৈরী করে দিয়েছে। আমার নিকট আত্মীয় ফ্ল্যাট কিনে ঢোকার দু'দিন পরে হাতে উকিলের চিঠি পেয়ে জানতে পারে, ঐটি ছাড়াও আরো কয়েকটি ফ্ল্যাট, প্রোমোটার একজনের কাছে বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে রেখেছে। পলতা রেল স্টেশন-এর পাশে, কয়েকশ ফ্ল্যাটের একটা প্রায় নতুন শহর তৈরী হচ্ছিল, বছর দশ বার আগে। বিরাট কোম্পানির প্রকল্প। এই বেচারাম এর কাছে লাখ লাখ টাকা বায়না দিয়ে যারা ফ্ল্যাট কেনার চেষ্টা করেছিলেন, তাদের দুর্ভাগ্য দেখলে আমার কষ্ট হয়। তিন চার তলা পর্যন্ত খাঁচা তৈরী হয়েছে। তারপরই কাজ বন্ধ। দশ বছরে সেই সব সিমেন্টের খাঁচায় কত মোটা ধুলোর আস্তরণ জমেছে জানিনা। কেনারাম বেচারাম-এর ছড়াটা আজও মনে আছে বলেছিলাম। শেষ লাইন দুটি হল; "একদিন ডিম ফুটে, বের হল বিদঘুটে, কালো কালো কদাকার দাঁড়কাক গুলো। কেনা বলে বেচারাম চোখে দিল ধুলো।"

পুনশ্চঃ চাকরী থেকে অবসর নিয়ে , আবার আমি কেনারাম। এবার গন্তব্য “ গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারানসী সমতুল।” কোথায় ? ডিম ফুটুক আগে; তারপর জানাব , কাক না, কোকিল কি বেরল!

হাউসিং এর নিজস্ব গঙ্গার ঘাট

মিত্রা মাসি

মহালয়া এলে বাঙালির কিছু স্মৃতিমেদুরতা সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়ায়। আমার মত বরিষ্ঠ নাগরিকদের তো আচ্ছন্ন করে রাখে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র মশাই এর সেই অলৌকিক স্তোত্র পাঠ। আমাদের তো জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই আকাশবাণীর প্রভাতী এই অনুষ্ঠান আমাদের স্মৃতির মর্ম মূলে ঢুকে গেছে। গত ৬০-৬৫ বছরে গোটা পৃথিবীর সব কিছুই প্রায় ওলট পালট হয়ে গেল; কিন্তু আমাদের মন থেকে মহালয়া একটি বছরের জন্যও সরে গেলো না। এই মহালয়ার ভোরের কত মধুর মায়াময় স্মৃতি। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে থাকার সময় অন্তত দু বার এই মহালয়ার ভোরে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা যেন এই সেদিন ঘটেছিল।

তখন আমরা প্রথম বর্ষের ছাত্র। আগের রাত্রে মেসে খেতে গিয়ে কানাঘুষো শুনলাম, কাল মহালয়ার ভোরে কোথায় যেন যাচ্ছে কয়েকজন। মনোজিৎদাকে ধরে জানলাম, বি ডি আর ট্রেনে চেপে কোথাও যাওয়া হবে। আমিও যাব। বেশী লোককে জানানো হয়নি; তবুও ভোর রাত্রে উঠে স্টেশনে পৌঁছে দেখা গেল চোদ্দ জন। কি এই বি ডি আর? বাঁকুড়ার আজকের প্রজন্মের প্রায় কেউ জানেই না। বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে নামে একটা ন্যারো গেজের, কয়লার ইঞ্জিন এর রেল গাড়ি চলত তখন। পরে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় ওটা। আবার নতুন করে ব্রড গেজ লাইন হয়েছে কয়েক বছর হল। দিন দুই আগে ঐ লাইনে সরাসরি বাঁকুড়া থেকে মশাগ্রাম হয়ে হাওড়া ট্রেন চালু হয়েছে। আমরা শুধু ঐ প্রায় খেলনা গাড়ীতে চাপার আনন্দে রাত থাকতে ছুটেছি। দুটি স্টেশন গিয়ে বেলিয়াতোড়ে নামলাম। ওখান থেকে বাস ধরে দু তিন কিমি দূরে ধবনীতে নামলাম। ধবনীতে আমাদের ক্লাসের কেশবের গ্রামের বাড়ি। সকলে হৈ হৈ করে ওদের বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম। এখন ভাবলে অবাক হয়ে যাই। চোদ্দ জন কেন, চারজনও না জানিয়ে কারো বাড়ীতে ঢুকতে পারব না। বাড়ীতে কেশব ছিল না, ছিলেন ওর কাকা। কেশব বোধহয় সেদিন ধানবাদে ছিল। ওর কাকু আমাদের সাদরে ডেকে নিলেন। আমরা ভেবেছিলাম চা খেয়ে চলে আসব; কাকু কিন্তু আমাদের দুপুরে না খেয়ে আসতে দিলেন না। উনি বাস ধরে বাঁকুড়া চলে গেলেন। বাঁকুড়া থেকে মাছ কিনে ফিরলেন। আমরা চা মুড়ি খেয়ে মাঠের দিকে ঘুরতে গেলাম। মাঠের পাশে পলাশ গাছের ছায়ায় বসে গল্পগুজব করলাম। দুপুরে খেয়ে হোষ্টেল এ ফিরলাম।

আর একবার মহালয়ার ভোরে দল বেঁধে চললাম নদী দেখতে। হাসপাতাল এর পশ্চিমে তখন শুধুই ধানের ক্ষেত। এক মাইল মত দূরে দ্বারকেশ্বর নদী। আমরা রাত থাকতে চললাম মাঠের আল ধরে। আমাদের পরের ব্যাচের ঘোষাল এর হাতে ঝোলানো একটা প্রমাণ সাইজের রেডিও। রেডিওতে বাজছে মহালয়া। আমরা মিছিল করে যখন নদীর পাড়ে পৌঁছলাম তখন অন্ধকার। বর্ষার পর বলে নদীতে একটু জল ছিল। অন্ধকার ছিল বলেই আমি জামা প্যান্ট খুলে নদীতে নেমে একটা ডুব দিয়ে এলাম। ঘোষাল এর সেই ঢাউস সাইজের রেডিও কিন্তু তার আগের প্রজন্মের রেডিওগুলির প্রায় অর্ধেক ছিল। সেই রকম বিরাট একটা রেডিও ছিল, আমাদের মিত্রা মাসীর। মিত্রা মাসি ছিলেন আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একজন স্বাস্থ্যকর্মি। মিত্রা মাসি, বেলাদি, নিতাইদা, টিকাদাদু, কম্পাউন্ডার বাবু , সুধার মা সবাই আমাদের গ্রামের প্রতিবেশী। ওনারা সবাই কোয়ার্টারে থাকতেন। বন্যা হলে আমরা বাক্স প্যাটরা নিয়ে ওদের কোয়ার্টারে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। অবশ্য ডাক্তারবাবু ছাড়া সবারই একটি করে ঘরের ছোট ছোট কোয়ার্টার। এই মিত্রা মাসি আমার মাকে দিদি আর বাবাকে জামাইবাবু বলতেন সবদিন। পরে

জেনেছি , আমাদের বোধ হওয়ার আগেই কোন এক কালী ডাক্তার মাসিকে বিয়ে করার নামে প্রতারণা করেছিলেন। সেই সময় বাবা মাসির পাশে দাঁড়িয়ে প্রচুর লড়াই করেছিলেন, বিচারের আশায়। আমরা কোনদিন মাসিকে শাঁখা সিঁদুর পরতে দেখিনি। চাকরী করতে করতেই পঞ্চাশের উপর বয়সে মাসি একদিন হঠাৎ মারা গেছেন। এই মাসির কোয়ার্টারে আমার আর ছোট ভাইয়ের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ থাকত। আমরা সকাল থেকে গিয়ে মাসির কোয়ার্টারে বসে থাকতাম। মাসি কেরোসিন স্টোভ জ্বালিয়ে ডিমের ঝোল ভাত রান্না করতেন। সেই রান্নার লোভনীয় গন্ধ এখনও চোখ বন্ধ করে মনে করতে পারি। এখন অবশ্য " ডিম্ভাত" বলে একটা রাজনৈতিক পরিভাষা খুব বিখ্যাত হয়েছে। সেই তিন-চার বছর বয়সে মাসির কোয়ার্টারে নিমন্ত্রণ আমাদের কাছে একটা লোভনীয় ব্যাপার ছিল। সেই প্রায় প্রাচীন যুগে, দুই একবার মিত্রা মাসীর সেই ঢাউস রেডিও, মহালয়ার ভোরে আমাদের বাড়িতে বেজেছিল। আগের রাত্রে বড়দা ওটা ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছিল। সবাই ভোরে উঠে মহালয়া শোনা শুরু করতাম। কিন্তু অনেক বছর পর্যন্ত মাঝপথে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, সবটা শোনা হয়নি। আমার অতি শৈশবের সামান্য যে কয়েকটা স্মৃতি এখনও আছে তার অন্যতম সেই মিত্রা মাসীর বড় রেডিওতে মহালয়া শোনা। পরে আমাদের বাড়ীতে রেডিও এসেছে। আমি ডাক্তার হয়ে নিজে একটা রেডিও কিনেছি। বছর দশেক হল রেডিও খারাপ হয়ে বিদায় নিয়েছে। তার জায়গায় কম্পিউটার এ মহালয়া বেজেছে। এবার তো মোবাইলে , অনলাইনে সরাসরি আকাশবাণীর মহালয়া শোনা গেল। কিন্তু মহালয়া এলেই আমার মনে আসে মিত্রা মাসির সেই বিরাট কাঠের বাক্সের মত রেডিওটা। ৩.১০.২৪.

একটা পাথর

একটা পাথর কেমন করে দেবতা হয় , দেখিয়েছেন সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী মশাই। আমাদের প্রায় সব দেবতা আর মন্দির তো পাথরেরই তৈরী।

আদিম যুগে পাথরই মানুষের জীবন ধারনের হাতিয়ার ছিল। আবার এই পারমাণবিক অস্ত্রের যুগেও , হাজার হাজার মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল পাথর, ছুড়ে মারার জন্য। এই পাথরের আর এক রূপ দেখা যায় মানুষের হাতের আঙ্গুলে আঙ্গুলে। নানা রঙের সেসব পাথরের কাজ মারা নয়, বাঁচানো। একদল বলে , এই সব রঙিন পাথর নাকি মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচায়। আর একদল বলে , এই সব রঙীন পাথর পুরোটাই বুজরুকি।

পাথরের কত রূপই না দেখলাম। ভুগোলের বইতে পাথর নিয়ে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখা আছে। আমাদের মত আদার ব্যাপারীর অত শত নিয়ে ভাবার সময় কোথায়। বিজ্ঞানীদের মতে পাথর নিয়ে অনেক জ্ঞানের কথা আছে। আমি সাধারন মানুষ, ওসবের দিকে যেতে চাই না। পাথর নিয়ে আমার কয়েকটা অভিজ্ঞতার কথা বলি।

গলব্লাডার আর কিডনির পাথর আজকাল সবার জানা। আচ্ছা বলুন তো , গলব্লাডারে পাথর কি করে হয়?

ডাক্তারী বইতে এ নিয়ে সুন্দর একটা কথা আছে। এই গলষ্টোন হল মৃত ব্যাকটেরিয়ার সমাধী মন্দির। কোন এক সময় গলব্লাডারে জীবাণু সংক্রমণ হয়েছিল। সেই জীবাণু মারা যাওয়ার পর, তার মৃতদেহ ঘিরে কোলেস্টেরল জমতে থাকে, সেটাই পাথর হয়।

আমাদের প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক, ডা ডি কে রায় স্যার, পড়ানোর সময় এ নিয়ে মজা করতেন। স্যার বলতেন, একটা গলষ্টোন সব সময় পকেটে রাখবি।

স্ত্রী তাজমহল দেখানোর কথা বললেই , পকেট থেকে বের করে দেখাবি, এই হল মৃত ব্যাকটেরিয়ার তাজমহল।

এমনিতে এই গলষ্টোন খুব একটা বড় অসুখ নয়, একটা অপারেশন করলেই ঠিক হয়। কিন্তু খুব ছোট্ট একটা পাথর বেকায়দায় আটকে গেলে প্রাণঘাতী হতে পারে। আর এই ছোট্ট পাথরগুলিরই , পিত্ত থলি থেকে বেরিয়ে এসে , পিত্ত নালীতে আটকে মারাত্বক জটিলতা করার বিপদ থাকে। ওরা যত সময় পিত্ত থলির ভেতরে থাকে তেমন সমস্যা হয়না। স্থানচ্যুত হলেই বিপদ।

একই ভাবে কিডনির পাথরও স্থানচ্যুত হলেই সমস্যা বাড়ায়। হয়তো একটা একশ গ্রাম ওজনের পাথর কিডনীর ভেতরে বসে আছে, রুগী কিছুই বুঝবে না। কিন্তু একটা পাঁচ গ্রাম ওজনের পাথর নিচে নেমে এলে ভয়ংকর ব্যাথা হয়। এই দুরকম উদাহরনেই বুঝলাম, ‘ স্থান কাল পাত্রের’ গুরুত্ব কতোটা।

বছর কুড়ি আগে আমার দাঁতের গোড়া থেকে একটা পাথর বেরিয়ে গেল। দাঁতের ঐ জায়গাটা একেবারে ছুরির মত ধারালো হয়ে গেল। একটু জিভ নড়লেই কেটে যায়। নিজের হাসপাতালের দাঁতের ডাক্তারবাবুকে দেখালাম। যন্ত্র নেই, উনি কিছু করতে পারলেন না। এদিকে বিকেলেই মেদিনীপুরে যেতে হল। পরদিন , মেদিনীপুর শহরে আমার বন্ধু ডাক্তারের কাছে গেলাম। উনি মিনিট দশেক যন্ত্র দিয়ে ঘসে দাঁতের ধারালো জায়গাটা ঠিক করে দিলেন।

চোখের পাতার ভেতর দিকে একরকম পাথর হয়। চোখটা অবশ করে খুঁচিয়ে বের করতে হয়। অপারেশন বললে অনেকে ভয় পেয়ে যান, তাই ওটাকে অপারেশন না বলেও অনেক সময় কাজটা করতে হয়।

চোখের কথাই যখন এল , চোখে পাথর বা পাথরের চোখ নিয়ে কথাকটা বলেই নিই। পাথরের চোখ কি জানেন নিশ্চয়ই । এটা আসলে কোন চোখই নয়। কোন কারনে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেলে, চোখের জায়গায় , চোখের মত দেখতে একটা পাথরের কৃত্রিম চোখ বসিয়ে দেওয়া হয়। দেখতে ভালো লাগে । ঐ চোখ দিয়ে দেখা যায় না।

পাথর ছুঁড়ে মেরে কতো লোকের যে চোখ নষ্ট করা হয়েছে , সে মর্মান্তিক খবরগুলি আমরা চোখের ডাক্তাররা জানি। আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি । লোকাল ট্রেনের জানালার পাশে বসে যাচ্ছিলেন এক যুবক। আমি ঠিক তার পাশেই বসে। হঠাৎ ফট্ করে একটা শব্দ হল। দেখি আমার পাশের যুবক হাত দিয়ে নিজের বাম চোখটা চেপে ধরেছে। হাতের তলা দিয়ে, গাল বেয়ে রক্ত বেরচ্ছে। ওর কাছে রুমালও নেই। আমার কাছে চশমা মোছার একটা কাপড় ছিল, তাই দিয়ে চেপে ধরতে বললাম। দেখলাম , ওর চোখে লাগেনি, চোখের ঠিক নিচে কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। চোখে লাগেনি জেনে ও একটু আস্বস্ত হল। কাপড়টা দিয়ে একটু চেপে রাখতে বললাম।

পাথর না হলেও, একেবারে ঠিক চোখের নিচে, তুবড়ি ফেটে কেটে যাওয়া জায়গা সেলাই করতে গিয়ে, চামড়ার তলা থেকে তুবড়ির টুকরো বের করেছি।

পাথর তো আমদের জীবনের প্রায় সব জায়গার জরুরী হয়ে গেছে। বাড়ী তৈরীতে পাথর। এ নিয়েই একটা মোটা বই হয়ে যায়। রাস্তা তৈরীতে পাথর। পাথর ছাড়া রেল লাইন আমি দেখিনি।

বাড়ী তৈরির জন্য পাথর লাগে এ তো আমরা সবাই জানি; কিন্তু বাড়ী ভাঙ্গার পর যে পাথর পাওয়া যায় , তার একটা পুরনো স্মৃতি আমার দীর্ঘ দিনের। আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রথমে চলতো একটা টিনে ছাওয়া লম্বা পাকা বাড়িতে। পরে ছাদ ঢালা নতুন বাড়ী হলে , ঐ পুরনো বাড়ী ভেঙ্গে ফেলা হয়। আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ- পঞ্চাশ বছর আগে, একদিন সকালে , গ্রামের সব লোক শাবল ইত্যাদি নিয়ে বাড়িটা ভাঙ্গতে শুরু করল। ভাঙ্গা বাড়ীর মেঝে, দেওয়াল, যে যা বয়ে নিতে পারে, নিয়ে গেল। ঐ রকম একটা পাথর, আসলে সিমেন্ট বালির তৈরী একটা মেঝের অংশ, আমাদের পুকুর ঘাটে বহু বছর ছিল। আমরা ঐ পাথরের উপর সাবান দিয়ে, জামা কাপড় কাচতাম।

এই পর্যন্ত লেখার পর, করোনার জনতা কারফিউ ইত্যাদির জন্য আর লেখা নিয়ে বসতে পারিনি। ঘরে বসে থাকলেও লেখায় মন বসাতে পারিনি। কত কিছুই লেখার ছিল ; এখন মনে হচ্ছে লেখাটা শেষ করতে পারলে বাঁচি।

আসলে পাথরের বিচিত্র ব্যবহার নিয়ে শুধু একটা তালিকা তৈরী করলেও বিশাল আকার নেবে। মানব সভ্যতার প্রথম আবিস্কারও কিন্তু পাথর দিয়েই। পাথরে পাথর ঠুকেই প্রথম আগুন জ্বালানো হয়েছিল। আমার খুব ছোট বেলায়ও চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাতে দেখেছি।

কোলকাতার জাদুঘরে একটা বাটনা বাটা শিলের মত পাথর ছিল। একটা হাতলে চাপ দিলে পাথরটা বেঁকে যেত। বাটনা বাটা শিল আর নোড়া , এরাই বোধ হয় বাঙালীর সব থেকে বেশী ব্যবহার করা পাথর।

এই পাথর নিয়েই কী ভয়ানকর ভ্রান্ত ধারণা এখনও আছে ভাবা যায়না। আমি বছর দশেক আগেই জেনেছি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক গ্রামে, এক বিখ্যাত মিশনের হাসপাতালে, সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা হয় "বিষ পাথর" দিয়ে। যুক্তিবাদী সমিতি বহু ভাবে চেষ্টা করেছেন, এই মারাত্মক বুজরুকি বন্ধ করার। কি করে পারবেন? আমার এক শ্রদ্ধেয় আধিকারিক আমাকে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে বোঝাচ্ছিলেন, ঐ বিষ পাথর কি ভাবে কাজ করে। এই ক'মাস আগেই, উত্তরাখণ্ডের এক সাংসদ, প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, ওখানকার এক নদীর পাথর দিয়ে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করলে, নিশ্চিত ফল! এসব কথা উন্নত দেশে বললে, এদের পাগলা গারদে ঢুকিয়ে রাখবে।

এবার সত্যি কথাটা বলি। একটা পাথর নিয়ে বলতে গিয়ে , এতটা গৌরচন্দ্রিকা করলাম। আমার টেবিলে একটা কাগজ চাপা দেওয়ার পাথর আছে। ওটা রুদ্র প্রয়াগে বেড়াতে গিয়ে নদীর থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। বেড়ানোর জায়গার স্মৃতি হিসেবেই ওটাকে আনা।

স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই তো বহু যুগ থেকে পাথরকে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব এর শিলালিপি , শ্বেতপাথরের তাজমহল, কিংবা আমার গ্রামের পাকাঘাট। জ্ঞান হওয়া থেকেই দেখতাম, গ্রামের হাসপাতালের পাশের পুকুরে সুন্দর বাঁধানো ঘাট। গ্রামের সবাই বলতাম, পাকাঘাট। সেই ঘাটে ছোট মার্বেল পাথরে লেখা, স্বর্গিয় শশীভূষণ সামন্তর স্মৃতি রক্ষার্থে , তদীয় পুত্র পতিত পাবন সামন্ত কর্তৃক , সর্ব্বসাধারনের জন্য। সেই পতিতদাই স্বর্গত হয়েছেন বছর পনের হল। আগামী প্রজন্ম পতিতদাকেই চিনবে না।

আমাদের কৈশোরের ব্রজভূমী পাকাঘাট , এখনও আছে। বছর কুড়ি –পঁচিশ ওদিকে যাওয়া হয়নি। শেষ যখন দেখেছিলাম তখনই বেশ অযত্নে ছিল। শশীভূশণবাবুর সেই স্মৃতিফলক আজও আছে কিনা জানিনা। নাই বা থাকল; আমদের কৈশোরের স্বপ্নমাখা পাকাঘাট, স্মৃতিতেই থাক চির উজ্জল হয়ে। একটা ক্ষয়ে যাওয়া মার্বেল পাথরের খোঁজে আর নাই বা গেলাম।
( ২৮.৩.২০২০)

আরও ছুটি চাই

আজ সকাল সাড়ে সাতটার পর হঠাৎ করেই আমাদের হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে ভিড় জমে গেল। সাধারণত এই সময় এক দুজন করে রুগী আসে। আমাদের একজন হাউস স্টাফ বসে তাদের কথা শুনে , কাউকে ভর্তি করে বা বড় ডাক্তারদের কাছে পাঠায়। আমি রাতের ডিউটি সেরে ব্যাগ পত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলাম, পরের ডাক্তার এলেই বাড়ী রওনা দেব। এমন সময় একজন কর্মী এসে বলল, স্যার , ইমারজেন্সিতে খুব ভিড় জমে গেছে। বেরিয়ে গিয়ে দেখি, হাউস স্টাফ –এর সামনে কুড়ি বাইশ জন লোক দাঁড়িয়ে গেছে। এবার আমরা দুজনেই এক এক করে রুগীর সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখি, কুড়ি জনের মধ্যে দু তিন জন নতুন রুগী। বাকি সতের আঠারো জনই , আউটডোর -এর কাগজ দেখাচ্ছে। তারা দূর দূর থেকে এসেছে। এসে শুনছে, “আজ ছুটি”, আউট ডোর খুলবে না। আমাদেরই অনুরোধ করছে, কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতে। সত্যি কথা বলতে কি, নিজেকেই অপরাধী আর অসহায় লাগছিল। এই যে লোকগুলি একটা বড় হাসপাতালের আউটডোরে দেখাতে আসে, এদের কেউ কেউ হয়তো তিন মাস, ছয় মাস এমনকি এক বছর ধরে আসছে যাচ্ছে। আর যাদের অপারেশন -এর দরকার, তারা হয়তো বার চারেকের চেষ্টায়, সবকটা পরীক্ষা করিয়ে , আজ ভর্তির আশায় এসেছে।

আরও কত রকমের সমস্যা , যেগুলি আউটডোরে বসে সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষক চিকিৎসকেরাই দেখেন। এই সকল রুগীদের জন্য আমাদের মত ডাক্তার দু' একজন হাসপাতালের ইমার্জেন্সীতে বসে , " সোমবার আসুন" বলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না। একজন রুগীর কাগপত্রগুলো দেখে বুঝলাম , তাকে সম্ভবত আমার থেকেও বেশী অভিজ্ঞ কোন ডাক্তাবাবু কয়েকবার দেখেছেন। কাকদ্বীপ থেকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন , হার্টের কিছু আধুনিক পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আজ হার্টের আউটডোর বন্ধ, আর একদিন আসতে হবে, এই মর্মান্তিক সংবাদটি শুনতে এই রুগীর বাড়ীর লোকের কেমন লাগছে , বুঝতেই পারছিলাম। আমার পাশে বসে আমাদের হাউসস্টাফ এই কথা যখন বলছে, তখন আমি সম্ভবত একজন হাতের প্লাস্টার কাটাতে আসা রুগীর বাড়ীর লোকের সাথে কথা বলছিলাম। আমাদের সামনে তখনো দশ -পনের জন লোক দাঁড়িয়ে ধাক্কা ধাক্কি করছে। তাদের পিছনে একটি বাচ্চাকে মায়ের কোলে বসে , চিৎকার করে কাঁদতে দেখলাম। এই বাচ্চার দু' হাতেই বড় বড় ফোস্কা পড়ে আছে, পোড়া রুগী, দশ ফুট দূরের থেকেই দেখতে পাচ্ছি। চিৎকার করে , বাচ্চার বাড়ীর লোককে সামনে আসতে বললাম। বাচ্চাকে নাম লিখে, টিকিট দিয়ে , সার্জিক্যাল বিভাগে পাঠানোর সময় আমার মন পড়ে আছে, সেই কাকদ্বীপ থেকে আসা হার্টের রুগীর দিকে। অন্য বাড়ীর পাঁচ তলায় অবস্থিত হার্টের বিভাগে, ওদের ইমার্জেন্সী দেখার জন্য একজন থাকেন; হাউস স্টাফকে বললাম, একে একটা ইমার্জেন্সী টিকিট দিয়ে একবার পাঁচ তলায় পাঠাও। আমাদের হিসেবে যাকে ইমার্জেন্সী বলে, এই রুগী এরকম নয়, না বোঝার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, অনেক সময় , ঐ রকম চার তলা পাঁচ তলায় বসে থাকা, আমার থেকে তিরিশ পঁয়তিরিশ বছরের ছোট ডাক্তারও ফোনে, কিংবা নেমে এসে রীতিমত ধমক দেওয়ার চেষ্টা করে, কেন এসব রুগীকে পাঠিয়েছি, জানতে চায়!

এই হল একটা ছুটির দিনে সকাল সাড়ে সাতটার পর মিনিট চল্লিশ -এর সামান্য একটু অংশ। আমার পরে ডিউটিতে এলেন যে লেডি ডাক্তার, তিনি তিন মাস পর অবসর নেবেন; অর্থাৎ তার বয়স চৌষট্টি বছর নয় মাস। আমি জানি, ছুটির দিনে বেলা প্রায় একটা দেড়টা পর্যন্ত আউটডোরে দেখাতে আসা রুগীদের চার আনাও যদি একবার করে ইমারজেন্সি ঘুরে যায়, ঐ ম্যাডাম আর এক হাউস স্টাফ তাদের প্রত্যেকের সাথে আধ মিনিট করে কথা বললেও, মাঝে মাঝেই তিরিশ চল্লিশ জনের ভিড় জমে যাবে। প্রতি রবিবার সকালে, এর অর্ধেক ভিড় জমে। এই কুড়ি থেকে তিরিশ জনের সাথে কম করে দু'জন করে বাড়ীর লোক থাকেই। অর্থাৎ সব সময় পঞ্চাশ থেকে সত্তর জন লোকের জমায়েত। এর মধ্যেও অতি সংকটজনক রুগী থাকে। সামনে ভিড় করে থাকা পঞ্চাশ জনকে পেরিয়ে , ডাক্তারের কাছে গিয়ে , আমার রুগীকে একটু দেখুন বলবার আগেই অনেক সময় রুগী মারাই যায়।

এসব কিন্তু রুগী বা রোগ নিয়ে কথা। এর বাইরে কত বিচিত্র রকমের কাজ ঐ হাসপতালের ইমারজেন্সির ডাক্তারদের করতে হয় , লিখতে গেলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে। আমার প্রয়াত বন্ধু ডা ভোলানাথ রায় এসব কাজকে বলতেন , পঞ্চায়েতী কাজ। ছুটির দিনে হাসপাতালের আপিস বন্ধ থাকে, তাই পঞ্চায়েতী কাজ আরও বেড়ে যায়। বারো মাস , তিনশ পঁয়ষট্টি দিন , মারামারি করে সরকারী হাসপাতালের কাগজ নিতে আসা লোকের অভাব হয় না। চিকিৎসার দরকার নেই, রিপোর্টটা লিখে দিন, আগে থানায় যাই; এমন লোকই বেশী । যে যে ছুটির আগের সন্ধ্যায় মদের দোকানে লম্বা লাইন পড়ে, সেই সেই ছুটিতে হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে পঞ্চায়েতী কাজও বেড়ে যায়।

এত কিছু একটা ছুটির দিন নিয়ে লিখছি কেন? আর হাসপাতাল ছাড়া আর কোথাও কি ছুটি থাকে না? ছুটি আসলে হাসপাতালে থাকেই না প্রায়। দুর্গা পূজার মহাষ্টমী, বড়দিন, ঈদ এরকম মোট সাত কি আট দিন হাসপাতালের আউটডোর বন্ধ থাকে। বাকি সরকারি ছুটির দিনে হাসপাতালের আপিস বন্ধ থাকে, অর্থাৎ ডাক্তারকে পঞ্চায়েতী বেশী করতে হয়। "ডাক্তার তো সরকারের পয়সায় তৈরী, লাখ লাখ টাকা রোজগার করে , মাঝে মাঝে বেশী কাজ করতে হলে করবে"। এই তো শতকরা নিরানব্বই জন লোকের বক্তব্য। আমি কিন্তু ছুটি থাকলে ডাক্তারদের কি কি অসুবিধা হয় সেকথা লিখতে বসিনি। আমি টেবিলের উলটো দিক বা জানালার বাইরে থেকে লোকগুলি কি ভাবে, কি অবস্থায় পড়ে, বা কি রকম হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়, সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি। আমি নিজে হাসপতালে কাজ করি, তাই হাসপতালের খবরটা ভালো জানি। কিন্তু ছুটি থাকলে সাধারণ জনগনের ঠিক কতোটা সুবিধা হয় আর অসুবিধাই বা কতোটা সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি। সরকারি আপিস আর স্কুল কলেজ ছুটি থাকলে কার কি সুবিধা অসুবিধা হয়? পূজার ছুটি বললে আমরা দুর্গা পূজার ছুটিই বুঝি। খেয়াল করে দেখেছেন কি, সরকারী আপিসে পূজার ছুটি আসছে আসছে করেই কতোদিন আগে থেকেই কাজ কর্ম সব আটকে

থাকে? তারপর মহালয়া থেকেই দুর্গা পূজা শুরু হওয়ার মত , সরকারী ভাবেই পূজার ছুটি ক্রমশ বাড়ছে আর বাড়ছে। পূজার ছুটি বাদেও সরকারী আপিসগুলিতে বছরে বাহান্নটা রবিবার ছাড়াও আরও কতগুলি ছুটির দিন থাকে, গুনে দেখেছেন?

রবিবার সকাল বা যে কোন সরকারী ছুটির দিনে শহরতলীর রেল গাড়ীতে চেপে দেখেছেন কোনদিন? রেলের ঘোষিত নিয়ম অনুযায়ী রবিবার আর সরকারী ছুটির দিন অনেক শহরতলীর লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকে। আমি গত কুড়ি বছর ধরে শহরতলীর লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করছি। একটা ট্রেন বাতিল থাকলেই পরের ট্রেনে ওঠাই মুস্কিল।

ছুটির দরকার সবার আছে। ডাক্তার, পুলিশ, বাস ট্রেনের ড্রাইভার কন্ডাকটর , এরা সবাই যদি আপনার মত ছুটির দিনে কাজে না যায়, কি অবস্থাটা হবে কখনো ভেবে দেখেছেন? দিন দিন কর্মীর সংখ্যা কমছে, জনসংখ্যা বাড়ছে। কয়েক বছর ধরে নতুন জিনিস দেখা যাচ্ছে। অতি সামান্য প্রথা বা পূজা পার্বনেও ছুটি ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে মহাত্মা, মহানায়কের কোন অভাব কোনদিন ছিল না। নতুন একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে; ঐ সব মহান মানুষগুলির জন্মদিনে তাদের সম্মান দেখাতে ছুটি ঘোষণা। কোন মহান মানুষ, কাজ না করে শুধু ছুটি উপভোগ করে দেশের উন্নতি হয়, এমন কথা বলে গেছেন কি?

# দয়াল বন্ধুর মন্দির দর্শন

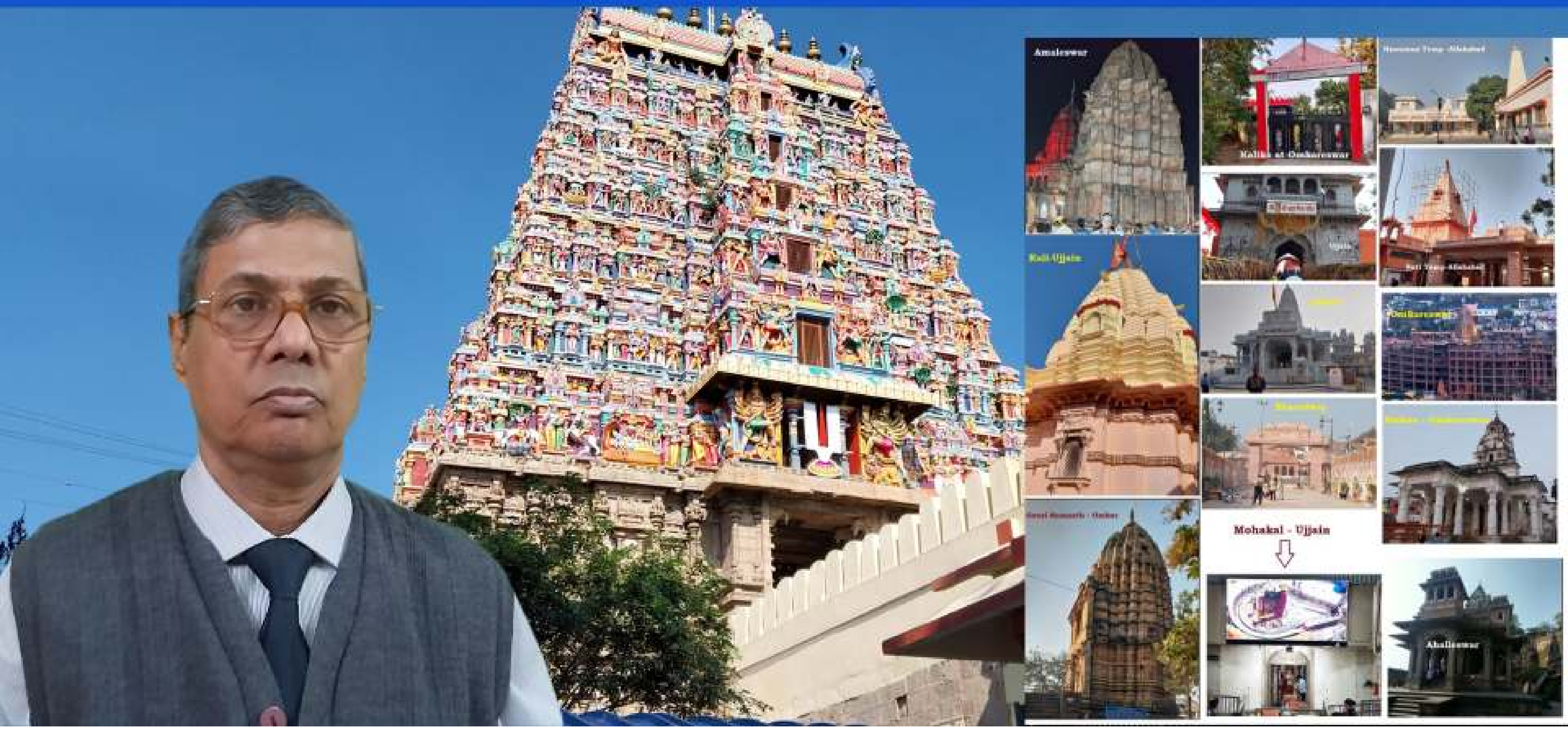

মন্দির দর্শন

পঁয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত চাকরী করে গত বছর অবসর নিয়েছি। এই এক বছরে দেশের মধ্যে গোটা আটেক ট্যুর বা ভ্রমণ হল। এই বিশাল দেশে এরকম বেড়ানোর জায়গা কয়েক হাজার আছে। মোটামুটি প্রচলিত জায়গাগুলি দেখতে হলেও, আমার আরও বছর কুড়ি লাগবে। আর স্বাভাবিক নিয়মেই ঐ বয়স পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানোর মত সুস্থ শরীর থাকার কথা নয়। তারপর তো কথা হচ্ছে, ঐ পঁচাশি বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচেই থাকবো না হয়তো। তাই , আপাতত বছরে আট দশবার ভ্রমণে বেরোব, এরকমই চিন্তা করে রেখেছি।

গত এক বছর তো শুধু নয়, আগেও বহু জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি। বেড়ানোর জায়গা বললে, পাহাড়, সমূদ্র, জঙ্গল আর মন্দির এই চার রকমের বলা যায়। বাঙালির সহজ পাহাড় হল দার্জিলিং । সে তো অনেকদিন আগেই দেখেছি। এছাড়া সিকিমের পাহাড়ও ঘোরা হয়েছে। মধ্য ভারতের কিছু পাহাড় আর পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় ঘুরেছি। আজ মনে হল, মন্দির কি কি দেখা হল তার একটা হিসেব করে দেখি।

আজন্ম দেখে আসছি আমাদের গ্রামের মন্দির। মেদিনীপুরের ত্রিলোচনপুর গ্রামের শীতলা মন্দির। প্রতিদিনই পূজা হয়। শনি মঙ্গলবার বড় তিথি। ছোটবেলায় দেখেছি, এক এক শনিবারে চার-ছয়টা পাঁঠা বলি হয়েছে। দোলের সাতদিনের মাথায় বিরাট উৎসব হয়।

তালন্দ মাতা মন্দির

ছোট বেলায় কলকাতায় বেড়াতে এসে মানিকতলার কাছে পরেশনাথের মন্দির দেখতে গেছলাম। গত কুড়ি পঁচিশ বছরের মধ্যে কাউকে আর সেই মন্দিরে বেড়াতে যেতে দেখিনি। কলেজে পড়ার সময় বাঁকুড়া থেকে বিষ্ণুপুর গিয়ে ওখানকার টেরাকোটার মন্দিরগুলি দেখেছি। জানতাম ওগুলি বেশ বিখ্যাত; কিন্তু আমার তেমন বিরাট কিছু মনে হয়নি। ওখানে কোন টেরাকোটার মন্দিরে কোন বিগ্রহ দেখিনি। কলেজ থেকে দিল্লিতে পরীক্ষা দিতে গিয়ে সেখান থেকে একবার হরিদ্বার হৃষিকেশ ঘুরে এসেছিলাম। ভোরবেলা হৃষিকেশ পৌঁছে একজন গাইডের পিছন পিছন ঘুরেছিলাম। সেরকম কোন মনে রাখার মতো মন্দির দেখিনি। গঙ্গা নদী আর তার উপরে

লছমনঝুলা ব্রীজ কিছুটা দেখার মত মনে হয়েছিল। হরিদ্বারে কোন মন্দিরেই সেবার যাওয়া হয় নি। পরে একবার সপরিবারে হরিদ্বারে গিয়ে অনেক মন্দির আর আশ্রম দেখেছিলাম।

বাংলার এক বিখ্যাত শিব মন্দির দেখেছিলাম আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। এক চোখের অপারেশন শিবিরে থেকে গেলাম দিন পাঁচেকের জন্য। বিকেলের দিকে তেমন কোন কাজ থাকত না। আর একটি ছেলে জুটে গেল। দু'জনে চলে গেলাম তারকেশ্বর মন্দির দেখতে। খুবই সাদামাটা একটি মন্দির। আমাদের গ্রামের মন্দির ওর থেকে বড় হবে। যাত্রী আমরা দুই জনই। সাধারণ একটি শিব লিংগ দেখে বিশেষ কিছু মনে হয়নি। ঐ রকম আর এক শিবিরে গিয়ে দেখলাম, নদিয়া জেলার শিবনিবাসের মন্দির। এত বড় শিবলিঙ্গ আর কোথাও দেখিনি।

সবাই পুরী যায়, জগন্নাথ মন্দির দেখতে। আমরাও সপরিবারে গেলাম একবার। সন্ধ্যা বেলা একজন লোক মন্দিরের গা বেয়ে উঠে, মন্দিরের চূড়ায় পতাকা পাল্টে দিল। তেমন দর্শক কিছু ছিল না। পরদিন সকালে পাণ্ডার সাথে পূজা দিতে গিয়ে দেখলাম, বেশ ভিড়। একদিন সকলে একটা গাড়ী নিয়ে চললাম ভুবনেশ্বর শহর দেখতে। সেখানে কালো পাথরের লিঙ্গরাজ মন্দির দেখলাম। তার অন্তত কুড়ি বছর পর আবার গেলাম ভুবনেশ্বর। সন্ধ্যাটা খালি ছিল। একটি সরকারী গাড়ী পেয়েছিলাম। সাথের ছেলেটি বলল, চলুন লিঙ্গরাজ মন্দির দেখে আসবেন। তাকে বললাম, ও মন্দির আমি দেখেছি, তার চেয়ে বরং চল অচ্যুত সামন্ত বাবুর ইউনিভার্সিটি দেখে আসি। যারা ভুবনেশ্বর যাবেন; সুযোগ পেলে এটি দেখে আসবেন। সেবারই পুরী থেকে কোনারকে গিয়ে বিখ্যাত সূর্য মন্দির দেখেছিলাম।

ধৌলগিরী মন্দির

কোনারক মন্দির

বেশ প্রাচীন মন্দির, আর বেশ বড়। আর দেখেছিলাম একটি শ্বেত শুভ্র বুদ্ধ মন্দির; ধৌলাগিরি বা ধবল গিরি মন্দির। বিশাখাপত্তনম বেড়াতে গিয়ে শহরের বাইরে, পাহাড়ের উপর একটা বড় মন্দির দেখতে গেলাম। আগে ঐ মন্দিরের নাম শুনিনি। ওখানে গিয়ে জানলাম, সিমাচলম মন্দির। মন্দিরে ঢোকার স্টিলের বেড়া ইত্যাদী দেখে বুঝলাম, এক এক সময় বেশ ভিড় হয়। আমরা কিন্তু বেশ ফাঁকায় ফাঁকায় দেখে এলাম। অনেক বছর আগে দিল্লী বেড়াতে গিয়ে দেখেছিলাম, লোটাস টেম্পল। পরে কয়েকবার দিল্লি গেলেও মন্দির দেখার মত সময় ছিল না।

সিমাচলমের নৃসিঙ্ঘ মন্দির

সাপের কামড় নিয়ে কাজ করা শুরু করার পর গোটা রাজ্যেই ঘুরে বেড়িয়েছি। কয়েকটা জেলায় গিয়ে সেখানকার বিখ্যাত মন্দিরও দেখেছি। প্রথমবার কুচবিহারে গিয়ে দেখলাম, মদনমোহন মন্দির। বেশ বিখ্যাত কিন্তু মন্দির তেমন দর্শনীয় নয়। ওখান থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার রাস্তায় পড়ে একটি বিখ্যাত শিব মন্দির; বানেশ্বর। নেমে মিনিট দশেক সময় থাকলাম। খুবই সাধারণ মন্দির। মন্দিরের পুকুরে বেশ কিছু বড় বড় কচ্ছপ আছে। লোকজন ঘাটের কাছে গেলে ওরা

মদনমোহন মন্দির

এগিয়ে আসে। পরে একবার তুফানগঞ্জে গিয়ে একটি স্থানীয় ছেলের সাথে গেলাম, চেংমারী বর্ডার দেখতে। একজন সৈনিকের সাথে, কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে অন্য পারে গেলাম; এটাই বেশ রোমাঞ্চকর। বেড়ার ঐ পারে আছে একটি মনসা মন্দির; ওরা বলল, চাঁদ সওদাগরের  মন্দির। নতুন মন্দির, দেখলেই বুঝতে পারা যায়। পূজাপাঠ কিছু হয় বলে মনে হল না।

মনসা মন্দির

এই সাপের কামড় এর কাজ করতে গিয়েই দেখা হল, বর্ধমানের একশ আট শিব মন্দির। মন্দিরগুলি খুব একটা বড় নয়, কিন্তু একটা বড় ঝিলের চার পাড়ে সুন্দর করে সাজানো। এখনও সবকটি মন্দিরে পূজা হয়।

এছাড়া বর্ধমান শহরের মধ্যে বুড়ো শিবের মন্দির আছে। আর বোধহয় একটি সর্বমঙ্গলা মন্দিরও দেখেছি। এরকম একশ আট বা ঐ রকম অনেক অনেক শিবের মন্দির আছে বর্ধমানের কালনায়। সাপের ক্লাশ নিতে কালনা গেলেও সেই সব মন্দির দেখা হয়নি। কাটোয়া শহরেও বার দুই যেতে হয়েছে , এরকম সাপের কামড় এর ক্লাশ নিতে। একবার একদল শিক্ষকের সাথে গেলাম , কাটোয়া থেকে একটু ভেতরে সিঙ্গি গ্রামে। এই গ্রামে জন্মেছিলেন কবি কাশীরাম দাস। একটি সাধারণ আবক্ষ মূর্তি ছাড়া আর কিছু নেই। ওর পাশের গ্রাম শ্রীপুরে বেশ কয়েকটি পুরনো মন্দির আছে। মন্দিরের গায়ের টেরাকোটার কাজ এখনও দেখা যায়। এই বাংলার মন্দিরের শহর বলা যায় নবদ্বীপকে। অনেক ছোট ছোট মন্দির, তার থেকেও বেশি আশ্রম আছে। স্টেশনে নেমে

একটা রিক্সা নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম, অনেক মঠ মন্দির। নৌকায় গঙ্গা পেরিয়ে অন্য পারে মায়াপুর। এখানে তো অসংখ্য মন্দির। সবথেকে বিখ্যাত ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দির। এই মন্দিরটি কিন্তু একটি একতলা নাট মন্দির মত ছিল। সে সময় ওখানে সবথেকে বড় মন্দির ছিল প্রভুপাদ সমাধী মন্দির। পরে একটি বিশাল বড় মন্দির তৈরি হচ্ছে দেখেছিলাম; এখনও নির্মাণ সম্পূর্ন হয়েছে কি না জানি না।

নবদ্বীপ সমাজবাড়ী

নবদ্বীপের কয়েক ষ্টেশন পরে পূর্বস্থলী। ওখানে নেমে অটো রিক্সা নিয়ে চুপী গেলাম। চুপিতে নৌকা করে মজা ভাগীরথীর খাঁড়িতে ঘুরলাম। দুপুরে স্টেশনের অন্য পারে নিয়ে গেল টোটো। বেশ কিছুটা বাগান গাছপালার ভেতর দিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম একটি আশ্রমের গেটে। নাম দেখলাম, কপিল কুটির। বেশ বড় আশ্রম।

কপিল কুটির

পরে ইউটিউবে এরকম বহু মঠ আশ্রমের খবর দেখেছি; কোথাও যাওয়া হয়নি।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের উপন্যাস পড়ে জেনেছিলাম, বহরমপুরে শহরের একটু বাইরে একটি বিখ্যাত কালী মন্দির আছে। পরে ওখানকার এক পরিচিত ডাক্তারের কাছে জানলাম, ওটার নাম বিষ্ণুপুর কালীবাড়ি। নরেন ক্ষ্যাপা নামের এক বড় সাধক ওখানে থাকতেন। এক ডাক্তার দাদার গাড়ী করে গিয়ে একবার দেখে এলাম।

বিষনুপুর কালীবাড়ী

সাপের কামড় এর কাজ করতেই প্রথম আসামে গেলাম। দুপুরে কাজ সেরে গৌহাটি এয়ারপোর্টে ফেরার রাস্তায় দেখে এলাম বিখ্যাত কামাখ্যা মন্দির। সেদিন মন্দির চত্বরে দুই চারজনের বেশী লোক দেখিনি। কিন্তু কয়েক বছর পর একটি বড় দলের সাথে গিয়ে দেখি বিশাল ভিড়। আমাদের দলের সকলে ভোরে লাইনে দাঁড়িয়ে বিকেলের পরে পূজা দিয়ে ফিরেছিল। আমি লাইন ছেড়ে একা একাই ভুবনেশ্বরী মন্দির আর উমানন্দ দেখে এসেছি। এবারই সন্ধ্যায় বশিষ্ঠ আশ্রম আর দুই একটা নতুন মন্দিরও দেখেছিলাম।

সাগরের কপিল মুনি মন্দির

কামাক্ষা মন্দির

ভুবনেশ্বরী মন্দির

ঐ দলের সাথেই কাজিরাঙ্গা যাওয়ার সময় মাঝপথে একটা বিশাল শিব লিঙ্গের মত দেখতে মন্দির দেখে গেলাম। নাম বলল, মহা মৃত্যুঞ্জয় jমন্দির। শিলং শহরের যে পাড়ায় আমরা দুই রাত ছিলাম, সেখানেও একটা কালী মন্দির ছিল।

সাপের কামড় নিয়ে একটা কর্মশালায় যোগ দিতে ভেলোরের বিখ্যাত মেডিক্যাল কলেজে গেলাম। ওদের কলেজ থেকে হাস্পাতাল পাঁচ কিমি মত দূরে। এক বিকেলে আমরা পাঁচজন একটা গাড়ী নিয়ে ওদের হাস্পাতাল দেখতে চললাম। গাড়ীতে উঠে একজন বললেন, ভেলোরের স্বর্ণ মন্দির বিখ্যাত, চলুন ওটা দেখে যাই। দুপুর তিনটে নাগাদ পৌঁছলাম। মাথাপিছু আড়াইশ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। একটা বিশাল বড় প্রান্তরের চারদিকে প্রায় এক কিমি হেঁটে মন্দিরের সামনে পৌঁছলাম। পিতলের বিষ্ণু মূর্তি মনে হল। কিন্তু বেরোনোর রাস্তার পাশে একজন সৌম্য দর্শন মনুষের ছবি বিক্রী হচ্ছে দেখলাম। পুরুষ মানুষ, কিন্তু কি যেন একটা আম্মা বলে নাম, এটুকু মনে আছে।

প্রথমবার মধ্যপ্রদেশ বেড়াতে গিয়ে জব্বলপুরকে কেন্দ্র করে ঘুরেছিলাম। ওখানকার নর্মদা নদীর ধুঁয়াধারা জলপ্রপাত দেখতে যাওয়ার সময় আমাদের ড্রাইভার বড় রাস্তা ছেড়ে ছোলা গমের মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা দিয়ে কয়েক কিমি ঢুকে একটি দেবী মন্দিরে নিয়ে গেল। সাধারণ মন্দির, কিন্তু বেড়ার গায়ে গায়ে হাজার হাজার নারকেল বাঁধা অবস্থায় আছে দেখেছিলাম।

ত্রিপুর মন্দির

জলপ্রপাত দেখে বিখ্যাত মার্বেল রকের দিকে যাওয়ার সময় একটা টিলার নিচে থেকে ড্রাইভার বলল, উপরে চৌষট্টি যোগিনী মন্দির আছে, উঠে দেখে আসতে পার। আমরা উঠিনি। জব্বলপুর থেকে বান্ধবগড় দেখে আমরা চলে গেছলাম, অমরকন্টক । অমরকন্টক এর নর্মদা উদগম মন্দির দেখলাম। মন্দিরের থেকে একশ মিটার দূরে কর্ন মন্দির। লাল রঙের বেশ পুরনো কয়েকটা মন্দির। এখন খুব যত্নে বাগান দিয়ে সাজানো। তপোভূমি নর্মদা বইতে ঘোষাল মশাই লিখেছেন, সে সময় ঐ মন্দির জঙ্গলে ঘেরা ছিল।

নর্মদা মন্দির সাদা

এ ছাড়া পাহাড়ের একেবারে মাথায় দেখলাম একটি বিশাল জৈন মন্দির। বিশাল মার্বেল পাথরের তৈরি মন্দিরটি তখনও অসম্পূর্ণ। ফেরার পথে আমাদের গাড়ী আরও গোটা দুই শিব মন্দির ঘুরিয়ে পেনড্রা রোড স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। ঐ শিব মন্দির দুটির একটিতে প্রায় বারো ফুট উচু শিব লিঙ্গের মাথায় জল দেওয়ার জন্য সিঁড়ি করা আছে। ছবি খুঁজে বের করতে গিয়ে দেখি এই শিবের নাম , মহাকালেশ্বর। এই ক'মাস আগে উজ্জয়নি বেড়াতে গিয়ে জানলাম, সেখানকার বিখ্যাত শিবের নাম , মহাকাল।

মহাকালেশ্বর

উজ্জয়িনী তো শুধুই মন্দিরে ঠাসা। একটা আটো নিয়ে এক বেলা ঘুরে ঘুরে পাঁচ সাতটা মন্দির দেখলাম। উজ্জয়িনী, ইন্দোর , ওমকারেশ্বর আর প্রয়াগরাজ ভ্রমণের কথা আগে বিস্তৃত লিখেছি। ইন্দোর শহরের মধ্যে বিরাট অন্নপূর্ণা মন্দির দেখলেও জৈনদের কাঁচ মন্দির খোলা পাইনি। ওমকারেশর এর দুটি বিখ্যাত শিব মন্দির তো দেখলাম। পরদিন সকালে দ্বীপ পরিক্রমা করতে করতে আরও গোটা চার -পাঁচ মন্দির দেখলাম, বাইরে থেকে; সবকটি মন্দিরে ঢুকে দেখা হল না। মহেশ্বরে রাণী অহল্যা বাই এর নিজের পূজার ঘর দেখলাম। সেখানে সোনার সিংহাসনে শিব লিংগ।

অহল্যাবাই এর পুজার ঘর

এছাড়া দুর্গের মধ্যে বিরাট শিব মন্দির ছাড়াও আরও দুটি মন্দির দেখেছি। আমরা যখন প্রয়াগরাজ হয়ে ফিরি সেই সময় সরকারী ভাবে কুম্ভ মেলা শুরু হয়েছে। তার দিন সাতেক আগে প্রধান মন্ত্রী মেলার উদ্বোধন করে গেছেন। আমাদের অবশ্য মেলা নিয়ে সেরকম উৎসাহ ছিল না। আমরা এলাহাবাদ শহরটি ঘুরে দেখতে চেয়েছিলাম। স্টেশন থেকে একটি গাড়ী নিয়ে, শহর দেখতে চাই বলেছিলাম। প্রথমেই আমাদের নিয়ে গেল হনুমান মন্দিরে। বিরাট চত্বরের মধ্যে মন্দির। মন্দির বললে আমরা যেমন বুঝি সেরকম দেখতে নয়। বিশাল নাট মন্দিরের মত। সেখান থেকে গেলাম ভরদ্বাজ আশ্রম। পুরনো আশ্রমের কোন চিহ্নই নেই; শহরের মধ্যে ঝকঝকে মার্বেল পাথরের কয়েকটা ছোট ছোট মন্দির। শহরের মধ্যে সতী মন্দিরটি কিছুটা পুরনো মনে হল। সঙ্গমে স্নান করে ফেরার সময় " শোয়ানো হনুমানের মন্দির" দেখার কথা ছিল; রাস্তা বন্ধ থাকায় দেখা হয়নি।

২০২৪ সালেই একবার বেরিয়ে নৈনিতালের দিকে কয়েকটা জায়গা ঘুরে এলাম। জুন মাসের মাঝামাঝি ওদিকে প্রচণ্ড গরম থাকে, জানা ছিল না। ভীম তাল থেকে রানিক্ষেতের দিকে যাওয়ার পথে পড়ে ওদিককার বিখ্যাত নিব করোরি বাবার কাঁইচি ধাম। ঐ সময় মেলা চলছিল। আমরা জ্যামে আটকা পড়ে গেলাম। তিন চার কিমি রাস্তা পেরোতে ঘন্টা দুই লাগল। ভিড় দেখে আর আশ্রমে ঢোকার চেষ্টা করলাম না। রানিক্ষেতে পৌঁছে প্রথমে গেলাম , ঝুলা দেবী মন্দিরে। মন্দির সাধারণ। সেরকম যাত্রী ও ছিল না। যেটা দেখার মত সেটা হল, বেড়ার গায়ে গায়ে হাজার হাজার পিতলের ঘন্টা ঝোলানো।

ঘন্টার দোকানে বাবার ছবি

দুদিন পর এর প্রায় দশগুণ ঘন্টা দেখলাম, চিতোই গোলু দেবতার মন্দিরে। রাণীক্ষেতে আরও গোটা দুই ছোট ছোট মন্দির দেখেছি। এই চিতোই গোলু দেবতা ঠিক কোন ঠাকুর বোঝা গেল না। খুবই সাধারণ একটি মন্দির। কিন্তু গোটা চত্বর জুড়ে লাখ খানেক ঘন্টা ঝুলছে। ঘন্টার সাথে নিজের নিজের মনোবাসনা লিখে একটি করে চিরকুট। মন্দিরে ঢোকার আগেই রাস্তার পাশে ডালার দোকানের মত শুধুই ঘন্টা বিক্রীর দোকান। বিনসার থেকে কাসার দেবী আসার রাস্তায় আর একটি গোলু দেবতার মন্দিরে ঢুকে দেখে এলাম। যাত্রী প্রায় নেই।

কাসার দেবী মন্দির

কাসার দেবী খুব বিখ্যাত জায়গা। একটি ছোট পাহাড়ের উপর ছোট্ট মন্দির। মূর্তি বেশ ছোট। মন্দিরও বেশ ছোট। ঐ পাহাড়ের নাকি বিরাট কি সব মাহাত্ম আছে। কি সব মহাজাগতিক রশ্মির সমাবেশ হয় ওখানে। ঐ পাহাড়ের উপরে একটি ছোট্ট খোঁদলের মত গুহায় বসে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যান করেছিলেন। বাঙালি ছাড়া আর

কেউ ওদিক দেখতে যায় বলে মনে হল না। ঐ পাহাড়ের উপর একটি সারদা মঠ আর একটি বৌদ্ধ মনাস্ট্রিও দেখলাম। নৈনিতালের লেকের পাড়ে নয়না দেবী মন্দিরে সবাই পূজা দিচ্ছে দেখলাম। পরদিন সকালে ঘুরতে বেরিয়ে গুরুদ্বোয়ারায় ঢুকলাম। ওখানে ঢোকার সময় মাথায় একটি ফেটটি বেঁধে ঢুকতে হল। এটাই আমাদের প্রথম শিখ ধর্মের মন্দিরে ঢোকার অভিজ্ঞতা। আর মুসলিম মাজারে ঢুকেছিলাম, মুম্বই এর হাজী আলী দরগায়। সমুদ্রের মাঝে সমাধী মন্দির।

পাহাড়ের এক বিখ্যাত সমাধী মন্দির আছে সিকিমে। সে হল বাবা মন্দির। প্রয়াত সৈনিক বাবা হরভজন সিং এর স্মৃতি মন্দিরে ঢুকে দেখে এসেছি। সেদিন বরফ ছিল না, কিন্তু রাস্তা কালো মেঘে ঢেকে গেল। আমার জীবনের সবথেকে পুরনো যে সমাধী মন্দির দেখার কথা মনে পড়ে সেটা আমাদের গ্রামের বাড়ীর পুরোহিত চন্ডি বাবুর সমাধী। ওনাকে আমি চোখে দেখিনি। ওনার সেই ছোট্ট সমাধী মন্দির আমাদের স্কুলে যাওয়ার পথের পাশে দেখতাম। সিমেন্টের সেই মন্দির কি করে একেবারে উধাও হয়ে গেছে জানিনা। শেষ বোধহয় দেখেছি পঞ্চাশ বছর আগে।

বাবা হরভজন সিং

এই মাস দুই আগেই ঘুরে এলাম দক্ষিণ ভারতের কয়েকটা বিখ্যাত জায়গা। তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত আগেই লিখেছি। একবছর আগে আর একবার কোঝিকোর শহরে গেছলাম। সেবারও শুনিনি যে ঐ শহরে থালি মন্দির নামে একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। ওখান থেকে একদিনেই গিয়ে দেখে আসা যায় বিখ্যাত গুরুভায়ুর মন্দির। কিন্তু মন্দির দেখার আগ্রহ ছিল না। একইভাবে সেবার ত্রীবান্দ্রম হয়ে ফিরলেও ঐ শহরের অতি বিখ্যাত পদ্মনাভস্বামী মন্দির দেখার কোন উৎসাহ ছিল না। এবার হঠাৎ করেই, সকালে হাঁটতে বেরিয়ে থালি মন্দির দেখে এলাম। মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখা বা পূজা দেওয়ায় চেষ্টা করিনি। কন্যাকুমারী তো লোকে যায় বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল দেখতে। আমরাও তাই করলাম। ঐ একই জায়গায় দেবীপাদ মন্দির নামে একটি মন্দির আছে; উঁকি দিয়ে দেখলাম। পরদিন সকালে একটা গাড়ী নিয়ে কন্যাকুমারী ঘুরে নাগের কোয়েল স্টেষণে ফিরলাম। কন্যাকুমারীতেই অন্তত পাঁচটি সুন্দর মন্দির দেখলাম। ফেরার পথে সূচীন্দ্রম মন্দির দেখে নিলাম। এই সুচিন্দ্রম মন্দিরের গোপূরমেই নাকি সবথেকে বেশী মূর্তি আছে।

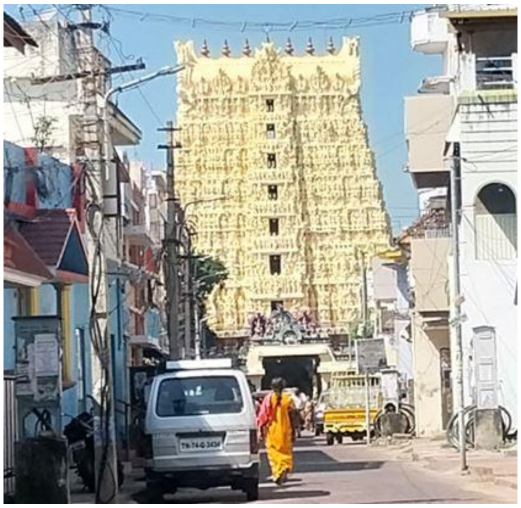
সুচিন্দ্রম মন্দিরের গোপূর

মাদুরাই এর মীনাক্ষী মন্দিরের চারটি গোপুরম পৃথিবী বিখ্যাত। আমরা যখন গেলাম সে সময় ওগুলি চট দিয়ে ঘেরা, মেরামতির কাজ চলছে। ওখান থেকে মাইল দশেক দূরে আলাগিরী পাহাড়ে গোটা তিনেক মন্দির দেখে এলাম। রামেশ্বরম মন্দিরের ভেতরে ঢুকে, বিখ্যাত করিডোরের ছবিও তুলেছি। কিন্তু ওখানকার বাইশ কুন্ডের জলে স্নান করতে যাই নি। আটো নিয়ে ধনুষ্কোডির দিকে যেতে বিভিশনের মন্দির দেখলাম। রামেশ্বরমে গোটা তিনেক কুণ্ড নামের ডোবা পুকুর দেখলাম।

আর যে দুটি বিখ্যাত মন্দিরে বাঙালি মাত্রই একবার যাবেই তাদের কথা বলে শেষ করা যাক। গয়া গিয়ে পিতৃপুরুষের পিণ্ড দেওয়া হিন্দুদের পবিত্র কর্তব্য। আমিও দাদাদের সাথে গেলাম। গোটা গয়া শহরটাই অত্যন্ত নোংরা। দেখেই একটা অশ্রদ্ধা হয়ে গেল। ওখানকার বিষ্ণু মন্দির কেমন দেখেছিলাম, একটুও মনে নেই। ওখান থেকে একটা বড় আটো নিয়ে বুদ্ধ গয়া দেখতে গেছলাম। বুদ্ধ গয়া বেশ পরিস্কার সুন্দর জায়গা। বৌদ্ধ মন্দির আর বুদ্ধ মূর্তি বেশ সুন্দর। পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচির আশেপাশে বেশ কয়েকটি বড় জলপ্রপাত আছে। আমরাও ঐ জলপ্রপাত দেখতেই গেছলাম। ওদিকের কোন একটা বিখ্যাত দেবী মন্দির লোকে দেখতে যায়। রাজারাপ্পার সেই মন্দির আমাদের দেখা হয়নি। আমাদের ড্রাইভার আমাদের নিয়ে চলল শহরের দক্ষিণ প্রান্তের জগন্নাথ মন্দির দেখাতে। একটা ছোট্ট টিলার উপর এই মন্দির। নতুন হয়েছে। মন্দিরের থেকেও দূরে , নীচে শহরটা দেখতে বেশি সুন্দর লাগে।

সিকিম বেড়াতে গেলে কিছু বৌদ্ধ মোনাষ্ট্রী দেখা হয় ; আমরাও দেখেছি।একটি মোনাষ্ট্রীতে অনেক লামা দেখেছি। কিন্তু দার্জিলিঙের রিশিহাটে যে ফার্মস্টেতে ছিলাম তার অনেকটা উপরে পাহাড়ের মাথায় একটি মনাষ্ট্রী আছে। উঠে দেখে এলাম। কিন্তু কোন মানুষজন দেখলাম না। দার্জিলিং এর ম্যাল থেকে একশ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে একটা মন্দির আছে; শিব মন্দির বোধহয়। আমরা বছর কুড়ি আগে একবার দেখেছি। পশ্চিম সিকিমের নামচি বাজারের কাছে একটা চারধাম তৈরী হচ্ছিল, সে বোধহয় বছর পনের কুড়ি আগে। এতদিনে নিশ্চয়ই পুরো তৈরী হয়ে গেছে।বেনারসে আমি যখন গেছলাম তখনও বিখ্যাত বিশ্বনাথের গলি ছিল। আজকের মত ঝকঝকে করিডোর হয়নি তখনও। বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা মন্দির দেখলাম। ঐ গলির প্রসঙ্গ এলেই আমার এক ডাক্তার দাদার কথা মনে আসবেই। সে এক আলাদা গল্প। এই দাদা অন্নপূর্ণা মন্দির এর সামনের রাস্তায়,

অলৌকিক ভাবে , মা অন্নপূর্ণার প্রাসাদ পেয়েছিলেন। সেবারই সারনাথের বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ ইত্যাদী দেখতে গিয়ে অনেক বিদেশী বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রী দেখেছিলাম।

সারনাথ

জম্মু কাশ্মীরের বিখ্যাত বৈষ্ণদেবী মন্দিরে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করিনি। কাটরা ষ্টেশন হয়ে ফেরার সময় দেখেছি, শত শত যাত্রী খোঁড়াতে খোঁড়াতে ট্রেনের জন্য চলেছে। এত কষ্ট করে পূণ্য অর্জন করতে পারবো না। আর এই জন্যই তিরুপতি দর্শন করার ইচ্ছাই হয়নি। গুলমার্গে ছোট্ট টিলার উপর একটি কাঠের শিব মন্দির আছে। ওটি একবার পুড়ে গেছল। কোন এক হিন্দি সিনেমার গান ওখানে শ্যুটিং হয়েছিল, তাই খুব বিখ্যাত। দূর থেকে দেখলাম। শ্রীনগরে একটি পাহাড়ের উপর একটি শিব মন্দির দেখতে সবাই যায়, আমরাও গেলাম। চার পাঁচশ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়।

কাশ্মীরের দুটি মন্দির

গোটা দেশ ঘুরে ঘুরে অনেক বিখ্যাত অখ্যাত মন্দির দেখা হল। এবার বাড়ীর কাছে ফিরে আসি। বছর কুড়ি আগে একবার হলদিয়া ঘুরতে গেছলাম। ফেরার পথে মহিষাদল রাজবাড়ীর পুরনো মন্দির দেখেছিলাম। আর দেখেছিলাম তমলুকের বিখ্যাত বর্গভীমা মন্দির।এই বরগভীমা একটি সতী পীঠ। এ রাজ্যের সবথেকে বিখ্যাত সতী পীঠ হল তারাপীঠ। প্রায় তিরিশ বছর আগে একবার গেছলাম; পূজা দিয়েছিলাম কি না মনে নেই। ঠিক করোনা অতিমারী শুরুর আগে একবার মুর্শিদাবাদ বেড়াতে গেছলাম। সেবার হাজার দুয়ারী না দেখে অন্য পারে চলে গেছলাম। ঐ পারে আর এক সতী পীঠ, নলাটেশ্বরি মন্দির দেখলাম। ওদিকেই আছে আমাদের গৃহ দেবতা প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রম , ডাহাপাড়া ধাম।

ডাহাপাড়া ধাম

বছর কুড়ি আগে একবার সাগরদ্বীপ দেখতে গেছলাম। না, মেলার ভিড়ে যাওয়ার সাহস হয়নি। অন্য সময় দেখে বোঝা মুস্কিল যে মেলার সময় ওখানে কি ভয়ংকর ভিড় হয়। আমরা ওখানে কপিল মুনীর মন্দির দেখেছি। এখন শুনছি সমুদ্র এগিয়ে আসছে। কয়েক বছর পর হয়তো এই মন্দির আর থাকবে না।

মেদিনীপুর শহরে থাকার সময় একবার গেছলাম, কর্নগড়ের মহামায়া মন্দিরে পূজা দিতে। মেদিনীপুরের জগন্নাথ মন্দির বেশ পুরোনো, দেখেছি কয়েকবার ; ভেতরে ঢোকা হয়নি। মেদিনীপুর শহরে কেন্দ্রে বটতলা

চকের কালী মন্দির বেশ বিখ্যাত। এছাড়া হবিবপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরও বেশ বিখ্যাত। উত্তর দিনাজপুর জেলায় চাকরী করার সময় খুব শুনতাম পতিরামের বোল্লা কালী মন্দিরে কথা। কালী পূজার রাত্রে হাজার খানেক বলী হয় শুনেছি। কোনদিন দেখার ইচ্ছাই হয়নি। প্রথম যেদিন ইটাহার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাত্রে ছিলাম, সেই রাত্রেই ছিল কালী পূজা। ভোর থেকে দেখলাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাঠ পেরিয়ে লোকে চলেছে, খড়ের খাঁচায় বলি দেওয়া পায়রা নিয়ে। রাস্তার অন্য পারে কালী মন্দির দেখতে গেলাম। তখন বলী শেষ হয়েছে। মন্দিরের উঠান রক্তে লাল।

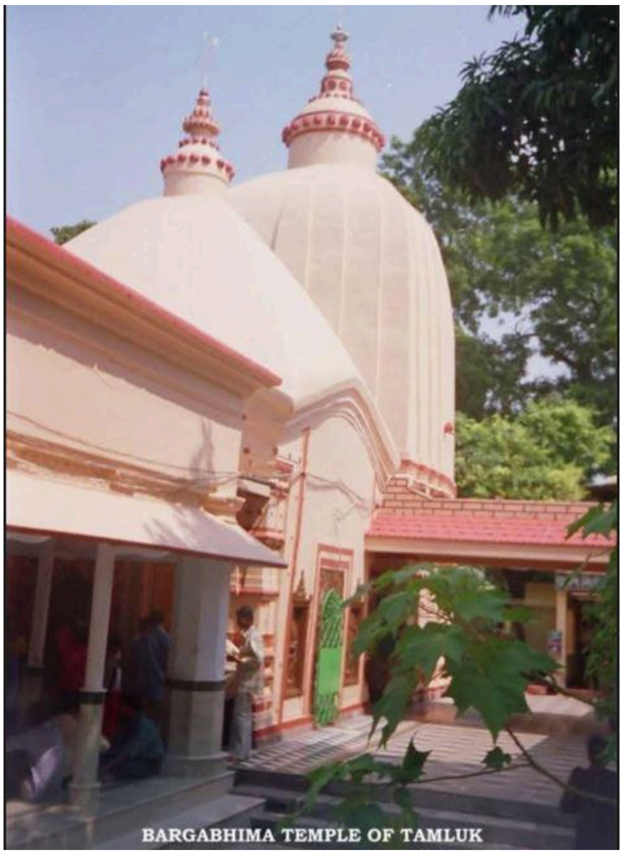

বর্গভীমা মন্দির

আমার বর্তমান জেলা উত্তর ২৪ পরগনায় আছে বিখ্যাত লোকনাথ বাবার মন্দির। বাড়ীর কাছের দুটি বিখ্যাত মন্দির কয়েকবারই দেখেছি। দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড়ের মন্দির। কলকাতার ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি রাস্তা থেকেই দেখা যায়; সেই এগারো বারো ক্লাশে পড়ার সময় ঐ রাস্তা দিয়ে স্কুলে যেতাম। বালিগঞ্জে একটি বিরাট মিন্দির একবার দেখতে ঢুকেছিলাম; কি দেবতার মন্দির মনে নেই। আর কলকাতার মন্দির বললে যে কালী মন্দির বোঝায় সেটা আমার দেখা হয়নি। এখন তো আর ঐ জায়গার সেই স্থান মাহাত্ম নেই। উল্টে ঐ নামটা শুনলে কেমন এক বিতৃষ্ণা হয়। lআমার বাড়ির থেকে হাঁটা দুরত্বে দমদমের হনুমান মন্দির; কোনোদিন ভেতরে ঢুকে দেখা হয়নি। আর এখন আমার বাড়ীর ঠিকানা বোঝাতে লোককে বলি, বড় কালী বাড়ীর কাছে। একবার একটা গাড়ী নিয়ে চাকলা আর কচুয়া ধাম ঘুরে এলাম। ঐ দিনই যাওয়ার পথে দেখে গেলাম নীলগঞ্জের

নন্দদুলাল মন্দির। এই মন্দিরের কাঁঠাল প্রাসাদ নাকি কোন কোন বড় অসুখ সারিয়ে দেয়। ব্যারাকপুরের বি এন বোস হাসপাতালের কাছেই , গঙ্গার ধারে আছে, অন্নপূর্ণা মন্দির; অনেকটা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মত। কিন্তু বেশ অযত্নে আছে। বারাকপুর স্টেশনের হনুমান মন্দিরে বেশ যাত্রী হয় দেখেছি।

চাকলা ধাম

এরকম মাহাত্ম্য প্রায় সব কটি মন্দিরেরই কিছু না কিছু আছে। আমরা কোন মন্দিরেই কোন অলৌকিক দেখতে যাইনি। মন্দিরের ভাস্কর্য দেখতেই মূলত যাওয়া। অনেক বিখ্যাত মন্দিরেই দেখার মত তেমন বিগ্রহ নেই। এ দেশে ভ্রমণে বের হতে হলে যে দুটি রাজ্য অবশ্যই দেখতে চায় সকলে সেগুলি হল , কাশ্মীর আর আন্দামান। কাশ্মীরে একটি মন্দিরে ঢুকেছি। আন্দামানের যে মন্দির সকল ভারতবাসীর কাছে পবিত্রতম সেটা হল আমাদের মুক্তির মন্দির, সেলুলার জেল। ওটা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

সেলুলার জেল

৮.৪.২০২৫.

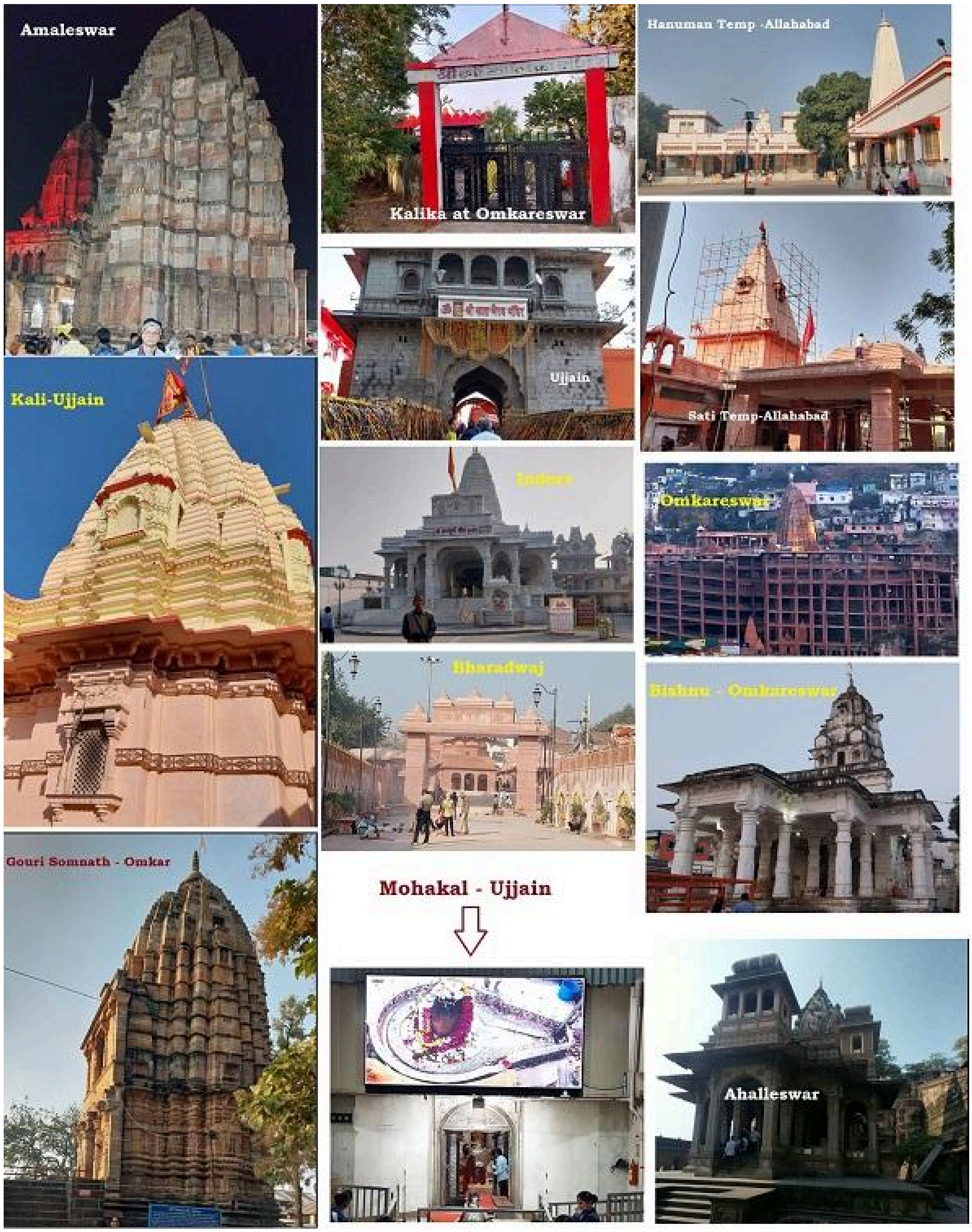


উজ্জয়িনি, ইন্দোর, ওমকারেশ্বর আর মহেশ্বর এর কিছু মন্দির

দক্ষিনের কিছু মন্দির পরের পৃষ্ঠায়

Thali temple

Minakshi E-gate

Bivishon Temp
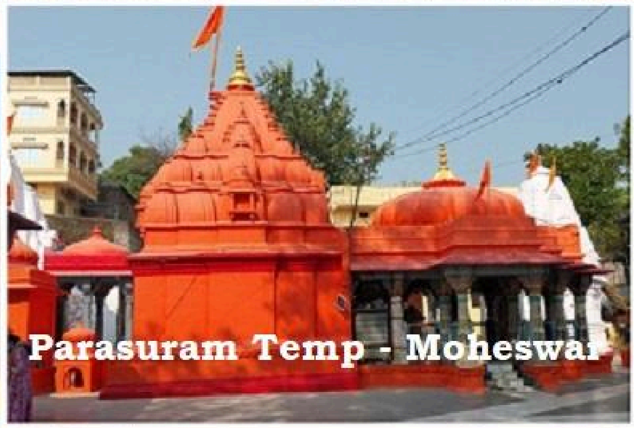
Parasuram Temp - Moheswa
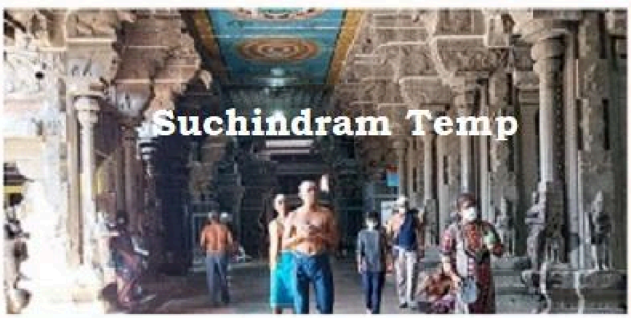
Suchindram Temp

Nataraj Temp-Rameswaram

Debipada Temp, Vivekananda Rock
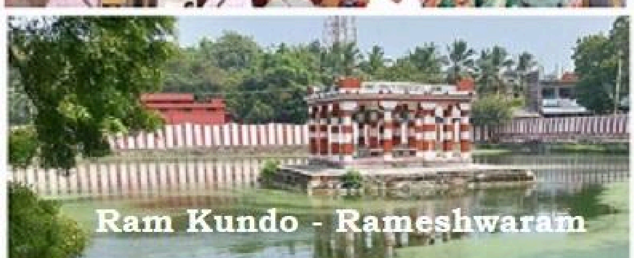
Ram Kundo - Rameshwaram

Balaji Temp - Kanyakumari

Rameshwaram Corridor

Saibaba Temp -Kanyakumari
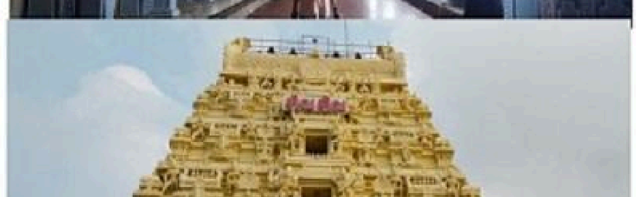

SNAKE ANTIVENIN
(POLYVALENT) I.P.
SNAKE ANTIVENIN
(POLYVALENT) I.P.
সর্প দংশনের অ আ ক খ
ডা দয়াল বন্ধু মজুমদার

# সর্পদংশনের অ আ ক খ

ডা দয়াল বন্ধু মজুমদার

আমাদের পশ্চিমবাংলায় প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে সাপেকাটা রোগীর চিকিৎসা হয়। একেবারে গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সব সরকারি হাসপাতালে, সকলের জন্যই বিনামূল্যে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তবুও প্রতিবছর কয়েক হাজার মানুষ সাপের কামড়ে মারা যাচ্ছেন। এর কারন কি?

সাপের কামড়ে মৃত্যুর প্রধান কারনই হল সময় মত চিকিৎসা না করা। কেন দেরী হয়? সাপ কামড়ানোর পর প্রথম ১০০ মিনিট সময় অত্যন্ত গুরুত্তপুর্ণ। এই সময়ের মধ্যে সাপের বিষের ঔষধ এ ভি এস ( অ্যান্টি স্নেক ভেনাম সিরাম (চিত্র নং-১) ১০০ মিলি লিটার ( অর্থাৎ ১০ টি) রোগীর শরীরে দিতে পারলে, যে কোন বিষধর সাপের কামড়ের রোগীই বিপদমুক্ত হয়।

চিত্র নং-১ আন্টিভেনম সিরাম

বাস্তবে দেখাযায় বেশীরভাগ রোগীই এই ১০০ মিনিটের মধ্যে চিকিৎসাকেন্দ্রে এসে পৌছয় না। এমন কি ৭-৮ ঘন্টা পরেও রোগী আসছেন। এই দেরীর একটি কারন বাড়ীর থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরত্ব। সাপ কামড়ের দূর্ঘটনা গ্রামাঞ্চলেই ঘটে সাধারনত। রাত্রে, বিশেষত বর্ষাকালে, গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু তার থেকেও বড় কারণ অজ্ঞতা।

প্রায়শই দেখা যায় সাপে কামড়ানোর পর আক্রান্ত ব্যক্তি বা বাড়ীর লোক ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করেন।এই উপেক্ষা করার মূল কারন অজ্ঞতা। আমাদের অনেক পুরাতন ধারনা হল; সাপ কামড়ালে ভয়ংকর ব্যথাযন্ত্রনা হবে, কামড়ের দাগ থাকবে, রোগী ঝিমিয়ে পড়বে। এরকম কিন্তু সব সময় হয় না।একমাত্র ফনাযুক্ত গোখরো আর কেউটে সাপের কামড়ে এরকম রোগ লক্ষণ দেখা যায়। ( চিত্র নং-.২)

অন্য আর দুই রকম বিষধর সাপ আছে আমাদের রাজ্যে। কালাচ আর চন্দ্রবোড়া। এই দুরকম সাপে কামড়ালে, প্রথম দিকে প্রায় কোন উপসর্গ থাকে না।বহুযুগ থেকে আমাদের ধারনা বিষধর সাপে কামড়ালে দুটি কামড়ের দাগ থাকবে, এটা ঠিক নয়। কামড়ের দাগ দুটি, একটি, আঁচড়ের মত, এরকম যা কিছুই হতে পারে।বাস্তবে দেখা যায়, কালাচ সাপের কামড়ে কোন দাগই দেখা যায় না।

এই সমস্ত বিভ্রান্তির থেকে বাঁচতে হলে আমাদের রাজ্যের প্রধান চার রকমের বিষধর সাপ সম্বন্ধে একটু জেনে রাখা দরকার। ( সাপের চিত্রগুলি দেখুন) ফণাযুক্ত গোখরো আর কেউটে একই রকম সাপ। ওদের কামড়ে একই রকম উপসর্গ দেখা যায়।সাধারনত দুটি কামড়ের দাগ দেখাযায়।

কামড়ের সাথে সাথে প্রচন্ড জ্বালা পোড়ার মত ব্যথা হয়। জায়গাটি ক্রমশই ফুলতে থাকে ( চিত্র নং-২)। অন্ধকারে কিসে কমড় দিল দেখাই যায় না অধিকাংশ সময়ই। কিন্তু ঐ ব্যথা আর ক্রমবর্ধমান ফোলা দেখেই বোঝাযায় ফণাযুক্ত বিষধর সাপে কামড়েছে। এছাড়া এই দু রকম সাপে কামড়ালে রোগীর কথা জড়িয়ে আসে। ক্রমশ রোগী ঝিমিয়ে আসে। চিকিৎসায় দেরী হলে রোগীর শ্বাসকার্য্য বন্ধ হয়ে যায়। এদের কামড়ে রোগীর স্নায়ুতন্ত্র অকেজো হয়ে যায়, এজন্য এদের বিষকে নার্ভবিষ বলা হয়।

রহস্যময় কালাচ সাপের বিষও নার্ভবিষ। কিন্তু ফণাহীন এই সাপের কামড়ে , কামড়ের জায়গায় কোন রকম ব্যথা বা ফোলা হয় না। ৯৯% ক্ষেত্রে কোন কামড়ের দাগ থাকে না। এই সাপটি প্রায় সময়ই গভীর রাত্রে বিছানায় উঠে ঘুমন্ত মানুষকে কামড়ায়। এজন্য খোলা বিছানায়, মেঝেতে ঘুমানো বিপজ্জনক। কালাচ কামড়ের রোগী প্রায়শই সকালবেলা পেটের যন্ত্রনা বলে। এছাড়া গলা ব্যথা, কোমড়ে বা গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা নিয়েও অনেকে আসে।ছোট বাচ্চা শুধু শ্বাসকষ্ট নিয়েও আসতে পারে। পেটব্যথা, গলাব্যথা, গাঁঠেব্যথার তো অনেক কারন আছে; তাহলে সাপে কামড়েছে কি করে বোঝা যায়? সাপের কামড়ের নির্দিষ্ট কিছু রোগ লক্ষণ দেখেই ডাক্তারবাবুরা বুঝতে পারেন। কালাচ বা গোখরো জাতীয় সাপের নার্ভবিষের সুনিশ্চিত প্রমান হল শিবনেত্র বা টোশিষ (চিত্র নং- ৩)

। রোগী সাপ দেখুক বা না দেখুক, কামড়ের দাগ থাক বা না থাক, শিবনেত্র, অর্থাৎ হঠাৎ দুই চোখের পাতা পড়ে আসছে দেখেই নিশ্চিত বোঝা যায় রোগীর শরীরে নার্ভবিষ ঢুকেছে।

চিত্র নং-৩

এখানেই দু একটি জরুরী কথা বলা দরকার। কালাচ সাপ কামড়ের ঘটনাগুলি যেহেতু সাধারনত বিছানায় ঘুমের মধ্যে ঘটে; কামড়ের দাগ ও দেখা যায় না, তাই অনেক সময়ই বাড়ির লোককে বোঝানো যায় না যে এটা সাপের কামড়। এতে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। ( এই রকম একটি ঘটনার বিবরণ ......নং পৃষ্ঠায় দেখুন)।

চন্দ্রবোড়া একটি ফণাহীণ ভয়ংকর বিষধর সাপ। এদের বিষ একটু অন্য রকম। এদের কামড়ে একটু ব্যথা হলেও, প্রথমেই গোখরোর কামড়ের মত প্রচন্ড ব্যথা হয়না। জায়গাটি একটু দেরীকরে, আস্তে আস্তে ফোলে। প্রায়শই রোগী ভাবে, কাঁটা ফুটেছে বা কোন পোকা কামড়েছে। কিন্তু ৪৫ মিনিট থেকে এক ঘন্টা পর থেকেই , কখনও তারও আগেই শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত বেরতে শুরু করে। যেমন, কামড়ের জায়গা, দাঁতের গোড়া, নাক থেকে, থুতুর সাথে ( রক্ত তঞ্চনের গন্ডগোলের জন্য) পরের দিকে রক্ত প্রস্রাব ও শুরু হয়।

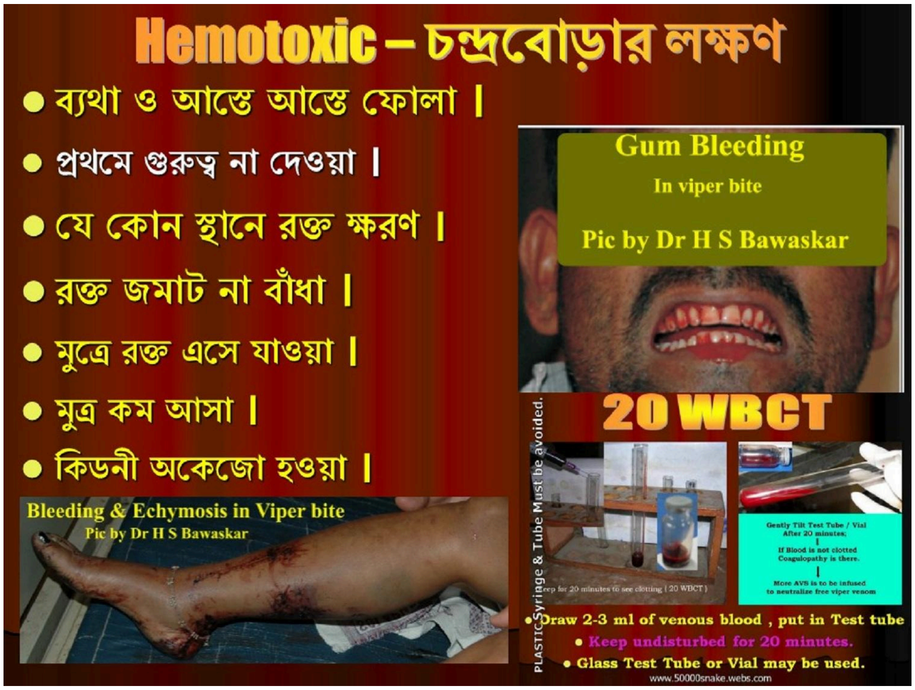


রক্ত প্রস্রাব একটি মারাত্বক লক্ষণ। বিষের প্রতিক্রিয়ায় রোগীর কিডনি নষ্ট হতে শুরু হলেই মূত্রে রক্ত আসা শুরু হয়। দ্রুত রোগীকে এ ভি এস দিতে পারলেই কিডনি বাঁচানো সম্ভব। চিকিৎসায় দেরী হলে কিডনি নষ্ট হয়ে প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ৫-৬ দিন ডায়ালিসিস লাগে। হাত বা পা ফুলে থাকে কিছুদিন।

প্রস্রাবে রক্ত

প্রাথমিক চিকিৎসা

সাপ কামড়ের প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে কিছু হয় না। কিছু একটা কামড়েছে সন্দেহ হলেই দ্রুত নিকটের স্বাস্থকেন্দ্রে পৌঁছতে হবে। শহরের বড় হাসপাতালে যাওয়ার চেষ্টা না করাই ভাল; তাতে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়।

বাঁধন বা টুর্নিকেট দিয়ে কোন লাভ হয় না। যুগ যুগ ধরে চলে আসা, "বাঁধন দেওয়ার" কোন দরকার নেই। বাঁধনে বিষ আটকায় না। এতেও হিতে বিপরীত হয়েছে অনেক সময়।**বিশেষকরে** চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের পর বাঁধন দিয়ে হাত – পায়ে পচন ধরে যেতে পারে ( চিত্র নং 4) অনেকে , হাত বা পায়ে হাড় ভাঙ্গলে যে ভাবে নড়াচড়া বন্ধ করে বাঁধা হয় ( Immobilization) ,সেভাবে বাঁধতে বলেন । বাস্তবে , মাঠেঘাটে সবসময় সেরকম অভিজ্ঞ লোক পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই , এই পদ্ধতিতে বাঁধার চেষ্টাও না করাই ভালো।

মনোবল বাড়ান : যে কোন লোককে সাপে কামড়ালেই , স্বাভাবিক ভাবেই সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই আতঙ্ক বা উদ্বেগ নানান রকম বিপদ বাড়ায়। এমনকি সাধারণ একটি নির্বিষ সাপের কামড়ের পর আতঙ্কে রুগীর হার্টের অসুখ থাকলে বেড়ে যাবে। আতঙ্ক বা উদ্বেগ আমাদের শরীরে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে দেয় ; এতে সাপের বিষ শরীরে তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। এজন্যই সাপের কামড়ের ব্যক্তির কাছে যারা থাকবেন , তাঁদের কাজ হবে রুগীর মনোবল বাড়ান। রুগীকে বোঝান যে ৭০-৮০ শতাংশ সাপের কামড়ই নির্বিষ সাপের কামড় । এমনকি বিষধর সাপে কামড়ালেও ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে বিষ মানুষের শরীরে ঢোকে না। ( চিত্র নং..৫) সব থেকে বড় কথা হল , হাসপাতালে সাপের কামড়ের ভালো চিকিৎসা আছে।

Dry Bite

তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলুন

কিছু একটা কামড়ালেই অকারন আতঙ্কিত না হয়ে বাড়ীর কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাড়াতাড়ি পৌছতে হবে। সব সময় মাথায় রাখতে হবে, প্রথম ১০০ মিনিট দারুন মূল্যবান। রোগী নিজে দৌড়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে না, তাতে বিষ দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। সাপ মেরে বা ধরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কোন দরকার নেই। এজন্যই সাপটিকে খোঁজার বা মেরে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন সময় নষ্ট করার দরকার নেই। সাপ দেখে চিকিৎসা হয় না ; আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ লক্ষণ দেখেই চিকিৎসা করা হয়।

দ্রুত হাসপাতালে যাওয়ার জন্য মোটরসাইকেল হল আদর্শ পরিবহন। ( চিত্র নং...৬) । গ্রামে গঞ্জে চার চাকার আম্বুলেন্স এর থেকে মোটরসাইকেল পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। গ্রামের সরু রাস্তায় চার চাকার আম্বুলেন্স এর থেকে মোটরসাইকেল অনেক স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। মাঝে খেয়া পেরোতে হলেও মোটরসাইকেল সহজেই পের করা যায়। আক্রান্ত ব্যক্তিকে মাঝে বসিয়ে , একজন পিছন থেকে তাকে ধরে বসবেন ।

সাপে কামড়ের পর প্রথম দিকে রুগী একেবারে সুস্থ থাকলেও নিজে সাইকেল বা মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। সাইকেল চালালে শরীরে রক্ত চলাচল বেড়ে যায় , তাতে বিষ তারাতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে। বিশেষ করে ফণাযুক্ত সাপে কামড়ালে , কিছু সমর পর থেকেই শরীর দুর্বল হয়ে আসবে ; সেক্ষেত্রে রুগী নিজে চালালে দুর্ঘটনা ঘটার সমূহ সম্ভাবনা।

রুগীর পিছনে যিনি বসবেন তাঁর আরও কিছু জরুরী কাজ আছে। উনি রুগীর সাথে কথা বলতে বলতে যাবেন। উনি সবসময় রুগীর মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করে চলবেন। এছাড়া , হাসপাতালে পৌছনোর আগে পর্যন্ত , রুগী কখন কি কি অসুবিধা বলেছেন , সেটা ডাক্তারবাবুকে জানানোটা চিকিৎসার জন্য জরুরী। অনেক সময়ই, রুগী হাসপাতালে পৌছনোর আগেই কথা বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক কত সময় আগে পর্যন্ত কথা বলতে পেরেছেন, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের বহু যুগের কিছু ভ্রান্ত ধারনা আমরা ভুলতে পারছি না। সাপে কামড়ালে এখনও বহু লোকে ওঝার বাড়ী যাচ্ছেন। বিষধর সাপে কামড়ালে শরীরে যে বিষ ঢোকে, কোন মন্ত্রতন্ত্র বা গাছ গাছড়ায় ঐ বিষ নষ্ট হয়না। যত দ্রুত সম্ভব এ ভি এস দিয়েই চিকিৎসা সম্ভব। ওঝার বাড়ী ঘুরে আসার জন্য যেটুকু সময় নষ্ট হয় , সেটাও অনেক সময় মারাত্মক হতে পারে।

কয়েকটি প্রচলিত ভুল পদক্ষেপ

১) গত কয়েক বছরে আমদের রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। এ জন্যই ছোট খাট সামান্য দরকারেই , আমাদের শহরে আসার প্রবনতা বেড়েছে। অন্য যে কোন রোগের ক্ষেত্রে, শহরের বড় হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা ভালো থাকতে পারে। কিন্তু এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসাই সব সময় ভালো। কারন, সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে প্রতিটা মিনিট গুরুত্বপূর্ণ। শহরের বড় হাসপাতালে যেতে যদি পনের মিনিট বেশী লাগে, সেটাই প্রাণঘাতী হতে পারে। এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যাপারটি সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষের ধারনা পরিস্কার নয়। প্রথম কথা হল, ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চব্বিশ ঘন্টা ডাক্তার থাকতে হবে। ওখানে রুগী ভর্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোন প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, যেখানে ঐ দুটি ব্যাপারে নিশ্চয়তা আছে, সাপের কামড়ের চিকিৎসা সেখানে হবেই। অবশ্য যদি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বা বর্ধমানের মত গ্রামীণ মেডিক্যাল কলেজের দু চার কিমির মধ্যে সাপে কামড়ায়, সেক্ষেত্রে ঐসব হাসপাতালেই তাড়াতাড়ি পৌছন সম্ভব।

২) বাঁধন দেওয়া , সাপ মেরে বা ধরে হাসপাতালে আনা , ওঝার বাড়ী সময় নষ্ট করা এ সব বহুল প্রচলিত ভ্রান্ত ধারনা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

৩) কামড়ের জায়গা বা তার আশে পাশে কেটে চিরে বিষ বের করার চেষ্টা মারাত্মক ভুল। এতে বিষতো বেরবেই না , উল্টে চন্দ্রবোড়া জাতীয় সাপের কামড়ে প্রাণঘাতী রক্তপাত হতে পারে।

৪) কামড়ের জায়গা ধোওয়া বা বরফ ইত্যাদি লাগাবেন না। কুকুর বেড়াল কামড়ালে সাবান দিয়ে ধুতে বলা হয় ; সেই থেকে মনে করা হয় , যে কোন কামড়েই ধুয়ে দিতে হয়। সাপের বিষ ইঞ্জেকসন দেওয়ার মত অনেকটা ভেতরে ঢুকে যায় । ধুয়ে লাভ তো হয়ই না ; উল্টে বিষ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে।

৫) কোন ছোপ বা কেমিক্যাল কামড়ের জায়গায় লাগাবেন না।

৬) রুগীকে কোন রকম অনুপান বা টোটকা ওষুধ খাওয়াবেন না।

**পশ্চিমবাংলার বিপজ্জনক সাপ কি কি ?**

পশ্চিমবাংলায় মাত্র সাত -আট রকমের বিষধর সাপ আছে ; তার মধ্যে মাত্র চার রকমের সাপই ৯৯ শতাংশ বিপদ্গুলি ঘটাচ্ছে। ১) চন্দ্রবোড়া ২) কেউটে , ৩) গোখরো আর ৪) কালাচ , এই চার প্রজাতীর সাপই প্রায় সমান সমান আছে আমাদের রাজ্যে।

এছাড়া সমুদ্রের সাপ , শাখামুটি, শঙ্খচুড় , কৃষ্ণ কালাচ ও সিন্ধু কালাচ এই পাঁচ রকমের বিষধর সাপ এ রাজ্যে থাকলেও বছরে দু- একটির বেশী কামড়ের ঘটনা ঘটেনা।

সাপের কামড় থেকে নিজেকে বাঁচাতে বা চিকিৎসার জন্যও সাপ চেনাটা খুব জরুরী নয়। তবে সাপগুলি সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক ধারনা থাকলে , হাসপাতালের চিকিৎসা বুঝতে সুবিধা হয়।

এবার আমাদের বাড়ীর আশেপাশে যে বিপজ্জনক চারটি সাপ প্রায়শই দেখা যায় , তাদের নিয়ে কয়েকটি কথা।

**চন্দ্রবোড়া সাপটি** একটি ফনাহীন সাপ। একটু বাদামিঘেঁষা হলদেটে রঙের সাপ। গায়ে চাকা চাকা দাগ থাকে। বাড়ীর আশেপাশে ঝোপঝাড়, ফসলের মাঠে , যে কোন জায়গায়ই থাকতে পারে। ব্যাঙ ইঁদুর প্রভৃতি খাদ্যের খোঁজে ঘরের ভিতরেও চলে আসে। যে কোন সাপের মতই, আঘাত পেলে মানুষের শরীরে কামড় দেয়। এদের বিষ দাঁত বেশ লম্বা। অনেক পরিমাণ বিষ, সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে মানুষের শরীরের গভীরে ঢুকিয়ে দেয়। কামড়ের দাগ থাকলেও , ফণাযুক্ত সাপের কামড়ের মতো সাথে সাথেই প্রচন্ড জ্বালা যন্ত্রনা না হওয়ায় , অনেক সময়ই প্রথমে এটাকে সাপের কামড় মনে হয় না। সাধারণ কাঁটা ফোঁটা বা পোকার কামড় বলে ভুল হয়। কিন্তু এক- দেড় ঘন্টা থেকে চার ঘন্টা পরে শরীরের নানান জায়গা থেকে অস্বাভাবিক রক্তপাত শুরু হয়। কামড়ের জায়গা ক্রমশ ফুলতে থাকে। সাপ দেখতে না পেলেও, ঐ অস্বাভাবিক রক্তপাত দেখেই ডাক্তারবাবুরা রক্ত তঞ্চনের গণ্ডগোল অনুমান করেন।

নির্দিষ্ট করে সাপের কামড় জানা না থাকলে একটি খুব সাধারণ রক্ত পরীক্ষা করেই , মাত্র কুড়ি মিনিটেই রক্ততঞ্চনের পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যায় । 20WBCT বা কুড়ি মিনিটের রক্ত পরীক্ষা ( চিত্র নং..৮) ।প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই , রুগীর বিছানার পাশেই পরীক্ষাটি করা হয়, কোন ল্যাবরেটিরী দরকার হয় না। এই পরীক্ষা চার- পাঁচ বারও করার দরকার হতে পারে।

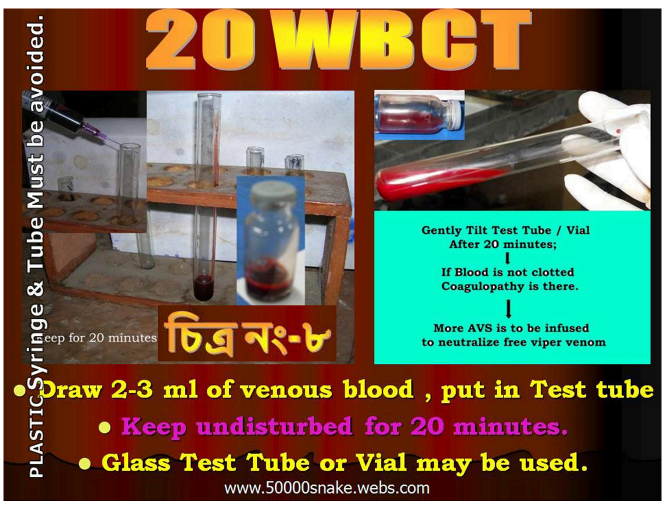

অবশ্যই কাঁচের টেষ্ট টিউবে করতে হবে।

চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের চিকিৎসায় দেরী হলে রুগীর কিডনী নষ্ট হয়। মুত্রে রক্ত দেখা গেলেই বোঝা যায় , কিডনী আক্রান্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বড় হাসপাতালে গিয়ে ডায়ালিসিস করাতে হয়।

গোখরো সাপ : - ফণাযুক্ত এই সাপটির অঞ্চলভেদে আরও কয়েকটি নাম আছে। মেদিনীপুর জেলায় বলে খরিশ সাপ। মালদায় বলে গোমা সাপ। এই সাপের ফণার পিছনে গোরুর খুরের মত বা খড়ম চিহ্ন থাকে।

কেউটে সাপ : - এদের ফণার পিছনে একটি পদ্ম ফুলের মত চিহ্ন থাকে। ফণাযুক্ত এই সাপটিরও অঞ্চলভেদে আরও কয়েকটি নাম আছে । কালো সাপ , টক সাপ , কাল কেউটে , শামুকভাঙ্গা সাপ , ঝাংলাই প্রভৃতি। ফণাযুক্ত এই দু রকমের সাপই আমাদের রাজ্যে প্রায় সমান সমান সংখ্যায় দেখা যায়। এদের বিষ তীব্র নার্ভ বিষ। দু রকমের সাপেরই থাকার জায়গা , স্বভাব চরিত্র , কামড়ের রোগ লক্ষণ , চিকিৎসা একই। এজন্যই প্রাণীবিদ্যার শ্রেণীবিভাগে আলাদা হলেও , চিকিৎসার ক্ষেত্রে এদের একই সাপ বলে ধরা হয়।

কোন সাপে কামড়েছে দেখতে না পেলেও , কামড়ের প্রায় সাথে সাথেই প্রচন্ড জ্বালা , পোড়ানোর মত যন্ত্রনা , আর কামড়ের জায়গা দ্রুত ও ক্রমবর্ধনাম ফোলা দেখেই বোঝা যায় , ফণাযুক্ত সাপে কামড়েছে।

কালাচ সাপ **:-** ফণাহীন এই সাপটিও আমাদের রাজ্যে প্রচুর সংখ্যায় আছে। এটি মারাত্মক বিষধর একটি সাপ। এই সাপটিরও অঞ্চলভেদে আরও কয়েকটি নাম আছে । কালচিতি, ডোমনা চিতি, শিয়রচাঁদা , ঘামচাটা এসব নামেও এদের পরিচয় আছে। কালো রঙের সাপটির গায়ে সরু সরু সাদা চুড়ির মত দাগ বা ব্যান্ড থাকে , লেজের শেষ পর্যন্ত। এরা সাধারণত রাতের বেলায় বেরয় । এদের এক বিচিত্র স্বভাব হল , এরা খোলা বিছানায় উঠে আসে। এজন্য একটি কথা চালু আছে যে, এরা বোধহয় ঘামের গন্ধে মানুষের কাছে চলে আসে ( এই জন্য ঘামচাটা নাম)। কালাচের কামড়ের রুগীদের প্রায় আটানব্বই শতাংশই রাত্রে ঘুমের মধ্যে ঘটে। এদের কামড় বেশ রহস্যজনক । মারাত্মক নার্ভ বিষ হলেও , এদের কামড়ে একটুও ব্যথা যন্ত্রনা হয়না। কামড়ের জায়গা ফুলে ওঠে না। এমন কি কামড়ের কয়েক ঘন্টা পর থেকে কামড়ের দাগও খুঁজে পাওয়া যায় না।

কালাচ সাপের কামড়ের রোগ লক্ষণও রহস্যময়। সাধারণত রুগী সকালে পেটে ব্যথা নিয়ে আসে। তাছাড়াও গলা ব্যথা, গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা, গলা বসে যাওয়া , সারা শরীর দুর্বল লাগা , মাঠে কাজ করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়া , বাচ্চাদের শ্বাস কষ্ট , এরকম বিচিত্র সব রোগ লক্ষণ নিয়ে বিপদটা শুরু হয়। ডাক্তারবাবুরা নার্ভবিষের প্রধান লক্ষণ , শিবনেত্র বা টোশিশ ( চিত্র নং..৩) দেখেই বুঝতে পারেন যে ,এটি কালাচের কামড়। যেহেতু ঘুমের মধ্যে কামড়ায় , রুগী জানতেই পারে না যে তাকে সাপে কামড়েছে । ডাক্তারবাবুরা ,সাপে কামড়েছে , বলার পরও অনেক সময়ই রুগী বা তার বাড়ীর লোক মানতে চাননা। কামড়ের দাগ খুঁজতে গিয়ে চিকিৎসায় মারাত্মক দেরী হয়ে যায়। এরকম একটি ঘটনার বিবরন পরে দেওয়া হল।

নির্বিষ সাপের সাথে অনেক সময় বিষধর সাপের নামের বা চেহারার কিছু মিলের জন্য বিভ্রান্তি দেখা যায় । সব থেকে বেশী বিভ্রান্তি দেখা যায় কালাচ আর ঘরচিতি সাপের মধ্যে। দুটি সাপের নামের মধ্যে চিতি কথাটি আছে। এছাড়া দুটির গায়েই চুড়ির মত ব্যান্ড আছে। ছবিতে দেখলেই পরিস্কার বোঝা যায় , চুড়িগুলির পার্থক্য আছে। কালাচের চুড়ি লেজের শেষ পর্যন্ত থাকে , আর ঘরচিতির লেজের কাছে কোন ব্যান্ড নেই। ( চিত্র নং.১২)

বিষধর সাপে কামড়েছে কিনা কি করে অনুমান করবেন **?**

কামড়ের দাগ :- যুগ যুগ ধরে চলে আসা কিছু ভ্রান্ত ধারণা আমাদের ভুলতে হবে। দুটি কামড়ের দাগ মানেই বিষধর সাপের কামড় , এই ধারনা ঠিক নয়। কালাচের কামড়ে দাগ নাও পেতে পারেন। আবার গোখরো কেউটে বা চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে একটি বা দুই-এর বেশী দাগও পেতে পারেন। ছবিতে দেখুন , কেউটে সাপের কামড়ে একটি চেরা দাগ দেখা যাচ্ছে। ( চিত্র নং.১৩) I আরেকটি ছবিতে দেখুন , ( চিত্র নং....৫) , পরিস্কার দুটি কামড়ের দাগ ; অথচ এই রুগির শরীরে কোন বিষের লক্ষণই আমরা পাইনি। অর্থাৎ , কামড়ের দাগ দেখে আমরা নির্দিষ্ট করে কিছুই বুঝব না।

বিষ ঢোকার লক্ষণগুলি কি কি : - সাপ দেখতে পাওয়া যাক বা না যাক, কামড়ের জায়গায় জ্বালা যন্ত্রনা আর ক্রমবর্ধমান ফোলাই বিষ ঢোকার প্রথম লক্ষণ। ফণাযুক্ত সাপে কামড়ালে খুব তাড়াতাড়ি রুগীর শরীরে নার্ভ বিষের লক্ষণ দেখা যাবে। হঠাৎ দুই চোখের পাতা পড়ে আসা , অর্থাৎ শিবনেত্রই নার্ভ বিষের নিশ্চিত লক্ষণ। ( চিত্র নং..৩) I ফণাযুক্ত সাপে কামড়ালে খুব তাড়াতাড়ি রুগী ঝিমিয়ে পড়বে, কথা জড়িয়ে যাবে। কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া বা একেবারে নিস্তেজ হয়ে যেতে পারে।

চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে প্রথম দিকে এতোটা জ্বালা যন্ত্রনা বা ফোলা নাও থাকতে পারে। কামড়ের জায়গা বা শরীরের অন্য যে কোন স্থান থেকে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ দেখেই সন্দেহ করা হয় , শরীরে চন্দ্রবোড়া সাপের বিষ ঢুকেছে। হয়তো একটি টিটেনাসের ইঞ্জেকসন দেওয়ার পর জায়গাটি ফুলে যাচ্ছে। দাঁতের গোড়া, নাক , পুরনো কোন ঘা থেকে রক্ত বেরতে পারে। থুতুর সাথে, বমির সাথে বা প্রস্রাবে রক্ত আসতে পারে।

প্রথম দিকে একটু সন্দেহ থাকলে ডাক্তারবাবু 20WBCT ( চিত্র নং..৮) পরীক্ষাটি করে দেখে নিতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডাক্তারবাবু , কোন পরীক্ষা ছাড়াই চন্দ্রবোড়া সাপের কামড় বুঝতে পারেন। পরীক্ষা করার জন্য কুড়ি মিনিট সময় নষ্ট করাটাও রুগীর কিডনীর পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। দরকার হলে , পরীক্ষার জন্য রক্ত টানা হলেই , স্যালাইনে এ ভি এস চালিয়ে দেওয়াটা বাঞ্ছনীয়।

কি কামড়েছে দেখতে না পেলেও , কিছু একটা কামড়ের পর , বমি করা , শরীরে বিষ ঢোকার একটি লক্ষণ।

কালাচের কামড়ের সব কিছুই বিচিত্র। সাধারণ পেটে ব্যথার চিকিৎসায় সাড়া না দিয়ে , শিবনেত্র হলেই নিশ্চিত ভাবে ধরে নিতে হবে , কালাচ সাপে কামড়েছে। আগের রাত্রে মেঝেতে ঘুমানো , পরে পেট ব্যথা, গলা ব্যথার মত সাধারণ রোগ লক্ষণ ,প্রচলিত চিকিৎসায় সাড়া না দেওয়া ; অবশেষে , শিবনেত্র হলেই নিশ্চিত ভাবে ধরে নিতে হবে , কালাচ সাপে কামড়েছে I এক্ষেত্রে কোন পরীক্ষা নিরিক্ষার সুযোগ নেই।

## প্রাথমিক হাসপাতালের চিকিৎসা

রুগী প্রথমে যে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসবে , সেখানেই অবশ্যই ভর্তি করতে হবে। প্রথমেই নিশ্চিত বিষ ঢোকার লক্ষণ নাও থাকতে পারে। তখন শুধু অবজারভেশন বা নিরিক্ষার জন্যই ভর্তি রাখা হয়। আমাদের রাজ্যের সরকারী চিকিৎসা বিধির ফ্লো চার্ট বা চিকিৎসা সারনী মেনে সাপের কামড় -এর চিকিৎসা বেশ সহজ। যে কোন সাপের কামড়ের সন্দেহ হলেই , রুগীকে ভর্তি করা হয়। যতক্ষন না নিশ্চিত ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে শরীরে বিষ ঢুকেছে, একটি সাধারণ স্যালাইন আস্তে চালানো থাকবে।

বিষ শরীরে ঢুকেছে বোঝা মাত্রই চালু স্যালাইনের ভেতরে দশটি এ ভি এস মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই এভি এস যুক্ত স্যালাইন দ্রুত চালানো হয়।

আমাদের দেশে যেহেতু পলিভ্যালেন্ট এ ভি এস ই পাওয়া যায়, সেজন্য সব সাপের কামড়েই একই ওষুধ। বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও একই পরিমান এ ভি এস দিতে হবে। কিন্তু স্যালাইনের পরিমান আর অন্যান্ন ওষুধ-পত্র , বাচ্চার শরীরের ওজন মত নির্ধারণ করতে হবে। ( ফ্লো চার্টে দেখুন)।

এই এ ভি এস আসলে ঘোড়ার সিরাম। তাই মানুষের শরীরে এর কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ করার জন্য ওষুধ পত্রের নির্দেশও দেওয়া আছে। তবে সব ক্ষেত্রে হাসপাতলগুলোতে যেমন যেমন সরবরাহ থাকে, আর ডাক্তারবাবুর বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে কোনটি কতোটা প্রয়োগ করবেন।

খুব মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হাজারে একটাও হয়না।

সাধারনত মুখ মন্ডল , গলা বা বুকে আমবাতের মত চাকা বের হয়। রুগী ঘোরের মধ্যে থাকলেও মাথা চুলকাতে থাকে। বমি করা বা হঠাৎ রক্ত চাপ কমে যাওয়া একটু উদ্বেগের কারণ হয়। যে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া একটি মাত্র , সামান্য দামের, অ্যাড্রেনালিন ইনজেশন দিলেই পাঁচ সাত মিনিটে ঠিক হয়ে যায়। এই পাঁচ সাত মিনিট ঐ এ ভি এস যুক্ত স্যালাইন বন্ধ রাখতে হয়।

ফণাযুক্ত সাপে কামড়ালে আরও কয়েকটি ইনজেশন খুবই জরুরী। দুই চোখের পাতা পড়ে আসা , অর্থাৎ শিবনেত্রই নার্ভ বিষের নিশ্চিত লক্ষণ। তাই শিবনেত্র দেখলেই আগে একটি আট্রোপিন ইঞ্জেকসন রুগীর শিরায় দেওয়া হয় ( Intra venous). এর পর তিন মিলি লিটার নিওস্টিগমিন ইঞ্জেকসন রুগীর শিরায় কিংবা পেশীতে ( Intra Muscular) দেওয়া হয় । IV নাকি IM দেওয়া হবে , সেটি ডাক্তারবাবু রুগীর অবস্থা বিবেচনা করে ঠিক করেন। এই দুই ইঞ্জেকসন , ফণাযুক্ত সাপের কামড়ে অত্যন্ত ভালো কাজ করে । এই দুই ইঞ্জেকসন-এর বদলে একই রকম কাজের একটি ইঞ্জেকসনও পাওয়া যায় ; সেখানে আট্রোপিন-এর বদলে গ্লাইকোপাইরোলেট ওষূধটি নিওস্টিগমিন-এর সাথে মেশানো থাকে। এমনকি যেখানে এ ভি এস নেই , সেখানেও দূরের হাস্পাতালে যাওয়ার আগে একটি এই মিশ্র ইঞ্জেকসন রুগীর শিরায় দেওয়া হলে , ফনা যুক্ত সাপের কামড়ে , নার্ভ অকেজো হওয়া ( Paralysis ) কিছুটা দেরী করে হয়।

ফণাযুক্ত সাপের কামড়ে জরুরী

প্রথম দশটি এ ভি এস দেওয়ার এক ঘন্টা পর , ডাক্তারবাবু রুগীর অবস্থা বিবেচনা করে , আরও দশটি দিতে পারেন। বিশেষ করে চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে , মোট তিরিশটি এ ভি এস ও দরকার হতে পারে।

## শহরের বড় হাসপাতালে কেন যেতে হয় **(Referral)**

নার্ভ বিষের সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে , যদি দেরী করে চিকিৎসা শুরু হয় , রুগীর শ্বাস কার্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিপদ থাকে। ডাক্তারবাবু রুগীর অবস্থা বিবেচনা করে , বড় হাসপাতালে পাঠাতে পারেন। রুগীর শ্বাস কার্য বন্ধ হয়ে গেলে , মেশিনের সাহায্যে শ্বাস কার্য চালু রাখতে হয় ( Ventilation)। ঐ মেশিন সব থেকে কাছের যে উচ্চতর হাসপাতালে আছে , সেখানেই রুগীকে পাঠানো হয়। এ ক্ষেত্রে , ঐ উচ্চতর হাসপাতালে আগেই ফোন করে জানিয়ে রাখতে পারলে খুব ভালো হয়।

চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে রুগীর কিডনী বিকল হওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করলে , যে হাসপাতালে ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা আছে , সেখানেই রুগীকে পাঠানো হয়।

## পরীক্ষা নিরিক্ষা **( laboratory Test)**

সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্য রুগীর রোগ লক্ষণই আসল I অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন পরীক্ষা নিরিক্ষা দরকারই হয় না। একমাত্র চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে রক্ততঞ্চনের পরীক্ষাটি ( 20WBCT) রুগীর বিছানার কাছেই করা সম্ভব ; এর জন্য কোন ল্যাবরেটরী লাগে না। রুগীর কিডনী বিকল হওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করলে কয়েকটি রক্ত পরীক্ষা করার দরকার পড়ে , এগুলিও আমাদের রাজ্যের সব সরকারী হাসপাতালেই বিনামূল্য করা হয়।

## অপারেশন **( Surgery)**

কামড়ের জায়গায় ঘা থেকে গেলে বা পচন ধরলে কিছু ছোটখাট অপারেশন দরকার হতে পারে। যে কোন জেলা স্তরের হাস্পাতালেই তা করা সম্ভব I এসব ক্ষেত্রে , কিংবা অনেক ফোলা থেকে গেলে , কিছু আন্টিবাইওটিক অষুধ দেওয়ার দরকার হয়। ফোলা কমানোর জন্য ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেটের পটি ভালো কাজ দেয়।

দিনে ৩ বার করে পাল্টান

উপসংহার – সাপের কামড়ের চিকিৎসায় সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন । এজন্যই সবথেকে কাছের যে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চব্বিশ ঘন্টা ডাক্তারবাবু থাকেন , সেখানেই দ্রুত , রুগীকে নিয়ে চলুন। পশ্চিমবাংলার সকল সরকারী হাস্পাতালে , সাপের কামড়ের সব রকম চিকিৎসা বিনামূল্যেই হয়। এছাড়াও সরকারী হাস্পাতালে , সাপের কামড়ের রুগী মারা গেলে , বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দপ্তর ( Disaster Management Department) থেকে , এক বা দু লাখ টাকা অনুদান পাওয়া যায়। এই অনুদানের জন্য , বি ডি ও আপিসে বিপর্যয় ব্যবস্থাপন আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করতে হয়।

## পঃ বঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর প্রকাশিত ( ২০১৬ সালে ) পুস্তিকার একটি পৃষ্ঠা

### একটি ঘটনা

চিত্র নং-১৪

গত ২৪ জুন ২০১৪ সকালবেলায় জাঙ্গীপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন ১৬ বছর বয়সের ছেলেকে পেটে ব্যাথার জন্য আনা হয়েছিল। বাড়ির লোকের ধারণা হয়েছিল আগের রাতে নিমন্ত্রণ খেয়ে বদহজম হয়েছে। কিন্তু ডাঃ শিকদার নিশ্চিত বুঝেছিলেন রোগীটি সাপের কামড়ে আক্রান্ত। আগের রাতে মেঝেতে ঘুমানো, ভোরবেলা পেটব্যাথায় ঘুমভাঙ্গা তারপর দুই চোখের পাতা পড়ে আসা এই হল রহস্যময় কালাচ সাপের কামড়ের নিশ্চিত রোগ নির্ণয়ের শিক্ষা। যেহেতু ঘুমের মধ্যে, কোন রকম যন্ত্রনাভূতি ছাড়াই কালাচ কামড়ায়, আরও বড় কথা; কামড়ের দাগ বা কোন রকম চিহ্নই থাকে না, রোগী বা তার বাড়ির লোককে বোঝানো খুব মুশকিল যে এটা সাপের কামড়। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছিল। বাড়ীর লোক, প্রথম দু ঘন্টা এ ভি এস দিতে রাজী হয়নি।

ডাঃ শিকদার নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন বলেই রোগীকে সাপের বিষের ওষুধ এ ভি এস (অ্যান্টি স্নেক ভেনাম সিরাম) দিয়ে চিকিৎসা করেছিলেন। আনুষঙ্গিক অন্যান্য ওষুধ, ইনজেকশন দিয়েও ডাঃ শিকদারের মনে হয়েছিল রোগীর শ্বাসকার্য ঠিক মত চলছে না, তাই ভেন্টিলেশনের দরকার হতে পারে। এসব চিন্তা করেই রোগীকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। মেডিকেল কলেজে কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর রোগীটি মারা যায়।

## ২৭.১০.২০২১ তাং ধান্যকুড়িয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আবার ঘটল একই মারাত্মক ভুল